প্রথম প্রকাশ : জুন/১৯৫৯
প্রথম পুনর্মুদ্রণ: পৌষ ১৪০১/জানুয়ারি ১৯৯৫

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩৩/২বি হরমোহন ঘোষ লেন,
কলকাতা ৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

সাহিত্যসমাজ এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ বিভিন্ন সময়ে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে অভিভাবক করে নেন। এক সময়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারপর এলেন রাজশেখর। একই ব্যক্তির মধ্যে গল্প-লেখক পরশুরাম ও প্রাবন্ধিক রাজশেখরের অবস্থান সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে মান্যতা এমনই ছিল, রবীন্দ্র পরবর্তী যে কোনও শারদ সংখ্যায় বা কোনও সংকলনে তাঁর প্রবন্ধ বা গল্প থাকলেই তা সর্বাগ্রে স্থান পেত। সাহিত্য ও সমাজের এই অভিভাবকত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ অসাধ্য, তবে সমাজ কতকগুলি লক্ষণ দেখেই তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেন। এই প্রসঙ্গে রাজশেখরের উক্তি উদ্ধৃত করি, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত—''সকল দেশেই অল্প কয়েকজন বিচক্ষণ বোদ্ধা সাহিত্যের বিচারকরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। এঁদের কেউ নির্বাচন করে না, নিজের প্রতিভাবলেই এঁরা বিচারকের পদ অধিকার করেন। এঁরা কেবল রচনার রস বা উপভোগ্যতা দেখেন না, সমাজের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিচার করেন। পাঠকের আনন্দ ও সামাজিক স্বাস্থ্য দুইয়ের প্রতিই তিনি দৃষ্টি রাখেন। ...সামাজিক আদর্শ চিরকাল একরকম থাকে না, সে কারণে রচনায় অল্পস্বল্প বিচ্যুতি থাকলে তিনি উপেক্ষা করেন, কিন্তু অধিক বিচ্যুতি তিনি মার্জনা করেন না। ...শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁর অভিমতই প্রামাণিক মনে করে।''

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধাবলীর বিষয়ব্যাপ্তি এবং বিষয়বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে এক বিরাট মহাদেশ উন্মোচন করে। সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মতামত এক অনায়াসলব্ধ অখণ্ডনীয় কাণ্ডজ্ঞানের উদাহরণ, যা আমাদের কাছে এক দুর্লভ প্রাপ্তি। প্রবন্ধ-গ্রন্থের এবং অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলীর কালানুক্রমিকতা বজায় রেখেই এই প্রবন্ধাবলী প্রস্তুত হয়েছে। প্রবন্ধগুলির নামেই অবশ্য বিষয়ের প্রকাশ। এই প্রখর ও মহান্ ব্যক্তিত্বের রচনায় আপাতভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সংশোধনের সাহস আমরা পাই নি। সম্পাদক শ্রী দীপংকর বসুর সর্ববিষয়ে সাহায্য ও শ্রী পবিত্র সরকারের ভূমিকার জন্য আমরা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই সমবেত প্রচেষ্টা পাঠকের সমাদর পাবে বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস। গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠক ও সমালোচকদের মতামত পেলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি যথাসাধ্য কার্যকর করব।

বিনত

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

সূচি

লঘুগুরু

বিচিন্তা

চলচ্চিন্তা

উত্তর-চলচ্চিন্তা

বিবিধ রচনা

সম্পাদনা

রাজশেখর বসুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক (বংশলতা পশ্য) মেয়ের মেয়ের ছেলে, দৌহিত্রীপুত্র। দৌহিত্রী, আমার মা, বলতেন—দাদা (এবং 'আপনি'), আমাকে শেখানো হয়েছিল—দাদু (সর্বদাই 'তুমি')। একদিন বললেন—আজ সুনির্মল বসু তোমাকে দূর থেকে দেখে জিগেস করলেন—আপনার নাতি? আমি বললাম—ঠিক নাতি নয়...ও, তাহলে পুতি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন! আর একবার বলেছিলেন— আমার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্কই নেই—মোক্ষম যুক্তি দিলেন—আমি মারা গেলে তোমার অশৌচও হবে না! (অশৌচ অবশ্য নিয়েছিলুম।)

আসলে ১৯৪২এ স্ত্রীবিয়োগের পর বকুলবাগানের বাড়িতে একা হয়ে যাওয়ায় আমার মা বাবা দেড় বছরের আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। সেই থেকে আমার অহরহ রাজশেখর সান্নিধ্য—২৭ এপ্রিল ১৯৬০, পরশুরামএর শেষ প্রস্থানের দিন পর্যন্ত। তাঁর রামায়ণ মহাভারত ও পরবর্তী সব সৃষ্টির সাক্ষাৎদর্শী, প্রথম পাঠক, অনিয়োজিত একান্ত সচিব। সর্বোপরি, জ্ঞানোন্মেষ অবধি শেষদিন পর্যন্ত (প্রায় পনর বৎসর) তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে গুরুগম্ভীর অসংখ্য বিষয়ে তাঁর গল্পচ্ছলে সরল শিক্ষাদান ও আলোচনা আমার শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানলাভ। তাই দেশী-বিদেশী সাহিত্যে, এমনকি বাংলা ভাষায়ও আমার সামান্য দখল সত্ত্বেও আজন্ম দাদুর এই শিক্ষা-সান্নিধ্য-'শ্রুতি' এবং তাঁর কাছে আসা তখনকার প্রায় সব জ্ঞানী গুণীজনের আলোচনায় আমার অনিবার্য উপস্থিতি ও তার সঙ্গে আমার অতি খুঁটিনাটি বিষয়ের (অনেকের কাছে 'বিরক্তিকর') স্মৃতিশক্তি—এই সব মিলিয়ে আমার এই একদা বাংলা ভাষার অন্যতম কর্ণধার এক অনন্ত প্রতিভাধর ব্যক্তির রচনা সম্পাদনার স্পর্ধা ও অধিকার।

॥ ২ ॥

অবশ্য প্রথমে মনে হয়েছিল—সম্পাদনা! আজন্ম দেখেছি দাদু প্রুফ দেখছেন—ছাপার ভুল ছাড়া প্রতি শব্দ বাক্য, মায় কমা দাঁড়ি ড্যাশ পাণ্ডুলিপিতে যা আছে অপরিবর্তিত থাকছে। তাঁর লেখার আবার সম্পাদনা কী করব। পরে দেখলুম, দরকার আছে। প্রথমত দীর্ঘজীবনের 'গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে' (দরভঙ্গা) থাকা, বার বৎসর বয়স পর্যন্ত বাংলা-না-জানা এক বালকের পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে ব্যবহারিক রসায়নের বিপুল মণ্ডলে স্বচ্ছন্দ আধিপত্যের পর সেই বাংলা ভাষারই অন্যতম কর্ণধার হওয়ার বিবর্তন, বহু বয়োজ্যেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে নিজমত প্রতিষ্ঠার লড়াই, বানান সংস্কারে যা সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গড়িয়েছিল, শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়া—এসব অবশ্যই

তাঁকে ক্লান্ত সংশয়াচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নিজের কিছু মতবাদ, শব্দের বানানও বদলাচ্ছেন। কোন্‌টা রাখব? অন্যদিকে তাঁর মৃত্যুর পর চল্লিশ বৎসর (এমনকি জীবদ্দশারও শেষ দিকে অশক্তির জন্য) নজর না দেওয়ায় জমে ওঠা তুমুল মুদ্রণ প্রমাদাবলী! গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের বিকৃতি ও অবলুপ্তি এই অসাধারণ সৃষ্টির বহু স্থানই কিম্ভূত করে তুলেছিল। সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।

এই সুবিশাল কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে মনে হল সব বানানের সমতা আনব? তাহলে বিবর্তনের ইতিহাস লুপ্ত হবে। অতএব প্রথম দিকের সাধুভাষায় রচনার শুধু ভ্রম সংশোধিত হল, পরের চলিত ভাষায় সংশোধন ও যথাসাধ্য সমতা। কিন্তু প্রমাদ-শিখর বিরাট অন্তরায়। পাণ্ডুলিপি প্রায় কিছুই নেই। (ছাপতে পাঠিয়ে নিজের কপি রাখতেন না। প্রুফ সংশোধন ও পরবর্তী কিছু পরিবর্তন করতেন পাণ্ডুলিপি না দেখে, স্মৃতি থেকে)। অগত্যা 'অনুমান' এবং তিনি কী ভাবতেন, কী করতেন—সেই স্মৃতি অনুসরণ করতে হল। একটা সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি। জীবনযাত্রা প্রবন্ধে—'শ্রমিকের আহার অশ্রমিকের সমান হলে চলবে না।' 'অশ্রমিক' শব্দে সংশয়। এই বিশেষ প্রয়োগে রাজশেখরীয় ছোঁয়া নেই। অনেক জায়গায় রাজশেখর বসুর সঙ্গে পরশুরামের 'মিসচিভস' মিশ্রণ রাজশেখর-প্রবন্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—এবং তা বলছে ওটা 'আশ্রমিক' হবে। এ অনুমানের সাহায্য আরও অনেক নিতে হয়েছে।

এই সূত্রে একটা সত্য কবুল করি। পরশুরাম রচনা-সমগ্র বারবার পড়ে প্রায় নখদর্পণে আনলেও রাজশেখর-প্রবন্ধ এতকাল অতি অল্পই পড়েছি। এই প্রথম দাদুর সমগ্র প্রবন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়লুম। এক নতুন জগৎ দেখা হল। সেইসঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতি বলছে—সারাজীবন দাদুর মুখে অগণিত মজার কথা, ঘটনা, চুটকি মন্তব্য শুনেছি (তখন তাঁর মুখে বহুজন পরিচিত গাম্ভীর্যের লেশমাত্র থাকত না)। আজও, দাদুর অবর্তমানের দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষেও আবিষ্কার করি সেসব কথা গম্ভীর অথচ সরসভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। আর একই কথা— রাংতার মোড়কে, ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত হয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছে পরশুরামের সব গল্পে।

এইখানে আর এক প্রাসঙ্গিক স্মৃতি—আমার শৈশবে-কৈশোরে অনেকবার শোনা দাদুর সকৌতুক উক্তি—আমি যখন ঠাট্টা করে কিছু লিখি তখন নকল নামে লিখি, আর যখন গম্ভীর হয়ে লিখি তখন আসল নামে।

তবু স্বীকার করছি আরও গবেষণা দরকার ছিল। এগোতে এগোতে বারবার বুঝেছি বহু শব্দের সমতা থাকছে না। কিন্তু বারবার পিছনো সম্ভব নয়, সাধ্যও নয়। সান্ত্বনা এই, যে সবই তুচ্ছ, গভীর কিছু নয়। এবং অধিক তাপসের শরণ না নিয়ে পদে পদে স্মরণ করেছি শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়—ভানুবাবুকে। বহু শব্দ প্রয়োগের—সংস্কৃত হলে কথাই নেই — যাথার্থ্য বিচারে (ঠিক আছে না ছাপার ভুল) তিনিই আমার অনন্য দিশারী। শংসা কিছু পেলে অবশ্যই, শঙ্কিত অভিশংসারও কিঞ্চিৎ 'অংশ' তাঁকে 'গ্রহণ' করতেই হবে। তবু বিদ্বজ্জনের কাছে যুক্তকর নিবেদন, প্রায় বিস্মৃতি, অবলুপ্তির কবল থেকে যে

রত্নখনি-উদ্ধার করেছি তার ঔজ্জ্বল্য উপভোগই মুখ্য হক। আমার ছিদ্রান্বেষণ নিতান্তই গৌণ কর্ম।

॥ ৩ ॥

পরবর্তী কঠিন সমস্যা প্রবন্ধ নির্বাচন। কোন্‌টা থাকবে, কোন্‌টা বাদ (রিগিং-এর অপবাদ না জোটে)। একই বিষয়ের পুনরুক্তি একাধিক প্রবন্ধে আছে। স্বমত প্রতিষ্ঠায় এই 'কর্ণেজপন' অবশ্যম্ভাবী। আর এক বিরল প্রতিভাধর, যাঁর অশেষ স্নেহ লাভ করেছি, দাদুর এক 'গুণমুগ্ধ, বশংবদ' ভক্ত সৈয়দ মুজতবা আলী বলতেন—গদ্যসাহিত্যে বারবার এককথা না বললে কানে জল যাবে কী করে। গানে তার দরকার নেই, সেখানে একই লাইন ফিরে ফিরে আসে। তাই যতই পুনরুক্তি থাক, তার জন্য কোনও প্রবন্ধ ত্যাজ্য নয়। (রবীন্দ্র-প্রশস্তি যে কতবার ফিরে এসেছে; থেমেছে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগে লেখা শেষ প্রবন্ধে।)

॥ ৪ ॥

সংকলন বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মত অনেকদিন মনে রেখেছিলুম। শরদিন্দু অমনিবাস দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ডায়েরিতে ২৮ ভাদ্র ১৩৪০—আজ থেকে ৬৮ বৎসর আগে লেখা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক মন্তব্যের একটি—সাময়িক রচনা (topical) পুস্তকাকারে বাহির করিবে না।—এর ব্যত্যয় আছে। বিষয়ের topicality যতই তামাদি হক, রাজশেখরের ভাষা, শৈলী, শব্দপ্রয়োগ, স্বল্পতম শব্দে বক্তব্যের স্বচ্ছতা সর্বকালীন। 'টপিকলিটি'র অভাব যুক্তিতে তার পরিহার সংগত হবে না। অন্য একটি ব্যাপারও আছে। 'উদয়ের পথে'র মুক্তির বহু বৎসর পরে ছবিটি দেখি। তখন রেশনের লাইন অবাস্তব হয়ে গেছে। তাই এতে দেখা চালের জন্য লাইন কৌতুককর লেগেছিল। তখন তা টপিকলিটি-রহিত। আরও পরে ঘটনাটি প্রবল উদ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উদিত হল; আজও তা বিদ্যমান। ক্ষণিক অবলুপ্তির পর উদয়ের পথের সে লাইন আজ আবার টপিকল। প্রায় সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির নিয়মে চক্রবৎ আবর্তিত হয়—দশ বিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পরে। তার বর্জন অনুচিত।

এই সব ভেবেই আপাতত বিশল্যকরণীর সন্ধানে বিরত থেকে যথালভ্য সমগ্র প্রবন্ধই রাখা হল। অন্তত একটা যথাসাধ্য প্রামাণিক দলিল লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা তো হল—আরও অনেক ছিল জেনেও। আমি নিরুপায়, সে সব লুপ্ত।

॥ ৫ ॥

এই সুযোগে দুটি সামান্য দোষের কথা উল্লেখ করছি—আমার নয়—দাদুর। তাঁর ভাষা যতই সরল হক বহু সুপরিচিত শব্দের এমন বিকল্প রূপ ব্যবহার করেছেন যা

সাধারণের নাগালের বাইরে ('খ্যাপন' অর্থাৎ প্রচার, জ্ঞাপন)। 'প্রতিযোগ' দেখে হোঁচট-খেতে হয়—ছাপার ভুলে 'প্রতিযোগিতা'? দুটোই এক—চলন্তিকা উবাচ। অবশ্য এই 'দোষ' থেকে মস্ত লাভ—নতুন কিছু শেখা গেল; জানাও গেল—একটা ই-কার, একটা ত ও একটা আ-কার বাদ দিয়ে যদি শুদ্ধি বজায় থাকে তবে অযথা আড়ম্বর কেন। তবে সমগ্র প্রবন্ধে একটিমাত্র শব্দ পেয়েছি যা বোধহয় কোনও বাংলা অভিধানে নেই। প্রথম প্রবন্ধ নামতত্ত্বে ব্যবহৃত 'গরদখোর নাম'। কিছুতেই যখন ভেবে পাচ্ছি না ওটা কিসের 'প্রমাদ' তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলুম ওটা হিন্দী শব্দ। একটা হিন্দী অভিধানে পেয়েছি—যা গর্দ বা ময়লা খায় বা সাফ করে। তবু এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঠিক বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয় দোষ, অনেক ক্ষেত্রে শব্দের ভুল বা দোষ উল্লেখ করলেও তার সঠিক বিকল্পের নির্দেশ নেই, যেমন বাধ্যতামূলক, আইন-অমান্য-আন্দোলন ইত্যাদি। বহুপ্রচলিত 'অংশগ্রহণ'এ প্রবল আপত্তির কারণ অবশ্য সোজা; ওটা ইংরেজির কণামাত্র নকল তাঁর কাছে পুরীষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল বলে। Take part, অতএব অংশ-গ্রহণ। সাঁতারে বা আলোচনায় অংশ নেওয়া মানে? সাঁতারের কোন্ বা কতটা বখরা? খাঁটি বাংলা 'যোগদান' সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হল কোন্ দোষে?

॥ ৬ ॥

এই বৃহৎ কর্মের এক প্রেরণা কয়েক বৎসর আগে কলকাতা দূরদর্শনে এক আলোচনায় শ্রদ্ধেয় পবিত্র সরকারের উক্তি—আগেকার সেসব চমৎকার লেখা আর কোথায়, রাজশেখর বসুর কত বিস্তৃত ক্ষেত্রে কত সরস স্বচ্ছন্দ প্রবন্ধ। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই সংকলনে তাঁব ভূমিকার জন্যও আমি ধন্য। সত্যই অমূল্য তাঁর কৃত দাদুর রচনার মূল্যায়ন।

কিছু প্রবন্ধ সামান্য টীকাভারাক্রান্ত করার লোভ সামলাতে পারিনি—গভীর বিশ্বাস নিয়ে, যে তা নিতান্ত বিরক্তিকর লাগবে না।

সব প্রবন্ধের রচনাকাল দাদু বঙ্গাব্দে (১৩...) লিখতেন। বিজ্ঞানসম্মত শকাব্দ প্রচলনের পর তাই (১৮...) লিখেছেন। কিন্তু আমি লজ্জিত; এখনও সময়ের সঠিক

তবু বিকটতম মাছিমারাটা দেখতে হয়নি—work culture। ওয়র্ক মানে কর্ম, কাল্চর অবশ্যই একমেবদ্বিতীয়ম্ সংস্কৃতি—অর্থাৎ কর্মে অবহেলা কর না, খুব সংস্কৃতি— গান বাজনা চালাও। রীতিমতন ওয়াক (বমি) কালচর। বিশুদ্ধ কর্মনিষ্ঠাকে গুমখুন করা হল কোন্ মহাপাতকে? নানান ইনফেকশন লেগে থাকলে কি যেন একটা কালচর করা হয়—কি একটা সংস্কৃতি!

পরিপ্রেক্ষিত পাওয়ার জন্য খ্রিষ্টাব্দই সহজ, তাই প্রতি রচনায় বঙ্গা-শকের সঙ্গো আনুমানিক খ্রিষ্টাব্দ দেওয়া হল।

অপর এক অপরিচিতজনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। Statesman পত্রিকার উল্লেখ দাদুর অনেক প্রবন্ধে আছে। অগস্ট ২০০০এ তারই এক রবিবাসরীয় Impressionএ শ্রীজ্যোতি সান্যাল মহাশয় লিখেছিলেন—

Indians who wish to write good English need to first study writing in our regional languages. Bengalis have in short stories by Parashuram and Rabindranath Tagore perhaps the world's best models for precision and economy of languages. In his first three collections...Parashuram's prose defies editing. Not a word is excess; every sentence is stripped to its cleanest component.

দাদুর মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে তাঁর সম্বন্ধে এই এক অদৃষ্টপূর্ব মন্তব্য পেলুম, যা তাঁর প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। দৃঢ়তার সঙ্গো বলতে পারি একে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের এক বিরাট সম্মান মনে করতেন।

অনেক হাটের মাঝে এবার দাঁড়ি দিচ্ছি॥

ভূমিকা

রাজশেখর বসু-পরশুরাম (১৮৮০-১৩৬৫) যাকে বলেন 'ললিত সাহিত্য', (ইদানীং আমরা যাকে বলি সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম)—তা রচনা করা তাঁর পক্ষে যতটা আকস্মিক ও অভাবিত, প্রবন্ধরচনা ততটা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র, পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের জবরদস্ত প্রশাসক, অসাধারণ এক অভিধানকার এবং ভাষা-নিয়ামক রাজশেখর তাঁর ন-টি গল্পের বইয়ের প্রায় একশোটি গল্পের একটিও লিখলেন না, এমন হতেই পারত, হওয়াই খুব স্বাভাবিক ছিল। হয়তো কেবল সংকলন করলেন 'চলন্তিকা' (১৯৩০), লিখলেন 'লঘুগুরু' (১৯৩৯/১৩৪৬), 'কুটিরশিল্প' (১৯৪৩/১৩৫০), 'ভারতের খনিজ' (১৯৪৩/১৩৫০), 'বিচিন্তা' (১৯৫৫/১৩৬২), 'চলচ্চিন্তা' (১৯৫৮/ ১৩৬৫) ইত্যাদি গ্রন্থের অন্তর্ভূত এবং অগ্রন্থিত নানা প্রবন্ধ। তাহলে তা আমাদের মনে খুব একটা বিস্ময় উৎপাদন করত না। তাঁর যে শিক্ষাদীক্ষা, কর্মক্ষেত্র, উপরন্তু ভাষা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিনিবেশ ও বিশেষজ্ঞতা—তাতে এ ধরনের রচনা তাঁর কলম থেকে মোটেই অনপেক্ষিত নয়। তারও উপরে তিনি যে অনুবাদ করলেন 'মেঘদূত' (১৯৪৫/১৩৫২), বাল্মীকির রামায়ণ (১৯৪৬/১৩৫৩), ব্যাসদেবের মহাভারত (১৯৪৯/১৩৫৬), এবং 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' (১৩৬৫)— তাও আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতেই পারি, কারণ তখনকার দিনে বিজ্ঞানের ছাত্ররাও সংস্কৃত ভাষায় অনেকেই বিশেষ পারদর্শী হতেন। আর রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখরের সংস্কৃত ভাষা এবং বেদান্তদর্শনে গভীর অনুপ্রবেশ ছিল, বাড়িতে সংস্কৃতভাষা সমাদৃত ছিল, চন্দ্রশেখর বেদান্তের নানা বিষয়ে একাধিক ভাষ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ-নিয়ন্ত্রিত গুরুগম্ভীর ভাষার পাশে রাজশেখরের অত্যন্ত সহজ শিশুবোধ্য ভাষায় পুনঃকথিত 'হিতোপদেশের গল্প' (১৯৫০/১৩৫৭) হয়তো একটু সচকিত করে। তবু সহজ সরল অন্তরঙ্গ ভাষায় বাংলা লেখাও সম্ভবত তাঁর পারিবারিক ঘরানার অন্তর্গত ছিল। তাঁর বাবার কোনো রচনা আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু যিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যস্থানীয় এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাঁর ভাষাশৈলীর আদর্শ দেবেন্দ্রনাথের অতিশয় প্রসাদগুণসম্পন্ন গদ্য হওয়াই সম্ভব। তাঁর দাদা শশিশেখরের বাংলা গদ্যও ছিল স্বচ্ছ ও সরসতাপূর্ণ।

শুধু উপরে তালিকাবদ্ধ সব গ্রন্থের রচয়িতা—তাঁর প্রধান সব অনুবাদও এক ধরনের রচনাকর্ম—হয়ে থাকলে তিনি কেবল রাজশেখর বসুই থাকতেন, পরশুরাম হতেন না—এ তো সংগত সিদ্ধান্ত।

এই কথা বলা সত্ত্বেও আমরা রাজশেখর এবং পরশুরামের মধ্যে কোনো স্থায়ী বিভাজন রচনা করতে চাই না। আমরা অন্যত্র প্রমথনাথ বিশীর এই কথা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারিনি যে, "এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন,

এমন আর কোনো লেখক রাখতে পেরেছেন কি না সন্দেহ।" পরশুরাম রাজশেখরের কাছে নিশ্চয়ই হাত পেতেছেন তাঁর গল্পগুলির অন্তবর্তী বিপুল অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যের জন্য, কিন্তু রাজশেখরের প্রবন্ধেও মাঝে মাঝে পরশুরামের ছায়া পড়েছে। "আমিষ ও নিরামিষ" ('চলচ্চিন্তা') প্রবন্ধে সরস সংলাপ গ্রন্থনা ও বক্তাদের সংলাপবাহিত চরিত্রচিত্রণ, 'লঘুগুরু'-র "প্রার্থনা"-য় গল্পের প্রাক্‌সূত্র, 'বিচিন্তা'র "ভেজাল ও নকল" এবং "সমদৃষ্টি" প্রবন্ধে নিজের জীবনখণ্ডের দুটি ছিন্ন চিত্র দিয়ে গল্পের ধরনে প্রবন্ধের উপক্রম রচনা—ইত্যাদি রাজশেখরের পিছনে পরশুরামের অদৃশ্য উপস্থিতির প্রমাণ। একেবারে বিশুদ্ধ জ্ঞাপনাত্মক (শুধু জানানোর জন্য লেখা) প্রবন্ধ অবশ্যই আছে 'ভারতের খনিজ' বা 'কুটিরশিল্প' যেমন—কিন্তু তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ উভয়ে যে উভয়ের কাছ থেকে মনোভঙ্গি, শৈলী ও অভিজ্ঞতার (জীবন ও গ্রন্থগত) নানা সূত্র গ্রহণ করেছে তা আমরা লক্ষ করব। বিশেষ করে সামাজিক এবং সামাজিক আচরণ ও বিশ্বাসগত নানা প্রবন্ধেই এমন প্রবন্ধ-প্রকরণের সীমা ভাঙার প্রবণতা যেন একটু বেশি।

২

তবু গল্প গল্পই, প্রবন্ধ প্রবন্ধ। উভয়েই পাঠকের কাছে কিছু বলতে চায়, কিন্তু দুয়ের লক্ষ্য ও বলার ভঙ্গি মূলত পৃথক, ফলে দুয়ের প্রতি পাঠকের সাড়াও ভিন্ন, এবং দুয়ের পাঠকচরিত্রও এক নয়। গল্পসাহিত্য সাধারণ ও ব্যাপক পাঠকসমাজকে লক্ষ করে, প্রবন্ধ সাহিত্য বেশির ভাগ সময়ে এই ব্যাপক পাঠকসমাজের দ্বারা গৃহীত হয় না। কখনও তা একেবারেই বিশেষ জ্ঞান বা সংবাদমুখী পাঠকের প্রত্যাশী, যেমন অভিধান ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা, বানান সমতা ইত্যাদি সংক্রান্ত বা 'ভারতের খনিজ' জাতীয় প্রবন্ধে, আবার কখনও তা তুলনায় একটু ব্যাপক পাঠকদের জন্য প্রস্তুত হয়, যেমন পোশাক, খাদ্যাখাদ্য, বিশ্বাস কুসংস্কার, সমদৃষ্টি ইত্যাদি মূলত সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা নানা প্রবন্ধে। পরশুরাম দীর্ঘদিন ধরে, গল্পরচনার প্রায় অব্যাহত ধারাবাহিকতার ফাঁকে ফাঁকে প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তাঁর এসব প্রবন্ধ সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত উপলক্ষ্যে লেখা হয়নি। 'ভারতের খনিজ' বা 'কুটিরশিল্প' বিশ্বভারতীর অনুরোধে লেখা, সে অনুরোধ না এলে তিনি লিখতেন কি না সন্দেহ। আবার বেশ কিছু নৈমিত্তিক প্রবন্ধ আছে যা হয়তো সেই মুহূর্তের কোনো উপলক্ষ্যের তাগিদে কোনো সম্পাদকের অনুরোধে লেখা, নাতিদীর্ঘ, অবিশদ, কিছুটা দায়পালনের প্রয়াস দ্বারা চিহ্নিত, যেমন 'চলচ্চিন্তা'-র "অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর", 'বিচিন্তা'-র "কবির জন্মদিনে" ইত্যাদি। কিন্তু বেশির ভাগ প্রবন্ধ, যেগুলিতে একটি প্রসঙ্গ নানা উদাহরণ ও আলোচনার সাহায্যে অল্পাধিক বিস্তারিত রূপ পেয়েছে, তাঁর নিজস্ব কর্ম ও অভিজ্ঞতার উৎস থেকে আরব্ধ এবং রূপায়িত। এগুলি যেন তাঁর জীবন ও কর্মের সম্প্রসারণ, শুধু ভাবনার নয়। ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও আলোচনার আগে, গ্রন্থ, অভিধানের সঙ্গে যুক্ত বাংলা ব্যাকরণতত্ত্ব, অনুবাদের ভূমিকা ও ভাষ্য ইত্যাদি বাদ দিয়ে এ গ্রন্থে যে সব

প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে সেগুলির একটা মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করি।

ভাষা ও বানান সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি বিশেষার্থী ও বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য। সেগুলির মধ্যে একটি প্রায় অক্ষুণ্ণ ধারাবাহিকতা আছে, 'লঘুগুরু' থেকে আরম্ভ করে 'চলচ্চিন্তা' পর্যন্ত তিনটি নিছক প্রবন্ধের সংকলনেই একাধিক এ ধরনের প্রবন্ধ আছে, এ ছাড়াও একই বিষয়ে যেমন আছে অগ্রন্থিত কিন্তু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ, তেমনই আছে নানা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে লেখা চিঠি। আগেই বলেছি, এগুলি ভাষা বানান পরিভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজশেখরের নানা কর্ম ও দায়িত্বের সূত্রে রচিত। রাজশেখর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত উভয় সমিতির (১৯৩৪, ১৯৩৫) সর্বমান্য সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সমিতিতে সুনীতিকুমারের উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সত্ত্বেও তিনি যে এদুটি দায়িত্বের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন, তা তাঁর এ লেখাগুলি পড়লেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এই প্রবন্ধগুলি হল—'লঘুগুরু'-র "নামতত্ত্ব", "ভাষা ও সংকেত", "সাধু ও চলিত ভাষা", "বাংলা পরিভাষা", "ভাষার বিশুদ্ধি", "বাংলা বানান", "বাংলা ছন্দের শ্রেণী"; 'বিচিন্তা'তে আছে "ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার", "বাঙালীর হিন্দীচর্চা", "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান", "বাংলা ভাষার গতি"; আর 'চলচ্চিন্তা'য় এ সংক্রান্ত লেখাগুলি হল "বানানের সমতা ও সরলতা", "আচার্য উপাচার্য"। অগ্রন্থিত লেখার মধ্যে পাচ্ছি "ভুল নাম ও নকল জিনিস", "বাংলা বানানের নিয়ম" (এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সমিতির সুপারিশগুলির (তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৩৬) পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে, তবে রাজশেখরের একটি ছোটো ভূমিকা, এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের চিঠির—(আসলে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, শরৎচন্দ্র তাঁর স্বাক্ষরের নীচে স্বাক্ষর করেছেন মাত্র)—প্রতিলিপি আছে। দুটিই 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত। এ ছাড়া আছে কিছু চিঠি ও অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি— একটি জামসেদপুরের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক সুস্থিরকুমার বসুকে লেখা (২৪/১২/৪০), 'বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক রূপ ও তাহা সর্বজনমান্য করিবার উপায়' সম্বন্ধে, আর একটি অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা" প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় লেখা, ৫-৯-৪৮ তারিখের পাণ্ডুলিপি। আরও একটি পাণ্ডুলিপি আছে সরকারি পরিভাষা সম্বন্ধে এবং এ সংক্রান্ত শেষ লেখাটি হল 'বাংলা অক্ষরের' সংস্কার। পাণ্ডুলিপি ও পত্রগুলি কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল কি না সে বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য আপাতত আমাদের কাছে নেই।

সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে 'লঘুগুরু'-র "রস ও রুচি", "সাহিত্যবিচার", "সংকেতময় সাহিত্য", "রবীন্দ্র-পরিবেশ", 'চলচ্চিন্তা'-র "অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর", "গল্পের বাজার", "সাহিত্যের পরিধি", "কবির জন্মদিনে" "সাহিত্যিকদের ব্রত"; 'বিচিন্তার' "নিসর্গচর্চা", "সংস্কৃতি ও সাহিত্য" এবং অগ্রন্থিত "ছোটগল্প বলতে কি বোঝায়"।

সমাজ-মানসিকতা ও সামাজিক প্রথা, স্বভাব ও আচরণ বিষয়ে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ আছে। 'লঘুগুরু'-র "ডাক্তারি ও কবিরাজি", "ভদ্র জীবিকা", "ঘনীকৃত তৈল", "খ্রিষ্টীয়

আদর্শ'', ''তিমি''; 'চলচ্চিন্তা'-র ''আমাদের পরিচ্ছদ'', ''আমিষ-নিরামিষ'', 'বিচিন্তা'-র ''বিলাতী খ্রিষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু'', ''ভেজাল ও নকল'', ''জীবনযাত্রা'', 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন'', ''সমদৃষ্টি'', ''অশ্রেণিক সমাজ'' তার মধ্যে পড়বে। ব্যাপকতর ভাবে জাতীয় রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলিও হয়তো আসবে, যেমন 'চলচ্চিন্তা'-র ''স্বাধীনতার স্বরূপ'', 'বিচিন্তা'-র ''ভারতীয় সাজাত্য'', এবং অগ্রন্থিত ''বঙ্গ-বিহার''।

আমাদের বিশ্বাস, সংস্কার ও বিজ্ঞানভাবনা নিয়ে রাজশেখরের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে কিছু সামাজিক প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন 'লঘুগুরু'-র ''ডাক্তারি ও কবিরাজি''। কিন্তু ওই বইয়েরই ''অপবিজ্ঞান'', ''প্রার্থনা'' এবং 'বিচিন্তা'-র ''ইহকাল পরকাল'' ও ''বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি''-কে আলাদা করে তালিকাবদ্ধ করতে হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে পাই একটিমাত্র পৃথক প্রবন্ধ, 'চলচ্চিন্তা'-র ''শিক্ষার আদর্শ''। আর আছে তিন জন অসাধারণ বাঙালির জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, আগে অগ্রন্থিত—''লোকহিতৈষী প্রফুল্লচন্দ্র'', ''কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'' ও ''ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়''।

আমরা আগেই বলেছি, বিষয় অনুসারে প্রবন্ধাবলির এ ধরনের বিভাজন খানিকটা কৃত্রিম ও সুবিধা-নির্দেশিত। এক বিষয় নানা প্রসঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে, কিন্তু মূলত বিষয়ের প্রাধান্য ও প্রাথমিকতাকে ভিত্তি করে এ ধরনের বিভাগ করে নিলে আলোচনার পক্ষে সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, বিষয়-অনুযায়ী তালিকা থেকে আমরা বুঝতে পারি রাজশেখরের প্রধান ও স্থায়ী মনোযোগের প্রসঙ্গ কোন্‌গুলি ছিল, এবং তাঁর মনোযোগ আর অগ্রাধিকারের একটি ক্রমও এভাবে হয়তো নির্দেশ করা চলে। হয়তো, কিন্তু সম্পূর্ণত নয়। কারণ লেখাগুলির প্রত্যেকটির বিস্তার ও ভাবনার নানামুখিতা তাঁর মনোযোগের আর একটি প্রমাণ, ''আমিষ ও নিরামিষ'' প্রবন্ধটি যার নিদর্শন। তবু ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ যেখানে তিনি লিখছেন ১৯২৩ থেকে, এবং শেষ লেখাটি লিখেছেন ১৮৮০ শকে, সম্ভবত ১৯৫৮-তে। আর নানা সময়ে লিখেছেন তিনি মোট কুড়িটি প্রবন্ধ বা পত্রপ্রবন্ধ। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ আছে বারোটি, কিন্তু সবগুলি সমান বিশদ নয়, বোঝাই যায় সেগুলি 'অনুরোধে বা উপলক্ষ্যে'র তাগিদে লেখা। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক লেখা ষোলোটি, ফলে বিষয়ের এবং অভিনিবেশের গুরুত্বে, আমাদের মনে হয়, এগুলির স্থান ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির পরেই, যদিও ''বঙ্গ-বিহার''-এর মতো দু-একটি লেখা স্পষ্টতই উপলক্ষ্যতাড়িত। আবার ''লোকহিতৈষী প্রফুল্লচন্দ্র'' নিবন্ধটিকে এর মধ্যেও পার্শ্বিকভাবে স্থান দেওয়া যায়। বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে লেখা চার-পাঁচটি প্রবন্ধও গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-বিষয়ক প্রায় নিঃসঙ্গ প্রবন্ধটি, ''শিক্ষার আদর্শ''। ফলে গুরুত্বের নানা প্রমিতি ও মাত্রা অনুযায়ী তাঁর অগ্রাধিকারকে বিচার করেই এ সম্বন্ধে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে হবে।

আসলে রাজশেখরের প্রবন্ধাবলি যদি প্রসঙ্গ অনুসারে সংকলিত ও গ্রন্থিত হত, তাহলে আমাদের দায়িত্ব কমত, তাঁর মনন ও সংবেদনের ক্ষেত্র খুব সহজেই নির্দেশ করা

যেত। কিন্তু এক-একটি বইয়ে নানা প্রসঙ্গের রচনার বিমিশ্র সংকলন প্রস্তুত হওয়ায় তাঁর লেখাগুলিকে আমাদের মতো করে সাজিয়ে নিতে হয়েছে।

৩

ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে তাঁর চিন্তা বহুধা ও বিচিত্র। কখনও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এবং অর্থানুযায়ী উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ বা নির্মাণ (শব্দার্থ-তত্ত্ব বা সিম্যানটিক্‌স), কখনও বাংলা ভাষার শৈলীগত আদর্শের চিন্তা, কখনও বর্তমান সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন কোন্ উপভাষা হবে সে বিষয়ে ভাবনা, কখনও বা ভাষার লিখিত রূপের শারীরিক পরিচর্যা—যা ভাষার আদর্শায়নের পক্ষে জরুরি। বাংলা ছন্দের শ্রেণিবিভাগের উপরেও দুটি প্রবন্ধ আছে।

"নামতত্ত্ব" প্রবন্ধটি দাঁড়িয়ে আছে একটি নৈয়ায়িক প্রশ্নের উপর, নাম ও নামীর কোনো গুণগত অভেদ থাকে কি না, বিশেষত proper name-এর connotation আছে কি না। ভাষাবিজ্ঞান ও যুক্তিবিজ্ঞান বলে, নেই। তবু সরস কৌতুকছলে রাজশেখর নামের লৌকিক ও আক্ষরিক অর্থ যদি কোনোভাবে ব্যক্তি বা সমাজ গ্রহণ করে তাহলে কী বিভ্রাট দাঁড়ায় তা নিয়ে নানা জল্পনা করেছেন। তারই মধ্যে পদবির বানান, শ্রী ও মিস্টার, শ্রীমতী ও মিস্ বা মিসেস্ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সংগত সুপারিশ আছে। "ভাষা ও সংকেত" নামে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে অর্থের আর একটি মাত্রা—ব্যঞ্জনা, যার বাহন "সর্বথা নমনীয় নির্বাধ ভাষা"— তা-ই যে সাহিত্যের যথার্থ ভিত্তি তা প্রতিষ্ঠা করেছেন পরিভাষা দরকার, কিন্তু 'ললিত সাহিত্যে' নয়। ব্যঞ্জক দরকার, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রবন্ধে নয়। পরিভাষার ব্যঞ্জনারিক্ততা তাকে সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ্য করে রাখে। এ প্রবন্ধটি, মনে হয়, আরও বিশদ হতে পারত। 'চলচ্চিন্তা'-র একটি প্রবন্ধ "সাহিত্যের পরিধি"-তে এই নাম সত্ত্বেও শব্দার্থতত্ত্বই মূল আলোচ্য,—কীভাবে বিভিন্ন লোক একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধরে নিয়ে অর্থহীন তর্কে কাল ও শক্তিক্ষয় করে। নিপুণ অভিধানকার রাজশেখর জানতেন, ভাষার সাধারণ শব্দমাত্রেরই একাধিক অর্থ থাকে, এখানেই একার্থমাত্রিক পরিভাষার সঙ্গে সেগুলির তফাত। তবে এই বহু-অর্থকতার মাত্রা ও স্তর সব শব্দের ক্ষেত্রে সমান নয়। কোনো কোনো অর্থ মূলের বিভাজন, বিস্তার বা বিবর্তন, কোনো কোনো অর্থ সম্পূর্ণত ভিন্ন উৎস থেকে এসে এক শব্দের শরীরে ঢুকে গেছে, যেমন রাজশেখরের দৃষ্টান্তে 'ঘোড়া' ('চতুষ্পদ দ্রুতগামী তৃণভোজী জন্তু', আর 'যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়')। এগুলি আসলে এক শরীরে দুটি (বা তার বেশি) শব্দ। "আচার্য উপাচার্য" প্রবন্ধে ('বিচিন্তা') রাজশেখরের পরিভাষা-জনিত উদ্‌বেগের কারণ তার প্রয়োগযোগ্যতা ও যথার্থতা শুধু নয়, একটি সার্বিক ব্যবস্থার মধ্যে তার স্থান, তাতে একটির সঙ্গে আর একটি পরিভাষার সম্পর্ক। দুর্গামোহন ভট্টাচার্যের সুপারিশ মেনে তিনি আচার্য-এর (চ্যান্সেলর) জায়গায় চেয়েছেন 'মহাধিপাল', 'উপাচার্য'-এর জায়গায় 'অধিপাল'। আমার মনে হয় এ সুপারিশ আমাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল। আসলে "কালক্রমে অনেক শব্দের মানে

বদলায়" এবং এক শব্দের একাধিক অর্থ দাঁড়িয়ে যায়—এই দুই বিপত্তি এড়ানোর জন্যই যে পরিভাষা নির্মাণ করতে হয় তা রাজশেখর খেয়াল করেন। এগুলি হল পরিভাষা-নির্মাণের তাত্ত্বিক বা নৈয়ায়িক ভিত্তি বা যুক্তি। "গ্রহণীয় শব্দ"-তে পরিভাষা গ্রহণে তাঁর যে একটি উদারনীতি তা লক্ষ করে আমাদের ভালো লাগে। যথার্থ ব্যাকরণসম্মত পরিভাষা যেমন চাই ('নিষ্প্রদীপ' নয় 'অপ্রদীপ'), তেমনই 'পিগ্-লোহা'-তেও তাঁর আপত্তি নেই। নানা প্রচলিত পরিভাষার ব্যাকরণগত বিচারে তাঁর ব্যাকরণ-সতর্ক মনটি অবশ্য বেরিয়ে পড়ে। অগ্রন্থিত "ভুল নাম ও নকল জিনিস"-এ বিজ্ঞাপনে বিক্রেতার স্বার্থে কীভাবে ভুল পরিভাষা তৈরি করে লোক-ঠকানোর ব্যবস্থা চলে তা চমৎকার দেখিয়েছেন। 'লঘুগুরু'র "বাংলা পরিভাষা" পরিভাষা সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক বিচার, এবং ভারতীয় ও বাংলা ভাষায় যাঁরা পরিভাষা রচনা করেন তাঁদের অবশ্যপাঠ্য।

ওই প্রবন্ধে এবং সরকারি পরিভাষা সংক্রান্ত দুটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধে রাজশেখর পরিভাষা-নির্মাণের তাত্ত্বিক যুক্তির বাইরে এসে কিছু 'শারীরিক' যুক্তি তৈরি করেছেন, বলেছেন ইংরেজি পরিভাষাকে যদি স্থানচ্যুত করতে হয় তবে ১. সর্বভারতে প্রচলনযোগ্য 'ভারতীয়' পরিভাষা চাই, কিন্তু ২. জনপ্রিয় প্রচলিত ফারসি ও ইংরেজি শব্দ চলতেই পারে, তবে ৩. সংস্কৃত শব্দের কাছেই বেশি করে হাত পেতে পরিভাষা সৃষ্টি করতে হবে। অগ্রন্থিত ওই দুটি পাণ্ডুলিপি আসলে মূলত একই লেখার প্রতিলিপির মতো—তা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ করবেন। তবে পরিভাষা থেকে অ-পরিভাষায় রাজশেখরের পরিক্রমা ভাষার একদিককার একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। সুনির্দিষ্ট অর্থ থেকে অনির্দিষ্ট, ব্যঞ্জিত, বিভক্ত, বিবর্তমান, অস্থায়ী ইত্যাদি নানা অর্থের মধ্যে যে ভাষার বাসস্থান তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না।

আর-একটা জিনিস চমৎকৃত হয়ে দেখি। বিশেষ করে শব্দার্থের বিবেচনা শুধু তাঁর কাছে আর ব্যাকরণবিদের শুষ্ক বিবেচনা থাকে না, তা সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার সঙ্গেও প্রায়ই মিশে যায়। "ভুল নাম ও নকল জিনিস" নিবন্ধটি তার নিদর্শন।

আসলে পরিভাষা যেমন অর্থের দিক থেকে শব্দকে সুনির্দিষ্ট করে, এবং ভাষার মনন, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিকতার ভিত্তি সবল করে, তেমনই অন্যদিকে অতিকথন, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, শব্দাড়ম্বর ও ভাষার অস্পষ্টতাকে ধ্বংস করে। ফলে ভাষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে বিজ্ঞানমনস্ক এবং ঋজুকথন-প্রিয় রাজশেখর ছিলেন সমস্ত অস্পষ্টতা ও অতিকথনের প্রবল শত্রু! 'লঘুগুরু'-র "ভাষার বিশুদ্ধি"-তে সেই ১৯৪৩ থেকেই তিনি আমাদের সতর্ক করছেন, 'পূর্বাহ্নেই' না লিখে 'পূর্বেই' লেখা যায়, 'কার্যকরী'-র বদলে 'কার্যকর' দিব্যি চলে, 'পরিস্থিতি'-র বদলে 'অবস্থা' যেমন। প্রমথনাথ বিশীর একটি গল্পে, মনে পড়ছে, কাগুজে ভাষার এই 'পরিস্থিতি' নিয়ে ব্যঙ্গ ছিল। এইসব কাগুজে 'জার্নালিজ' (journalese) অপপ্রয়োগ সাধারণ লেখাতেও বিস্তারিত হয়েছে, তার আলোচনা তিনি করেছেন 'বিচিন্তা'-র "ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার" প্রবন্ধে, যেখানে আরও বহু এরকম

দৃষ্টান্ত তুলেছেন তিনি : 'ব্যর্থ হইবে' না লিখে 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে', 'হিন্দীভাষী' না লিখে 'হিন্দীভাষাভাষী' লেখা যেমন। সংস্কৃত শব্দের ভুল অর্থে প্রয়োগ এরকম আর একটি দোষ। নামকরণে (সন্তান থেকে দোকানের) যে ধরনের স্বপ্নবিলাস দেখা যায়, তা রাজশেখরের মতে, কেবল বাঙালির পক্ষেই সম্ভব। এ বইয়ের "বাংলা ভাষার গতি" প্রবন্ধেও এই প্রসঙ্গ অংশত আলোচিত হয়েছে। রাজশেখর লক্ষ করেছেন, "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান" রচনার প্রধান কণ্টক এইগুলি, শুধু পরিভাষার অভাব নয়। সেই সঙ্গে আছে ইংরেজি থেকে আক্ষরিক অনুবাদের কৃত্রিম ও আড়ষ্ট শৈলী, কখনও-বা অকারণ উচ্ছ্বাস ও কাব্যিকতা, কখনও নিখাদ অল্পজ্ঞান।

ভাষার, বিশেষত লিখিত ভাষার শারীরিক প্রসঙ্গগুলির মধ্যে দুটি প্রধান। একটি বর্ণমালা ও লিখনরীতির সংস্কার, অন্যটি বানানের সরলতা ও সমতাবিধান। একটি আর-একটির উপর অংশত নির্ভরশীল—রেফের নীচে একটি ব্যঞ্জন লিখলেই বানান সরল হবে। "বাংলা অক্ষরের সংস্কার" প্রবন্ধে তিনি যে-সব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উদার হল বাংলা লিখতে রোমক লিপির ব্যবহার। এ কাজে কী অসুবিধা তা আমরা অন্যত্র, ('ভাষা দেশ কাল' বইয়ের "রোমক লিপি ও ভারতীয় ভাষা" প্রবন্ধে) দেখিয়েছি। কিন্তু অন্যান্য সুপারিশ, যথা কিছু যুক্তব্যঞ্জন হস্‌ চিহ্ন দিয়ে ভাঙা, যুক্তব্যঞ্জনের 'স্বচ্ছতা', তুচ্ছ কারণে বর্ণবাহুল্য (আগে ও মধ্যে দু-রকমের এ-কার) ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য, কিছু এর মধ্যে গৃহীতও হয়েছে। বর্ণের ঘাড়ে ফুটকি চিহ্ন দিয়ে সমবর্গীয় নাসিক্যব্যঞ্জন বোঝানোর প্রস্তাব সংগত, কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রবল বাধা আমরা লক্ষ করেছি।

বানানের সরলতা ও সমতা সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার অধিকাংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬-এর প্রস্তাবগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে, ফলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। 'লঘুগুরু'-র "বাংলা বানান" প্রবন্ধটি তবু উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি লক্ষ করেন প্রাদেশিক উপভাষার প্রভাব কীভাবে বানান ভুলের দিকে আমাদের চালিত করে। ভাষা সম্বন্ধে আর যে প্রসঙ্গটিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল, সাধারণ সাহিত্যের বাহন কোন্‌ লেখ্য উপভাষা হবে—সাধু না চলিত? এইখানে রাজশেখর সুদক্ষ ভাষাবিজ্ঞানীর মতো, কিছুটা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সূত্র গ্রহণ করে, 'মৌখিক' ও 'লৈখিক' এই দুটি ভাষার মধ্যে তফাত আমাদের খেয়াল করতে বলেন। লৈখিক ভাষার আবার দুটি রূপ আছে বাংলায়—সাধু ও চলিত। রাজশেখর বিশেষ যত্ন নেন মৌখিক ও চলিত-এর পার্থক্য বোঝাতে। মৌখিক যেখানে অ-মান্য (non-standard) উপভাষা মাত্র, সেখানে চলিত একটা সর্বমান্য স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শ ভাষা। মৌখিক ভাষা 'অযত্নলব্ধ', কিন্তু 'লৈখিক' চলিত যত্ন করে শিখতে হয়। আমাদের 'মাতৃভাষা' সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি—তার জন্ম এই মৌখিক ও চলিতের পার্থক্য ভুলে যাবার ফলে। রাজশেখর 'চলন্তিকা'র প্রস্তাবনাতেও ওই পার্থক্যের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, এ প্রবন্ধেও তাঁর উদারতা লক্ষ করি আমরা, চলিত ভাষার বিবর্তনে সর্ববঙ্গের দানের উল্লেখ করতে

ভোলেন না তিনি, আর পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার সঙ্গে তার দূরত্বও দেখিয়ে দেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি নিজে ১৯৩০ সাল থেকেই চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখছেন, ১৯৩২-এ "প্রেমচক্র" গল্পে এলেন চলিত ভাষায়।

এ পর্যন্ত বাংলা ভাষারই নানা রূপের (উপভাষার) মধ্য থেকে নির্বাচনের প্রসঙ্গ তাঁর বিবেচ্য। "বাঙালীর হিন্দীচর্চা"-তে বাংলাকে অতিক্রম করে অন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা দখল করার কথা বলেছেন তিনি, প্রস্তাব করেছেন বাঙালি লেখকেরাও ক্রমে হিন্দিতে মৌলিক সাহিত্য রচনার দিকে অগ্রসর হোন। তাঁর এই প্রস্তাব যে খুব উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়নি, এতেই বোঝা যায় যে সে-প্রস্তাব পালন করা কোথাও খুব সহজ নয়। দ্বিভাষী লেখক নেই তা নয়, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা খুবই বিরল। আর প্রতিষ্ঠালোভী বিশ্বায়নপ্রত্যাশী বাঙালি ইংরেজি ছেড়ে হিন্দির দিকে এগোবেন কেন? লোকে যে বেশি বড়োলোক বা বেশি শক্তিশালী তারই সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করবার চেষ্টা করে। "সংস্কৃতি ও সাহিত্য" ('বিচিন্তা') নাম হলেও, এ প্রবন্ধে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে বাংলা ভাষার শারীরিক পরিবর্তন ও সমস্যার কথাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

ছন্দের শ্রেণি-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেনের পরিভাষার বিকল্প পরিভাষা প্রস্তাব করেছেন তিনি। কিন্তু মুক্তদল রুদ্ধদলের পরিবর্তে 'মুক্তধ্বনি' 'বদ্ধধ্বনি' কথাগুলি কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি করতেই পারে। মাত্রাবৃত্ত (এখনকার সরল কলাবৃত্ত বা কলামাত্রিক)-কে 'স্থিরমাত্র' বলতে অসুবিধে নেই, কিন্তু দলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত দুধরনের ছন্দেই দলের সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে বলে মাত্রা-মানের হেরফের হয়। ফলে 'সংকোচক' 'প্রসারক' বা 'অস্থিরমাত্র' এই নামে বাকি দুটি ছন্দপদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু আগেকার "বাংলা ছন্দের মাত্রা" প্রবন্ধটিতে এই সংজ্ঞার পুনর্বিন্যাস নেই, তা অভ্যস্ত পরিভাষাগুলিকে আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করার এক প্রশংসার্হ প্রয়াস। তবে "হরফ"-এর বিবেচনা যে ছন্দোবিচারে প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, সে উপলব্ধি এ প্রবন্ধে নেই।

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তুলনায় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেগুলিতেও মৌলিক চিন্তার ঝলক আছে। এর মধ্যে কিছুটা বিস্তারিত "রস ও রুচি"-তে সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় সূত্র অনুসারে যৌনতা ও কামনার অনাবরণ ছবি থাকবে কি না সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি মূলত রাবীন্দ্রিক। তাঁর মতে জীবনের সব তথ্য সাহিত্যের উপজীব্য নয়। "সাহিত্য রস" নামে ছোটো নিবন্ধটি মূলত এরই অনুবৃত্তি, তাতে তিনি সর্বসাধারণের জন্য রচিত সাহিত্যে "মজা ও স্বাস্থ্য" দুইই রক্ষা করতে বলেন, শুধু "মজা" বা শুধু "স্বাস্থ্য" নয়। "ভাষা ও সংকেত"-এ সাহিত্যে ব্যঞ্জনার স্থায়ী ভূমিকা, কিন্তু "সংকেতময় সাহিত্য"-এ প্রধানত এসেছে ভাষা এবং সাহিত্য দুইই যে প্রতীকের বয়ন ও বিন্যাস—তারই চমৎকার স্বীকৃতি। আজকের ভাষাবিজ্ঞানী হয়তো ভাষাকে বলবেন প্রতীক বা symbol-এর সমষ্টি, আর সাহিত্যকে, বিশেষত কবিতাকে, —রোমান ইয়াকবসনরা যেমন—বলবেন রূপক বা metaphor-এর সমষ্টি। এখান থেকে রাজশেখর চলে যান নানা কারুকলা ও শিল্পকলার প্রতীকধর্মে,

কবিতার সুবোধ্যতা-দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গো, কিন্তু বিতর্কের জটিল পথে অগ্রসর হতে চান না। "কবির জন্মদিনে"-তে দেশীয় সাজাত্যবোধ ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত মানবপ্রেম, "সাহিত্যিকের ব্রত"-তে একই ভাবে সংকীর্ণ মতাদর্শ পরিহার করে সমাজ ও মানবজীবনের আশু ও স্থায়ী স্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে লেখকের অভিনিবেশ, "নিসর্গচর্চা"-তে নিসর্গ-পরিবেশের সঙ্গো মানুষের গভীর আত্মিক যোগ রক্ষা করা—এ সমস্তই তাঁর মূল চিন্তাসূত্র। "অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এক মহৎ শিল্পী, শিল্পভাষ্যকার ও লেখকের এক সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ পরিচয়। "গল্পের বাজার" মূলত পাঠকরুচি-নিয়ন্ত্রিত বাজারের কথাই আলোচনা করে। তিনি লক্ষ করেন, পাঠক দু ধরনের—একদল চায় 'নিষ্কণ্টক' গল্প, সুখান্ত আখ্যান। কিন্তু "বিদগ্ধ এবং মানবচিত্তের রহস্য সম্বন্ধে কুতূহলী", বাস্তবরসিক পাঠকেরা চান "সকণ্টক" গল্প। "সাহিত্যের পরিধি"-তে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারে একমাত্র ও নির্ভুল মানদণ্ড-নির্ধারণের সমস্যা, সাহিত্যের সীমানা নির্ধারণে বাস্তব ও কল্পনার ভূমিকা, প্রকাশে ভঙ্গি ও রসের টেনশন বা আততি—এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা করার পর, আমরা জানি, তাঁর এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত যে, বিচক্ষণ সমালোচক "পাঠকের আনন্দ আর সামাজিক স্বাস্থ্য" দুয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন। সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে যেমন, অন্যান্য প্রবন্ধেও আমরা লক্ষ করব, মতামতের এক ধরনের জটিল দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে তিনি একটা সমন্বয়ের সূত্র সন্ধান করেন। কিন্তু তা দুর্বল আপোষরফা নয়, সুচিন্তিত বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।

৪

সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেই এই ডায়ালেক্‌টিক্‌স বা দ্বান্দ্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখি। তিনি জানেন বহু মানুষের বহু মত, অধিকাংশই পরস্পরবিরোধী, কারণ সেগুলি ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ও স্বার্থের সঙ্গো যুক্ত। তবু এসব অতিক্রম করে সার্বিক কোনো 'সামাজিক' সত্য (নির্বিশেষ সত্য না হোক), নৈতিকতা ও কল্যাণের কোনো ভিত্তি আছে কি না—মূলত এই তার সন্ধান। এ সন্ধানে তিনি 'নেতি নেতি' করে এগোবার চেষ্টা করেন, এবং যে সমাধান দেন তা কোনো এক পক্ষকে রেয়াত করে না, কোনো একদেশদর্শিতার দ্বারা গ্রস্ত হয় না। "ভদ্র জীবিকা"-র "ভদ্র" কথাটিকে তাঁর প্রশ্ন বিদ্ধ করে, এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ধরনেই বাঙালির ওই "ভদ্র" ধারণার মোহ তার হাত থেকে কীভাবে অর্থনৈতিক শক্তি ও উদ্‌যোগ অন্যদের হাতে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা লক্ষ করেন রাজশেখর। তাঁর একটু আশান্বিত সিদ্ধান্ত, "বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না।" "ঘনীকৃত তৈল"-এ আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কুসংস্কার নিরসনের জন্য আশ্বাস দেন যে, স্বদেশীয় 'ডালডা' জাতীয় তেলে "ধর্মহানির আপত্তি থাকিবে না।" কিন্তু এই বিশ্বায়নের যুগে, রুচি হলে "স্বদেশীয় চর্বি" খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে "বিদেশীয় ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব"—তাঁর এ কথা এখন অরণ্যে রোদনের মতো শোনাবে বলে মনে হয়। "খ্রিষ্টীয় আদর্শ" বা যে-কোনো

ধর্মের আদর্শ, সেই ধর্মের যারা অনুগামী, যারা যুদ্ধ, সাম্রাজ্যদখল, জোচ্চুরি, জালিয়াতি সবই করে—তাদের হাতে কতটা রক্ষিত হয় তাই নিয়ে তাঁর প্রশ্ন। এখানেও প্রচারণ ও আচরণের সেই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর অবলম্বন। "প্রার্থনা"-র মূল কথাও তাই—ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কীভাবে ধর্মকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, তারই বিবরণ। এর উপসংহার বাক্যটি যেন ঋষিবাক্যের মতো শোনায়—"হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে, জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টি তা তোমাতে সঞ্চারিত হোক।" এ প্রার্থনা সম্বুদ্ধ মানুষের, রাজশেখর সেই বিরল প্রজাতির সদস্য। "তিমি" প্রবন্ধটিতেও ওই একই উদ্‌বেগ—তিমি বৃহৎ শক্তির প্রতীক, তিমিংগিল আরও বৃহৎ শক্তির প্রতীক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিবেশে লেখা এ প্রবন্ধে রাজশেখর বৃহৎ ও অতিবৃহৎ শক্তিগুলির সমস্ত আশ্বাস ও আদর্শের ঘোষণায় একটি সংগত অবিশ্বাস পোষণ করছেন, বলেছেন "সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল একসঙ্গে জড়িত —এই উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধির প্রসার না ঘটলে সমস্ত ব্যবস্থাই পণ্ড হবে।"

এই "উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধি"র পিছনে আছে যেমন প্রখর যুক্তি, তেমনই বিশ্বাস, ঘটনা ও আবেগের স্রোত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও মতাদর্শের সংকীর্ণতায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একটি কল্যাণকর বিশ্বানুভব নির্মাণের চেষ্টা। রাজশেখর জানেন সমস্যা কত জটিল, গড্ডলিকার বিরুদ্ধে যাওয়া কত কঠিন। ফলে তাঁর আশা তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচারবোধের দ্বারা শাসিত ও দমিত। তবু অনাসক্তির মধ্যেও, প্রায় সোক্রাতেসীয় গোত্রের প্রশ্নসংকুলতার (সোক্রাতেসের ছদ্মযুক্তির ফাঁদে ফেলার চেষ্টা রাজশেখরে নেই) মধ্যেও মানবজীবন ও সমাজের ভবিষ্যতের জন্য তাঁর প্রচ্ছন্ন উদ্‌বেগটি আভাসিত হয়। "ভেজাল ও নকল"-এও সামাজিক মানুষের নীতিবোধের সেই ক্ষীয়মাণ তাৎপর্যের বিষয়ে তাঁর উদ্‌বেগ, যার নাম চারিত্রশক্তি। সমাজে প্রতারণা, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রিক প্রতারণাতে আমরা কত সহজে অভ্যস্ত হয়ে যাই, "সত্যমেব জয়তে" কথাটা কত বিচিত্রভাবে আমাদের হাতে লাঞ্ছিত তা তিনি লক্ষ করেন, আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ চেষ্টায় ক্রোধ নেই, হতাশা নেই, অভিশাপ নেই, প্রভুত্বধর্মী হুকুম নেই। এমনকি "সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়"—এই ভাববাচ্যীয় নিষেধে যে প্রত্যক্ষতাও অনুপস্থিত—তা থেকে রাজশেখরের মনোভঙ্গিটি বুঝতে পারি আমরা। "বিলাতী খ্রিষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু"-র মধ্যেও তুলনার সূত্রে দু সমাজের বিশ্বাস ও আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেন, এবং সমাজের শক্তির মূলে যে চারিত্রশক্তি তার কথা বার বার বলেন। "অশ্রেণিক সমাজ" তাঁরও কাম্য, কিন্তু তার নির্মাণ যে কত কঠিন সে সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা আছে, তাই আলোচনা ও প্রশ্নের গণ্ডি তিনি পেরোন না, সমাধান দেন না। "সমদৃষ্টি"-র মধ্যেও সেই স্বার্থহীন নৈতিকতার কথা আসে, যে-নৈতিকতা সামাজিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি। তিনি গুরুর আসন নিতে আদৌ আগ্রহী নন, বন্ধুর মতো সৎপরামর্শ নিয়ে হাজির থাকেন মাত্র। সমাজের কাছ থেকে খুব একটা প্রত্যাশা তাঁর নেই, কিন্তু তাঁর নিজের দায়, ওই সুপরামর্শ নিয়ে প্রস্তুত থাকার দায়

তাঁকে বহন করতেই হবে। যে-নৈতিকতা তিনি নিজের উপর এমন শান্তভাবে আরোপ করেন তা তিনি সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত দেখতে চাইবেন, এ স্বাভাবিক। কিন্তু কখনোই তিনি ক্রুদ্ধ ও সর্বজ্ঞ গুরুর আসন নেন না।

'সর্বজ্ঞতা'প্রসূত আপ্তবাক্যপ্রবণতার অভাব এবং নিরপেক্ষ বিচারবোধ, মতামতের নানাদিক দেখার ইচ্ছা তাঁর সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির এক বিশেষ লক্ষণ। এবং এ প্রবন্ধগুলিতেই দেখি তিনি পাঠকের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি, কখনও গল্প বা কল্পিত উদাহরণ দিয়ে শুরু করেন, কখনও-বা সংলাপের রীতি গ্রহণ করেন, যে-প্রসঙ্গে আমাদের রাজশেখরের পাশে পরশুরামের উপস্থিতির কথা মনে হয়। বিশেষ করে পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাখাদ্য, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি নিয়ে নানা প্রবন্ধগুলিতে মৃদু কৌতুকেরও আলো জেগে ওঠে। এখানে আবার রাজশেখরের নির্মোহ বৈজ্ঞানিক ঔদার্যও স্পষ্ট। পোশাক-যে দেশের জলবায়ু ও উপলক্ষ্য অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তা তিনি জানেন, তবু অন্য সংস্কৃতির কাছ থেকে গ্রহণ করা পোশাক মেনে নিতে তাঁর আপত্তি নেই। ফলে পাজামার প্রতি অনেকের (হয়তো কিছুটা সাম্প্রদায়িক) বিদ্বেষ থাকলেও, রাজশেখর বলে দেন "তা নানা বিষয়ে ধুতির চাইতে শ্রেষ্ঠ।" এমনকি কর্মক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েরা যদি স্কার্টস বা স্ল্যাক্‌স পরে যায় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। "আমিষ-নিরামিষ"-এও এই ঔদার্য সম্পূর্ণ হাজির। অঘোর এখানে তাঁর সত্তার প্রতিনিধি। সে প্রথমত বলছে বিজ্ঞানের কথা—"হাতি ঘোড়া থেকে পোকামাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য। প্রবৃত্তি বলছে, বাছা বাছা গুটিকতক প্রাণীই খেতে ইচ্ছা করে। অন্তরাত্মা বলছে, নিরামিষেই যখন কাজ চলে তখন জীবহিংসার দরকার কি।" এখানেও সমস্ত দিক দেখে, খাদ্যের গ্রহণীয়তার অন্তত তিনটি মাত্রা—বিজ্ঞান, রুচি বা প্রবৃত্তি এবং অন্তরাত্মা— দিয়ে তিনি তাঁর নিজের পছন্দের ইঙ্গিত দেন। কোথাও বলেন না, 'এরকমই করো', বা 'এরকমই হওয়া উচিত।'

রাজশেখরের বিজ্ঞান ও সংস্কার-কুসংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে গণ্য হবার মতো। তবে তাঁর হোমিয়োপ্যাথি সম্বন্ধে সংশয় ও বিদ্রূপ আমরা মেনে নিতে পারি না, কারণ আমাদের নিজেদের এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞতা থেকে এ পদ্ধতির কার্যকরতা ও দরিদ্র দেশের পক্ষে উপযোগিতার বিষয়টি আমাদের কাছে গ্রাহ্য। কিন্তু "ডাক্তারি ও কবিরাজি"-তে তাঁর যুক্তিবিস্তার আমাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। ভারতের ঐতিহ্যাগত চিকিৎসাপদ্ধতি, কবিরাজি বা হেকিমির ব্যবহারযোগ্যতা ও আস্থা তখনই বাড়বে যখন তা খলনুড়ির নিয়ন্ত্রণ, অসংবদ্ধ ও অলৌকিক তত্ত্বের অধীনতা ছেড়ে এসে আধুনিক রসায়নাগারে প্রস্তুত হবে, যখন তার উপাদান, মিশ্রণ, উৎপাদন ইত্যাদি কঠোরভাবে তালিকাভুক্ত ও বিধিবদ্ধ হবে। রাজশেখরের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুগোপযোগী, কারণ আমরা চিনে সেদেশের প্রাচীন চিকিৎসা ও ভেষজের সাফল্য দেখেছি, এদেশেও ক্রমশ তা শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

"অপবিজ্ঞান" "ইহকাল পরকাল" এবং "বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি"-তে তাঁর বিজ্ঞান ও

যুক্তির প্রতি অবিচল আনুগত্যের পরিচয় পাই, কিন্তু তাঁর মন সংকীর্ণ এবং একদেশবদ্ধ নয়। এ বিষয়ে "ইহকাল পরকাল" প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যিনি নিজে গীতার অনুবাদ করেছেন তিনি "বাসাংসি জীর্ণানি" ইত্যাদি শ্লোকের প্রসঙ্গে বলছেন, মানুষ যে জীর্ণ বস্ত্রের মতো এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহ নেয়— "গীতাকার প্রমাণ দিলেন না।" ফলে ইদানীং প্যারাসাইকোলজি-র নানা প্রচারে জাতিস্মর ইত্যাদির ঘটনা সম্বন্ধে, অর্থাৎ পরলোক, আত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর চূড়ান্ত মন্তব্য—"অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে সতর্ক গবেষণা সবে আরম্ভ হয়েছে, তা সফল হবে কি বিফল হবে এখনই বলা অসম্ভব। ভবিষ্যতে হয়ত অনেক আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কৃত হবে; কিন্তু এখনই উৎফুল্ল হবার কারণ নেই।" আমরা এ লেখার তিপ্পান্ন বছর পরেও অলৌকিকের ব্যাপারে 'উৎফুল্ল' হবার মতো কিছু পাইনি। "শিক্ষার আদর্শ" প্রবন্ধটিতে শিক্ষার নৈতিক, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সচেতন, সর্বাঙ্গীণ আলোচনা যেমন নেই, তেমনই ব্যক্তিত্বভিত্তিক প্রবন্ধগুলিতে মহৎ মানুষটির ব্যক্তিত্বের মূল সূত্রগুলিকে ধরে—তাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

৫

সব প্রবন্ধের আলোচনা আমরা করছি না। উপরে শুধু প্রবন্ধলেখক রাজশেখরের প্রধান মনোযোগের ক্ষেত্র, এবং তাঁর আলোচনার ধরন ও প্রকরণ আমরা লক্ষ করলাম। প্রায় অনাসক্ত বিচার ও যুক্তিবিচার, দু পক্ষের বা নানা মতের উদ্ধার ও আলোচনা তাঁর নানা ধরনের প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য, এবং কোথাও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের ভার পাঠকদের উপরে নিক্ষেপ করেন না। বানান পরিভাষা ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি তাঁর বিশেষজ্ঞের অভিমত দেন, পাঠকের চিন্তা বা অভিপ্রায়কে ততটা স্বীকৃতি দেন না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি জানেন এ বিষয়টা সম্বন্ধে অধিকাংশ পাঠক খুব অধিকারসম্পন্ন বা আগ্রহী নন, আর তাঁরা খুব গুছিয়ে বা সুশৃঙ্খলভাবে এসব নিয়ে ভাবেন না। তাঁরা রাজশেখরের মতো সর্বমান্য অপক্ষপাতী পণ্ডিতের কাছে ex cathedra (উপদেশকের মঞ্চ থেকে) আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সামাজিক ও বিজ্ঞানপ্রসঙ্গের প্রবন্ধগুলিতে তথ্য ও যুক্তির নানামুখী আহরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও লৌকিক সংস্কার, ধারণা, ইত্যাদিকেও তিনি বিচারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। আগেই যেমন বলেছি, এখানে তিনি পাঠকের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করেন। তাই এগুলিতে গল্প, ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদির ভূমিকা বেশি, এবং কৌতুকরসেরও একটা অবকাশ তিনি তৈরি করে নেন।

আমার কাছে রাজশেখরের প্রবন্ধরচনার ভাষা বাংলায় প্রবন্ধের জন্য আদর্শ গদ্যভাষা বলে মনে হয়। ভাষার আতিশয্য ও প্রগল্‌ভতা তাঁর নিজের অপছন্দ ছিল, এ দুটিই তিনি সযত্নে পরিহার করেন। তাঁর চিন্তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, বিষয়গুলির অবতারণায় পুনরাবৃত্তি বা অপ্রাসঙ্গিকতা বা প্রসঙ্গমিশ্রণ তাঁর লেখায় আদৌ নেই। আবেগ উচ্ছ্বাস, ব্যক্তিত্বের

একমাত্রিক ভাষালক্ষণ বা মুদ্রাদোষ তাঁর গদ্যকে বিড়ম্বিত করে না। নেই তৎসম শব্দের অতিরিক্ত আসক্তি, অন্যদিকে নেই পাঠকতোষক 'ছ্যাবলামি'—যা পাঠককে কখনও নির্বোধ অনুকম্পাযোগ্য শিশু, কখনও-বা আড্ডার ইয়ার্কিযোগ্য বন্ধু মনে করে নেয়। পাঠকদের বুদ্ধিমান এবং মতামতসম্পন্ন (সে মতামত ভ্রান্ত হলেও ক্ষতি নেই) জীব মনে করে, তাদের সম্মান করে, রাজশেখর একটি অত্যন্ত সৌজন্যসম্মত স্বচ্ছ ভাষা নির্মাণ করে বঙ্কিমচন্দ্রের "সরলতা ও স্পষ্টতা"-র নির্দেশ তো শিরোধার্য করেইছেন, সেই সঙ্গে যে সস্মিত হৃদ্যতা ও সরসতা যোগ করেছেন তা-ই তাঁর গদ্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

এ কথা আমাদের বেশি করে মনে রাখা, এবং এই গদ্যকে আমাদের সাধারণ প্রবন্ধরচনায় আরও ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা এই কারণে উচিত যে, আমাদের ছাত্রদের স্কুলে, নোট বইয়ে রচনা বইয়ে বা পরীক্ষার খাতায় যে গদ্যরীতির শিক্ষা দেওয়া হয় তা কুৎসিতের শ্রেণিতে পড়ে। তাতে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, বিশেষণপীড়িত পল্লবিত অতিশয়োক্তি ইত্যাদির প্রাবল্যে বলার কথাবস্তু, সুশৃঙ্খল তথ্য ও যুক্তির বিন্যাস সবই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইস্কুলের মাস্টারমশাইয়েরা যখন ছাত্রছাত্রীদের 'ভাব বা ভাষা দিয়ে' লিখতে বলেন এবং না লিখলে নম্বর দেন না, তখন ওই ভ্রান্ত জবড়জং বাংলার আদল সহজে মরতে চায় না। এই গদ্য আমাদের ছেলেমেয়েদের সজ্জিত সুবিন্যস্ত চিন্তা করতে শেখায় না, কেবল অর্থহীন শব্দের ধূম্রজাল তৈরি করতে উৎসাহ দেয়। তাতে তারা ভুল করে বেশি, কারণ ওই সব শব্দের শরীরটাকেই তারা দেখে, তাদের অর্থ কিছু সুসংহত বক্তব্যে গিয়ে দাঁড়ায় কি না তা তারা বোঝে না।

রাজশেখরের গদ্যভাষা কবে আমাদের হাতে এই শব্দদূষণের যোগ্য প্রতিবিধান হয়ে উঠবে জানি না। কিন্তু তা সর্বদা আমাদের সামনে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকা দরকার। সেখানেই প্রবন্ধগুলির একত্র প্রকাশের অন্যতর একটি সার্থকতা তৈরি হবে।

পবিত্র সরকার

রাজশেখর জীবনচরিত

একই ব্যক্তির দুই নাম। রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। 'বাঙালী সাহিত্যিকগণের অগ্রজস্বরূপ, বাংলা সাহিত্যের নিয়ামক নায়ক ও লোকশিক্ষক' রূপে রাজশেখর বসু বিংশ শতকের বাংলার প্রণম্য পুরুষ। পাণিনিকে বলা হতো অশেষবিৎ, রাজশেখর বসুও ছিলেন অশেষবিৎ।

পরশুরামের প্রথম রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ রসায়নাগারে অনপেক্ষিত রসস্রষ্টা বনস্পতিকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজশেখর বসুর সব কিছুই বিস্ময়কর। রাসায়নিক, যন্ত্রবিজ্ঞানী, কুটিরশিল্পজ্ঞ, সুদক্ষ ব্যবসায় পরিচালক, ভাষাবিজ্ঞানী, শাস্ত্রবিদ্, আভিধানিক ও রসস্রষ্টা,—একসঙ্গে এতগুলি গুণের সমাবেশ অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু রাজশেখরের মধ্যে বাংলার সুধীসমাজ ও সাধারণ মানুষ এইসব গুণ প্রত্যক্ষ করেছেন। উনিশ শতকের প্রাণরসে সঞ্জীবিত ও প্রজ্বলিত দ্বৈত নামের বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণপুরুষ।

রাজশেখর বসু ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ (১২৮৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র) মঙ্গলবার বর্ধমান জেলায় শক্তিগড়ের কাছে মাতুলালয় বামুনপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের কাছে উলা বীরনগরে।

পিতা চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯১৩) তিনবার বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যান। কয়েকবছর পরে হাওড়ায় সুপুরিয়ার কাশীশ্বর মিত্রের কন্যাকে চন্দ্রশেখর বিবাহ করেন। তাঁর একটি কন্যা ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর তিরিশ বছর বয়সে বর্ধমানে বামুনপাড়ায় নৃত্যগোপাল দত্ত ও জগমোহিনী দত্তের কন্যা লক্ষ্মীমণি দেবীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীমণির চারপুত্র ও পাঁচ কন্যা —ইন্দুমতী (পরে দত্ত), কুমুদবতী (পরে মুস্তৌফী), শশিশেখর, ঊষাবতী (পরে সোম), লীলাবতী (পরে ঘোষ), রাজশেখর, হিরণ্যবতী (পরে দত্ত), কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর।

রাজশেখরের ডাকনাম ছিল ফটিক। 'রাজশেখর' নামকরণের ইতিহাস প্রসঙ্গে শশিশেখর বসু লিখেছেন, 'দারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার বললেন, ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে না কি? কি শেখর হবে? আমি বললাম, ইয়র হাইনেস যখন তাকে আশীর্বাদ করচেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য,—আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর।' ('রাজশেখরের ছেলেবেলা', যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা ১৩৬০।

রাজশেখরের শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে দরভঙ্গায় পিতার কর্মস্থলে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে বড়দাদা শশিশেখর রাজশেখরের ছেলেবেলার অনেক কৌতুককর ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। শৈশবে রাজশেখর ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু। খেলনা

ভেঙ্গে-ভেঙ্গে তাঁর বিচিত্র 'এক্সপেরিমেন্ট' চলতো। শশিশেখর লিখেছেন, "সায়েন্স পাশ করবার আগেই ল্যাবরেটরী হল, দুই আলমারি অ্যাসিড, ক্লোরেট অব পটাস, কোবাল্ট, ক্লোরাইড ইত্যাদি। বোমা তৈরি করে ফাটাতো, কাগজের ব্যারোমিটার দেওয়ালে এঁটে বলতো বিষ্টি হবে কি না। আমাদের কাশি হলে কফ-মিকশ্চার প্রেসক্রিপশন লিখতো, কবিরাজি কেতাব আমি এনে দিতাম তাই পড়তো। টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে শখ করে মড়াও চিরতো। আমাকে গীতার বুকনি ইংরেজীতে ট্রানস্লেট করে দিত, আমি সেগুলো টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল ও পাইওনীয়ারে নিজের বলে চালিয়ে দিতাম। তার অরিজিন্যাল কমপোজিশনে ঝোঁক হতে লাগল, কিন্তু সে কভারওয়ালা ম্যাগাজিন ভিন্ন লিখতো না; ডেলি পেপারকে গ্রাহ্য করতো না, এখনও নয়। যতদূর মনে পড়ে 'ইন্ডিয়ান টিট্‌বিট্' ম্যাগাজিনে কি একটা লিখেছিল ছেলেবেলায়।" (তদেব)।

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজশেখর দরভঙ্গা রাজ স্কুলে পড়াশুনো করেন, এবং সেখান থেকে চৌদ্দ বছর নয় মাস বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বছর দরভঙ্গা রাজ স্কুলে রাজশেখরই ছিলেন একমাত্র বাঙালী ছাত্র। হিন্দী ছিল তাঁর কাছে মাতৃভাষার মতো সহজ ও স্বচ্ছন্দ, একেবারে শৈশবে তিনি বাংলা বলতে পর্যন্ত পারতেন না।

এনট্রান্স পাশ করে পটনা কলেজে এফ-এ পড়তে এলেন। কলেজে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে বাঙালী সহপাঠী ছিলেন জন দশেক, তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা চলতো। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ এই সময়ে মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে রাজশেখর পটনা কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি-এ পড়ার জন্য কলকাতা এলেন, ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। অনর্স ছিল ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে অনর্স-সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সে বছর অনর্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ছাত্র শরৎকুমাব দত্ত, রাজশেখর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

এক বছর পরে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রাজশেখর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং সে বছর প্রথম শ্রেণী কেউ না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে তিনিই প্রথম স্থানাধিকারী বলে পরিগণিত হন।

বিজ্ঞানের দিকে তাঁর আবাল্য ঝোঁক। তবু বৈষয়িক দিকের কথা ভেবেই সম্ভবত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিপন কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হয়ে ঠিক তিনদিন কোর্টে যান। কিন্তু আদালত-জীবন তাঁর পছন্দ হলো না। ফিরে এলেন বিজ্ঞান-চর্চার স্বক্ষেত্রে।

পরিচয় হলো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালে রাজশেখরকে ডেকে নিলেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজশেখর কেমিস্ট হিসাবে

বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন। তারপর এক বছরের মধ্যেই হলেন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী। বেঙ্গল কেমিক্যাল ধরতে গেলে রাজশেখরেরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্যই এর জন্মদাতা—'জনক', রাজশেখর প্রকৃত 'পিতা'—প্রতিপালক। একদিকে গবেষণার কাজ অন্যদিকে ব্যবসায়পরিচালনা—উভয় ক্ষেত্রেই রাজশেখরের দক্ষতা ও সাফল্য লক্ষণীয় ছিল।

ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজশেখরের বাস্তববুদ্ধি, নিয়মনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ বেঙ্গল কেমিক্যালকে প্রতিষ্ঠাদানে সাহায্য করে। বেঙ্গল কেমিক্যালের অনেক খাতাপত্র রাজশেখর বাংলায় লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের নামকরণে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার তিনিই প্রথম শুরু করেন। সেই সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিভিন্ন ঔষধ, সেন্ট, সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের নামকরণে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের সুন্দর ব্যবহার তাঁর সৃষ্টি। 'তাছাড়া বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনের লেখনী, ছবি ও বিভিন্ন জিনিসের সচিত্র লেবেল তাঁরই কল্পনাপ্রসূত ছিল।' [সুধীরচন্দ্র সরকার, 'রাজশেখর বসু', যষ্টিমধু, বৈশাখ ১৩৬৭]। মাণিকতলায় কারখানা, কাজের সুবিধার জন্য সেখানেই একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন। কারখানা এবং অফিস—দুদিকই তাঁকে দেখতে হতো।

দীর্ঘ তিরিশ বছর কাজ করে স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুআরী তিনি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো না, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার ও একজন ডিরেক্টর হিসাবে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

যে-বছর রাজশেখর বি-এ পাশ করলেন, (১৮৯৭) সেবারই তাঁর সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর (১৮৮৬-১৯৪২) বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র সন্তান প্রতিমা (১৯০১-১৯৩৪)।

'গড্ডলিকা'র গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ পরশুরামকে অভিনন্দিত করেন, কিন্তু রাজশেখরকে তিনি তখনও দেখেননি, কোনও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। অমল হোম লিখেছেন, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর বাড়ি এলে রাজশেখরকেও তিনি আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজশেখরের এই 'প্রথম পরিচয়'-এর কথা (দ্রঃ পৃ ৩৩৫) রাজশেখর পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'প্রায় কুড়ি বৎসর আগেকার কথা। অমল হোম মহাশয় বলে পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে আসবেন, আমাকে দেখতে চান। ভয় ছিল আমার সঙ্গে কথা কয়ে কবি নিরাশ হবেন। কবি কি মনে করেছিলেন জানি না, কিন্তু আমি নিরাশ হই নি। 'কবি কি মনে করেছিলেন' তা জানতে পাই অমল হোমকে লেখা তাঁর চিঠিতে, 'কাল তোমার ওখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে কথা বলে ভারি খুশি হয়ে এসেছি। ওঁর হাতে কুঠার আছে কি না জানি না কিন্তু ওঁর অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবুদ্ধির আবর্জনা। উনি সহজ করে সব জানেন—সহজ করে সব বলতে পারেন। ওঁকে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসবার ভার রইল তোমার উপর।' (দ্র. অমল হোম, 'প্রথম দেখা : রবীন্দ্রনাথ-রাজশেখর',

কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০)। রাজশেখর সে সময়ে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান গবেষণাগারের নামকরণ-কালে 'রাজশেখর বিজ্ঞান-সদন' নামের মধ্য দিয়ে রাজশেখরকে স্মরণীয়তা দান করেছেন।

রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধানটি প্রকাশিত হলে 'গুণগ্রাহী' রবীন্দ্রনাথ ১১ই ফেব্রুআরি ১৯৩১ তারিখের চিঠিতে রাজশেখরকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, 'এতদিন পরে বাঙলা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে চলন্তিকায় বাঙলার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েছেন তাও অপূর্ব হয়েছে।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮)।

'চলন্তিকা' রাজশেখরের এক অসামান্য কীর্তি। 'ভূমিকা'য় তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ভাষার একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে—যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে। যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁহারা প্রধানতঃ যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।' রাজশেখর বাংলা শব্দের বানান ও পারিভাষিক শব্দ নিয়ে সারাজীবন চিন্তা করেছেন। 'চলন্তিকা' সংকলনকালে বাংলা বানানের বৈচিত্র্য দূর করার জন্য রাজশেখর সাহিত্যিকদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি লেখকদের কাছে তিনি বানানের তালিকা পাঠিয়েছিলেন।

'চলন্তিকা প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'বাংলা বানানের নিয়ম' স্থির করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয় (নভেম্বর ১৯৩৫)। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাটি (১৩৪৩) যখন বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা 'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি',—এই মর্মে তাঁদের সমর্থন জানান। প্রকৃতপক্ষে 'চলন্তিকা' সংকলয়িতা রাজশেখরের প্রয়াস-প্রযত্নের ফলেই বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আজ অনেকটা সমতা এসেছে। সজনীকান্ত দাসের ভাষায়, "ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক গোড়াপত্তন করিয়াছেন এবং বাঙালীর ঢিলাঢালা এলোমেলো প্রকৃতিতে একটা বাঁধন আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই বাঁধনে কষ্ট নাই, অপমান নাই। 'চলন্তিকা' মারফৎ আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই ভাষার শৃঙ্খলা শিখিতেছি। সাহিত্যকর্মী রাজশেখরের ইহা একটি বিপুল কীর্তি।" ('সাহিত্যকর্মী শ্রীরাজশেখর বসু', কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০)।

পারিভাষিক শব্দের জন্যেও 'চলন্তিকা'র আশ্রয় আমাদের নিতে হয়। যদিও এর ভূমিকায় রাজশেখর বসু জানিয়েছেন, "পরিশিষ্টে যে পারিভাষিক শব্দাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহার 'পাটীগণিত' হইতে 'মনোবিদ্যা' প্রভৃতি বিষয়ক অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন হইতে উদ্ধৃত। 'সরকারী কার্য' বিষয়ক অংশ পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের সংকলন হইতে উদ্ধৃত।" কিন্তু আসলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকলন দুটিও প্রধানত রাজশেখরের উদ্যোগের ও অনেক পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফল। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষা সমিতি গঠন করে, তার সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু।

বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসেও রাজশেখরের বিশিষ্ট দান স্মরণীয়। বাংলা লাইনো টাইপের উদ্ভাবক সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কিন্তু এই কাজে তাঁর অন্যতম সহায় ছিলেন রাজশেখর। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর লাইনোটাইপ কোম্পানীর শো-রুমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা লাইনো টাইপ যন্ত্রের কর্মারম্ভের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজশেখর বসুও উপস্থিত ছিলেন। লাইনো টাইপ কোম্পানীর পক্ষ থেকে মিঃ গেভিল বলেন, "শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে; শ্রীরাজশেখর বসু তাঁহাকে এ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন। মূল অক্ষরগুলির আকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন যতীন্দ্রকুমার সেনের সহায়তায় এস. কে. ভট্টাচার্য।" সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার চেষ্টার ফলে লাইনো যন্ত্রে বাংলা অক্ষর মুদ্রণের একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিভাষিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন প্রভৃতি আমাকে এ বিষয়ে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। সে সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এ কার্য করা সম্ভব হইত না।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)।*

সুরেশচন্দ্র মজুমদার লাইনো টাইপকে বাজারে চালু করেছিলেন, কিন্তু যুক্তাক্ষরের জট ছাড়িয়ে সহজ হরফ তৈরী করেছিলেন রাজশেখর বসু। বাংলা লাইনো টাইপে প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রিত বই পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদির গল্প' দ্বিতীয় সংস্করণ।

সভা-সমিতি উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজশেখরের খুব একটা যোগ ছিল না। বক্তৃতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না, কর্মে ছিল তাঁর একান্ত নিষ্ঠা। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি, কিন্তু ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (The National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তিনি সক্রিয়ভাবে পরিষদের বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। রাজশেখর শুধু 'কাউন্সিল'-এর সভ্য ছিলেন না, তিনি 'ফ্যাকালটি অফ সায়েন্স' এবং ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যানুফাকচার ও কমার্সের 'বোর্ড অফ স্টাডিস'-এরও সদস্য ছিলেন। (দ্র. *The National Council of Education, Bengal, Calender, 1906-1908*, Calcutta, 1908, pp. 27, 30, 34, 36, etc.)

মানিকতলার বাগানে বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর ব্যাপারে রাজশেখর মালমশলা দিয়ে সাহায্য করতেন। বোমা তৈরীর ফর্মুলাও রাজশেখরের। বিপ্লবীদের পরিবারকে তিনি গোপনে অর্থসাহায্যও করতেন। একথা তিনি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দৌহিত্রীর কাছে। ভারত স্বাধীনতার পরে।

সাহিত্য-সংগঠন যেগুলির সঙ্গে রাজশেখর কোনও সময় যুক্ত ছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রবিবাসর ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৩৬ সালে রবিবাসর প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যুগে কিছুদিন রবিবাসর-এর সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে রাজশেখর রবিবাসর-এর সদস্য হয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পরে (১৩৪০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহেই রাজশেখর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সদস্য হন।। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'রাজশেখরবাবু পরিষদের সভ্য হইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো এতবড় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তিনি। তাঁহাকে যদি সাহিত্যপরিষদের সম্পাদকরূপে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার কার্য কিরূপ সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার (ব্রজেন্দ্রনাথের) বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।'

ব্যক্তিজীবনে রাজশেখর ছিলেন অল্পভাষী, পরিচ্ছন্ন-প্রকৃতি, নিয়মনিষ্ঠ আদর্শবাদী মানুষ।। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। একদা ছবি আঁকতেন, যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'একবার তিনি কিছুদিনের জন্য সুকিয়া স্ট্রীটের এক বাটী ভাড়া করিয়া ছিলেন। সেখানে গিয়া দেখি তিনি ছবি আঁকিতেছেন। তিনি যে চিত্রশিল্পেও সিদ্ধহস্ত, এ পরিচয় তখনই প্রথম পাইলাম। ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি—রাজশেখর অবসরকালে চিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত থাকেন।'

ফোটোগ্রাফিতেও একদা তাঁর আগ্রহ ছিল। শেষজীবনে পরিমল গোস্বামীকে বলেছেন, 'আজকাল চমৎকার সব ক্যামেরা বেরিয়েছে দেখলে আবার ক্যামেরা ব্যবহার করতে ইচ্ছা হয়।' পরিমল গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, " 'আবার ইচ্ছা হয়' মানে এ বিদ্যা তাঁর অজানা নয়। আগে তিনি ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন।" ("দ্বিতীয় স্মৃতি")।

অবসর সময়ে তিনি নানারকম শিল্পদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেই তৈরী করতেন। লেখার ফাইল, খাম ইত্যাদি থেকে শুরু করে ঘড়ির 'পার্টস' জোড়া লাগানো, ঘড়ি 'অয়েল' করা—সবকিছুই নিজে করতেন। কুমারেশ ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় রাজশেখরের তৈরি গণনার জন্য কাঠের ফ্রেমে আঁটা নানা রঙের সছিদ্র রুদ্রাক্ষ এবং নতুন ধরনের কাঠের নিক্তির কথা বলেছেন। (দ্র. 'শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজশেখব বসুব সঙ্গে কিছুক্ষণ', যষ্টিমধু, বৈশাখ ১৩৬৭)।

সাহিত্যকর্মের জন্য রাজশেখর স্বীকৃতি নিশ্চয়ই পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা থেকে শুরু করে অকাদেমি পুরস্কার পর্যন্ত—কিন্তু তবু যেন মনে হয়, সম্ভবত হাসির গল্প লেখার জন্যই তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কলিকাতা

* লাইনোটাইপ চিত্রাঙ্কনে রাজশেখরের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কিরকম ছিল, তা পত্রাবলী অংশে প্রথম চিঠি দেখলেই বোঝা যাবে (পৃ: ৪০৮-৪০৯)। এ কাজে সহায়ক হিসাবে এক তরুণ শিল্পীকে তিনি বেছে নেন—অর্ধেন্দু দত্ত। পরবর্তীকালে ইনি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শিল্পী ও মানচিত্র-অঙ্কনকারী ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৪৫এ সরোজিনী পদক দানের দ্বারা সম্মানিত করেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি তাঁকে দেওয়া হলো ১৯৫৭এ অল্প কয়েকদিন পরে কুমারেশ ঘোষকে পত্রে তিনি লিখেছেন, "৭৭ বৎসর পেরিয়ে উপাধিলাভে কিছুমাত্র আনন্দের কারণ নেই, আর ডাক্তার উপাধি তো গড়াগড়ি যাচ্ছে।" (তদেব)। যাদবপুর বিশ্ববিদালয় পরের বছর ১৯৫৮এ রাজশেখরকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন।

"কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প" গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরকে দেওয়া হয়। ভারত সরকার ১৯৫৬এ রাজশেখরকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫৮এ রাজশেখর পেলেন অকাদেমি পুরস্কার তাঁর "আনন্দবাঈ ইত্যাদি গল্প" গ্রন্থটির জন্য।

কিন্তু জীবনের প্রান্তভাগে এসে যে-সম্মান তিনি লাভ করেন তা তো অনেক আগেই তাঁর পাওয়ার কথা ছিল। হয়তো কিছু অভিমান এবং স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গেই রাজশেখর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে (১০ জানুআরি ১৯৫৭) সাহিত্যিকদের সংবর্ধনার উত্তরে প্রকাশ করেছিলেন (দ্র. পৃ ৪১৫)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'একমাত্র সন্তান, কন্যা; বিদ্বান্ গুণবান সর্বজনপ্রিয় জামাতা অন্তিম রোগশয্যায়; স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনে কন্যা যেন ইচ্ছামৃত্যুকে ডেকে এনে অবলীলাক্রমে দেহত্যাগ করলেন, মুমূর্ষু জামাতা তার কিছু পরেই প্রাণত্যাগ করলেন। একই চিতায় কন্যা-জামাতার অগ্নিক্রিয়া সম্পন্ন হল। পিতামাতার কাছে এরূপ মর্মন্তুদ দুঃখ, সংসারে মানুষের জীবনে এ ধরনের বেদনা যে কত গভীর কত চিরস্থায়ী তা আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সর্জনা যা জগতের জন্য, তাতে এই দুঃখের ছোঁয়াচ পর্যন্ত লাগতে দেখি না।' ('সুবুদ্ধিবিলাস রাজশেখর', কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০) ১৩৪১ সালে ২রা বৈশাখ কন্যা-জামাতার মৃত্যুর দিন রাজশেখর 'সতী' কবিতাটি লেখেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখরের পত্নীবিয়োগ ঘটে।। সে সময়ে (২-১২-৪২) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা তাঁর চিঠিখানিতে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, 'মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে যদি এর উল্টোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া-পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।

'নিরন্তর শোকাতুর আর একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উসকে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।' (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'স্থিতপ্রজ্ঞ', কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০)।

এরপর প্রায় আঠারো বছর রাজশেখর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে অনেক লিখেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের একজন ডিরেক্টর হিসেবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছিল। ডিসেম্বরে প্রথম স্ট্রোকের পর প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু লেখা বন্ধ থাকেনি।

'১৯৫৯এর ২৭শে এপ্রিল (১৪ই বৈশাখ ১৯৫৯) সকাল পর্যন্ত বেশ সুস্থ ছিলেন। দুপুরে বেঙ্গল কেমিক্যালের মিটিং-এ যাবার আগে বিশ্রাম করছিলেন। তারপর সকলের অজ্ঞাতে দ্বিতীয় স্ট্রোক, বিশ্রামরত অবস্থাতেই চিরনিদ্রায় মগ্ন হন। বেলা ১টা হইতে সোয়া একটার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে বলিয়া অনুমান করা যায়।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ এপ্রিল ১৯৫৯)।

· যষ্টিমধু ১৩ই বৈশাখ ১৯৫৯ সংখ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 'রাজশেখরবাবু যেতেই চেয়েছিলেন, যে ভাবে গেলেন তার চেয়ে ভালোভাবে কে কবে গেছেন। এ মৃত্যু সাধুসজ্জনের মৃত্যু। কর্মনিষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু। এর জন্যে সাধনা করতে হয়। প্রস্তুত হতে হয়। রাজশেখরবাবু একে বহু তপস্যায় অর্জন করেছেন। জীবনের শেষে এটি একটি পূর্ণচ্ছেদ। তাঁর সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে 'ইতি' লিখে দাঁড়ি টেনে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে তিনি তাঁর জীবনলিপি সমাপ্ত করলেন।'

এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত শ্রীযুক্ত অলোক রায় ও শ্রীযুক্ত দীপেন সাহার সৌজন্যে বাগর্থ প্রকাশিত *রাজশেখর বসু* জীবনীগ্রন্থ থেকে সংকলিত—প্রকাশক।

লঘুগুরু

রাজশেখর বসু প্রবন্ধাবলী—১

নামতত্ত্ব

হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।

কবি যাহাই বলুন, নাম নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। পুত্রকন্যার নামকরণের সময় অনেকেই মাথা ঘামাইয়া থাকেন। অতএব নাম লইয়া একটু আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

প্রথম প্রশ্ন—বাঙালীর সংক্ষিপ্ত নাম কিরকম হওয়া উচিত। মিস্টার ব্রাউনের নকলে মিস্টার ব্যানার্জি চলিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার আছেন! এত বড় গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যদি মিস্টার ব্যানার্জি হইতে চান তবে লোক চেনা মুশকিল। বিলাতী প্রথার অন্ধ অনুকরণে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে বা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলিতে পারে, কারণ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক চেনা সহজ। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে বাঁড়ুজ্যে বলিলে ব্যক্তিবিশেষ বোঝায় না। সুরেন্দ্রবাবু বরং ভাল। সুরেন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও বোধহয় বাঁড়ুজ্যের সংখ্যা অপেক্ষা কম। যদি নামের বিশেষ করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে নামকরণের সময় সুরেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনও অসাধারণ নাম রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশী রকম রূপান্তরিত করা অসম্ভব। বাঁড়ুজ্যে, ব্যানার্জি, বনারজি— বড় জোর বানরজি। সুরেন্দ্রবাবুতে অরুচি হইলে মিস্টার সুরেন্দ্র বা শ্রীযুত সুরেন্দ্র বা সুরেন্দ্রজী চলিতে পারে। কেউ হয়তো বলিবেন—বাপের নাম মিস্টার সুরেন্দ্র আর ছেলের নাম মিস্টার রমেশ, ইহা বড় বিসদৃশ; মিস্টার ব্রাউনের পুত্র মিস্টার ব্ল্যাক—এরকম বিলাতী নজির নাই। বাপের নাম বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু তাহা অন্য উপায়েও হইতে পারে। গুজরাট মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। বংশগত পদবীটা ছাড়িতে বলিতেছি না, পুরা নাম বলিবার সময় ব্যবহার করিতে পারেন। মিস্টার সুরেন্দ্র যদি স্বনামে জগদ্‌বিখ্যাত হন তবে বংশপরিচয় না দিলেও চলিবে। কালিদাস পাঁড়ে ছিলেন কি চৌবে ছিলেন, সক্রেটিস কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু

সেজন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—নাম শ্রীযুক্ত না শ্রীহীন হইবে। এই জটিল বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। শ্রী-বিরোধী বলেন—শ্রী অর্থে ভাগ্যবান, নিজের নামে যোগ করিলে সৌভাগ্য-গর্ব প্রকাশ পায়; আর অক্ষরটিও নিষ্প্রয়োজন বোঝা মাত্র। শ্রীর আদিম অর্থ যাহাই হউক সাধারণে এখন গতানুগতিকভাবেই ব্যবহার করে, অতএব গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। যিনি অনাবশ্যকবোধে ভার কমাইতে চান তিনি শ্রী বর্জন করিতে পারেন। তবে অনেকে যেসব ভারী ভারী বোঝা নামের সঙ্গে যোগ করিবার জন্য লালায়িত তাহার তুলনায় শ্রী অক্ষরটি নগণ্য।

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম প্রায় দুই শব্দ বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুইশব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক? ষষ্ঠী-তৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথ নিষ্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ রাজার রাজা। রাজেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধহয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্রও বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্রলাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি, ভাবার্থ বোধহয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুংসংস্করণ। মোটকথা, লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভাল হইলেই হইল। রাজা-মহারাজারা গালভরা নাম চান, যথা জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁহারা বিলাতী অভিজাতবর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধহয় তত নাই। তথাপি অর্থ-বিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথ পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণর ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা connotation। যেসকল নাম অনেকদিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনওরূপ ভাবের

উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধহয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নামরূপে গণ্য হইয়াছে কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালিদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে হইবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী কামিনী সরোজ শিশির নলিনী অমিত্র ইত্যাদি নাম পুরুষেরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম মৃণাল জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামেরই ব্যঞ্জনা লোপ পায় কিন্তু কোমল নারীজনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধহয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল। ঘটোৎকচ বা খড়্গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিস কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধহয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা, কুরূপা, বালিকা, বৃদ্ধা যাহাই হউন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলঙ্কার বা বেনারসী শাড়ির মতই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর একদিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছুকাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল—মেমেদের যেমন নামের আগে মিস বা মিসেস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি

প্রদেশে সধবাসূচক শ্রীমতী বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি—কুমারী বা সধবা বা বিধবা সূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে? বিলাতী প্রথার কারণ বোধ হয় এই যে বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ়া কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। বাঙালী মহিলা দ্বিজবর্ণা হইলে নামান্তে দেবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজা নহেন তাঁহারা সেকালে দাসী লিখিতেন, এখন স্বামীর পদবী বা অনূঢ়া হইলে পিতৃপদবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজজাতির দেবত্বের দাবী করেন তাঁহারা দেবী লিখুন, কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যেসকল মহিলা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা কেন নামের শেষে দেবী লিখিয়া দ্বিজেতরা নারী হইতে পৃথক গণ্ডিতে থাকিবেন? অবশ্য নারী মাত্রেই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে। অনাত্মীয়া অথচ সুপরিচিতা মহিলাকে মাসী পিসী দিদি বউদিদি বলিয়া অথবা নাম ধরিয়া ডাকা চলে। কিন্তু অল্প পরিচিতার সঙ্গে হঠাৎ সম্বন্ধ পাতানো যায় না, কেবল নাম ধরিয়া ডাকাও বেয়াদবি। যদি নামের সঙ্গে দেবী যোগ করিয়া ডাকার প্রচলন হয় তবে বাংলা কথাবার্তায় শ্রুতিকটু মিস মিসেস বাদ দেওয়া চলে। কুমারী বা বিবাহিতা, তরুণী বা বৃদ্ধা যাহাই হউন, 'শুনছেন অমুকা দেবী' বলিয়া ডাকিলে দোষ কি?

❑

ডাক্তারি ও কবিরাজি

আমি চিকিৎসক নহি, তথাপি আমার তুল্য অব্যবসায়ীর চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আছে। আমার এবং আমার উপর যাঁহারা নির্ভর করেন তাঁহাদের মাঝে মাঝে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং সেই চিকিৎসা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তাহা আমাকেই স্থির করিতে হয়। অ্যালোপাথি হোমিওপাথি কবিরাজি হাকিমি পেটেন্ট স্বস্ত্যয়ন মাদুলি আরও কত কি—এইসকল নানা পন্থা হইতে একটি বা ততোধিক আমাকে বাছিয়া লইতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের উপদেশে বিশেষ সুবিধা হয় না, কারণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমারই তুল্য। আর, যদি কেহ চিকিৎসক বন্ধু থাকেন, তাঁহার মত একেবারেই অগ্রাহ্য, কারণ তিনি আপন পদ্ধতিতে অন্ধবিশ্বাসী। অগত্যা জীবনমরণ সংক্রান্ত এই বিষম দায়িত্ব আমারই উপরে পড়ে।

শুনিতে পাই চিকিৎসাবিদ্যা একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের নামে আমরা একটু অভিভূত হইয়া পড়ি। ডাক্তার কবিরাজ মাদুলিবিশারদ সকলেই বিজ্ঞানের দোহাই দেন। কাহার শরণাপন্ন হইব? সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এত গণ্ডগোল নাই। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোল। সব প্রমাণ মনে নাই, মনে থাকিলেও পরীক্ষার প্রবৃত্তি নাই। সকলেই বলে পৃথিবী গোল, অতএব আমিও তাহা বিশ্বাস করি। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী ত্রিকোণ বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের মত বদলাইতে দেরি হইবে না। কিন্তু চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে লোকে একমত নয়, সে জন্য সকলেই একটা গতানুগতিক বাঁধা রাস্তায় চলিতে চায় না।

সর্বাবস্থায় সকল রোগীকে নিরাময় করার ক্ষমতা কোনও পদ্ধতির নাই, আবার অনেক রোগ আপনাআপনি সারে অথচ চিকিৎসার কাকতালীয় খ্যাতি হয়। অতএব অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন লোক আপন বুদ্ধি ও সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন চিকিৎসার শরণ লইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিকিৎসা নির্বাচনে এত মতভেদ থাকিলেও দেখা যায় যে, কেবল কয়েকটি পদ্ধতির প্রতিই লোকের সমধিক অনুরাগ। ব্যক্তিগত জনমত যতটা অব্যবস্থ, জনমতসমষ্টি

তত নয়। ডাক্তারি (অ্যালোপাথি), হোমিওপাথি ও কবিরাজি বাংলা দেশে যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় অন্যান্য পদ্ধতি বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সকলের সামর্থ্যে তাহা কুলায় না, সরকার বা জনসাধারণের আনুকূল্যের উপর আমাদের অনেককেই নির্ভর করিতে হয়। যে পদ্ধতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট তাহাই সাধারণের সহজলভ্য। যদি রাজমত বা জনমত বহু পদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব হয়, জনচিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অতএব উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্য তেমনই বাঞ্ছনীয়।

দেশের কর্তা ইংরেজ, সেজন্য বিলাতে যে চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে এদেশে তাহাই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কবিরাজির সপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে যে এই সুলভ সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসাপদ্ধতিকে সাহায্য করা সরকারের অবশ্যকর্তব্য। হোমিওপাথিরও বহু ভক্ত আছে, তথাপি তাহার পক্ষে এমন আন্দোলন হয় নাই। কারণ বোধ হয় এই—হোমিওপাথি সর্বাপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, সেজন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। সরকারী সাহায্যের বখরা লইয়া যে দুটি পদ্ধতিতে এখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ডাক্তারি ও কবিরাজি, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। হাকিমি-চিকিৎসা ভারতের অন্যত্র কবিরাজির তুল্যই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলা দেশে তেমন প্রচলিত নয় সেজন্য তাহার আলোচনা করিব না। তবে কবিরাজি সম্বন্ধে যাহা বলিব হাকিমি সম্বন্ধেও তাহা মোটামুটি প্রযোজ্য।

যাঁহারা প্রাচ্য পদ্ধতির ভক্ত তাঁহাদের সনির্বন্ধ আন্দোলনে সরকার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন—বেশ তো, একটা কমিটি করিলাম, ইঁহারা বলুন প্রাচ্য পদ্ধতি সাহায্যলাভের যোগ্য কিনা, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এই কমিটি দেশী বিলাতী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মত লইয়াছেন। এযাবৎ যাহা লইয়া মতভেদ হইয়া আসিতেছে তাহা সাধারণের অবোধ্য নয়। সরকারী সাহায্য যাহাকেই দেওয়া হউক তাহা সাধারণেরই অর্থ, অতএব সর্বসাধারণের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্তব্য। অর্থ ও উদ্যম যাহাতে যোগ্য পাত্রে যোগ্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

প্রাচ্য পদ্ধতির বিরোধীরা বলেন—তোমাদের শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। বাত পিত্ত কফ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, এসকল কেবল হিং টিং ছট্। তোমাদের ঔষধে কিছু কিছু ভাল উপাদান আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিস্তর বাজে জিনিস মিশাইয়া অনর্থক আড়ম্বর করা হইয়াছে। তোমাদের ঋষিরা প্রাচীন আমলের হিসাবে খুব জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু তোমরা কেবল অন্ধভাবে সেকালের অনুসরণ করিতেছ। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে পার নাই। তোমরা ভাব যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই চূড়ান্ত, তাহার পর আর কিছু করিবার নাই—অথচ তোমরা আয়ুর্বেদবর্ণিত শস্ত্রচিকিৎসার মাথা খাইয়াছ। চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে গেলে যেসব বিদ্যা জানা দরকার, যথা আধুনিক শারীরবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, জীবাণুবিদ্যা ইত্যাদি, তাহার কিছুই জান না। মুখে যতই আস্ফালন কর ভিতরে তোমাদের আত্মনির্ভরতায় শোষ ধরিয়াছে, তাই লুকাইয়া কুইনিন চালাও। তোমাদের সাহায্য করিলে কেবল কুসংস্কার ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এইবার আমাদের কথা শোন।—আমরা কোনও প্রাচীন যোগী-ঋষির উপর নির্ভর করি না। হিপোক্রাটিস গালেন প্রভৃতির আমরা অন্ধ শিষ্য নহি। আমাদের বিদ্যা নিত্য উন্নতিশীল। পূর্বসংস্কার যখনই ভুল বলিয়া জানিতে পারি তখনই তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করি। বিজ্ঞানের যে কোনও আবিষ্কারের সাহায্য লইতে আমাদের দ্বিধা নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া নব নব ঔষধ ও চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করি। আমাদের কেহ কেহ মকরধ্বজ ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু গোপনে নয় প্রকাশ্যে। আমাদের কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতা নাই।

অপর পক্ষ বলেন—আচ্ছা বাপু, তোমাদের বিজ্ঞান আমরা জানি না মানিলাম। কিন্তু আমাদের এই যে বিশাল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, তোমরা কি তাহা অধ্যয়ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ? বাত পিত্ত কফ না বুঝিয়াই ঠাট্টা কর কেন? আমাদের অবনতি হইয়াছে স্বীকার করি, এখন আর আমাদের মধ্যে নূতন ঋষি জন্মেন না। অগত্যা যদি আমরা পুরাতন ঋষির উপদেশেই চলি, সেটা কি মন্দের ভাল নয়? তোমাদের পদ্ধতিতে অনেক খরচ। তোমাদের স্কুলে একটা হাতুড়ে ডাক্তার উৎপন্ন করিতে যত টাকা পড়ে তাহার সিকির সিকিতে আমাদের বড় বড় মহামহোপাধ্যায় গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তোমাদের ঔষধ পথ্য সরঞ্জাম সমস্তই মহার্ঘ, বিদেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বিজ্ঞানের অজুহাতে তোমরা

চিকিৎসায় বিলাতী কুসংস্কার ও বিলাসিতা আমদানি করিয়াছ। আমাদের ঔষধপথ্য সমস্তই সস্তা, এদেশেই পাওয়া যায়, গরিবের উপযুক্ত। আমাদের ঔষধে যতই বাজে জিনিস থাক, স্পষ্ট দেখিতেছি উপকার হইতেছে। তোমাদের অনেক ঔষধে কোহল আছে। বিলাতী উদরে হয়তো তাহা সমুদ্রে জলবিন্দু, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত জঠরে সেই অপেয় অদেয় অগ্রাহ্য জিনিস ঢালিবে কেন? আমাদের দেশবাসীর ধাতু তোমাদের বিলাতীগুরুগণ কি করিয়া বুঝিবেন? তোমাদের চিকিৎসা যতই ভাল হউক, এই দরিদ্র দেশের কয়জনের ভাগ্যে তাহা জুটিবে? যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা ডাক্তারি চিকিৎসা করান, কিন্তু গরিবের ব্যবস্থা আমাদের হাতে দাও। বড় বড় ডাক্তার যাহাকে জবাব দিয়াছে এমন রোগীকেও আমরা সারাইয়াছি, বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেও আমাদের ডাকে, আমরাও মোটর চালাই। কেবল কুসংস্কারের ভিত্তিতেই কি এতটা প্রতিপত্তি হয়? মোট কথা—তোমাদের বিজ্ঞান একপথে গিয়াছে, আমাদের বিজ্ঞান অন্যপথে গিয়াছে। কিছু তোমরা জান, কিছু আমরা জানি। অতএব চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দ টাকার কিছু তোমরা লও, কিছু আমরা লই।

আমার মনে হয় এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে 'বিজ্ঞান' শব্দের অসংযত প্রয়োগ এবং 'চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও 'চিকিৎসাপদ্ধতি'র অর্থবিপর্যয়। Eastern science, eastern system, western science, western system—এসকল কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা ভাল।

'বিজ্ঞান' শব্দে যদি পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞান বুঝায় তবে তাহা দেশে দেশে পৃথক হইতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জগতের গুণিসভার বিচারে উত্তীর্ণ হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ, সে জন্য কালে কালে সিদ্ধান্তের অল্পাধিক পরিবর্তন হইতে পারে। যাঁহারা বলেন—পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান মানি না, অপৌরুষেয় অথবা দিব্যদৃষ্টিলব্ধ সনাতন সিদ্ধান্তই আমাদের নির্বিচারে গ্রহণীয়—তাঁহাদের সহিত তর্ক চলে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের এমন অর্থ হইতে পারে না যে একই সিদ্ধান্ত কোথাও সত্য কোথাও মিথ্যা। কুতার্কিক বলিতে পারে—শ্রাবণ মাসে বর্ষা

হয় ইহা এদেশে সত্য বিলাতে মিথ্যা; মশায় ম্যালেরিয়া আনে ইহা এক জেলায় সত্য অন্য জেলায় মিথ্যা। এরূপ হেত্বাভাস খণ্ডনের আবশ্যকতা নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের একমাত্র অর্থ—বিভিন্ন দেশে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যাহা সর্বদেশেই মান্য।

বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানীর সম্পত্তি নয়। সাধারণ লোক আর বিজ্ঞানীর এইমাত্র প্রভেদ যে বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক। আমরা সকলেই বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। অগ্নিপক্ব দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রন্ধন করি, দেহ-আবরণে শীতনিবারণ হয় এই তথ্য জানিয়া বস্ত্রধারণ করি। কতক সংস্কারবশে করি, কতক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করি। অসত্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াও অনেক কাজ করি বটে কিন্তু জীবনের যাহা কিছু সফলতা তাহা সত্য সিদ্ধান্ত দ্বারাই লাভ করি।

চরক বলিয়াছেন—

সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ম্।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সমগ্র দুঃখ অবিজ্ঞানজনিত। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত।

গাড়িতে চাকা লাগাইলে তাড়াতাড়ি চলে এই সিদ্ধান্ত কোন্ দেশে কোন্ যুগে কোন্ মহাবিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল জানা যায় নাই, কিন্তু সমগ্র জগৎ বিনা তর্কে ইহার সৎপ্রয়োগ করিতেছে। চশমা ক্ষীণ দৃষ্টির সহায়তা করে এই সত্য পাশ্চাত্ত্য দেশে আবিষ্কৃত হইলেও এদেশের লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞান বা সত্য সিদ্ধান্তের উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাহার জাতিদোষ থাকিতে পারে না, বয়কট চলিতে পারে না।

কিন্তু কি করিয়া বুঝিব অমুক সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক কি না? বিজ্ঞানীদের মধ্যেও মতভেদ হয়। আজ যাহা অভ্রান্ত গণ্য হইয়াছে ভবিষ্যতে হয়তো তাহাতে ত্রুটি বাহির হইবে, অতএব সিদ্ধান্তেরও মর্যাদাভেদ আছে। মোটামুটি সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে এই দুই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে—

১। যাহার পরীক্ষা সাধ্য এবং বার বার হইয়াছে।

২। যাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইতে পারে নাই অথবা হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ এবং যাহার সহিত কোনও সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরোধ এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বলাবাহুল্য প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তরই ব্যবহারিক মূল্য অধিক। এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত আরও নানা প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে যাহা এখনও অপরীক্ষিত অথবা কেবল লোকপ্রসিদ্ধি বা ব্যক্তি বিশেষের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এপ্রকার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি, কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞানীর শ্রেণীতে ফেলা অনুচিত।

চিকিৎসা একটি ব্যবহারিক বিদ্যা। ইহার প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিজ্ঞানের সকলগুলি সমান উন্নত নয়। কৃত্রিম যন্ত্রের কার্যকারিতা অথবা এক দ্রব্যের উপর অপর দ্রব্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে যত সহজে পরীক্ষা চলে এবং পরীক্ষার ফল যেপ্রকার নিশ্চয়ের সহিত জানা যায়, জটিল মানবদেহের উপর সেপ্রকার সুনিশ্চিত পরীক্ষা সাধ্য নয়। অতএব চিকিৎসাবিদ্যায় সংশয় ও অনিশ্চয় অনিবার্য। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর চিকিৎসাবিদ্যা যতটা নির্ভর করে, অল্পপরীক্ষিত কিংবদন্তীমূলক ও ব্যক্তিগত মতের উপর ততোধিক নির্ভর করে। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সকল চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। অতএব বর্তমান অবস্থায় সমগ্র চিকিৎসা-বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা অত্যুক্তি মাত্র, এবং তাহাতে সাধারণের বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়।

কবিরাজগণ মনে করেন তাঁহাদের চিকিৎসাপদ্ধতি একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান অতএব ডাক্তারি বিদ্যার সহিত তাহার সম্পর্ক রাখা নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ্যার যে অংশ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে, কিন্তু যাহা বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা বর্জন করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। অমুক তথ্য বিলাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে অতএব তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই—কবিরাজগণের এই ধারণা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে তাঁহাদের অবনতি অনিবার্য। এমন দিন ছিল যখন দেশের লোকে সকল রোগেই তাঁহাদের শরণ লইত। কিন্তু আজকাল যাঁহারা কবিরাজির অতিশয় ভক্ত তাঁহারাও মনে করেন কেবল বিশেষ বিশেষ রোগেই কবিরাজি ভাল। নিত্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রভাবে কবিরাজি চিকিৎসার এই সংকীর্ণ সীমা ক্রমশ সংকীর্ণতর হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিরই চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদেরও আয়ুর্বেদের প্রতি অবজ্ঞা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নবলব্ধ বিদ্যার অভিমানে হয়তো তাঁহারা অনেক পুরাতন সত্য হারাইতেছেন। এই সকল সত্যের সন্ধান করা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য।

চরকের এই মহাবাক্য সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—

> ন চৈব হি সুতরাং আয়ুর্বেদস্য পারম্। তস্মাৎ
> অপ্রমত্তঃ শশ্বৎ অভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ।...
> কৃৎস্নো হি লোকে বুদ্ধিমতাং আচার্যঃ, শত্রুশ্চ
> অবুদ্ধিমতাম্। এতচ্চ অভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা
> অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং লোকহিতকরম্
> ইতি উপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যম্ অনুবিধাতব্যঞ্চ।

অর্থাৎ—সুতরাং আয়ুর্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা ইহাতে অভিনিবেশ করিবে।...বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, কিন্তু অবুদ্ধিমান সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান ধনকর যশস্কর আয়ুষ্কর ও লোকহিতকর উপদেশবাক্য অমিত্রের নিকটেও শুনিবেন এবং অনুসরণ করিবেন।

কেহ কেহ বলিবেন, কবিরাজগণ যদি ডাক্তারি শাস্ত্র হইতে কিছু গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা ভক্তগণের শ্রদ্ধা হারাইবেন—যদিও সেসকল ভক্ত আবশ্যকমত ডাক্তারি চিকিৎসাও করান। এ আশঙ্কা হয়তো সত্য। এমন লোক অনেক আছে যাহারা নিত্য অশাস্ত্রীয় আচরণ করে কিন্তু ধর্মকর্মের সময় পুরোহিতের নিষ্ঠার ত্রুটি সহিতে পারে না। সাধারণের এইপ্রকার অসমঞ্জস গোঁড়ামির জন্য কবিরাজগণ অনেকটা দায়ী। তাঁহারা এযাবৎ প্রাচীনকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; সাধারণেও তাহাই শিখিয়াছে। তাঁহারা যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা অন্যবিধ করেন এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সাক্ষ্য একটু কমাইয়া বর্তমানকালোচিত যুক্তি প্রয়োগ করেন তবে লোকমতের সংস্কারও অচিরে হইবে।

শাস্ত্র ও ব্যবহার এক জিনিস নয়। হিন্দুর শাস্ত্র যাহা ছিল তাহাই আছে, কিন্তু ব্যবহার যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। অথচ সেকালেও হিন্দু ছিল, একালেও আছে। প্রাচীন চিন্তাধারার ইতিহাস এবং প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে শাস্ত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সযত্ন অধ্যয়নের বিষয়, কিন্তু কোনও শাস্ত্র চিরকালের উপযোগী ব্যবহারিক পন্থা নির্দেশ করিতে পারে না। চরক সুশ্রুতের যুগে অজ্ঞাত অনেক ঔষধ ও প্রণালী রসরত্নাকর ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোনও একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত যেসকল আবিষ্কার বা উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আয়ুর্বেদের অন্তর্গত, তাহার পর

আর উন্নতি হইতে পারে না—এরূপ ধারণা অধোগতির লক্ষণ। নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিলেই আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির জাতিনাশ হইবে না। বিজ্ঞান ও পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান সর্বত্র সমান, কিন্তু পদ্ধতি দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াও বিভিন্ন সমাজের উপযোগী পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে এবং একই পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াও আপন সমাজগত বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে পারে।

বিলাতের লোক টেবিলে চীনামাটির বাসন কাচের গ্লাস ইত্যাদির সাহায্যে রুটি মাংস মদ খায়। আমাদের দেশের লোকের সামর্থ্য ও রুচি অন্যবিধ, তাই ভূমিতে বসিয়া কলাপাতা বা পিতল কাঁসার বাসনে ভাত ডাল জল খায়। উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। হইতে পারে বিলাতী পদ্ধতি অধিকতর সভ্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কিন্তু কলাপাতাতে ভাত ডাল খাইলেও বিজ্ঞানের অবমাননা হয় না। দেশীয় পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আলু কপির ব্যবহার বিলাত হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী প্রথায় রাঁধি। গ্লাসে জল খাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী রুচি অনুসারে পিতল কাঁসায় গড়ি। এইরূপ অনেক জিনিস অনেক প্রথা একটু বদলাইয়া বা পুরোপুরি লইয়া আপন পদ্ধতির অঙ্গীভূত করিয়াছি। অনেক দুষ্ট প্রথা শিখিয়া ভুল করিয়াছি, কিন্তু যদি নির্বিচারে ভালমন্দ সকল বিদেশী প্রথাই বর্জন করিতাম তবে আরও বেশী ভুল করিতাম।

চাকা-সংযুক্ত গাড়ি যে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। আমি যদি ধনী হই এবং আমার দেশের রাস্তা যদি ভাল হয় তবে আমি মোটরে যাতায়াত করিতে পারি। কিন্তু যদি আমার অবস্থা মন্দ হয়, অথবা পল্লীগ্রামের কাঁচা অসম পথে যাইতে হয়, অথবা যদি অন্য গাড়ি না জোটে তবে আমাকে গরুর গাড়িই চড়িতে হইবে। আমি জানি, গোযান অপেক্ষা মোটরযান বহু বিষয়ে উন্নত এবং মোটরে যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে গোযানে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তথাপি আমি গরুর গাড়ি নির্বাচন করিলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিব না। মোটরে যে অসংখ্য জটিল বৈজ্ঞানিক কৌশলের সমবায় আছে তাহা আমার অবস্থার অনুকূল নয়, অথচ যে সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গরুর গাড়ি নির্মিত তাহাতে আমার কার্যোদ্ধার হয়। কিন্তু যদি গরুর গাড়ির মাঝে চাকা না বসাইয়া শেষ প্রান্তে বসাই অথবা ছোট বড় চাকা লাগাই তবে অবৈজ্ঞানিক কার্য হইবে।

অথবা যদি আমাকে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাইতে হয় এবং কেহ গাড়ির সম্মুখে লণ্ঠন বাঁধিবার যুক্তি দিলে বলি—গরুর গাড়ির সামনে কস্মিন্‌কালে কেহ লণ্ঠন বাঁধে নাই, অতএব আমি এই অনাচার দ্বারা সনাতন গোযানের জাতিনাশ করিতে পারি না—তবে আমার মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি মোটরের প্রতি অন্ধ ভক্তির বশে মনে করি—বরং বাড়িতে বসিয়া থাকিব তথাপি অসভ্য গোযানে চড়িব না—তবে হয়তো আমার পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি হইবে।

কেহ যেন মনে না করেন আমি কবিরাজি পদ্ধতিকে গরুর গাড়ির তুল্য হীন এবং ডাক্তারিকে মোটরের তুল্য উন্নত বলিতেছি। আয়ুর্বেদভাণ্ডারে এমন অনেক তথ্য নিশ্চয় আছে যাহা শিখিলে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ ধন্য হইবেন। আমার ইহাই বক্তব্য যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি একাধিক পদ্ধতিতে হইতে পারে, এবং অবস্থাবিশেষে অতি প্রাচীন অথবা অনুন্নত উপায়ও বিজ্ঞজনের গ্রহণীয়—যদি অন্ধ সংস্কার না থাকে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পরিবর্তন করিতে দ্বিধা না থাকে। এই পরিবর্তন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান বিষয়ে কেবল যে কবিরাজি পদ্ধতি উদাসীন তাহা নয়, ডাক্তারিও সমান দোষী। ডাক্তারি পদ্ধতি বিলাত হইতে যথাযথ উঠাইয়া আনিয়া এদেশে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহাতে যে নিত্যবর্ধমান তথ্য আছে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার ঔষধ কেবল বিলাতে জ্ঞাত ঔষধ, তাহার পথ্য বিলাতেরই পথ্য। এদেশে পাওয়া যায় কিনা, অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতর কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিবার দরকার হয় না। দেশীয় উপকরণে আস্থা নাই, কারণ তাহার সহিত পরিচয় নাই। যাহা আবশ্যক তাহা বিদেশ হইতে আসিবে অথবা বিলাতী রীতিতেই এদেশে প্রস্তুত হইবে। চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ বিলাতের জ্ঞাত বুদ্ধি অভ্যাস ও রুচি অনুসারে উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য হওয়া চাই, আধেয় অপেক্ষা আধারের খরচ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই, এই দরিদ্র দেশের সামর্থ্যে না কুলাইলেও আপত্তি নাই। দেশসুদ্ধ লোকের ব্যবস্থা নাই হইল, যে কয়েকজনের হইবে তাহা বিলাতের মাপকাঠিতে প্রকৃষ্ট হওয়া চাই। কাঙালী ভোজনের টাকা যদি কম হয় তবে বরঞ্চ জনকতককে পোলাও খাওয়ানো হইবে কিন্তু সকলকে মোটাভাত দেওয়া চলিবে না। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থায় ইহাই দাঁড়াইয়াছে।

একদল পুরাতনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ

করিয়াছেন, আর একদল পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানের এবং বিলাসিতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। একদিকে অসংস্কৃত সুলভ ব্যবস্থা, অন্যদিকে অতিমার্জিত উপচারের ব্যয়বাহুল্য। আমাদের কবিরাজ ও ডাক্তারগণ যদি নিজ নিজ পদ্ধতিকে কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করেন তবে ক্রমশ উভয় পদ্ধতির সমন্বয় হইয়া এদেশের উপযোগী জীবন্ত আয়ুর্বেদের উদ্ভব হইতে পারে। যাঁহারা এই উদ্‌যোগে অগ্রণী হইবেন তাঁহাদিগকে দেশী বিদেশী উভয়বিধ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং পক্ষপাত বর্জন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতি হইতে বিজ্ঞানসম্মত বিধান এবং চিকিৎসার যথাসম্ভব দেশীয় উপায় নির্বাচন করিতে হইবে। কেবল উৎকর্ষের দিকেই লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, যাহাতে চিকিৎসার উপায় বহুপ্রসারিত, দরিদ্রের সাধ্য এবং সুদূর পল্লীতেও সহজপ্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য যদি নূতন এক শ্রেণীর চিকিৎসক সৃষ্টি করিতে হয় এবং ব্যয়লাঘবের জন্য নিকৃষ্ট প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য। কবিরাজী পাচন অরিষ্ট চূর্ণ মোদক বটিকাদির প্রস্তুত প্রণালী যদি অল্পব্যয়সাপেক্ষ হয় তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। একপ্রকার ঔষধ যদি ডাক্তারি টিংচার প্রভৃতির তুল্য প্রমাণসম্মত বা Standardized অথবা অসার অংশ বর্জিত না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। দেশের যে অসংখ্য লোকের ভাগ্যে কোনও চিকিৎসাই জুটে না তাহাদের পক্ষে মোটামুটি ব্যবস্থাও ভাল। ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যার অবনতি হইবার কারণ নাই, যাহার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সে প্রকৃষ্ট চিকিৎসাই করাইতে পারে। অবশ্য যদি দেশের অবস্থা উন্নত হয় তবে নিম্নস্তরের চিকিৎসাও ক্রমে উচ্চস্তরে পৌঁছিবে।

কবিরাজগণ দেশীয় ঔষধের গুণাবলী ও প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত। ঔষধের বাহ্য আড়ম্বরের উপর তাঁহাদের অন্ধভক্তি নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তারগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অধিকতর উন্নত। অতএব উভয় পক্ষের মতবিনিময় না হইলে এই সমন্বয় ঘটিবে না।

এইপ্রকার চিকিৎসা-সংস্কারের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক। প্রচলিত কবিরাজি পদ্ধতিকে সাহায্য করিলে দেশে চিকিৎসার অভাব অনেকটা দূর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না, ডাক্তারির ব্যয়বাহুল্য এবং কবিরাজির গতানুবর্তিতা কমিবে না। যদি অর্থ ও উদ্যমের

সৎপ্রয়োগ করিতে হয় তবে সরকারী সাহায্যে এইপ্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া উচিত—

১। ডাক্তারি স্কুল-কলেজে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদকে স্থান দেওয়া। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র না পড়িলে যেমন ফিলসফি-শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, চিকিৎসাবিদ্যাও তেমনই আয়ুর্বেদের অপরিচয়ে খর্ব হয়।

২। সাধারণের চেষ্টায় যে সকল আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের সাহায্য করা। সাহায্যের শর্ত এই হওয়া উচিত যে চিকিৎসাবিদ্যার আনুষঙ্গিক আধুনিক বিজ্ঞানসকলের যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বিলাতী ফার্মাকোপিয়ার অনুরূপ এদেশের উপযোগী সাধারণ প্রযোজ্য ঔষধসকলের তালিকা ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংকলন। ডাক্তারি চিকিৎসায় যদিও অসংখ্য ঔষধ প্রচলিত আছে তথাপি ফার্মাকোপিয়া-ভুক্ত ঔষধসকলেরই ব্যবহার বেশী। বিলাতে গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত সমিতি দ্বারা এই ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত হয়। দশ-পনর বৎসর অন্তর ইহার সংস্করণ হয়, যেসকল ঔষধ অকর্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়, সুপরীক্ষিত নূতন ঔষধ গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনবোধে ঔষধ তৈয়ারির নিয়মও পরিবর্তিত হয়। এদেশে এককালে শার্ঙ্গধর এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সকল সভ্য দেশেরই আপন ফার্মাকোপিয়া আছে এবং তাহা দেশের প্রথা ও রুচি অনুসারে সংকলিত হইয়া থাকে। এদেশের ফার্মাকোপিয়ায় বর্তমান কালের উপযোগী সুপরীক্ষিত যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ তৈয়ারির যেসকল ডাক্তারি প্রণালী আছে তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্বেদীয় প্রণালীও থাকা উচিত। অবশ্য যেসকল ঔষধ বা প্রণালী বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অখ্যাত বা অপরীক্ষিত তাহা বর্জিত হইবে। কেবল কিংবদন্তীর উপর অত্যধিক নির্ভর অকর্তব্য। কিন্তু দেশীয় অমুক ঔষধ বা প্রণালী, বিলাতী অমুক ঔষধ বা প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়াই বর্জিত হইবে না, ব্যয়লাঘব ও সৌকর্যের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এপ্রকার ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে পক্ষপাতহীন উদারমতাবলম্বী ডাক্তার ও কবিরাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই সংযোগ দুঃসাধ্য, কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই হতাশ হইবার কারণ নাই। এখন ডাক্তারগণই প্রবল পক্ষ, সুতরাং প্রথম উদ্যমে তাঁহারাই একযোগে সাক্ষী বিচারকের

আসন গ্রহণ করিবেন এবং কবিরাজগণকে কেবল সাক্ষ্য দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। প্রথম যাহা দাঁড়াইবে তাহা যতই সামান্য হউক, শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানবিনিময়ের ফলে ভবিষ্যতের পথ ক্রমশ সুগম হইবে।

৪। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাসম্ভব পূর্বোক্ত দেশীয় উপাদান ও দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ। যে সকল নূতন চিকিৎসক আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়বিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবেন তাঁহারা সহজেই এইসকল নূতন ঔষধ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এদেশের প্রতিষ্ঠাবান অনেক ডাক্তার আয়ুর্বেদকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইসকল নবপ্রবর্তিত দেশীয় ঔষধের প্রচলনে সাহায্য করিতে পারেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা কার্যে পরিণত করা অর্থ উদ্যম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিকে কালোপযোগী করা এবং চিকিৎসার উপায় সাধারণের পক্ষে সুলভ করার অন্যবিধ পন্থা খুঁজিয়া পাই না। সরকারী সাহায্য মিলিলেই কার্যোদ্ধার হইবে না, চিকিৎসক অচিকিৎসক সকলেরই উৎসাহ আবশ্যক। মোট কথা, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এমন হয় যে, জ্ঞান সর্বত্র আহরণ করিব, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োগ দেশের সামর্থ্য অভ্যাস ও রুচি অনুসারে করিব, তবেই উদ্দেশ্য সহজ হইবে।

ভদ্র জীবিকা

বাংলার ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় ভাবিতেছেন এবং জীবিকা নির্বাহের নূতন পন্থা নির্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হউক, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঔষধনির্বাচন মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য চাই, উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভবপর বোধহয় তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া দুর্দশার কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দশা কেবল ভদ্রসমাজেই বর্তমান এমন নয়। কিন্তু সমগ্র বাঙালীসমাজের অবস্থার বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিতে যে শ্রেণী বুঝায় তাহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই আছেন। অন্যধর্মীয় ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। প্রতিকারের পন্থা যে সকলের পক্ষেই সমান তাহা বলা বাহুল্য।

শতাধিক বৎসর পূর্বে 'ভদ্র' বলিলে কেবল ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানত জন্মগত হইলেও একটা গুণকর্মবিভাগজ বিশিষ্টতা সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপস্বত্ব ভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, অধিকাংশ বৈদ্য চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য করিতেন, এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরেজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। বাণিজ্যবৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিককে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন। উভয় গৃহস্থের মধ্যে সদ্‌ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা জমিদারি এবং মামলা

পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জন করিতেছেন তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জিত আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাঁহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইত। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনও বর্তমান, কেবল প্রভেদ এই—বাঙালী বণিকও তাঁহাদের বংশপরম্পরালব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে ব্যবসায় না শিখিলে তাঁহাদের আর চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্পব্যয়ে নির্বাহ হইত। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর আসিল। বাঙালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমেরও সুবিধা হয়। কেরানীযুগের সেই আদি কালে সামান্য ইংরেজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল, সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকতক অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সরকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্‌যোগী তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙালী ভদ্রসন্তানই ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরেজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এই সকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইঁহাদের উপার্জনের পরিমাণ যাহাই হউক, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চালচলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণপোষণ হইত। সভ্যতা ও বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জকের

নিজ খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারাও চাকরির উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্মান বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবর্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবনযাত্রার প্রণালী বিশেষ। ভদ্রতালাভের উপায় হইল—বিশেষ-প্রকার জীবিকা গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল-কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা —চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটি ভদ্রমণ্ডূক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমাও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মাঠের মণ্ডূক হাটের মণ্ডূক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতালাভ করিল। কূপমণ্ডূকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আহার্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই ভদ্রতা বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা অর্থাৎ স্কুল-কলেজে লব্ধ বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায় তাহাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয়। কেরানীগিরির বেতন যতই অল্প হউক, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই কম হউক, তথাপি এসকলে একটু কেতাবী বিদ্যা খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি, পুরানো লোহা বিক্রয় বা গরুর গাড়ির ঠিকাদারিতে বিদ্যা-প্রয়োগের সুযোগ নাই, সুতরাং এসকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না তখন অপর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙালী ভদ্রসন্তান ক্রমশ অকেতাবী বৃত্তিও লইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহার নূতন আমদানি হইয়াছে কিংবা যাহার ইংরেজী নামই প্রচলিত, সেরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের কাজ, ধোবার কাজ, কোচমানি, মুদিগিরি চলিবে না; কিন্তু ঘড়ি বা বাইসিকেল মেরামত, নক্‌শা আঁকা, ডাইং-ক্লিনিং, চা-এর

দোকান, মাংসের হোটেল, স্টেশনারি শপ—এসকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক বা ইংরেজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এইসকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগার করা সম্ভব নয়। দরিদ্র ভদ্রসন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনও রকমে সংসার চালাইতে পারে, কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকিলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পসার অনিশ্চিত, এঞ্জিনিয়ার প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদরী হয়, সৈনিক হয়, নাবিক হয় কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এসকল বৃত্তি নাই।

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি।—গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শিখাও, ইউনিভার্সিটির পাঠ্য বদলাও। ছেলেরা অল্পবয়স হইতে হাতে-কলমে কাজ করিতে শিখুক, তাহার পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প-উৎপাদন শিখুক। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না তাহারা banking, accountancy, economics প্রভৃতিতে মন দিক। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সমস্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রাও স্থির হয় নাই, রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। ঔষধ সেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয় তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক উপকরণের ফলাফল বিচার কর্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। আমার যতটা জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দরজীর কাজ, সুতা কাটা, তাঁত বোনা, নক্‌শা করা ও কৃষি। যে সকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিংবা যাহারা ভবিষ্যতে ঐ কাজ বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয় হিতকর। যাহারা অবস্থাপন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্যা ও ব্যায়ামশিক্ষা আবশ্যক, হাতের নিপুণতা তেমনই আবশ্যক। কিন্তু

উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষা কেবল গৌণভাবেই হিতকর, মুখ্যভাবে উপার্জনের কোনও সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা। Mechanical ও electrical engineering, agriculture, surveying, banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্পবিস্তর আছে। এখন কয়েকপ্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, যথা—চামড়া, সাবান, কাচ, চীনামাটির জিনিস, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারি এবং সুতা ও কাপড় রং করার প্রণালী। উদ্দেশ্য এই যে দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা, যথা—engineering, accountancy ইত্যাদি শিখিলে চাকরির ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণত সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, কেবল এইপ্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল, বি এস-সি এম এস-সি-তে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয়স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরানী বা উকিল হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে? বিজ্ঞান ও কার্যকরী বিদ্যা এক নয়। কেমিস্ট্রী ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞান প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাকে বলে technical education। অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচনে ভুল করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসংযত ছিল তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, এবং এবারেও হয়তো সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞানে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে তাহা উদাহরণ রূপেই থাকে, উৎপাদনের প্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানপাঠে কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান লাভ হয়, এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয় শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যে সকল কারণ বর্তমান থাকিলে দেশে শিল্পবৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞানশিক্ষা তাহার অন্যতম কারণ, প্রধান কারণও বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্পশিক্ষা। ইহার অর্থ—যে প্রণালীতে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই প্রণালীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদূর সংগত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য তৈয়ারি বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না, তাহার জন্য দক্ষ ব্যক্তির কাছে হাতা-খন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। এই শিক্ষা লাভ করিলে পাচকের চাকরি মিলিতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুশী করা যায়। আয়ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না, তাহা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনও উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধনবিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধনশিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত জায়গায় বাড়ি চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাকালে বহুলোকের আহার্য সরবরাহ চাই, হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়ব্যয় খতাইয়া লাভ-লোকসান নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনও শিক্ষালয়ে পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অল্পাধিক দুর্গম। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং

কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের কঠোর প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়বুদ্ধি জন্মিবে না এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্‌যোগী ব্যক্তি পুঁথিগত বিজ্ঞানচর্চা করিয়া কিংবা বিজ্ঞানের কোনও চর্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানচর্চা এবং কার্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এই সুযোগ বর্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্বে যদি এক লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইয়া থাকেন; তবে এখন হয়তো দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি হইতে আমরা একমাত্র আশা করিতে পারি যে কয়েকজনের নূতন প্রকার চাকরি মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে কোনও প্রকার সুবিধা লাভ হইবে না।

Technical Education-কে নিরর্থক প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাহি—যদি ছাত্রগণ অত্যধিক সংখ্যায় নির্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফলমনোরথ হইবেন। কারণ, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এদেশে কারখানাও এত নাই যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। বিজ্ঞান সকলের রুচিকরও নয়। অতএব জীবিকালাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কিনা দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের এক দল এদেশের কুলী মজুর ধোবা নাপিত কামার কুমার মাঝি মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর এক দল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপনেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখিতেছে কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে

দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এইসকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা জানে না, ecnomics বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট, অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয়, কারণ ইহারা মনে করে পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্বিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ষার বশে কতক অজ্ঞতার জন্য এইসকল পরদেশীর কার্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ, টাকার জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে; যা তা খাইয়া যেখানে সেখানে বাস করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের তুল্য অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবিকানির্বাহ্ আরম্ভ করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না। অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্বে ইংরেজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরেজের চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী বুঝিয়াছে মোটা চালচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোন বিরোধ নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মনে করার কোনও হেতু নাই যে ঐসকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগে জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে বাঙালীর পরাভব তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এই সকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন অনুসন্ধানের

যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিগ্‌বৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত হইয়াছে এবং আত্মীয়স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙালী কেরানী মার্চেন্ট অফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice voucher day-book ledger লিখিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া আসে, মনিবের সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে মাত্র, মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই স্বার্থও নাই। ভারতীয় বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। তাহার সহায়তা করিয়া বণিকপুত্র অল্প বয়সেই পৈতৃক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শেখে, এবং কেনা বেচা আদায় উসুল জাবেদা রোকড় খতিয়ান হাতচিঠা হুন্ডি মোকাম—বাজারের গূঢ় তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙালী ভদ্রের দুর্লভ। উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রফেসার কেরানীর সন্তান ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে, কিন্তু অভিভাবকদের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল আড়তদার ব্যাপারী পাইকার দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে আসে। পণ্যের এই পরিক্রমপথে অগণিত ব্যক্তির অন্নসংস্থান হয়। এই মহাজন অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রলোককে এই পথের বার্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে এ সুযোগ নাই সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক অনেক সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয় তাহারই কিয়দংশে ব্যবসায় শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বাঞ্ছিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকল সময়ে সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না। কিন্তু যে হইতে চাহিবে তাহার সংকল্প স্থির করিয়া পঠদ্দশাতেই বণিগ্‌বৃত্তির সহিত পরিচয় আরম্ভ করা

ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর অনাবশ্যক। আগে অর্থবিদ্যা শিখিব তাহার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না। আগে ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণ—ইহাই স্বাভাবিক রীতি। দোকান হাট বাজার আড়ত ব্যবসায়শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ। এই সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে; আমদানি রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়প্রথা, পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য, দালালের করণীয়, হিসাবের প্রণালী, পাওনা আদায়ের উপায়—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এইসকল সংবাদ গ্রহণ করেন তবে তিনিও উপকৃত হইবেন এবং শিক্ষার্থীকেও সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা—অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা—শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকতক কোনও ব্যবসায়ীর কর্মচারী হইয়া হাতেকলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য premium দেওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু যদি দিতেও হয় তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনও নির্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যেকোনও সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশি করায় লাভ আছে, কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা হইবে না। সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপারে শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবিশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চশিক্ষা বা কার্যকরী বিদ্যা লাভ করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে এরূপ আশা করা অসংগত। প্রথমে যে ছোট কারবার আরম্ভ হইবে তাহা হাতেখড়ি বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তাহার পর অভিজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা জন্মিলে কারবার সহজেই বৃদ্ধি পাইবে।

এই প্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক, শৌখিন বাঙালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত লোহার ঘরে জ্বলন্ত হাপরের কাছে লোহা

পিটিয়া এঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সার্ভেয়িং শেখে। আইন পরীক্ষা পাস করিয়া বহুদিন মুরব্বী উকিলের বাড়িতে ধরনা দেয়। ভোরে অর্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন অফিসে কলম পিশিয়া বাড়ি ফেরে। এসকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে যে বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে, সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনও কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্বের তুলনায় বাঙালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন দিতেছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটিরশিল্প, উন্নত কৃষি এবং কার্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মন দেন তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রমিত হয়, ইহার ক্ষেত্রও বিশাল। দোকানদার না থাকিলে সমাজ চলে না। জনকতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা ও সৌষ্ঠবজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এইসকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয় জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও তাহার বৃত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের চর্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুকাইবে না।

রস ও রুচি

ঋগ্‌বেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বললেন—'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি' —অগ্রে যা উদয় হল তা কাম। তারপর আমাদের আলংকারিকরা নবরসের ফর্দ করতে গিয়ে প্রথমেই বসালেন আদিরস। অবশেষে ফ্রয়েড সদলবলে এসে সাফ সাফ বলে দিলেন—মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

সেদিন কোনও মনোবিদ্যার বৈঠকে একটি প্রবন্ধ শুনছিলাম—রবীন্দ্রনাথের রচনার সাইকোঅ্যানালিসিস। বক্তা পরমশ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্রসাহিত্যের হাড় মাস চামড়া চিরে চিরে দেখাচ্ছিলেন কবির প্রতিভার মূল উৎস কোথায়। কবি যদি সেই ভৈরবীচক্রে উপস্থিত থাকতেন তবে নিশ্চয় মূর্ছা যেতেন, আর মূর্ছান্তে ছুটে গিয়ে কোনও স্মৃতিভূষণকে ধরে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতেন।

কি ভয়ানক কথা! আমরা যা কিছু স্পৃহণীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি তার অনেকেরই মূলে আছে একটা হীন রিপু! ফ্রয়েডের দল খাতির করে তার নাম দিয়েছেন 'লিবিডো', কিন্তু বস্তুটি লালসারই একটি বিরাট রূপ। তাও কি সোজাসুজি লালসা? তার শতজিহ্বা শতদিকে লকলক করছে, সে দেবতার ভোগ শকুনির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটতে চায়, তার পাত্রাপাত্র কালাকাল জ্ঞান নেই। এই জঘন্য বৃত্তিই কি আমাদের রসজ্ঞানের প্রসূতি? 'পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—মনে করতাম এই কথাটি ভগবানকে খুশী করবার জন্য একটু অতিরঞ্জিত বিনয়বচন মাত্র। আমরা যে সত্য সত্যই এমন উৎকট পাপাত্মা তা এতদিন হুঁশ হয় নি। বিধাতা আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নরকস্থ করেছেন, আমাদের আবার সুরুচি কুরুচি।

ছটা রিপুর মধ্যে প্রথমটারই অত প্রতিপত্তি হল কেন? কাব্য সাহিত্য চৌষট্টি-কলা ভক্তি প্রেম স্নেহ সমস্তই কামজ; অতি উত্তম কথা। কিন্তু ক্রোধ থেকে কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায় নি কি? গীতাকার কাম-ক্রোধকে একাকার করে বলেছেন—'কাম এষ, ক্রোধ এষ'। লোভ মোহ প্রভৃতি অন্য

রিপুও বোধ হয় তাঁর মতে কামের রূপান্তর। ফ্রয়েডের শিষ্যরা গীতার একটা সরল ব্যাখ্যা লিখলে ভাল হয়।

আর একটা সংশয় আমাদের মতন আনাড়ীদের মনে উদয় হয়।—বৈদিক ঋষি থেকে ফ্রয়েডপন্থী পর্যন্ত সকলেই হয়তো একটা ভুল করেছেন। আগে কাম, না আগে ক্ষুধা? পাচনরসই আদিরস নয়তো? কাম-কমপ্লেক্স্ যেমন নব-নব মূর্তি পরিগ্রহ করে ফুটে ওঠে, ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সেরও কি তেমন কোনও ক্ষমতা নেই?

আধুনিক 'মনোজ্ঞ'গণ বলেন—অতৃপ্তি বা নিগ্রহেই কামের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, আর তার ফল এই বিচিত্র মানবচরিত্র। ভোজনেরও অতৃপ্তি আছে, কিন্তু সে অতৃপ্তি তেমন তীব্র নয়, সেজন্য মানুষের মনে তার প্রভাব অল্প। অর্থাৎ উপবাসের চেয়ে বিরহেরই সৃষ্টিশক্তি বেশী। অবশ্য 'বিরহ' শব্দটির একটু ব্যাপক অর্থ ধরতে হবে, ন্যায্য অন্যায্য পবিত্র পাশবিক অস্বাভাবিক সমস্ত অতৃপ্তিই বিরহ, আর তা মনের অগোচরেই কাজ করে।

ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সের যে কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই এমন নয়। শোনা যায় সেকালে অনেকে খানা খাবার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন, অবশ্য তাঁরা অপরকে এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক হেতুই দেখাতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করে গেছেন তিনি তুচ্ছ পাঁউরুটির লোভে দিনকতক সনাতন সমাজ বর্জন করেছিলেন। এখনকার ভদ্র হিন্দুধর্ম অতি উদার—অন্তত খাওয়া-পরা সম্বন্ধে, সেজন্যে লুব্ধ রসনা থেকে মনে আর ধর্মরসের সঞ্চার হয় না। কিন্তু বিবাহে যেটুকু বাধা আছে তা এখনও সমাজে আর উপন্যাসে অঘটন ঘটাচ্ছে।

সাহিত্যে ভোজনরসের প্রতিপত্তি নেই। কালিদাসের যক্ষ শুধু বিরহী নয়, উপবাসীও বটে। সে অলকাপুরীর হরেক রকম ভোগের বর্ণনা করেছে, কিন্তু সেখানকার বাবুর্চীখানার কথা কিছু বলে নি। রবীন্দ্রনাথও এ রসের প্রতি বিমুখ কিন্তু তিনি এর প্রভাব একবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কমলার উপর গাজীপুরযাত্রী খুড়োমশায়ের হঠাৎ যে স্নেহ হল তার মূলে কোন্ কমপ্লেক্স্ ছিল? খুড়োর বয়স হয়েছে, কিন্তু ভোজন ব্যাপারে তিনি উদাসীন নন। স্টীমারে রান্নার সুবাস পেয়ে বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস টেনে বলছেন—'চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে'। তরুণ যেমন অচেনা তরুণীর একটু হাসি একটু কাশি একটু হাঁচি অবলম্বন করে ভবিষ্য দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্ন রচনা করে, এই

বৃদ্ধও তেমনি কমলার ফোড়নের গন্ধে ভবিষ্য ব্যঞ্জনপরম্পরা কল্পনা করে অনাথা মেয়েটির স্নেহে বাঁধা পড়েছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য নিশ্চয় অন্য ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু আমরা কানে আঙুল দিয়ে রইলাম।

ভোজনরস এখন থাকুক, যে রস মানুষের মনে প্রবলতম তার কথাই হক। কামের পরিবর্তনের ফলে যদি আমরা প্রেম ভক্তি স্নেহ কলা কাব্য প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস পেয়ে থাকি, তবে কিসের খেদ? রসগ্রাহী ভদ্রজন ফুল চায়, ফল চায়, গাছের গোড়ায় কিসের সার আছে তার খোঁজ করে না। নীরস বিজ্ঞানী গাছের গোড়া খুঁড়ে দেখুক, সারের ব্যবস্থা করুক, তাতে আপত্তি নেই। পচা জৈব সারে গাছ সতেজ হয়—এটা খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু ফুল ফল উপভোগ করবার সময় কেউ তাতে সার মাখায় না।

কিন্তু অতীব লজ্জাসহকারে স্বীকার করতে হবে যে কেবল ফুল ফলে তৃপ্তি হয় না, গাছের গোড়ায় যে জীবনীয় রস আছে তার আস্বাদও আমরা মাঝে মাঝে কামনা করি। সামাজিক জীবনে যা ঘৃণ্য বা পীড়াদায়ক, এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হলে আমরা সমাদরে উপভোগ করি। নতুবা শোক দুঃখ নিষ্ঠুরতা লালসা ব্যভিচার প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে গল্পে চিত্রে স্থান পেত না।

আসল কথা—আমাদের বহু কামনা নানা কারণে আমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্বাসিত হয়েছে, এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয় ফুঁড়ে বার হয়েছে। এতেই তাদের চরিতার্থতা। এইসকল মনোবৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সমাজ তাদের সযত্নে পোষণ করে এবং সাহিত্যাদি কলায় তারা অনবদ্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু যেমন তেমন কামনার রূপান্তরগ্রহণের শক্তি নেই, তারা মাটিচাপা পড়েও অহরহ ঠেলা দিচ্ছে। সমাজ বলছে—খবরদার, যদি ফুটতেই চাও তবে কমনীয় বেশে ফুটে ওঠ। কিন্তু নিগৃহীত কামনা বলছে— ছদ্মবেশে সুখ নেই, আমি স্বমূর্তিতেই প্রকট হতে চাই; আমি পাষাণকারা ভাঙব কিন্তু করুণাধারা ঢালা আমার কাজ নয়। হুঁশিয়ার রস-স্রষ্টা স্নেহশীল পিতার ন্যায় তাদের বলেন—বাপু-সব, তোমাদের একটু রৌদ্রে বেড়িয়ে আনব, কিন্তু সাজগোজ করে ভদ্রবেশ ধরে চল; আর বেশী দাপাদাপি করো না। তৃষিত রসজ্ঞজন তাদের দেখে বলেন—আহা, কাদের বাছা তোমরা? কি সুন্দর, কিন্তু কেউ কেউ যেন একটু বেশী দুরন্ত। তাদের স্রষ্টা বুঝিয়ে দেন—এরা তোমার

নিতান্তই অন্তরের ধন; ভয় নেই, এরা কিছুই নষ্ট করবে না, আমি এদের সামলাতে জানি; এদের মধ্যে যে বেশী দুরন্ত তাকে আমি অবশেষে ঠেঙিয়ে দুরস্ত করে দেব, যে কম দুরন্ত তাকে অনুতপ্ত করব, যে কিছুতেই বাগ মানবে না তাকে নিবিড় রহস্যের জালে জড়িয়ে ছেড়ে দেব। দ্রষ্টার দল খুশী হয়ে বলেন—বাঃ, এই তো আর্ট। কিন্তু দু একজন অরসিক এত সাবধানতা সত্ত্বেও ভয় পান।

আর একদল রসস্রষ্টা তাঁদের আত্মজের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল। তাঁরা এইসব নিগৃহীত কামনাকে বলেন—কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? অত সাজগোজের দরকার কি, যাও, উলঙ্গ হয়ে রঙ মেখে নেচে এস। জনকতক লোলুপ রসলিপ্সু তাদের সমাদরে বরণ করে বলছেন—এই তো আসল আর্ট, আদিম ও চরম। কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল বলেন—কখনও আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকতে পারে না; আর্ট যদি হবে তবে ওদের দেখে আমাদের এতজনের অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মায় কেন? সমাজপতিরা বলেন—আর্ট-ফার্ট বুঝি না; সমাজের আদর্শ ক্ষুন্ন হতে দেব না; আমাদের সব বিধানই যে ভাল এমন বলি না; যদি উৎকৃষ্টতর বিধান কিছু দেখাতে পার তো দেখাও; কিন্তু তা যদি না পার তবে আত্মস্ফূর্তি বা self-expression-এর দোহাই দিয়ে যে তোমরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করবে, আমাদের ছেলেমেয়ে বিগড়ে দেবে, সেটি হবে না, আমরা আছি পুলিসও আছে।

উক্ত দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনও গণ্ডি নেই, আছে কেবল মাত্রাভেদ বা সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা ধরব না, কারণ অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর হাতে নরকবর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী হয়। কোন্ সীমায় সুরুচির শেষ আর কুরুচির আরম্ভ তারও নির্ধারণ হতে পারে না। এক যুগ এক দল যাকে উত্তম আর্ট বলবে, অপর যুগ অপর দল তার নিন্দা করবে, আর সমাজ চিরকালই আর্ট সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করবে।

বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা একা, তাই তাঁর সৃষ্টিতে আমরা নিয়মের রাজত্ব দেখি। মানুষ অনেক, তাই তার সৃষ্টি নিয়ে এত বিতণ্ডা। এই সৃষ্টির বীজ মানুষের মনে নিহিত আছে, তাই বোধহয় প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো' আর ঋষিপ্রোক্ত 'কাম'—

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্‌ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।

(*ঋগ্‌বেদ, ১০ম, ১২৯ সূ*)

কামনার হল উদয় অগ্রে, যা হল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবিরা পর্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।

(*শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কৃত অনুবাদ*)

ঋষি অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির কথাই বলছেন, এবং 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থই ধরতে হবে। কিন্তু সৎ-অসৎ-এর বাংলা অর্থ ধরলে এই সূক্তটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ফ্রয়েডপন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্‌বস্তু কাম থেকে সদ্‌বস্তু আর্ট উৎপন্ন হয়েছে। মনীষী কবিরা নিজ হৃদয় পর্যালোচনা করে হয়তো আপন অন্তরে আর্টের স্বরূপ উপলব্ধি করছেন। কিন্তু জনসাধারণের উপলব্ধি এখনও অস্ফুট। কি আর্ট, আর কি আর্ট নয়—বিজ্ঞান আজও নিরূপিত করতে পারে নি, অতএব সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির বিবাদ আপাতত চলবেই। যদি কোনও কালে আর্টের লক্ষণ নির্ধারিত হয়, তাহলেও সমাজের শঙ্কা দূর হবে কিনা সন্দেহ।

রস কি তা আমরা বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না। আর্টের প্রধান উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও আছে তাই আর্ট আরও জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির সঙ্গে অন্যান্য রসবস্তুর নিপুণ মিলনই আর্ট। কিন্তু যে সব উপাদান আমরা হাতের কাছে পাই তার সবগুলি অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্পবিস্তর অবান্তর খাদ আছে। নির্বাচনের দোষে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত বাজে উপাদান এসে পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে অবাঞ্ছিত স্বাদ জন্মায়। তার উপর আবার ভোক্তার পূর্ব অভ্যাস আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ আছে। এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, ভোক্তার রুচি গঠিত করে কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

❑

অপবিজ্ঞান

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসব ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ করে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।' এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন! বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন মায় প্রশংসাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়,

অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস—মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন্ রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী—অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধূঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধূঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা— ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল—'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাতা জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে,

তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসা বিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন—বাতাস করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসা বিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায়, ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন—আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন—পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ—যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই—কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম—কুইনিনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন—কুইনিন জ্বরকে জব্দ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন—জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুক প্রকার

হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে—কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই প্রশ্ন থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলিবেন—জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা Law of Gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান—অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাহাদের মধ্যে একটি; জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণ নির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, *laws are not causes*। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে

পারে—অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপারপরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন—কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে—এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা—অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ-ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদণ্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তার্কিক বলিবেন—প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার

আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন—তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ—অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ; নিয়তির অর্থ—সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্‌বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোন পরিচিত হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে—কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন—বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না! সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয়—কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স—তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা—মরণের অনির্ণেয়তা, বা অবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা—অমুক লোকটি ঘটনাপরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyinting-এর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।—

'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe....A law of nature explains nothing—it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.

❑

ঘনীকৃত তৈল

চলিত কথায় 'তৈল' বলিলে যেসকল বস্তু বুঝায় তাহাদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। সকল তৈলই দাহ্য, অল্পাধিক তরল এবং জলে অদ্রাব্য। তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলে এই সকল লক্ষণ বর্তমান। পক্ষান্তরে স্পিরিট তৈল নয়, কারণ তাহা দাহ্য ও তরল হইলেও জলের সহিত মিশে।

কিন্তু তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলের কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। তার্পিন সহজে উবিয়া যায়, কেরোসিন উবিতে সময় লাগে, সর্ষপ তৈল মোটেই উবে না। সর্ষপ তৈলের সহিত সোডা মিশাইয়া সাবান করা যায়, কিন্তু তার্পিন ও কেরোসিনে সাবান হয় না।

আমরা মোটামুটি কাজ চালাইবার জন্য পদার্থের স্থূল লক্ষণ দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করি, কিন্তু বিজ্ঞানী তাহাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন্ লক্ষণগুলি পদার্থের গঠন ও ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং সেইগুলিকেই মুখ্য লক্ষণ গণ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন। শ্রেণীনির্দেশের জন্য বিজ্ঞানী নূতন নাম রচনা করেন, অথবা প্রচলিত নাম বজায় রাখিয়া তাহার অর্থ সংকুচিত বা প্রসারিত করেন। এজন্য লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে অনেক স্থলে বিরোধ দেখা যায়। লোকে বলে চিংড়ি মাছ, বিজ্ঞানী বলেন চিংড়ি মাছ নয়। লোকে কয়েকপ্রকার লবণ জানে, যথা—সৈন্ধব, করকচ, লিভারপুল, বেআইনী, ইত্যাদি। বিজ্ঞানী বলেন, লবণ তোমার রান্নাঘরের একচেটে নয়, লবণ অসংখ্য, ফটকিরি তুঁতেও লবণ। কবি লেখেন—তাল-তমাল। বিজ্ঞানী বলেন—ও দুই গাছে ঢের তফাত, বরং ঘাস-বাঁশ লিখিতে পার।

রসায়নশাস্ত্র অনুসারে তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈল তিন পৃথক শ্রেণীতে পড়ে। তার্পিন, চন্দন, নেবুর তৈল প্রভৃতি গন্ধতৈল প্রথম শ্রেণী। কেরোসিন, পেট্রল, ভ্যাসেলিন, এমন কি কঠিন প্যারাফিন—যাহা হইতে বর্মা-বাতি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী। সর্ষপ তৈল, তিল তৈল, ঘৃত, চর্বি প্রভৃতি

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ স্নেহদ্রব্য তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ ইংরেজী নাম fat; আমরা এই শ্রেণীকেই 'তৈল' নামে অভিহিত করিব। অপর দুই শ্রেণী এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।

তৈল মানুষের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। ভারতের প্রদেশভেদে সর্ষপ তিল চীনাবাদাম ও নারিকেল তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতের তো কথাই নাই, ভারতবাসী মাত্রেই ঘৃতভক্ত। চর্বির ভক্তও অনেক আছে। কার্পাসবীজের তৈলও আজকাল রন্ধনে চলিতেছে। কোনও কোনও স্থানে তিসির তৈলও বাদ যায় না। মাদ্রাজে রেড়ির তৈলে প্রস্তুত উপাদেয় আমের আচার খাইয়াছি।

সাধারণ সাবানের উপাদান তৈল ও সোডা। তৈলভেদে সাবানের গুণের তারতম্য হয়। চর্বি ও নারিকেল তৈলের সাবান শক্ত, রেড়ি তিল চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলের সাবান নরম। লোকে নরম সাবান পছন্দ করে না, সেজন্য অন্য তৈলের সহিত কিছু চর্বি ও নারিকেল তৈল মিশানো হয়। নারিকেল তৈলের বিশেষ গুণ—সাবানে প্রচুর ফেনা হয়। কোনও কোনও কাজে নরম সাবানই দরকার হয়, সেজন্য নারিকেল তৈল ও চর্বি না দিয়া অন্য উদ্ভিজ্জ তৈল বা মাছের তৈল ব্যবহার করা হয় এবং সোডার বদলে অল্পাধিক পটাশ দেওয়া হয়। কিন্তু মোটের উপর কঠিন সাবানেরই আদর বেশী সেজন্য চর্বি ও নারিকেল তৈলের কাটতি ক্রমে বাড়িতেছে।

কলের তাঁতে বুনিবার পূর্বে সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় তাহার একটি প্রধান উপকরণ চর্বি। আমাদের দেশে তাঁতিরা নারিকেল তৈল দেয়, কিন্তু মিলে চর্বিই প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেও চর্বির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে।

লুচি কচুরি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দায় ঘি-এর ময়ান দেওয়া হয়, তাহার ফলে খাবার খাস্তা হয়, অর্থাৎ ময়দাপিণ্ডের চিমসা ভাব দূর হয়। খাজা ঢাকাই পরটা প্রভৃতিতে প্রচুর ময়ান থাকে, সেজন্য ভাজিবার সময় স্তরে স্তরে আলগা হইয়া যায়। কিন্তু যদি ঘি-এর বদলে তেলের ময়ান দেওয়া হয় তবে তত ভাল হয় না। চর্বি দিলে ঘি-এর চেয়েও ভাল হয়, অবশ্য সকলে সে পরীক্ষা করিতে রাজী হইবে না। বিলাতী বিস্কুটে এযাবৎ চর্বির ময়ান চলিয়া আসিতেছে। এদেশে যে 'হিন্দুবিস্কুট' প্রস্তুত হয় তাহা বিলাতীর সমকক্ষ নয়। ইহার প্রধান কারণ— নিপুণতার অভাব, কিন্তু চর্বির

বদলে ঘি বা মাখন ব্যবহারও অন্যতম কারণ।

তৈল চর্বি ইত্যাদির যতরকম প্রয়োগ আছে তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন ঘনীকৃত তৈলের কথা পাড়িব।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী রসায়নবিৎ আবিষ্কার করেন যে নিকেল ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তৈলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করা যায়, তাহার ফলে তরল তৈল ঘনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিকেল অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে মাত্র, উৎপন্ন বস্তুর অঙ্গীভূত হয় না। উক্ত আবিষ্কারের পর বহু বিজ্ঞানী এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার ফলে একটি বিশাল ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

যে-কোনও তৈল এই উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে ঘৃতের তুল্য কোমল, চর্বির তুল্য ঘন, মোমের তুল্য কঠিন অথবা তদপেক্ষাও কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়। সর্ষপ তৈল, নিম তৈল, এমন কি পূতিগন্ধ মাছের তৈল পর্যন্ত বর্ণহীন গন্ধহীন ঘন বস্তুতে পরিণত হয়।

Hydrogenated oil বা solidified oil বা ঘনীকৃত তৈল এখন ইওরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে হল্যান্ড মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংল্যান্ডও ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। এতদিন চর্বি দ্বারা যে কাজ হইত এখন বহুস্থলে ঘনীকৃত তৈল দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে। যে সকল উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল পূর্বে অতি নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য বলিয়া গণ্য হইত এখন তাহাদেরও সদ্‌গতি হইতেছে।

রুটি-মাখন বিলাতের জনপ্রিয় খাদ্য। কিন্তু গরিব লোকে মাখনের খরচ যোগাইতে পারে না, সেজন্য 'মারগারিন' নামক কৃত্রিম মাখনের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইহার উপাদান ছিল—চর্বি, উদ্‌ভিজ্জ তৈল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ এবং ঈষৎ মাত্রায় পিষ্ট-গোস্তনের নির্যাস। শেষোক্ত উপাদান মিশ্রণের ফলে মারগারিনে মাখনের স্বাদ ও গন্ধ কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভাল মারগারিনে কিছু খাঁটি মাখনও মিশ্রিত থাকে। আজকাল যে মারগারিন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে চর্বি ও স্বাভাবিক উদ্‌ভিজ্জ তৈল প্রায় থাকে না, তৎপরিবর্তে মাখনের তুল্য ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হয়, কিছু অন্যান্য উপাদান পূর্ববৎ বজায় আছে। চকোলেট টফি প্রভৃতি খাদ্যে পূর্বে মাখন দেওয়া হইত,

এখন প্রায় ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে লাভ বাড়িয়াছে এবং বিকৃতির আশঙ্কাও কমিয়াছে। বিস্কুটেও ক্রমশ চর্বির বদলে ঘনীকৃত তৈল চলিতেছে, সেজন্য কোনও কোনও ব্যবসায়ী সগর্বে বলিতেছেন—তাঁহাদের জিনিস খাইলে হিন্দু-মুসলমানের জাত যায় না। সাবান ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ে ঘনীকৃত তৈলের প্রয়োগ ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ কর্মের উপযুক্ত অনেক প্রকার ঘনীকৃত তৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং লোকেও তাহার প্রয়োগ শিখিতেছে।

এই নূতন বস্তুর ব্যবহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইওরোপ ও আমেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্বদা হাঁ করিয়া আছে, বিলাতী বণিক যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—'vegetable product' বা 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ'। ব্যবসায়িগণ প্রচার করিলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্মহানি হয় না, এবং পবিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—বনস্পতি বা পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতের জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেলওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্বত্র এই বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরোসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজকাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধাআধি ইহা চলিতেছে। ধর্মভীরু ঘিওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে, এখন আর চর্বি ভেজাল দিবার দরকার হয় না, বনস্পতি-মার্কা মিশাইলেই চলে। সুদূর পল্লীতে অনেক গোয়ালার ঘরে খোঁজ করিলে এই জিনিসের টিন মিলিবে। ঘি ভেজালের প্রথম পর্ব এখন গোয়ালার ঘরেই নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু এত গুণ এত সুবিধা সত্ত্বেও এই দ্রব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউনসিলে এ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ঘনীভূত তৈলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম এই।—

সপক্ষ বলেন—খাঁটি ঘি নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস। তাহার সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতেছি না। কিন্তু সকলের ঘি খাইবার সঙ্গতি নাই। অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা তেল দিয়া তৈয়ারি করিলে ভাল হয় না, যথা লুচি কচুরি গজা মিঠাই চপ। এই সকল দ্রব্য ভাজিবার জন্য বাজারের ভেজাল ঘি-এর বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথচ নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল ব্যবহার করিবে না কেন? ইহাতে ভাল ঘি-এর সুগন্ধ নাই সত্য, কিন্তু দুর্গন্ধও নাই, এমন কি কোনও গন্ধই নাই। ইহাতে খাবার ভাজিলে তেলেভাজা বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঘি-এ ভাজা বলিয়াই ভ্রম হয়, অথচ বাজারের ঘি-এর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। ঘি-এর উপর ভারতবাসীর যে প্রবল আসক্তি আছে তাহা অন্য তেলে মিটিতে পারে না, কিন্তু নির্গন্ধ ঘনীকৃত তৈলে বহুপরিমাণে মিটিবে। সাধারণ লোকের ঘি-এর উপর লোভ আছে কিন্তু পয়সা নাই, সেইজন্যই ভেজাল ঘি চলিতেছে। দূষিত চর্বিময় ভেজাল ঘি না খাইয়া নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল খাইলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা পাইবে। যদি ঘৃতের সুগন্ধ চাও, তবে ঘনীকৃত তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ঘৃত মিশাইয়া লইতে পার, বাজারের ঘি খাইয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না।

বিপক্ষ বলেন—ভেজাল ঘি খুবই চলে ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু ঘনীকৃত তৈলের আমদানির ফলে ঐ ভেজাল বাড়িয়াছে এবং আরও বাড়িবে। ভেজাল ঘি-এ চর্বি চীনাবাদাম তৈল ইত্যাদির মিশ্রণ যত সহজে ধরা যায় ঘনীকৃত তৈলের মিশ্রণ তত সহজে ধরা যায় না। যাহারা সজ্ঞানে বা চক্ষু মুদিয়া সস্তায় ভেজাল ঘি কেনে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা সাবধানতার ফলে এ পর্যন্ত প্রবঞ্চিত হয় নাই, এখন তাহারাও অজ্ঞাতসারে ভেজাল কিনিতেছে। মাখন গলাইলেও বিশ্বাস নাই কারণ তাহাতে মারগারিন আকারে ঘনীকৃত তৈল প্রবেশ করিয়াছে। আর এক কথা—ঘৃতে ভাইটামিন আছে, ঘনীকৃত তৈলে নাই, অতএব ঘৃতের পরিবর্তে ঘনীকৃত তৈলের চলন বাড়িলে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইবে। আর, যতই বৃক্ষ লতা ফল ফুলের মার্কা দাও এবং উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ বলিয়া প্রচার কর, উহা যে অতি সস্তা মাছের তেল হইতে প্রস্তুত নয় তাহারই বা প্রমাণ কি? বিলাতী ব্যবসাদার মাত্রেই তো ধর্মপুত্র নয়। আরও এক কথা—ঘনীকৃত তৈলে ঈষৎ মাত্রায় নিকেল ধাতু দ্রবীভূত থাকে, রাসায়নিকগণ তাহা জানেন। তাহাতে কালক্রমে স্বাস্থ্যহানি হয় কিনা কে বলিতে পারে?

এই বিতর্ক লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। দূরদর্শী দেশহিতৈষী মাত্রই বুঝিবেন—বিদেশী ঘনীকৃত তৈল সর্বথাবর্জনীয়। কেবল একটা কথা বলা যাইতে পারে—ভাইটামিনের অভাব জনিত আপত্তি প্রবল নয়। সাবধানে মাখন গলাইয়া ঘি করিলে ভাইটামিন সমস্তই বজায় থাকে। কিন্তু বাজারের ঘি তৈয়ারির সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না, গোয়ালা ও আড়তদারের গৃহে বহুবার উন্মুক্ত কটাহে জ্বাল দেওয়া হয়, তাহাতে ভাইটামিন অনেকটা নষ্ট হয়, অবশ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে। হালুইকরের কটাহে যে ঘি দিনের পর দিন উত্তপ্ত করা হয় তাহাতে কিছুমাত্র ভাইটামিন থাকে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা জানি না। মোট কথা বাড়ির রান্নায় যে ঘি দেওয়া হয় তাহাতে ভাইটামিন থাকিতে পারে কিন্তু বাজারের ঘৃতপক্ক খাবারে না থাকাই সম্ভবপর। ইহাও বিবেচ্য—দেশের অধিকাংশ লোক ঘি খাইতে পায় না, রান্নায় তেলই বেশী চলে, এবং ঘি-এ যে ভাইটামিন থাকে তাহা তেলে নাই।

কিন্তু অন্য যুক্তি অনাবশ্যক। বিদেশী ঘনীকৃত তৈলের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি—ইহাতে ধর্মহানি হয়। এই ধর্ম গতানুগতিক অন্ধসংস্কার নয়, ভাইটামিনের ধর্মও নয়—দেশের স্বার্থরক্ষার ধর্ম, আত্মনির্ভরতার ধর্ম। এই ধর্মবুদ্ধির উন্মেষের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে বিদেশী বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হয় না, বৃদ্ধি পায় মাত্র। ঘি খাইবার পয়সা নাই, কিন্তু কোন্ দুঃখে বিদেশী তৈল খাইব? এদেশের স্বাভাবিক তৈল কি দোষ করিল? সর্ষপ তৈলের ঝাঁজ সব সময় ভাল না লাগে তো অন্য তৈল আছে। প্রাচীন ভারতে 'তৈল' শব্দে তিল তৈলই বুঝাইত, লোকে তাহাতেই রাঁধিত; বোম্বাই মাদ্রাজ মধ্যপ্রদেশে এখনও তাহা চলে। ইহা স্নিগ্ধ, নির্দোষ, সুপচ। বাঙালীর নাক সিটকাইবার কারণ নাই। সর্ষপ তৈলের উগ্র গন্ধ আমরা সহিতে পারি, বাজারের কচুরি গজা খাইবার সময় ঘি-এর বিকৃত গন্ধ মনে মনে মার্জনা করি, নির্গন্ধ ভেজিটেবল প্রডক্ট উত্তপ্ত হইলে দুর্গন্ধ হয় তাহাও জানি, তবে তিল চীনাবাদাম তৈলে অভ্যস্ত হইব না কেন? সাহেবের দেখাদেখি কাঁচা শাকে স্যালাড় অয়েল মিশাইয়া খাই, তাহাতে কি গন্ধ নাই? অশ্বত্থামা পিটুলি গোলা খাইয়া ভাবিয়াছিলেন দুধ, আমরাও একটা নূতন কিছু খাইয়া ভাবিতে চাই ঘি খাইতেছি। এজন্য বিদেশী 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ' অনাবশ্যক, লুচি কচুরি

ভাজার উপযুক্ত স্বদেশী উদ্‌ভিজ্জ তৈল যথেষ্ট আছে। নিমন্ত্রিত কুটুম্বকে ঠকানো হয়তো একটু শক্ত হইবে, কিন্তু দেশবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা পাইবে। যদি কলিকাতা ও অন্যান্য নগরের মিউনিসিপ্যালিটি চেষ্টা করেন তবে তিলাদি তৈলের প্রচার সহজেই হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুন্দরীমোহন দাস, রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভিষক্ মহোদয়গণ প্রবন্ধাদি দ্বারা সাধারণকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করিতে পারেন। ময়রা যাহাতে প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ তৈলের অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈলের খাবার বেচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এইরকম খাবার ঘনীকৃত তৈলের অথবা খারাপ ঘি-এর খাবার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ঘি খাইব, অভাবে অজ্ঞাত-উপাদান ভেজাল দ্রব্য খাইব—লোকের এই মানসতার পরিবর্তন আবশ্যক। ঘি খাইব, না জুটিলে সজ্ঞানে বিশুদ্ধ তৈল খাইব অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈল খাইব—ইহাই সদ্‌বুদ্ধি।

যদি ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় লোকের উদ্‌যোগে ঘনীকৃত তৈলের উৎপাদন হয় তবে ধর্মহানির আপত্তি থাকিবে না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ক্ষমতায় কুলাইলে ঘি খাইব, অথবা সর্ষপ তিল চীনাবাদাম বা নারিকেল তৈল খাইব, অথবা ঘৃত ও তৈল মিশাইয়া খাইব, রুচিতে না বাধিলে স্বদেশী চর্বিও খাইব, কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব।

❑

ঘনীকৃত তৈলের ছদ্ম আলোচনায় ১৯৩০ সালে রচিত প্রচ্ছন্ন সিডিশন? —সঃ

ভাষা ও সংকেত

(১৩৩৮/১৯৩১)

ভাষা একটা নমনীয় পদার্থ, তাকে টেনে বাঁকিয়ে চট্‌কে আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম নরম জিনিসে কোনও পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্‌ভব হয়েছে। পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই। আলংকারিকের কথায় বলা যেতে পারে— পরিভাষার অভিধাশক্তি আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নেই। পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না।

কিন্তু ভাষা আর পরিভাষাতেও সব সময় কুলয় না, তখন সংকেতের সাহায্য নিতে হয়। যিনি ইমারত গড়েন তিনি কেবল বর্ণনা দ্বারা তাঁর পরিকল্পনা বোধগম্য করতে পারেন না, তাঁকে নক্‌শা আঁকতে হয়। সে নক্‌শা ছবি নয়, সংকেতের সমষ্টি মাত্র—পুরনো গাঁথনি বোঝাবার জন্য হলদে রং, নূতন গাঁথনি লাল, কংক্রিটে হিজিবিজি, খিলানের জায়গায় ঢেরা-চিহ্ন ইত্যাদি। বস্তুর সঙ্গে নক্‌শার পরিমাপগত সাম্য আছে, কিন্তু অন্য সাদৃশ্য বিশেষ কিছু নেই। অভিজ্ঞ লোকের কাছে নক্‌শা বস্তুর প্রতিমাস্বরূপ, কিন্তু আনাড়ীর কাছে তা প্রায় নিরর্থক; বরং ছবি দেখলে বা বর্ণনা পড়লে সে কতকটা বুঝতে পারে।

গানের স্বরলিপিও সংকেত মাত্র। গান শুনলে যে সুখ, স্বরলিপি পাঠে তা হয় না, কিন্তু গানের স্বর তাল মান লয় বোঝাবার জন্যে স্বরলিপির প্রয়োজন আছে।

একজনের উপলব্ধ বিষয় অন্যজনকে যথাবৎ বোঝাবার সুপ্রযোজ্য সংক্ষিপ্ত সস্তা উপায়—সংকেত। সংকেতের পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ যে জানে তার পক্ষে উদ্দিষ্ট বিষয়ের ধারণা করা অতি সহজ, তাতে ভুলের সম্ভাবনা নেই, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নেই, শুধুই বিষয়ের বোধ। সংকেতের কারবার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত, হৃদয়ের সহিত নয়। অবশ্য, নায়ক-নায়িকার সংকেতের কথা আলাদা।

বিজ্ঞানী বহু প্রকার সংকেতের উদ্‌ভাবনা করেছেন। তিনি আশা করেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনেক উপলব্ধিই কালক্রমে সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। একদিন হয়তো গানের স্বরলিপির তুল্য রসলিপি গন্ধলিপি স্পর্শলিপিও উদ্‌ভাবিত হবে, তখন আমরা দ্রাক্ষারসের স্বাদ, চুতমুকুলের গন্ধ, মলয়সমীরের স্পর্শ ফরমুলা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারব। শারদাকাশ ঠিক কি রকম নীল, সমুদ্রকল্লোলে কোন্ কোন্ ধ্বনি কত মাত্রায় আছে, তাও ছক-কাটা কাগজে আঁকাবাঁকা রেখায় দেখাব। এখন যেমন জুতো কেনবার সময় বলি ৮ নম্বর চাই, ভবিষ্যতে তেমনি সন্দেশ কেনবার সময় বলব—মিষ্টতা ৬, কাঠিন্য ২। হয়তো সুন্দরীর রং-এর ব্যাখ্যান লিখব—দুধ ৩, আলতা ২, কালি ৫। তখন ভাষার অক্ষমতায় বস্তু অপরঞ্জিত হবে না, যা সত্য তাই সাংকেতিক বর্ণনায় অবধারিত হবে।

কবির ব্যবসায় কি উঠে যাবে? তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। ভাষার যে উচ্ছৃঙ্খল নমনীয়তা হিসাবী লোককে পদে পদে হয়রান করে তারই উপর কবির একান্ত নির্ভর। তিনি বিজ্ঞানীর মত বিশ্লেষণ করেন না, প্রত্যক্ষ বিষয় যথাবৎ বোঝাবার চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষ ছাড়াও যে অনুভূতি আছে, যা মানুষের সুখদুঃখের মূলীভূত, বিজ্ঞান যার আশেপাশে মাথা ঠুকছে, সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কবি ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। সর্বথা নমনীয় নির্বাধ ভাষাই তাঁর প্রকাশের উপাদান, তাতে ইন্দ্রিয়গম্য ইন্দ্রিয়াতীত সকল সত্যই তিনি ব্যক্ত করতে পারেন। পরিভাষা আর সংকেতে কবির কি হবে? তা ভাবের পিঞ্জর মাত্র।

আদিকবিকে নারদ বলেছেন—

'—সেই সত্য যা রচিবে তুমি;
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।—'

যাঁরা নিরেট সত্যের কারবারী তাঁরাও এখন মাথা চুলকে ভাবছেন—হবেও বা।



সাধু ও চলিত ভাষা

(১৩৪০/১৯৩৩)

কিছুকাল পূর্বে সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল এখন তা বড় একটা শোনা যায় না। যাঁরা সাধু অথবা চলিত ভাষার গোঁড়া, তাঁরা নিজ নিজ নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন, কেউ কেউ অপক্ষপাতে দুই রীতিই চালাচ্ছেন। পাঠকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন—বাংলা সাহিত্যের ভাষা পূর্বে এক রকম ছিল, এখন দু রকম হয়েছে।

আমরা শিশুকাল থেকে বিদ্যালয়ে যে বাংলা শিখি তা সাধু বাংলা, সেজন্য তার রীতি সহজেই আমাদের আয়ত্ত হয়। খবরের কাগজে মাসিক পত্রিকায় অধিকাংশ পুস্তকে প্রধানত এই ভাষাই দেখতে পাই। বহুকাল বহুপ্রচারের ফলে সাধুভাষা এ দেশের সকল অঞ্চলে শিক্ষিতজনের অধিগম্য হয়েছে। কিন্তু চলিতভাষা শেখবার সুযোগ অতি অল্প। এর জন্য বিদ্যালয়ে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, বহুপ্রচলিত সংবাদপত্রাদিতেও এর প্রয়োগ বিরল। এই তথাকথিত চলিতভাষা সমগ্র বঙ্গের প্রচলিত ভাষা নয়, এ ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী কয়েকটি জেলার মৌখিকভাষার কিছু মিল আছে মাত্র। এই কারণে কোনও কোনও অঞ্চলের লোক চলিতভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা দুরূহ।

যোগেশচন্দ্র-প্রবর্তিত দুটি পরিভাষা এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করছি—মৌখিক ও লৈখিক। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিকভাষা আছে, তা রাঢ়ের বা পূর্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। চেষ্টা করলে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিকভাষার অনুরূপ করে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হোক আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্বসম্মত, সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালীর বোধ্য, অর্থাৎ সাহিত্যের উপযুক্ত। এই লৈখিকভাষা 'সাধু' হতে পারে কিংবা 'চলিত' হতে পারে। কিন্তু যদি দুটিই কষ্ট করে শিখতে হয় তবে আমার উপর অনর্থক জুলুম হবে। যদি চলিত ভাষাই যোগ্যতর হয় তবে সাধুভাষার লোপ হলে হানি কি? সাধুভাষায় রচিত যেসব সদ্‌গ্রন্থ আছে তা

না হয় যত্ন করে তুলে রাখব। কিন্তু যে ভাষা অবাঞ্ছনীয় এখন আর তার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, যদি সাধুভাষাতেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিদিত ভাষার পাশে আবার একটা অনভ্যস্ত ভাষা খাড়া করবার চেষ্টা কেন?

যাঁরা সাধু আর চলিত উভয় ভাষারই ভক্ত তাঁরা বলবেন, কোনওটাই ছাড়তে পারি না। সাধুভাষার প্রকাশশক্তি একরকম, চলিতভাষার অন্যরকম। দুই ভাষাই আমাদের চাই, নতুবা সাহিত্য অঙ্গহীন হবে। ভাষার দুই ধারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব করে তার একটিকে গলা টিপে মারতে পারি না।

কোনও ব্যক্তি বা বিদ্বৎসংঘের ফরমাশে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হতে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির উপরেও মানুষের হাত চলে। সাধারণের উপেক্ষার ফলে যদি একটা বিষয় কালোপযোগী হয়ে গড়ে না ওঠে, তথাপি প্রতিষ্ঠাশালী কয়েকজনের চেষ্টায় অল্পকালেই তার প্রতিকার হতে পারে। অতএব সাধু আর চলিত ভাষার সমস্যায় হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই।

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিতভাষা আর পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষা সর্বাংশে সমান। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। মৌখিকভাষা যে অঞ্চলেরই হোক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিকভাষা দেখে অর্থাৎ পড়ে বুঝতে হয়। মৌখিকভাষার উচ্চারণই তার সর্বস্ব। লৈখিকভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকমে না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষা সর্বসাধারণের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হোক।

'ভাষা' শব্দটি আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করি। জাতিবিশেষের কথা ও লেখার সামান্য লক্ষণসমূহের নাম ভাষা, যথা—বাংলা ভাষা। আবার, শব্দাবলীর প্রকার (form)—অর্থাৎ কোন্ শব্দ বা শব্দের কোন্ রূপ প্রযোজ্য বা বর্জনীয় তার রীতিও ভাষা, যথা—সাধুভাষা। আবার, প্রকার এক হলেও ভঙ্গীর (style) ভেদও ভাষা, যথা—আলালী, বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা।

আলালী আর বঙ্কিমী ভাষা যতই ভিন্ন হোক, দুটিই যে সাধুভাষা তাতে সন্দেহ নেই। ভেদ যা আছে তা প্রকারের নয়, ভঙ্গীর। হুতোম প্যাঁচার নক্শা

আর রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র ভাষায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান, কিন্তু দুটিই চলিতভাষায় লেখা; প্রকার এক ভঙ্গী ভিন্ন। আজকাল সাধু ও চলিত ভাষায় যে সাহিত্য রচনা হচ্ছে তার লক্ষণাবলী তুলনা করলে এই সকল ভেদাভেদ দেখা যায় —

(১) দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানত—সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপের জন্য। 'তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন'।

(২) সাধুভাষার কয়েকটি সর্বনাম কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় মৌখিকরূপের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। ক্রিয়াপদেও মৌখিকের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। 'লিখা, শিখা, শুনা, ঘুরা' স্থানে অনেকে সাধুভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা' লিখছেন।

(৩) সর্বনাম আর ক্রিয়াপদ ছাড়াও কতকগুলি অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুতে 'উঠান, উনান, মিছা, কুয়া, সুতা', চলিতে 'উঠন, উনন, মিছে, কুয়ো, সুতো'। কিন্তু এইরকম বহু শব্দের চলিত রূপই এখন সাধুভাষায় স্থান পেয়েছে। 'আজিকালি, চাউল, একচেটিয়া, লতানিয়া' স্থানে 'আজকাল, চাল, একচেটে, লতানে' চলছে।

(৪) সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু সাধারণত চলিতভাষায় কিছু কম দেখা যায়। এই প্রভেদ উভয় ভাষার প্রকারগত নয়, লেখকের ভঙ্গীগত, অথবা বিষয়ের লঘুগুরুত্বগত।

(৫) আরবী ফারসী প্রভৃতি বিদেশাগত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু চলিতভাষায় কিছু বেশী দেখা যায়। এই ভেদও ভঙ্গীগত, প্রকারগত নয়।

(৬) অনেক লেখক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের মৌখিকরূপ চলিতভাষায় চালাতে ভালবাসেন, যদিও সে সকল শব্দের মূল রূপ চলিতভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যথা—'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' না লিখে 'সত্যি, মিথ্যে, নতুন, অবিশ্যি'। এও ভঙ্গী মাত্র।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি বিচার করলে বোঝা যাবে যে সাধুভাষা অতি ধীরে ধীরে মৌখিক শব্দ গ্রহণ করছে, কিন্তু চলিতভাষা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায়। সাধুভাষার এই মন্থর পরিবর্তনের কারণ—তার

বহুদিনের নিরূপিত পদ্ধতি। চলিতভাষার যদৃচ্ছা বিস্তারের কারণ—নিরূপিত পদ্ধতির অভাব। একের শৃঙ্খলার ভার এবং অন্যের বিশৃঙ্খলা উভয়ের মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে। যদি লৈখিকভাষাকে কালোপযোগী লঘু শৃঙ্খলায় নিরূপিত করতে পারা যায় তবে সাধু ও চলিতের প্রকারভেদ দূর হবে, একই লৈখিকভাষায় দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস থেকে লঘুতম সাহিত্য পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে লেখা যেতে পারবে, বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে ভাষার ভঙ্গীর অদলবদল হবে মাত্র।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গীগত ভেদ অনিবার্য, কারণ, লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয় কথাবার্তায় ততটা হতে পারে না। কিন্তু দুই ভাষার প্রকারগত ভেদ অস্বাভাবিক। কোনও এক অঞ্চলের মৌখিকভাষার প্রকার আশ্রয় করেই লৈখিকভাষা গড়তে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে।

কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে উদ্যম পণ্ড হবে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও বানান আর উচ্চারণের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। 'মতো, ছিলো, কালো, করো' ইত্যাদি কয়েকটি রূপ নাহয় উচ্চারণসূচক (?) করা গেল, কিন্তু আরও শত শত শব্দের গতি কি হবে? বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি ও-কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখা আর ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র। 'কাল' অর্থে কল্য বা সময় বা কৃষ্ণ, 'করে' অর্থে does কি having done, তার নির্ধারণ পাঠকের সহজ বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসবে—অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উচ্চারণের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া অনাবশ্যক। কলকাতার লোক যদি পড়ে 'রমণীর মোন', আর বরিশালবাসী যদি পড়ে 'রোমোণীর মঅন', তাতে সর্বনাশ হবে না, পাঠকের অর্থবোধ হলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষাকে স্থানবিশেষের উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিকভাষা হতে অল্পাধিক প্রভেদ—অনিবার্য।

মোট কথা, চলিতভাষাই একমাত্র লৈখিকভাষা হতে পারে যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধুভাষার সঙ্গে রফা করা হয়। বহু লেখক যে আধুনিক চলিতভাষাকে দূর থেকে নমস্কার করেন তার কারণ কেবল অনভ্যাসের কুণ্ঠা নয়, তাঁরা এ ভাষার নমুনা দেখে পথহারা হয়ে যান। বিভিন্ন লেখকের মর্জি অনুসারে একই শব্দের বানান বদলায়, একই রূপের বিভক্তি বদলায়, কভু বা বিশেষ্য সর্বনামের আগে অকারণে ক্রিয়াপদ এসে বসে, বাংলা শব্দাবলীর অদ্ভুত সমাস কানে পীড়া দেয়, ইংরাজী ইডিয়মের সজ্জায় মাতৃভাষা চেনা যায় না। সাধুভাষার প্রাচীন গণ্ডি ছেড়ে চলিতভাষায় এলেই অনেক লেখক অসামাল হয়ে পড়েন।

এমন লৈখিকভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিতজনের মৌখিকভাষা দুইএরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। চলিতভাষার লেখকরা একটু অবহিত হলেই সর্বগ্রাহ্য সর্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘু সাহিত্যে পাত্র-পাত্রীর মুখে সব রকম ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি পর্যন্ত।

এখন আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি।—

(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছুমাত্র লাভও নেই।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপ গৃহীত হোক।

(৩) অন্যান্য অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হোক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হোক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক—যথা, 'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিকরূপই নেওয়া হোক, যথা—'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠান, পুরানো' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, উঠন, পুরনো'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিতভাষায় অচল নয়—অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকগণ যা চলিতভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য,

মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধুভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '...হয়ে উঠল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দুদিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পঞ্জাবি পরতে হয়। এইরকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে—চলিতভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিস নিয়ে নয়। ভার বইতে হলে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিতভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে নবরচিত পাঠ্যপুস্তকে যদি এই ভাষা চলে তবে তা কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধারণের আয়ত্ত হবে। ব্যাকরণ আর অভিধানে এই ভাষার শব্দাবলীর বিবৃতি দিতে হবে, অবশ্য সাধুভাষাকেও উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ, সে ভাষার বহু পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকবে। কালক্রমে যখন সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে পড়বে তখনও তা স্পেনসার শেকস্পিয়রের ভাষার তুল্য সমাদরে অধীত হবে। নূতন লৈখিকভাষাও চিরকাল একরকম থাকবে না। শক্তিশালী লেখকগণের প্রভাবে পরিবর্তন আসবেই, এবং কালে কালে যেমন পঞ্জিকাসংস্কার আবশ্যক হয়, তেমনি যোগ্যজনের চেষ্টায় লৈখিকভাষারও নিয়মসংস্কার আবশ্যক হবে।



বাংলা পরিভাষা

(১৩৪০/১৯৩৩)

অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ—সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গবিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষাস্থানীয়। সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পন্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শনবিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।

সাধারণ লোকে কথাবার্তায় চিঠিপত্রে অসংখ্য শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিদ্যালোচনার জন্য করে না, সেজন্য আমাদের খেয়াল হয় না যে সেসকল শব্দ পারিভাষিক। 'স্বামী, স্ত্রী, গাই, ষাঁড়, বন্ধক, তামাদি, লোহা, তামা, চৌকো, গোল' প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক খ্যাতি নেই, কারণ এসকল শব্দ অতিপরিচিত। বিলাতে একটা নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হল, আবিষ্কর্তা তার পারিভাষিক নাম দিলেন 'অ্যালুমিনিয়ম'। বহুদিন এই নাম কেবল পন্ডিতমন্ডলীর গবেষণায় আবদ্ধ রইল। এখন অ্যালুমিনিয়মের ছড়াছড়ি, কিন্তু নামের পারিভাষিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম ক্রোমিয়ম' প্রভৃতি নাম বিশেষজ্ঞ পন্ডিতের সৃষ্ট, সেজন্য পরিভাষা রূপে খ্যাত। 'লোহা তামা সোনা' প্রভৃতি নাম পন্ডিতাগমের পূর্ববর্তী তাই অখ্যাত। পন্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা রূপে খ্যাত হবে। যে শব্দ সাধারণে আলগা ভাবে প্রয়োগ করে তাও পন্ডিতগণের নির্দেশে পরিভাষা রূপে গণ্য হতে পারে। সাধারণ প্রয়োগে রুই পুঁটি চিংড়ি তিমি সবই 'মৎস্য'। কিন্তু পন্ডিতরা যদি যুক্তি করে স্থির করেন যে 'মৎস্য' বললে কেবল বোঝাবে—কান্‌কো-যুক্ত হাত-পা-বিহীন মেরুদন্ডী অন্ডজ (এবং আরও কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত) প্রাণী, তবে 'মৎস্য' নাম পারিভাষিক হবে এবং চিংড়ি তিমিকে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে মৎস্য বলা চলবে না।

বিদ্যাচর্চায় যত পরিভাষা আবশ্যক, সাধারণ কাজে তত নয়। কিন্তু

জনসাধারণও নূতন নূতন বিষয়ের পরিচয় লাভ করছে সেজন্য বহু নূতন পারিভাষিক শব্দ অবিদ্বানেও শিখছে। যে জিনিস সাধারণের কাজে লাগে তার নাম লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হয় এবং সে নাম একবার শিখলে লোকে সহজে ছাড়তে চায় না। পন্ডিতরা যদি নূতন নাম চালাবার চেষ্টা করেন তবে সাধারণের তরফ থেকে বাধা আসতে পারে। বাংলা পরিভাষা সংকলনকালে এই বাধার কথা মনে রাখা দরকার।

আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যত দিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। বাংলা দেশ যদি স্বাধীন হত, রাজভাষা যদি বাংলা হত, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কৃত হত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংলান্ডে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। এদেশে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হয় তা অতি অল্প, যা হয় তার সংবাদ ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলিত হলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শব্দ। দেশের পন্ডিতমন্ডলী একমত হয়ে একটা বাংলা পরিভাষার ফর্দ মেনে নিতে পারেন, এমন প্রতিজ্ঞাও করতে পারেন যে তাঁদের পুস্তকে প্রবন্ধে ভাষণে বিলাতী শব্দ বর্জন করবেন (অবশ্য চাকরির কাজে তা পারবেন না)। কিন্তু পরিভাষাদ্বারা সূচিত দ্রব্য যদি বিদেশ থেকে আসে এবং সাধারণের ব্যবহারে লাগে, তবে নূতন নাম চালানো কঠিন হবে। বিদেশ থেকে আয়োডিন আসে, প্রেরকের চালানে ঐ নাম লেখা থাকে, দোকানদার ঐ নামেই বেচে—তাকে 'এতিন' বা 'নীলিন' শেখানো অসম্ভব। তার মারফত জনসাধারণেও ইংরেজী নাম শেখে। যাঁরা মাতৃভাষায় বিদ্যাবিতরণে অগ্রকর্মী হবেন তাঁদের পক্ষেও দেশী নামে নিষ্ঠা বজায় রাখা শক্ত হবে। তাঁরা বিদ্যা অর্জন করবেন ইংরেজী পরিভাষার সাহায্যে আর প্রচার করবেন বাংলা পরিভাষায়—এই দ্বৈভাষিক অবস্থা সহজ নয়। তাঁদের নানা ক্ষেত্রে স্খলন হবে। যাদের শিক্ষার জন্য দেশী পরিভাষার সৃষ্টি তারা যদি ইংরেজী নাম ছাড়তে না চায় তবে শিক্ষকও বিদ্রোহী হবেন। বাংলা ভাষায়

প্রয়োগযোগ্য পরিভাষা আমাদের অবশ্য চাই, কিন্তু সংকলনকালে ভুললে চলবে না যে ব্যবহারক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে।

সাধারণে 'আয়োডিন, অক্সিজেন, মোটর, কার্বুরেটর, কলেরা, ভ্যাকসিন' প্রভৃতি শব্দে অভ্যস্ত হয়েছে, এগুলির বাংলা নাম চলবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু কয়েকটি নবরচিত বাংলা শব্দের চলন সহজেই হয়েছে, যথা—'উড়োজাহাজ, বেতারবার্তা, আবহসংবাদ'। কতকগুলি বিকট শব্দও চলছে, যেমন 'আইন-অমান্য-আন্দোলন'। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সত্ত্বেও 'বাধ্যতামূলক' প্রবল প্রতাপে চলছে। এই প্রচলন খবরের কাগজের দ্বারা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রচারে এ সাহায্য মিলবে না। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকে প্রবন্ধে যদি একই রকম পরিভাষা গৃহীত হয়, তবে প্রচার অনেকটা সহজ হবে।

এদেশে বহু বৎসর থেকে পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা হয়ে আসছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দপ্তরে অনেক পরিভাষা সংগৃহীত হয়েছে। 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিভাষা রচনা করেছেন। এই সকল পরিভাষার প্রায় সমস্তই প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রচলিত শব্দ, অথবা সংকলয়িতার স্বরচিত সংস্কৃত শব্দ। এপর্যন্ত আয়োজন যা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু ভোক্তা বিরল। তার একটি কারণ—একই ইংরেজী শব্দের নানা প্রতিশব্দ হয়েছে কিন্তু কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তার নির্বাচন হয় নি। সংকলয়িতা নিজের রচনায় তাঁর পছন্দমত শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু সাধারণ লেখক দিশাহারা হয়। আর এক কারণ—সংগ্রহ বৃহৎ হলেও অসম্পূর্ণ। সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ—ইংরেজী পরিভাষার বিপুল প্রতিষ্ঠা।

আজকাল বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ যে ভঙ্গীতে লেখা হয় তা লক্ষ্য করলে আমাদের বাধা কোথায় আর সিদ্ধি কোন্ পথে তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—

(গ্রামোফোন রেকর্ড) 'Master-টি পরিষ্কার করিয়া ইহার উপর Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder যাহাতে ইহার প্রত্যেক groove-এর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা দেখিতে হইবে। পরে electroplate করিয়া ইহার উপর copper deposit করা হয়। এই deposit পরিমাপ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক করা হয়। Master-এর music

lines তখন এই copyর উপর উঠিয়া আসে। এই copy-কে Original বলা হয়।'

লেখক পরিশেষে বলেছেন—'টেক্‌নিক্যাল ডিটেইলস্‌এর মধ্যে যাই নাই।' যান নি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ইনি ভাষার দৈন্যের প্রতি দৃকপাত করেন নি, যেমন-তেমন উপায়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন।

আর একটি নমুনা দিচ্ছি। প্রবন্ধ আমার কাছে নেই, কিন্তু নামটি কণ্ঠস্থ আছে, তা থেকেই রচনার পরিচয় হবে— 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতীলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া।'

এই লেখক তাঁর বক্তব্য বোধগম্য করার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন, বিভীষিকা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ইনি নবলব্ধ পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কসরত করেছেন মাত্র।

একজন প্রথিতনামা মনীষীর রচনা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

'মণিসমূহের নিয়ত সংস্থান অসংখ্যপ্রকার। কিন্তু তৎসমুদায়কে ছয়টি মূল সংস্থানে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এই ছয় মূল সংস্থানের প্রত্যেকে দ্বিবিধ,— স্তম্ভাকার (prismatic) এবং শিখরাকার (pyramidal)। এই সকল সংস্থান বুঝিবার নিমিত্ত মণির মধ্যে কয়েকটি অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে। কোন নিয়তাকার মণির দুই বিপরীত স্থানকে মনে মনে কোন রেখা দ্বারা যোগ করিলে তাহার অক্ষরেখা পাওয়া যায়। যথা দুই বিপরীত কোণ, কিংবা দুই বিপরীত পার্শ্বের মধ্যস্থল, কিংবা দুই বিপরীত ধারের মধ্যস্থল।'

লেখকের বক্তব্য অনধিকারীর পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরূহ হতে পারে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই।

একজন লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনার নমুনা—

'রুমকর্ফ কয়েল ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে বা সেই পদার্থ রেডিয়ামের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেক্‌ট্রন নির্গত হয়...বেশী কিছু নয়, কোন পদার্থ একটু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন নির্গত হইতে থাকে।'

এই লেখক ইংরেজী শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তথাপি মাতৃভাষার জাতিনাশ করেন নি।

বাংলা ভাষার উপযুক্ত পরিভাষা সংকলন একটি বিরাট কাজ, তার জন্য অনেক লোকের চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু এই চেষ্টা সংঘবদ্ধ ভাবে একই নিয়ম অনুসারে করা উচিত, নতুবা পরিভাষার সামঞ্জস্য থাকবে না। প্রথম কর্তব্য —সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে নানা দিক থেকে দেখা, তাতে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, উপায় স্থির করাও হয়তো সহজ হবে। এই প্রবন্ধে কেবল সেই দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করব।

সকল বিদ্যার পরিভাষাকেই মোটামুটি এই কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

বিশেষ (individual)। যথা—সূর্য, বুধ, হিমালয়।
দ্রব্য (বস্তু, substance, অথবা সামগ্রী, article)।
যথা—কাষ্ঠ, লৌহ, জল, দীপ, চক্র, অরণ্য।
বর্গ (class)। —ধাতু, নক্ষত্র, জীব, স্তন্যপায়ী।
ভাব (abstract idea)। —গতি, সংখ্যা, নীলত্ব, স্মৃতি।
বিশেষণ (adjective)। —তরল, মিষ্ট, আকৃষ্ট।
ক্রিয়া (verb)। —চলা, ঠেলা, ওড়া, ভাসা।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ অনুসারে দ্রব্য বর্গ বা বিশেষণ বাচক হতে পারে। কতকগুলি শব্দ কোন্ শ্রেণীতে পড়ে স্থির করা কঠিন, যেমন—দেশ, কাল, আলোক, কেন্দ্র।

দেখা যায় যে এক এক শ্রেণীর শব্দ কোনও বিদ্যায় বেশী দরকার কোনও বিদ্যায় কম দরকার। জ্যোতিষে ও ভূগোলে বিশেষবাচক শব্দ অনেক চাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় খুব কম, অথবা অনাবশ্যক। দ্রব্যবাচক শব্দ রসায়নে অত্যন্ত বেশী, জীববিদ্যায় (botany, zoology, anatomy ইত্যাদিতে) কিছু কম, মণিকবিদ্যায় (mineralogy) আর একটু কম, পদার্থবিদ্যা (physics) ও ভূবিদ্যায় (geology) আরও কম, দর্শন ও মনোবিদ্যায় প্রায় নেই, গণিতে মোটেই নেই। বর্গবাচক শব্দ জীববিদ্যায় খুব বেশী, রসায়ন ও মণিকবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, অন্যান্য বিদ্যায় আরও কম। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দ সকল বিদ্যাতেই প্রায় সমান। সকল বিদ্যার পরিভাষা যদি একযোগে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে মোটের উপর দ্রব্যবাচক শব্দ সবচেয়ে বেশী, তার পর যথাক্রমে বর্গবাচক, ভাব-বিশেষণ-ক্রিয়াবাচক এবং

বিশেষবাচক শব্দ।

ইংরেজী পরিভাষার ফর্দ সম্মুখে রেখেই সংকলয়িতাকে কাজ করতে হবে, অতএব ইংরেজী পরিভাষার স্বরূপ বিচার করা কর্তব্য, তাতে উপায়ের সন্ধান মিলতে পারে। ইংরেজী পরিভাষা জাতি (origin) অনুসারে এইরূপে ভাগ করা যেতে পারে—

a. সাধারণ ইংরেজী শব্দ। যথা—iron, solid।

b. প্রচলিত অন্য ভাষার শব্দ। যথা—lesion, canyon, breccia, typhoon, totem।

c. গ্রীক লাটিন (আরবী সংস্কৃত বিরল) প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার শব্দ বা তার যৌগিক রূপ অথবা অপভ্রংশ। যথা—atom, spectrum, alcohol, ferrous, vertebrate।

d. কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত গ্রীক লাটিন বা অন্য শব্দ। যথা—glycerine, methanol, aniline, farad।

ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়—যেখানে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা নেই সেখানে c d-র সঙ্গে সঙ্গে a b অবাধে চলে। কিন্তু যেখানে স্পষ্টতর নির্দেশ বা সংক্ষেপ আবশ্যক, সেখানে a শব্দ প্রায় চলে না, তৎস্থানে c d প্রযুক্ত হয় এবং b কিছু কিছু চলে। যথা—iron implements, iron salts, spirit of wine, knee-cap, shedding of leaves; অথচ ferrous (বা ferric) sulphate, alcohol metabolism, patellar fracture, deciduous leaves।

বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলনকালে নিম্নলিখিত উপাদানের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে—

ক। সাধারণ বাংলা শব্দ।

খ। হিন্দী উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

গ। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ (পূর্ববর্ণিত a b c d)।

ঘ। প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ।

ঙ। মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্ন-জাতীয় শব্দ।

পরিভাষা যদিও মুখ্যত বাঙালীর জন্য সংকলিত হবে, তথাপি অধিকাংশ শব্দ যাতে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর (বিশেষত হিন্দী উড়িয়া মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষীর) গ্রহণযোগ্য ও সহজবোধ্য হয় সেই চেষ্টা করা উচিত। তাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাববিনিময়ের সুবিধা হবে। পূর্বোক্ত c d শব্দাবলী সকল ইওরোপীয় ভাষায় চলে। ভারতের পক্ষে গ ঘ-এর সেইরূপ উপযোগিতা আছে।

আধুনিক ইওরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে গ্রীক লাটিনের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে বাংলা হিন্দী প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ অনেক বেশী। সেজন্য এদেশে সংস্কৃত পরিভাষা (ঘ) সহজেই মর্যাদা পাবে। ইংরেজী পরিভাষার (গ) উপযোগিতাও কম নয়, তার কারণ পরে বলছি। এই দুই জাতীয় পরিভাষার পরেই সাধারণ বাংলা শব্দের (ক) স্থান। এরকম শব্দ সাধারণ বিবৃতিতে অবাধে চলবে, যেমন ইংরেজীতে a চলে। তারপরে খ-এর, বিশেষত হিন্দী উর্দু শব্দের স্থান; কারণ, হিন্দী উর্দু সুসমৃদ্ধ ভাষা, বাংলার প্রতিবেশী, এবং ভারতের বহু অঞ্চলে বোধ্য। বাংলায় ফারসী আরবী শব্দ অনেক আছে। যদি উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় তবে আরও কিছু ফারসী আরবী আত্মসাৎ করলে হানি নেই। পরিশেষে মিশ্র শব্দের (ঙ) স্থান। এরূপ শব্দ কিছু কিছু দরকার হবে। যদি 'focus' বাংলায় নেওয়া হয়, তবে focussed = ফোকসিত, longfocus = দীর্ঘফোকস।

বাংলা পরিভাষা সংকলনের সময় ইংরেজী শব্দের প্রতিযোগিতা মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র বাধ্য হয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশী পরিভাষা শিখবে। যিনি বিদ্যালয়ের শাসনে নেই অথচ বিদ্যাচর্চা করতে চান, তাঁর যদি মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকে তবে তিনি কিছু কষ্ট স্বীকার করেও দেশী পরিভাষা আয়ত্ত করবেন। কিন্তু জনসাধারণকে বশে আনা সহজ নয়। বিদ্যা মাত্রের যে অঙ্গ তত্ত্বীয় (theoretical), তার সঙ্গে সাধারণের বিশেষ যোগ নেই। বিদ্যার যে অঙ্গ ব্যবহারিক (applied), সাধারণে তার অল্পাধিক খবর রাখে। তত্ত্বীয় অঙ্গে দেশী পরিভাষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ জনসাধারণের রুচির বশে চলতে হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক অঙ্গের সহিত বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধারণ লোকে পথে ঘাটে বাজারে কর্মস্থানে যে বিদেশী শব্দ শিখবে তাই চালাবে, এর উদাহরণ পূর্বে দিয়েছি। এই বাধা লঙ্ঘন করা চলবে না, ব্যবহারিক অঙ্গে বহু পরিমাণে বিদেশী শব্দ মেনে নিতে হবে।

মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা সংকলন পণ্ড হবে। পরিভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য—বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশশক্তি বর্ধন। পরিভাষা যাতে অল্পায়াসে অধিগম্য হয় তাও দেখতে হবে। এ নিমিত্ত রাশি রাশি বৈদেশিক শব্দ আত্মসাৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি হবে না। বহু বৎসর পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

'মহৈশ্বর্যশালিনী আর্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্‌মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা ঋণ স্বীকারে কাতর হয় নাই। ...আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণগ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।' (*সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩০১*)।

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক ফারসী আরবী পোর্তুগিজ ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন করে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি—'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেট্‌ফুল হয়েছে' তবে ভাষাজননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—'মোটরের ম্যাগ্‌নেটোটা বেশ ফিনকি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষা জননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইওরোপ আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদান প্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একবারে বর্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত করে মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর ভদ্র সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে 'জাঁদরেল', hospital থেকে 'হাসপাতাল' হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে যুগ নেই, বহুকাল ইংরেজী পড়ে আমাদের জিবের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে। সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি

ভুল উচ্চারণ করে 'যাচ্ঞা'কে 'যাচিঙ্গা', 'জনৈক'কে 'জৈনিক', 'মোটর'কে 'মটোর', 'গ্লিসারিন'কে 'গিল্‌ছেরিন' বলে তাতে ক্ষতি হবে না—যদি বানান ঠিক থাকে।

এখন সংকলনের উপায় চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের উপকরণ—এক দিকে দেশী শব্দ, অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃত হিন্দী ইত্যাদি; অন্যদিকে ইংরেজী শব্দ। কোথায় কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য? ধরাবাঁধা বিধান দেওয়া অসম্ভব। মোটামুটি পথনির্ণয়ের চেষ্টা করব।

১। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে কতকগুলি বিদ্যার চর্চা আছে, যথা—দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শারীরবিদ্যা, প্রভৃতি। এইসকল বিদ্যার বহু পরিভাষা এখনও প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে আরও পাওয়া যাবে এবং সেই উদ্ধারকার্য অনেকে করেছেন। এই সমস্ত শব্দ আমাদের সহজেই গ্রহণীয়। এই শব্দসম্ভারের সঙ্গে আরও অনেক নবরচিত সংস্কৃত শব্দ অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গণিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বর্গ ঘাত (power) প্রভৃতি প্রাচীন শব্দের সঙ্গে নবরচিত কলন (calculus), অবঘাতন (evolution), উদ্‌ঘাতন (involution) সহজেই চলবে। বর্তমান কালে এই সকল বিদ্যার বৃদ্ধির ফলে বহু নূতন পরিভাষা ইওরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তার অনেকগুলির দেশী প্রতিশব্দ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত রূঢ় (যেমন focus, thyroid) তা যথাবৎ বাংলা বানানে নেওয়াই উচিত।

২। কতকগুলি বিদ্যা আধুনিক, অর্থাৎ পূর্বে এদেশে অল্পাধিক চর্চিত হলেও এখন একবারে নূতন রূপ পেয়েছে, যথা—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, মণিকবিদ্যা, জীববিদ্যা। এইসকল বিদ্যার জন্য অসংখ্য পরিভাষা আবশ্যক। যে শব্দ আমাদের আছে তা রাখতে হবে, বহু সংস্কৃত শব্দ নূতন করে গড়তে হবে, পাওয়া গেলে কিছু কিছু হিন্দী ইত্যাদি ভাষা থেকেও নিতে হবে; অধিকন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ রাশি রাশি আত্মসাৎ করতে হবে।

৩। বিশেষবাচকশব্দ আমাদের যা আছে তা থাকবে, যেমন—'চন্দ্র, সূর্য, বুধ, হিমালয়, ভারত, পারস্য'। যে নাম অর্বাচীন কিন্তু বহুপ্রচলিত, তাও থাকবে। যেমন—'প্রশান্ত মহাসাগর'। কিন্তু অবশিষ্ট শব্দের ইংরেজী নামই গ্রহণীয়, যথা— 'নেপচুন, আফ্রিকা, আটলান্টিক'।

৪। দ্রব্যবাচক শব্দের যদি দেশী নাম থাকে, তো রাখব, যেমন—'স্বর্ণ, লৌহ' বা 'সোনা লোহা'। যদি না থাকে তবে প্রচুর ইংরেজী নাম নেব। বৈজ্ঞানিক বস্তু যে নামে পরিচিত, সেই নামই বহু পরিমাণে আমাদের মেনে নিতে হবে। রাসায়নিক ও খনিজবস্তু এবং যন্ত্রাদি (যথা—মোটর, এঞ্জিন, পাম্প, স্কেল, লেন্স, থার্মমিটার, স্টেথস্কোপ) সম্বন্ধে এই কথা খাটে। রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের তালিকায় স্বর্ণ লৌহ গন্ধক প্রভৃতি নামের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ক্লোরিন সোডিয়ম থাকবে। ফরমুলা লিখতে ইংরেজী বর্ণ-ই লিখব, ইংরেজী বর্ণমালা আমাদের অপরিচিত নয়। সাধারণত লিখব—'লৌহ কঠিন, পারদ তরল। লেখবার কালি তৈয়ার করতে হিরাকস লাগে'। কিন্তু দরকার হলেই নির্ভয়ে লিখব—'ফেরস সলফেট অর্থোডাইক্লোরোবেনজিন, ম্যাগনিসাইট, রুমকর্ফ কয়েল, ইলেকট্রন।' শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা রচনায় আশ্চর্য কৌশল দেখিয়েছেন। কিন্তু সে পরিভাষা কল্পান্তেও চলবে না। 'অ্যান্টিমনি থায়োফস্ফেট'-এর চেয়ে মণীন্দ্রবাবুর 'অন্তমনসশুল্বভাস্ফেত' কিছুমাত্র শ্রুতিমধুর বা সুবোধ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—'ভাষা মূলে সংকেতমাত্র'। আমরা বিদেশী পারিভাষিক শব্দকে রূঢ়-অর্থ-বাচক সংকেত হিসাবেই গ্রহণ করব এবং তার প্রয়োগবিধি শিখব। যাঁর কৌতূহল হবে তিনি 'অক্সিজেন, অ্যান্টিমনি' প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি খোঁজ করবেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে রূঢ় অর্থের জ্ঞানই যথেষ্ট। জীববিদ্যাতেও ঐ নিয়ম। 'কাষ্ঠ, অস্থি, পুষ্প, অণ্ড' চলবে; 'প্রোটোপ্লাজম্, হিমোগ্লোবিন, ভাইটামিন' মেনে নিতে হবে।

৫। বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন বা নবরচিত দেশী নাম সহজে চলবে, যথা—'ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদণ্ডী, তৃণ'। কিন্তু যেখানেই শব্দ রচনা কঠিন হবে সেখানে বিনা দ্বিধায় ইংরেজী নাম নেওয়া উচিত। বোধ হয় বর্গের উচ্চতর অঙ্গে (element, compound, phylum, order, genus, species, endogen) দেশী নাম অনায়াসে চলবে। কিন্তু নিম্নতর অঙ্গে বহুস্থলে ইংরেজী নাম মেনে নিতে হবে, যেমন—হাইড্রোকার্বন, অক্সাইড, গোরিলা, হাইড্রা, ব্যাকটিরিয়া।

৬। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের অধিকাংশই দেশী হতে পারবে। Survival, symbiosis, reflection, polarization, density, gaseous, octahedral, decompose, effervesce প্রভৃতির দেশী

প্রতিশব্দ সহজে চলবে। কিন্তু রূঢ় শব্দ ইংরেজীই নিতে হবে, যথা—'গ্রাম, মিটার, মাইক্রন, ফারাড'।

বহুস্থলে একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত (cognate) আরও কয়েকটি শব্দ নিতে হবে। 'ফোকস, ফিনল, অক্সাইড, মিটার'-এর সঙ্গে 'ফোকাল, ফিনলিক, অক্সিডেশন, মেট্রিক' চলবে। ছাপাখানার ভাষায় যেমন 'কম্পোজ করা' চলেছে, রাসায়নিক ভাষায় তেমনি 'অক্সিডাইজ' করা চলবে।

৭। বাংলায় (বা সংস্কৃতে) কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই, যথা—শুক্লপক্ষ, পতঙ্গ (winged insect), উদ্‌বৃত্ত (circle cutting equinoctial at right angles), ছায়া (both shadow and transmitted light) উপাঙ্গ (limb of a limb)। পরিভাষার তালিকায় এই সকল শব্দকে সযত্নে স্থান দিতে হবে।

৮। দেশী পরিভাষা নির্বাচনকালে সর্বত্র ইংরেজী শব্দের অভিধা (range of meaning) যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। যদি স্থলবিশেষে দেশী শব্দের অর্থের অপেক্ষাকৃত প্রসার বা সংকোচ থাকে তবে ক্ষতি হবে না—যদি সংজ্ঞার্থ (definition) ঠিক থাকে। প্রসার, যথা—অঙ্গুলি = finger; toe। সংকোচ, যথা— fluid = তরল; বায়ব।

৯। বিভিন্ন বিদ্যার প্রয়োগকালে একই শব্দের অল্পাধিক অর্থভেদ হয় এমন উদাহরণ ইংরেজীতে অনেক আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করাই ভাল; কারণ, বাংলা আর ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি সমান নয়। যথা—sensitive (mind, balance, photographic plate)। Sensitive শব্দের সমান ব্যঞ্জনা (connotation)-বিশিষ্ট বাংলা শব্দ রচনার কোনও প্রয়োজন নেই, একাধিক শব্দ প্রয়োগ করাই ভাল। পক্ষান্তরে এমন বাংলা শব্দও আছে যার সমান ব্যঞ্জনা-বিশিষ্ট ইংরেজী শব্দ নেই, যেমন—'বিন্দু'= drop; point; spot। এস্থলে ইংরেজীর বশে একাধিক শব্দ রচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য বা গৌণ ভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে আর একটি নিবেদন জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। সংকলনের ভার যাঁদের উপর, তাঁদের কিরকম যোগ্যতা থাকা দরকার? বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যার বিশারদ বহু লোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে

সমিতি সংকলন করবেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী-উর্দু পরিভাষার খবর রাখেন। যদি কোনও হিন্দীভাষী বিজ্ঞান-সাহিত্য-সেবী সমিতিতে থাকেন তবে আরও ভাল হয়। সর্বোপরি আবশ্যক এমন লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রযোজ্যতা বিচার করতে পারেন, বিশেষত সংকলিত সংস্কৃত শব্দের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে যাঁরা পরিভাষা সংকলন করেছেন তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত এবং অনেকে একাধিক বিদ্যায় পারদর্শী। তথাপি বিভিন্ন সংকলয়িতার নৈপুণ্যের তারতম্য বহুস্থলে সুস্পষ্ট। Columnar, vitreous, adamantine-এর প্রতিশব্দ একজন করছেন—'স্তম্ভনিভ, কাচনিভ, হীরকনিভ'। আর একজন করেছেন—স্তাম্ভিক, কাচিক, হৈরিক। শেষোক্ত শব্দগুলিই যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য তার বিচারের ভার সাধারণের উপর দিলে চলবে না; সংকলন-সমিতিকেই তা করতে হবে। এ নিমিত্ত যে বৈদগ্ধ আবশ্যক তা সমিতির প্রত্যেক সদস্যের না থাকতে পারে, কিন্তু কয়েকজনের থাকা সম্ভব। অতএব, পরিভাষাসংকলন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হলেও শেষ নির্বাচন মিলিত সমিতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।



সে ১৯৩৪ সালের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে। অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক্‌ সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথমদিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখিনি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, ...ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নানা শাখার অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন। সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিয়ে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন, সভাপতি নীরব শ্রোতা; সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে দুটি-একটি ক্ষুদ্র কথায়—শিখা জ্বেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রমথনাথ বিশী

পরশুরাম রচনাবলী - ভূমিকা

সাহিত্যবিচার

(১৩৪১/১৯৩৪)

মানুষের মন একটি আশ্চর্য যন্ত্র। কোন্ আঘাতে এ যন্ত্র কিরকম সাড়া দেয় তা আমরা অল্পই জানি। রাম একটি কড়া কথা বললে, অমনি শ্যাম খেপে উঠল; রাম একটু প্রশংসা করলে, শ্যাম খুশী হয়ে গেল। মনের এইরকম সহজ প্রতিক্রিয়া আমরা মোটামুটি বুঝি এবং তার নিয়মও কিছু কিছু বলতে পারি। কিন্তু রাম যদি ব্যক্তি বা দল বিশেষকে উদ্দেশ না করে কিছু লেখে বা বলে, অর্থাৎ কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বা বক্তৃতা দেয়, তবে তাতে কোন্ কোন্ গুণ থাকলে সাধারণে খুশী হবে তা নির্ণয় করা সোজা নয়। পাঠক বা শ্রোতা যদি সাধারণ না হয়ে অসাধারণ হন, যদি তিনি সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তাঁর বিচারপদ্ধতি কিরূপ তা বোঝা আরও কঠিন।

একটা সোজা উপমা দিচ্ছি। চা আমরা অনেকেই খাই এবং তার স্বাদ গন্ধ মোটামুটি বিচার করতে পারি। কিন্তু চা-বাগানের কর্তারা চাএর দাম স্থির করেন কোন্ উপায়ে? এখনও এমন যন্ত্র তৈয়ারি হয়নি যাতে চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপা যায়। অগত্যা বিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। এই বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছুই জানেন না। এঁর সম্বল শুধু জিব আর নাক। ইনি গরম জলে চা ভিজিয়ে সেই জল একটু চেখে বলেন—এই চা দু টাকা পাউন্ড, এটা পাঁচ সিকে, এটা এক টাকা তিন আনা। তিনি কোন্ উপায়ে এইরকম বিচার করেন তা নিজেই বলতে পারেন না। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতি অল্প ইতরবিশেষও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই বিধিদত্ত ক্ষমতার খ্যাতিতে তিনি টি-টেস্টারের পদ লাভ করেন এবং চা ব্যবসায়ী তাঁর যাচাইকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়। তিনি যদি বলেন এই চাএর চেয়ে ঐ চা ঈষৎ ভাল তবে দু-দশ জন সাধারণ লোক হয়তো অন্য মত দিতে পারে। কিন্তু বহু শত বিলাসী লোক যদি ঐ দুই চা খেয়ে দেখে তবে অধিকাংশের অভিমত টি-টেস্টারের অনুবর্তী হবে।

যাঁরা সাহিত্যে বৈদগ্ধের খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা টি-টেস্টারের সহিত

তুলনীয়। টি-টেস্‌টারের লক্ষণ— স্বাদ-গন্ধের সূক্ষ্ম বোধ আর অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়। বিদগ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ— সূক্ষ্ম রসবোধ আর সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা। স্বাদ গন্ধ কাকে বলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমরা কেবল মনে মনে বুঝি। কিন্তু রসের স্বরূপ সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করাও শক্ত। সাহিত্য-বিচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আপনি কি কি গুণের জন্য এই রচনাটিকে ভাল বলছেন—তবে তিনি কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারবেন না। যদি বলতে পারতেন তবে রসবিচারের একটা পদ্ধতি খাড়া হতে পারত। তাঁর যদি বিদ্যা জাহির করবার লোভ থাকে (থাকতেও পারে, কারণ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং সব ক্ষেত্রে নয়), তবে তিনি হয়তো আর্টের উপর বক্তৃতা দেবেন, অলংকার উদ্‌ঘাটন করবেন, রসের বিশ্লেষণ করবেন। সেই ব্যাখ্যান শুনে হয়তো শ্রোতা অনেক নূতন জিনিস শিখবে। কিন্তু রসবিচারের মাপকাঠির সন্ধান পাবে না।

সাহিত্যের যে রস তা বহু উপাদানের জটিল সমন্বয়ে উৎপন্ন। সংগীতের রস বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা লোকপরম্পরায় জেনে এসেছি যে অমুক স্বরের সঙ্গে অমুক স্বর মিষ্ট বা কটু শোনায়, কিন্তু কিজন্য এমন হয় তা ঠিক জানি না। বিজ্ঞানী এইটুকু আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের কানের ভিতরের শ্রুতিযন্ত্রে কতকগুলি তন্তু আছে, তাদের কম্পনের রীতি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট। বিবাদী স্বরের আঘাতে এই তন্তুগুলির স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে ব্যাঘাত হয়, কিন্তু সংবাদী স্বরে হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের রহস্য যদি আরও জানা যায় তবে হয়তো সংগীতের অনেক তত্ত্ব বোধগম্য হবে। যতদিন তা না হয় ততদিন সংগীতবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলবে কিন্তু বিজ্ঞান বলা চলবে না।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট। সুললিত বর্ণনার মায়াজালে এই অজ্ঞতা ঢাকা পড়ে না। কেউ বলেন—art for art's sake, কেউ বলেন—মানুষের কল্যাণই সাহিত্যের কাম্য, কেউ বলেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন। এই সমস্ত ঝাপসা কথায় রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে সাহিত্যরসে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু রসের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ও যোজনার বিষয় আমরা কিছুই জানি না। যে যে উপাদান সাহিত্যরসের উপজীব্য, তার কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও

কর্মেন্দ্রিয়ের রুচিকর বিষয় বর্ণন, চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাসের আনুকূল্য, মানুষের প্রচ্ছন্ন কামনার তর্পণ, অপ্রিয় বাধার খণ্ডন, অস্ফুট অনুভূতির পরিস্ফুটন, জ্ঞানের বর্ধন, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি। এইসকল উপাদানের কতকগুলি পরস্পরবিরোধী, কতকগুলি নীতিবিরোধী। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু অম্ল মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে বিবিধ সুখাদ্য তৈয়ার করে, ওস্তাদ সাহিত্যিকও সেইরকম করেন। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লঙ্কা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটুকু রসুন দিলে বিকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে কতটুকু শান্তরস বা বীভৎসরস, তত্ত্বকথা বা দুর্নীতি বরদাস্ত হবে, এসবের নির্ধারণ একই পদ্ধতিতে হয়। কয়েকজন ভোক্তার হয়তো বিশেষ বিশেষ রসে অনুরক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পছন্দই জগতে চরম বলে গণ্য হয় না। যিনি কেবল দলবিশেষের তৃপ্তিবিধান করেন অথবা কেবল সাধারণ ভোক্তার অভ্যস্ত ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তিনি সামান্য পেশাদার মাত্র। যিনি অসংখ্য খোশখোরাকীর রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা; এবং যিনি অন্যের রচনায় এই প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি করে সাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হবার যোগ্য।

তামাক একটা বিষ, কিন্তু ধূমপান অসংখ্য লোকে করে এবং সমাজ তাতে আপত্তি করে না। কারণ, মোটের উপর তামাকে যতটা স্বাস্থ্যহানি হয় তার তুলনায় লোকে মজা পায় ঢের বেশী। পাশ্চাত্ত্য দেশে মদ সম্বন্ধেও এই ধারণা, এবং অনেক সমাজে পরিমিত ব্যভিচারও উপভোগ্য ও ক্ষমার্হ গণ্য হয়। মজা পাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তাতে যদি বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটে তবে মজা নষ্ট হয় এবং রসের উদ্দেশ্যই বিফল হয়। সাহিত্যরসের উপাদান বিচারকালে সুধীজন এবিষয়ে স্বভাবত অবহিত থাকেন। যিনি উত্তম বোদ্ধা বা সমালোচক তিনি মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে রসের যাচাই করেন। তাঁর যাচাইএর নিক্তি আর কষ্টিপাথর কিরকম তা তিনি অপরকে বোঝাতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না। তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে বড় একটা ভুল হয় না, অর্থাৎ শিক্ষিতজন সাধারণত তাঁর মতেই মত দেয়। ❑

খ্রীষ্টীয় আদর্শ

(১৩৪৯/১৯৪২)

মিত্ররাষ্ট্রসংঘ কোন্ মহাপ্রেরণায় এই যুদ্ধে লড়ছেন তার বিবরণ মাঝে মাঝে ব্রিটিশ নেতাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে। তাঁরা অনেকবার বলেছেন—আমাদের উদ্দেশ্য Christian Idealএর প্রতিষ্ঠা। বহু অখ্রীষ্টান রাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষে আছে, যেমন চীন ভারত মিশর আরব। রাশিয়ার কর্তারাও খ্রীষ্টধর্ম মানেন না। এই খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রতিবাদ সম্প্রতি বিলাতের মুসলমানদের তরফ থেকে হয়েছে। কিন্তু তার ঢের আগে ব্রিটিশ যুক্তিবাদী আর নাস্তিক সম্প্রদায় তাঁদের আপত্তি প্রবল ভাবে জানিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বললে যদি খ্রীষ্টের উপদেশ বোঝায় তবে তাতে এমন কি নূতন বিষয় আছে যা তাঁর আগে কেউ বলে নি? ইহুদি বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান ধর্মে কি নীতিবাক্য নেই? বিলাতে আমেরিকায় রাশিয়ায় যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম মানেন না তাঁদের কি উচ্চ আদর্শ নেই? 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' কথাটিতে ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। এখন ব্রিটিশ নেতারা আমতা আমতা করে বলছেন—আমাদের কোনও কুমতলব নেই, তোমাদেরও উচ্চ আদর্শ আছে বই কি, সেটা খ্রীষ্টীয় আদর্শের চেয়ে খাটো তা তো বলি নি, তবে কিনা 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' বললে তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই উচ্চতম ধর্মনীতি এসে পড়ে। প্রতিবাদীরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় আদর্শের অন্য একটা মানে থাকতে পারে।

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন না, যীশু খ্রীষ্টও খ্রীষ্টান ছিলেন না। ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে বহুকাল ধরে ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং পরিবর্তনও ক্রমান্বয়ে হতে থাকে। অবশেষে মঠধারী, প্রচারক, পুরোহিত এবং লোকাচার দ্বারাই ধর্ম শাসিত হয়, এবং যাঁরা আদিপ্রবর্তক তাঁরা সাক্ষিগোপাল মাত্র হয়ে পড়েন। বিলাতেও তাই হয়েছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ মানে খ্রীষ্টকথিত মার্গ নয়, আধুনিক প্রোটেস্টান্ট ধনীসমাজের আদর্শ। সে আদর্শ কি? গত দু শ বৎসরের মধ্যে বিলাতে যে সমৃদ্ধি হয়েছে তার কারণ অবশ্য প্রোটেস্টান্ট সমাজের উদ্যম। এই সমৃদ্ধির কারণ অবশ্য

প্রোটেস্টান্ট ধর্ম নয়, যেমন এদেশের পারসী জাতি জরথুস্ত্রীয় ধর্মের জন্যই ধনী হন নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁরা বিস্তার করেছেন এবং নিজের দেশে যাঁরা বড় বড় কারখানার পত্তন করে দেশ-বিদেশে মাল চালান দিয়ে ধনশালী হয়েছেন, দৈবক্রমে তাঁরা প্রোটেস্টান্ট—বিশেষ করে ইংল্যান্ডের অ্যাংলিক্যান এবং স্কটল্যান্ডের প্রেসবিটেরিয়ান সমাজ। ধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক শক্তি আসে, সেজন্য এই দুই সমাজই বিলাতে প্রবল। এঁরা চার্চের পোষক, চার্চও এঁদের আজ্ঞাবহ। গীতায় আছে—'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'—যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত কর, ঐ দেবগণও তোমাদের তৃপ্ত করুন, পরস্পরকে তৃপ্ত করে পরম শ্রেয় লাভ কর। বিলাতের দেবতা বিলাতবাসীকে ঐশ্বর্যদানে তৃপ্ত করেছেন, বিলাতের লোকেরাও তাঁদের যাজকসংঘকে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে তৃপ্ত করে থাকেন। কিন্তু শুধু তৃপ্ত করেন না, পরোক্ষভাবে হুকুমও চালান। পার্লামেন্ট যেমন ধনীর করতলস্থ, চার্চও সেইরকম। পাদ্রীরা যথাসম্ভব ধনীর ইঙ্গিতে চলেন, অবাধ্য রাজাকে সরাবার বিধান দেন, কমিউনিস্টদের শয়তানগ্রস্ত বলে প্রচার করেন, অসহিষ্ণু দরিদ্রকে স্বর্গরাজ্যের আশ্বাস দিয়ে শান্ত রাখবার চেষ্টা করেন, অধীন দুর্বল জাতিদের চিরস্থায়ী হেপাজত সমর্থন করেন। আমাদের দেশেও ধনী আর পুরোহিতের মধ্যে একটু ঐরকম সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ধর্মের ভেদ এখানে বেশী, রাজসাহায্যও নেই, তাই 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' ব্যাপারটা দেশব্যাপী হয়নি।

যে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এতটা শ্রীবৃদ্ধি জড়িত তার নামেই যে ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর আদর্শ ঘোষিত হবে তা বিচিত্র নয়। কিন্তু নূতন করে আদর্শ খ্যাপনের কারণ এ নয় যে পূর্বের আদর্শ ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। কথাটা বিদেশীকে লক্ষ্য করে বলা হয় নি, বৃটিশ জাতিরই আত্মপ্রসাদ রক্ষার জন্য বলা হয়েছে, যাতে এই বিপৎকালে কারও মনে গ্লানি বা বৈরাগ্য না আসে। এই আদর্শের আন্তরিক অর্থ—যে উত্তম ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত ইওরোপ এশিয়া আফ্রিকায় চলে এসেছে তাই কিঞ্চিৎ শোধনের পর পাকা করা। আদর্শটা ধূমাচ্ছন্ন, স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, সেজন্য একটা পবিত্র বিশেষণ আবশ্যক। আমাদেরও অনেক ক্ষুদ্র আদর্শ আছে, এক কথায়—আমরা রামরাজ্য চাই। বিলাসী ধনী তাতে বোঝেন—তাঁর ন্যস্ত সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে, দারজিলিং সিমলা বিলাত সুগম হবে, হীরে জহরত সিল্ক সাটিন পেট্রল 'সার'-উপাধি সুলভ

হবে, গৃহিণী পুত্র কন্যারা দুখানা মোটরেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতি নিরীহ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বোঝেন—তাঁর রোজগার বজায় থাকবে, ট্যাক্স বাড়বে না, দোকানদার সস্তায় জিনিসপত্র দেবে, চাকর কম মাইনেয় কাজ করবে, ছেলে-মেয়েরা আইন লঙ্ঘন বা বিয়ের আগে প্রেম করবে না। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বা আমাদের অতি ক্ষুদ্র আদর্শ যতই প্রচ্ছন্ন হক, তার মানে—যা আছে বা ভূতপূর্ব তাই কায়েম করা বা আরও সুবিধাজনক করা। কিন্তু আমাদের একটা বড় আদর্শও আছে— স্বাধীনতা, যা অভূতপূর্ব, যার খসড়াও তৈরি হয় নি শুধু নামটিই সম্বল। সুতরাং কিছু উহ্য না রেখেই আমরা সে আদর্শ ঘোষণা করতে পারি, ভাবী স্বরাজ্যকে রামরাজ্য বা ধর্মরাজ্য বলবার দরকার নেই।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ যাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের মধ্যে রাশিয়া আছে। সেদিন পর্যন্ত রাশিয়া অর্ধশত্রু ছিল, এখন পরমমিত্র। কিন্তু রাজনীতিক মৈত্রী আর বারবনিতার প্রেম একজাতীয়। যখন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার সময় আসবে তখন সাম্যবাদী মিত্র কি বলবে? হয়তো বলবে—ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য নিয়ে যা খুশি করুক, আমরা নিজের দেশ আগে সামলাই। হয়তো ব্রিটেন সেই ভরসাতেই নিজের আদর্শ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে।



ভাষার বিশুদ্ধি

(১৩৫০/১৯৪৩)

মৃতভাষা যদি দৈবগতিকে জীবিত সমাজের সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয় তবে তাতে নিয়মের বন্ধন সহজেই পড়ে। প্রাচীন লেখকদের রীতি এবং তদনুসারে সংকলিত ব্যাকরণ আর অভিধানের শাসন এরকম ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, বেশী বিকার ঘটতে দেয় না। এমন ভাষা কেবল পন্ডিতদের ভিতরেই চলতে পারে এবং অশুদ্ধির ভয়ে লেখকগণকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। জনসাধারণ সে ভাষার কৌশল বোঝে না, সেজন্য তাতে হস্তক্ষেপ করে বিকৃত করে না; জীবন্ত প্রাকৃত ভাষাতেই তাদের স্থূল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় যুগের আদিতে দক্ষিণপূর্ব ইওরোপের বিভিন্নজাতীয় পন্ডিত-সমাজে গ্রীক ভাষা সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সমগ্র ইওরোপে লাটিন ভাষা ঐরকম প্রতিষ্ঠা পায়। মুসলমান রাজত্বকাল পর্যন্ত সংস্কৃত সমগ্র ভারতের হিন্দু বিদ্বৎসমাজের সাহিত্যের ভাষা ছিল।

বর্তমান ইংরেজী প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষায় যে গ্রীক ও লাটিন অংশ আছে তার বেশীর ভাগই বিকৃত। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে গ্রীক লাটিন উপাদান যোগে অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশুদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নি। আধুনিক ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অধিকাংশই dog latin অর্থাৎ বিকৃত লাটিন। পন্ডিতগণ সজ্ঞানেই এইরকম শব্দ গঠন করেছেন, আধুনিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করে মৃত ভাষার হাড় মাস চামড়া কাজে লাগাতে তাঁরা সংকোচ বোধ করেন নি। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরিভাষা সংকলনে এরকম অনাচার আবশ্যক হয় নি।

প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন যে অর্থে মৃতভাষা, সংস্কৃতকে সে অর্থে মৃত বলা যায় না। সংস্কৃত বাক্য মরেছে, অর্থাৎ সাধারণে সে ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আধুনিক সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে বেঁচে আছে, উচ্চারণের বিকার হলেও রূপ বদলায় নি। আমরা শুধু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করি না, দরকার হলে সংস্কৃত রীতিতেই নূতন শব্দ এবং নূতন সমাসবদ্ধ পদ রচনা করি। সংস্কৃত ভাষা বাংলার জননী কি মাতামহী

তা ভাষাবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। সম্বন্ধ যাই হোক, ভাগ্যক্রমে আধুনিক বাংলা ভাষা বিপুল সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী হয়েছে। এই অধিকারের সঙ্গে তাকে সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্বও নিতে হয়েছে। যিনি সাহিত্যচর্চা করতে চান তাঁকে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ, অন্তত সংস্কৃত প্রাতিপদিকের গঠন ও যোজনের মোটামুটি নিয়ম শিখতেই হবে।

শব্দের প্রয়োগে অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার চলে না, সকলে একই নিয়মের অনুবর্তী না হলে ভাষা দুর্বোধ হয়, সাহিত্যের যা মূল উদ্দেশ্য—ভাবের আদান-প্রদান, তা ব্যাহত হয়। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য, কারণ এমন কোনও প্রবল শাসন নেই যা সকলেই মেনে নিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে ব্যাকরণ অভিধানের শাসন আছে। যদি আমরা মনে করি যে এই শাসন বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় তবে মহা ভুল করব। সংস্কৃত শব্দে যে সুচিরাগত নিয়মের বন্ধন আছে সকলেই তা প্রামাণিক বলে মেনে নিতে পারে, তাতে শব্দ এবং তার অর্থ স্থির থাকে, কিন্তু ভাষার স্বচ্ছন্দতা কিছুমাত্র বাধা পায় না।

বাংলার তুল্য হিন্দী মরাঠি প্রভৃতি কতকগুলি ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য আছে, এবং সেই কারণেই বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষী অল্পায়াসে পরস্পরের ভাষা শিখতে পারে। ভারতের কয়েকটি প্রদেশের ভাষায় এই যে শব্দসাম্য আছে তা অবহেলার বিষয় নয়, এই সাম্য যত বজায় থাকে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল।

এদেশে ৭০/৮০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা অল্পসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সেজন্য তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের বিকৃতি আর অপপ্রয়োগ বেশী ঘটে নি। 'ইতিমধ্যে, মহারথী, সক্ষম, সততা, সিঞ্চন, সৃজন' প্রভৃতি কয়েকটি অশুদ্ধ শব্দ বহুকাল থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, এখন এগুলিকে ছাড়া শক্ত, ছাড়বার প্রয়োজনও নেই। বর্তমানকালে সাহিত্যচর্চা খুব ব্যাপক হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল লেখকের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ হয় নি, তার ফলে অশুদ্ধ এবং অপপ্রযুক্ত শব্দের বাহুল্য দেখা দিয়েছে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা উপেক্ষার বিষয় নয়। অতি বড় বিদ্বানেরও মাঝে মাঝে স্খলন হয়, কিন্তু তাতে স্থায়ী অনিষ্ট হয় না যদি তাঁরা নিজের ভুল বোঝবার পরে সতর্ক হন। কিন্তু লেখকরা যদি নিরঙ্কুশ হন এবং তাঁদের ভুল বার বার ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় তবে তা সংক্রামক রোগের মতন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

প্রামাণিক অর্থে 'প্রামাণ্য', ইতিহাস অর্থে 'ইতিকথা', ক্ষীণ বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত', আয়ত্ত অর্থে 'আয়ত্তাধীন' চলছে। কর্মসূত্রে বা কর্মোপলক্ষ্যে স্থানে 'কর্মব্যপদেশে' লেখা হচ্ছে। 'উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, প্রসারতা, সৌজন্যতা, ঐক্যতা, ঐক্যতান, উচিৎ' প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ চলছে। 'আধুনিকী' স্থানে 'আধুনিকা', প্রচুর অর্থে 'যথেষ্ট', সংজ্ঞার্থ বা definition অর্থে 'সংজ্ঞা' প্রায় কায়েম হয়ে গেছে। অনেকে কবিতায় শ্রেণী অর্থে 'বলাকা' লিখছেন।

আজকাল সাহিত্যের প্রধান বাহন সংবাদপত্র। এই বাহনের প্রভাব কিরকম ব্যাপক হয়েছে তা সাধারণের লেখা আর কথা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। Situation অর্থে অনর্থক 'পরিস্থিতি' লেখা হচ্ছে, যদিও 'অবস্থা' লিখলেই কাজ চলে। আইন লঙ্ঘন স্থানে 'আইন অমান্য', আলোচনা স্থানে 'আলোচনী', কার্যকর উপায় স্থানে 'কার্যকরী উপায়', পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল স্থানে 'পূর্বাহ্নেই...' লেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের অদ্ভুত ভাষা মার্জনীয়। তাঁদের রাত জেগে কাজ করতে হয়, অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি সংবাদ ইংরেজী থেকে বাংলায় তরজমা করতে হয়, ভাষার বিশুদ্ধির উপর দৃষ্টি রাখবার সময় নেই, তাঁদের ভাষা ইংরেজীগন্ধী হওয়া বিচিত্র নয়। Stalin's speech has given rise to a first class political problem —'স্টালিনের বক্তৃতা একটি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে'! The Congress party did not take part in the discussion—'কংগ্রেসদল এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নাই'!

কিছুকাল পূর্বে একটি ইংরেজী পত্রিকায় পড়েছিলাম যে Times প্রভৃতি সংবাদপত্রের বেতনভুক্ লেখকগণকে মাঝে মাঝে শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়। এদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলের মধ্যে সুশিক্ষিত লোকের অভাব নেই। তাঁরা সহকারীদের প্রত্যেক লেখা ছাপবার আগে সংশোধন করে দেবেন এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু যদি তাঁরা দেখেন যে কোনও অশুদ্ধ শব্দ বা অপপ্রয়োগ বার বার ছাপা হচ্ছে তবে মাঝে মাঝে শুদ্ধাশুদ্ধির ফর্দ করে দিয়ে তাঁদের অধীন লেখকদের সতর্ক করে দিতে পারেন। কয়েকটি বিলাতী পত্রিকায় ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা ও বিতর্ক ছাপা হয়। এদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হলে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হবে।

❑

তিমি

(১৩৪৯/১৯৪২)

আধুনিক প্রাণীদের মধ্যে তিমি সব চেয়ে বড়। এই জন্তুটি মহাকায়, কিন্তু সাধারণত ক্ষুদ্রভোজী, ছোট ছোট মাছ শামুক ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারণ করে। পুরাণে আর একরকম জলজন্তুর উল্লেখ আছে—তিমিংগিল, যারা এত বড় যে তিমিকে গিলে খায়। পৌরাণিক কল্পনা এখানেই নিরস্ত হয় নি, তিমিংগিলেরও ভক্ষক আছে, যার নাম তিমিংগিলগিল। ততোধিক গিলগিলান্ত নামধারী জন্তুরও উল্লেখ আছে। পুরাণকর্তাদের প্রাণীবৃত্তান্ত যতই অদ্ভুত হোক, তাঁরা মাৎস্যন্যায় বা power politics বুঝতেন।

জন্তুর মধ্যে যেমন তিমি, দেশের মধ্যে তেমন আফ্রিকা ভারত চীন ইন্ডোচীন প্রভৃতি। এসব দেশ আকারে বৃহৎ, কিন্তু ক্ষুদ্রভোজী অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট। এদের অল্পাধিক পরিমাণে কবলিত করে যারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তারা তিমিংগিল জাতীয়; যেমন ব্রিটেন ফ্রান্স হল্যান্ড ইটালি জাপান। এইরকম পরদেশগ্রাস বহু যুগ থেকে চলে আসছে, অবশ্য কালক্রমে গ্রস্ত আর গ্রাসকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের তিমিংগিলরা সরলস্বভাব ছিল, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গিলত, কোনও সাধু সংকল্পের দোহাই দিত না। রোমান হূন তুর্ক মোগল প্রভৃতি বিজেতারা এই প্রকৃতির। এই গ্রাসননীতি প্রাচীন ভারতেও কিছু কিছু ছিল, শরৎকাল পড়লেই পরাক্রান্ত রাজারা খামকা দিগ্‌বিজয়ে বার হতেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের দৌড় ছিল সংকীর্ণ, আশেপাশের গোটাকতক রাজ্য করায়ত্ত করেই নিজেকে সসাগরা ধরার অধীশ্বর ঘোষণা করতেন।

আধুনিক তিমিংগিলদের চক্ষুলজ্জা আছে, তারা স্বজাতির সমালোচনাকে কিঞ্চিৎ ভয় করে। তাই শ্বেতজাতির বোঝা, সভ্যতার বিস্তার, অনুন্নত দেশের উন্নতি, শান্তি ও সুনিয়ম প্রভৃতি বড় বড় কথা শোনা যায়। এই সব নীতিবাক্যে তিমিংগিলদের আত্মপ্রসাদ বজায় থাকে, তাদের মধ্যে যারা একটু সন্দিগ্ধ তারাও বেশী আপত্তি তুলতে পারে না। এই ধর্মধ্বজী তিমিংগিল সম্প্রদায়ের আধিপত্য এতদিন অবাধে চলছিল, কিন্তু সম্প্রতি একশ্রেণীর নবতর জীব

গোলযোগ বাধিয়েছে, এরা তিমিংগিলগিল, যথা জার্মনি ও জাপান। এরা ভাবে পৃথিবীতে যত তিমি আছে সবই তো তিমিংগিলদের কবলে, আমরা খাব কি? অতএব প্রচণ্ড মুখব্যাদান করে তিমিংগিলদেরই গ্রাস করতে হবে। তাতে প্রথমটা যতই কষ্ট হোক অবশেষে যা পাওয়া যাবে তা একেবারে তৈরি সাম্রাজ্য, অন্যের চর্বিত খাদ্যের পুনশ্চর্বণ দরকার হবে না, মুখে পুরলেই পুষ্টিলাভ হবে। জার্মনি চায় সমস্ত ইওরোপ, জাপান চায় সমস্ত পূর্ব এশিয়া—পশ্চিম এশিয়া কার ভক্ষ্য হবে তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। অবশ্য এর পর দুই গিলগিলের মধ্যেও বিবাদ বাধতে পারে। বিজয়ী জার্মনি যদি ফ্রান্স আর হল্যান্ড কবলস্থ করেই রাখে তবে এই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইন্ডোচীন জাভা প্রভৃতি জাপানকে খোশমেজাজে ছেড়ে দেবে না। যদি এশিয়ার ঐশ্বর্য না মেলে তবে এমন মরণপণ যুদ্ধের সার্থকতা কি? বোধ হয় জার্মনি মনে করে যে ব্রিটেন আর আমেরিকাকে জব্দ করার পর জাপানকে সাবাড় করা অতি সহজ কাজ। সম্প্রতি একজন ব্রিটিশ জাঁদরেল বলেছেন, জাপানীরা বানর মাত্র। জার্মনিও মনে মনে তাই বলে! অবশেষে হয়তো কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ উৎপাটিত হবে। ইটালি বেচারা উভয়সংকটে পড়েছে। সেও গিলগিল হতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন তার গিলত্বও যেতে বসেছে। জার্মনি যদি জেতে আর দু একটা হাড় দয়া করে দেয় তবেই তার মুখরক্ষা হবে।

তিমিংগিলগিলদের চক্ষুলজ্জা নেই, কিন্তু তাদের ব্রত আরও মহৎ। জার্মনি বলে—সমগ্র পৃথিবী অতিমানব আর্যজাতির (অর্থাৎ তার নিজের) শাসনে আসবে এই হচ্ছে বিধাতার বিধান। জাপান একটু মোলায়েম সুরে বলে—হে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিবৃন্দ, আমাদের পতাকাতলে এসে আমাদের সঙ্গে সমান সমৃদ্ধি লাভ কর।

মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধোত্তর সংকল্প কি তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয় নি। ভারতবর্ষে আমেরিকার কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই। এদেশের সংবাদপত্রে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের যে বাণী ঘোষিত হয়েছে তাতে চতুর্বিধ আশ্বাস আছে—বাক্য ও ধর্মের স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু যে স্বাধীনতা সকলের মূল তার উল্লেখ নেই। অস্পষ্ট উক্তির একটা কারণ—সংকল্পই স্থির হয় নি। আর একটা কারণ—এই সংকটকালে নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করলে বন্ধুবর্গ চটতে পারে অথবা পরাধীন প্রজারা চঞ্চল হতে পারে। তথাপি ব্রিটেন আর আমেরিকার দুচারজন উচ্চাদর্শবাদী মাঝে মাঝে উদার কথা বলে ফেলেছেন, যথা—কোনও দেশ

পরাধীন থাকবে না, স্বভাবজাত সম্পদে কোনও রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার থাকবে না, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনই একমাত্র লক্ষ্য, জাপানী সহসমৃদ্ধি নয়, সর্বজাতিক সহসমৃদ্ধি।

উত্তম সংকল্প। কিন্তু জগতে ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভার যাঁরা নেবেন, তাঁদের কার্যক্রম কি? অপ্রতিহত ক্ষমতা হাতে পেলে তাঁদের মতিগতি কি হবে বলা যায় না। ধরা যাক তাঁরা নিষ্কাম, সমদর্শী, সর্বলোকহিতৈষী, তথাপি মানুষের বর্তমান অভিজ্ঞতা আর সাধারণ বুদ্ধির বশেই তাঁরা চলবেন এবং ভুলও করবেন। তাঁদের পন্থা কল্পনা করে দেখা যেতে পারে।

তাঁদের প্রথম করণীয় হবে—পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে নিজের সুবুদ্ধি দান করা। সম্রাট অশোক সিরিয়া ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশবাসীর হিতার্থে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এই প্রচারের অন্তরালে কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। অশোকের দূতরা বিদেশে রাজ্যস্থাপন করে নি, নিগৃহীতও হয় নি। অনেক ইওরোপীয় রাষ্ট্র থেকেও পররাজ্যে প্রচারক গেছে, কিন্তু বহু স্থলে পরিণাম অন্যরকম হয়েছে। Germany acquired the province of Shantung in China by having the good fortune to have two missionaries murdered there. (*Bertrand Russel*)। অশোক শুধু ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, সে জন্য বাধা পান নি। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রসংস্কারকদের উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের আর্থিক ও রাজনীতিক উন্নতিসাধন, সুতরাং স্বার্থের সংঘাত হবে এবং বাধা ঘটবে। সদুপদেশ বা propaganda-ই প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু যেখানে তা খাটবে না সেখানে প্রহারই সনাতন উপায়, কারণ লোকের মত পরিবর্তনের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা চলবে না। প্রহার অবশ্য নিষ্কামভাবে সর্বজনহিতার্থে দেওয়া হবে, যেমন বাপ দুষ্ট ছেলেকে দেয়। তার পর কি হবে তা রাজনীতিক নেতাদের আধুনিক উক্তি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, যথা—দুরন্ত জাতির সংযমন, নাবালক জাতির শিক্ষক ও রক্ষক নিয়োগ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধোপকরণের সংকোচ, প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বিভাগ, নূতন অর্থনীতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সব দেশ সমান নয়, সব মানুষও সমান নয়। এই অসমঞ্জস দূর করার উপায়—সর্বদেশের ঐশ্বর্য সর্বমানবের ভোগযোগ্য করা এবং সর্ব জাতিকে সমান শিক্ষিত করা। কিন্তু প্রথম উপায়টি সাধ্য হলেও দ্বিতীয়টি সহজ নয়। সকলের জ্ঞানার্জনক্ষমতা সমান না হতে পারে, হলেও শিক্ষাকালের বিলক্ষণ তারতম্য হতে পারে। কোনও ধনী লোকের যদি পাঁচটি ছেলে থাকে তবে

সমান সুযোগ পেলেও সকলে কৃতী হয় না। বাপ যত দিন বেঁচে থাকেন ততদিন অপক্ষপাতে সকলকে সুখে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে অকৃতীরা কষ্ট পায়। অতএব বাপের বেঁচে থাকা দরকার। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির পিতৃস্থানীয় কে হবে? যাঁরা সংস্কার আরম্ভ করবেন তাঁরা চিরকাল বাঁচবেন না, কোনও দলের দীর্ঘপ্রভুত্বও লোকে সইবে না। মনু প্রজাপতি, রাজচক্রবর্তী, ডিক্‌টেটার, অ্যারিস্টোক্রাসি, অলিগার্কি, প্রভৃতি সমস্তই এখন অচল। ডিমোক্রাসির উপর এখনও সাধারণের আস্থা আছে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে জনকতক স্বার্থপর ধূর্ত লোকেই সকল দেশের রাষ্ট্রসভায় প্রবল হয়। এই দোষের প্রতিকার হবে যদি নির্বাচকমণ্ডল (অর্থাৎ জগতের বহু লোক) সাধু ও জ্ঞানবান হয়। শিক্ষার প্রসার হলে জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু সাধুতা? এখানেই প্রবল বাধা।

সম্প্রতি Geoffrey Bourne একটি বই লিখেছেন—'Return to Reason'। এই বহুপ্রশংসিত বইটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে—ডাক্তার উকিল প্রভৃতির মতন পার্লামেন্টের সদস্যকেও আগে উপযুক্ত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, শুধু বাগ্মী আর দলবিশেষের প্রতিনিধি হলে চলবে না। কিন্তু কেবল বিদ্যাশিক্ষায় সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় না, সাধুতাও আসে না।

সংঘবদ্ধ চেষ্টায় এবং বিজ্ঞানবলে বহু দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, সভ্যতা বেড়েছে, রোগ কমেছে। কিন্তু এসবের তুলনায় মানুষের চারিত্রিক উন্নতি যা হয়েছে তা নগণ্য। যেটুকু হয়েছে তা প্রাকৃতিক নিয়মে মন্থর অভিব্যক্তির ফলে, এবং পুণ্যাত্মা কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রভাবে, রাষ্ট্রের বা বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রিত চেষ্টায় হয়নি। বিজ্ঞানের প্রেরণা এসেছে মুখ্যত মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে এবং গৌণত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকে। অথচ যে স্বার্থ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক তা বিজ্ঞান কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে। চরিত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির চরিত্র শোধিত না হলে সমষ্টির পরম স্বার্থজ্ঞান আসবে না, নিষ্কলুষ প্রজাতন্ত্র তথা বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থাও হবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা মাঝে মাঝে enlightened self-interest-এর কথা বলেন, তার মানে—অধীন প্রজাকে বেশী শোষণ না করে এবং প্রতিপক্ষকে লাভের কিছু অংশ দিয়ে সুদীর্ঘকাল নিজের স্বার্থ বজায় রাখা। এরকম ক্ষুদ্র কুটিল নীতিতে জাতিবিরোধ দূর হয় না। সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল একসঙ্গে জড়িত—এই উজ্জ্বলা স্বার্থবুদ্ধির প্রসার না হলে সব ব্যবস্থাই পণ্ড হবে। ❑

প্রার্থনা

(১৩৫০/১৯৪৩)

রাম চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছে। রামের মা তার মাথায় একটি টাকা ঠেকিয়ে মনে মনে মা কালীর কাছে মানত জানিয়ে টাকাটি বাক্সে তুলে রাখলেন। এই মানত যদি ভাষায় বিস্তারিত করা যায় তবে এইরকম দাঁড়ায়।—হে মা কালী, চাকরিটি আমার রামকে দিও। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এখন রোজগার না করলে চলবে কেন। মা, আমি শুধু হাতে তোমার কাছে আসিনি, এই দেখ একটি টাকা নজর দিচ্ছি। আমার ছেলে প্রথম মাইনে পেলেই তা থেকে যা পারি খরচ করে তোমার পুজো দেব, এই টাকাটি তারই বায়না।

সম্ভবত রামের মায়ের মনের কথা শুধু এইটুকু, কিন্তু যদি সাবধানে জেরা করা হয় তবে তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশ থেকে আরও কিছু বার হবে। এই জেরা আপনার আমার সাধ্য নয়, কারণ রামের মা ধর্মশীলা, ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে কোনও আজগবী প্রশ্ন করলেই তিনি ক্ষেপে উঠবেন। তাঁকে জেরা করতে পারেন কেবল একজন, স্বয়ং মা কালী। দেবীকৃত প্রশ্নের অর্থ বোঝবার শক্তি হয়তো রামের মায়ের নেই, তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বলতে পারেন—মা, আমি মুখ্খু মানুষ, কি বলছ কিছুই বুঝছি না, অপরাধ নিও না। ধরে নেওয়া যাক যে মা কালী নাছোড়বান্দা, তিনি রামের মায়ের বোধগম্য ভাষায় জেরা করছেন এবং আমাদের বোধগম্য ভাষায় তা প্রকাশ করছেন।—

হ্যাঁগা রামের মা, ওই যে টাকাটা ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখলে, ওটা কার জন্যে?

তোমারই জন্যে মা। শুধু একটি টাকা নয়, চাকরিটি হলে আরও অনেক কিছু দেব।

চাকরি যদি না হয় তা হলেও টাকাটা আমায় দেবে তো?

তা কি আর দিতে পারি মা, গরিব মানুষ। চাকরিটি হলে গায়ে লাগবে না।

ও, আমাকে লোভ দেখাবার জন্যে টাকাটা বার করেছ?

সেকি কথা মা! এই যে দরখাস্ত করা ইস্তক রোজ মন্দিরে গিয়ে শ্রীচরণে পাঁচটি করে পঞ্চমুখী জবাফুল দিচ্ছি তা তো আর ফেরত নেব না।

চাকরি না হলেও রোজ ফুল দিয়ে যাবে?

তা কোত্থেকে দেব মা, পাঁচটি ফুল দু পয়সা।

ও, এই ফুলগুলো আমাকে ঘুষ দিচ্ছ?

ঘুষ বলতে নেই মা, বল পুজো।

আচ্ছা রামের মা, শুনেছ বোধ হয় যে এই চাকরিটার জন্য দু হাজার দরখাস্ত পড়েছে। তোমাদের তো কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, যেমন করে হোক চলে যাচ্ছে। কিন্তু রামের চেয়ে গরিব উমেদার অনেক আছে, তাদের কেউ যদি চাকরিটি পায় তবে খুশী হও না?

এ যে ছিষ্টিছাড়া কথা মা। থাকলই বা গরিব উমেদার, আমার ছেলে আগে না যেদো মেধো আগে?

আচ্ছা, ওই যে চৌধুরীরা আছে, মস্ত বড়লোক, তাদের মেজো ছেলে হারু যদি চাকরিটা পায় তো কেমন হয়? তার মা এর মধ্যেই ঘটা করে আমার পুজো দিয়েছে।

তা হেরোকে চাকরি দেবে বইকি মা, তারা যে বড়লোক, তোমাকে অনেক ঘুষ খাইয়েছে।

অর্থাৎ তোমার ঘুষ খেয়ে যদি আর সবাইকে ফাঁকি দিই তাতে তুমি খুশী হবে, আর যদি অন্যের ঘুষ খেয়ে তোমাকে ফাঁকি দিই তবে চটবে। আচ্ছা, এত লোক যখন উমেদার, আর অনেকেই আমার কাছে মানত করেছে, তখন চাকরিটা কাকে দেওয়া যায় বল তো? একচোখা হয়ে রামকেই দিতে বল নাকি?

তাই বলছি মা।

কিন্তু সকলেই তো একচোখা হতে বলছে, কার দিকে চোখ দেব?

অত শত জানি না মা, যা ভাল বোঝ কর।

তাই তো চিরকাল করি।

চারুবালা শিক্ষিতা মহিলা, রামের মায়ের মতন তাঁর অন্ধ সংস্কার নেই। তিনি আগে ভগবানের খোঁজখবর নিতেন না, কিন্তু সম্প্রতি বিপদে পড়ে

প্রার্থনা করছেন।—ভগবান, আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর। লোকটা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে, কিন্তু এখন আর আমার কোন রাগ নেই, সে সেরে উঠুক—শুধু এইটুকুই চাই। যদি মরে যায় তবে আমার সর্বনাশ হবে, ছেলেমেয়েরা খাবে কি? গয়না বাড়ি জিনিসপত্র সব বেচে ফেলতে হবে। দয়াময়, আমি অন্যায় আবদার করছি না, কাকেও বঞ্চিত করে নিজের ভাল চাচ্ছি না। শুধু আমার স্বামীকে সারিয়ে দাও, তাতে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হবে না।

এবারেও সওয়াল-জবাব আমরা কল্পনা করতে পারি।—

আচ্ছা চারুবালা, তুমি কি করে জানলে যে তোমার স্বামী বেঁচে উঠলে কারও ক্ষতি হবে না? সে মরলেই তার চাকরিটা যোগেন ঘোষাল পাবে, বেচারা অনেক কাল আশায় আশায় আছে। আর তোমাদের এই বাড়িটার উপর চৌধুরীদের নজর আছে, তোমরা নিরুপায় হলেই তারা সস্তায় কিনে নেবে।

ভগবান, এমন সাংঘাতিক কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না?

কিছুমাত্র না। তুমি এই যে রেশমী শাড়িটা পরে আছ তার জন্য কতগুলো পোকার প্রাণ গেছে জান?

পোকার আবার প্রাণ! লক্ষ পোকার প্রাণের চেয়ে আমার একটু সাধ আহ্লাদ কি বড় নয়?

নিশ্চয়ই বড়। আমার সাধ আহ্লাদও কোটি কোটি মানুষের প্রাণের চেয়ে বড়।

পোকা মরলে আমার একটি চমৎকার শাড়ি হয়। মানুষ মরলে তোমার কি লাভ হয় শুনি?

তোমার তা বোঝবার শক্তি নেই। পোকা কি শাড়ির মর্ম বোঝে?

কি নিষ্ঠুর! লোকে তোমাকে দয়াময় বলে কেন?

তুমিও তো একটু আগে দয়াময় বলে ডাকছিলে, তোমার স্বামীর যদি মৃত্যু হয় তা হলেও দয়াময় বলে ডাকবে। হয়তো আশা কর যে বার বার দয়াময় বললে সত্যিই আমার দয়া হবে।

সংকটে পড়লে অধিকাংশ লোকের দৈবের উপর নির্ভর বাড়ে। অশিক্ষিত জন কবচ মাদুলি হোম স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির শরণ নেয়, শিক্ষিত জন ভগবানের

কাছে প্রার্থনা করে। সাধারণের ধারণা মাদুলি স্বস্ত্যয়নের মতন প্রার্থনারও শক্তি আছে। হোমিওপ্যাথিভক্তরা বলে থাকেন, যদি ঠিক মতন ওষুধ পড়ে তবে রোগ সারতেই হবে। প্রার্থনাবাদীরা বলেন, যদি ডাকার মতন ডাকতে পার তবে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে লজিক বা স্ট্যাটিস্টিক্‌সের সম্পর্ক নেই। যে বিশ্বাসী সে আশা করে যে তার ওষুধ বা প্রার্থনাটি লাগসই হতেও পারে।

যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুকতাক অথবা প্রার্থনা করা হয় তা ন্যায্য কি অন্যায্য ভাববার দরকার হয় না। সেকালে ডাকাতরা যাত্রার আগে কালীপূজা করত।৹ উচ্চাটন মারণ প্রভৃতি অভিচারের চলন এখনও আছে। যারা বিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা আনে তারাও দেবতার কাছে মানত করে। যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হতে চায়, যে লোক দুহাজার উমেদারকে নিরাশ করে চাকরিটি বাগাতে চায়, যে মেয়ে প্রতিযোগিনীদের হারিয়ে দিয়ে সদ্য আগত আই সি এসকে গাঁথতে চায়, তাদেরও অনেকে প্রার্থনা করে বা দৈবশক্তির শরণ নেয়। এরা কেউ মন্দ লোক নয়; রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—এই প্রার্থনা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এমন ধারণা কারও নেই যে ভগবান ন্যায়বিচার করবেন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই করুণা করবেন। অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয় যখন প্রত্যহ ঘটতে দেখা যাচ্ছে তখন ন্যায় অন্যায়ের চিন্তা না করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানকে ধরতে দোষ কি? যদি মাদুলি বা স্বস্ত্যয়ন বা প্রার্থনার মাহাত্ম্য থাকে তবে উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তা ভাববার দরকার নেই।

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই দৈবসাহায্য চাওয়া হয়, কিন্তু বিপদ যখন দেশব্যাপী হয় তখন লোকে সমবেতভাবে দেবতাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে। প্লেগ বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময় হোমযাগ নগরসংকীর্তন, মন্দিরাদিতে বিশেষ উপাসনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গভর্নমেন্ট এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের মহাভয়ে গভর্নমেন্টেরও নাস্তিক্য দূর হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজার উপর হুকুম আসে অমুক দিনে সকলে মিলে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর। সম্ভবত গভর্নমেন্টের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করেন যে ভগবান এত লোকের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না, অথবা মনে করেন যে ভগবানের দয়া না হলেও প্রজার মনে কতকটা ভরসা আসবে।

আমাদের দেশে অল্পসল্প পাষণ্ড আছে, কিন্তু তারা সংযত, বেশী কথা বলতে সাহস করে না। বিলাত সর্ববিষয়ে স্বাধীন দেশ, সেজন্য সেখানকার পাষণ্ডদের মুখের বাঁধন নেই। সেখানে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা ছাড়াও সরকারী হুকুমে বিশেষ বিশেষ দিনে বড়রকম উপাসনা হয়। বিলাতী পাষণ্ডরা বলে—এ বড় আশ্চর্য কথা, যখনই বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হয় তখনই বোমাবর্ষণ বাড়ে, আর যে গীর্জায় বেশী উপাসনা হয় বেছে বেছে তাতেই বোমা পড়ে। আমাদের পাদ্রীরা ভগবানের কাছে শত্রুপক্ষের নামে অনেক লাগাচ্ছেন, আর আমরা যে নির্দোষ, অনিচ্ছায় যুদ্ধে নেমেছি, একথাও বার বার বলছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের পাদ্রীরাও তো ঠিক এইরকম বলছে, আমাদের দুতিনশ বৎসরের অপকর্মের ফর্দ ভগবানকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর কান ভারী করছে। ভগবান কার কথা শুনবেন?

বিলাতের যাজকসম্প্রদায় খুব সতর্ক। তাঁরা বোঝেন যে তাঁদের অনেক যজমান এখন স্বজাতির সমালোচনা করে এবং স্পষ্ট কথা বলে, সুতরাং ভগবানের কাছে এই বাঁধাধরা মামুলী মন্ত্রে প্রার্থনা করা আর চলবে না।—'Save and deliver us, we humbly beseech Thee, from the hands of our enemies; abate their pride, asauage their malice, and confound their devices; that we, being armed with Thy defence, may be preserved evermore from all perils, to glorify Thee, who art the giver of all victory।' সুন্দর রচনা, কিন্তু সরল আর নিষ্পাপ না হলে কি এমন প্রার্থনা করা চলে?

সম্প্রতি আর্কবিশপ অভ ক্যান্টারবেরি এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমরা এ প্রার্থনা করব না—ঈশ্বর, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ কর; শুধু বলব—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমাদের প্রার্থনা সমস্ত জগতের হিতার্থ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তা করব, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য নয়।'

পাষণ্ডরা এতেও ঠাণ্ডা হয় না। বলে—ঈশ্বর তোমাদের তোয়াক্কা রাখেন না, তোমরা প্রার্থনা কর আর না কর, উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবেই।

পাদ্রীদের কাছে যুক্তি আশা করা বৃথা, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং আবশ্যক মত তাঁদের কূটনীতি আশ্রয় করতে হয়। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক—এই প্রার্থনা অতি পুরাতন, বহু দেশের ভক্ত আর জ্ঞানী বহু ভাষায় এই বাক্য বলেছেন। কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে এর

মূল অভিপ্রায় লুপ্ত হয়েছে।

সামান্য লোকে (মায় বেতুনভুক্ যাজক) যখন এই বাক্যটি বলে তখন জানাতে চায় যে ভগবানের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। হিন্দুর অনেক ক্রিয়াকর্মে কর্মফল বাক্যত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয়। কিন্তু স্বার্থকামনা সর্বত্রই উহ্য থাকে। আশ্রিত জন যখন ক্ষমতাশালী প্রভুকে তুষ্ট করে কাজ উদ্ধার করতে চায় তখন বলে—হুজুরের উপর কথা বলবার আমি কে? হুজুর সবই বোঝেন, সব খবর রাখেন, এই গরিবের অবস্থাটা ভাল রকমই জানেন। আপনার দ্বারা কি অবিচার হতে পারে? যা হুকুম করবেন মাথা পেতে নেব। আমাদের কথক-ঠাকুররাও দরবারী ভাষা জানেন, তাঁরা বিপন্ন প্রহ্লাদকে দিয়ে বলান—আমি মরি তাহে ক্ষতি নাহি হে, তোমার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হবে! ভগবানকে যখন বলা হয়—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তখন সাধারণ প্রার্থীর মনে এই গূঢ় কামনা থাকে—ভগবান আমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন।

এই প্রার্থনাবাক্য যাঁদের মুখ থেকে প্রথমে বেরিয়েছিল তাঁদের কোন প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল না। নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী এখনও বলেন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই বাক্যে কিছু রূপক আছে, বক্তার বিশ্বাস অনুসারে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু রূপকের আবরণ ভেদ করলে শুধু এই অর্থই পাওয়া যায়— আমি অভিষ্টসাধন বা বিপদ্‌বারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার সফলতা বা বিফলতা দৈবাধীন অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব, যা ঘটবে তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা বিধাতার বিধান বা নিয়তি। সেই নিয়তি মেনে নেবার এবং সইবার শক্তি আমার আসুক। তার জন্যই প্রার্থনা করছি, অর্থাৎ উদ্‌বুদ্ধ হবার জন্য বার বার নিজেকেই বলছি— হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টি তা তোমাতে সঞ্চারিত হোক।

সংকেতময় সাহিত্য

(১৩৫০/১৯৪৩)

যে আবিষ্কার বা উদ্ভাবন আমাদের সমকালীন তার মূল্য আমরা সহজে ভুলি না। রেলগাড়ি টেলিফোন মোটর সিনেমা রেডিও প্রভৃতির আশ্চর্যতা এখনও আমাদের মন থেকে লুপ্ত হয় নি। আধুনিক সভ্যতার এইসব ফল ভোগ করছি বলে আমরা ধন্যজ্ঞান করি, যদিও মনের গোপন কোণে একটু দীনতাবোধ থাকে যে উদ্ভাবনের গৌরব আমাদের নয়।

কিন্তু যে আবিষ্কার অত্যন্ত পুরাতন, কিংবা যে বিষয়ের পরিণতি প্রাচীনকালের বহু মানবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে হয়েছে, তার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের বিস্ময় নেই। দীর্ঘকাল ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তার উপকারিতা মোটর সিনেমা রেডিওর চেয়ে লক্ষগুণ বেশী হলেও আমরা তা অকৃতজ্ঞচিত্তে আলো বাতাসের মতই সুলভ জ্ঞান করি। আগুন কৃষি আর বয়নবিদ্যার আবিষ্কার কে করেছিল তা জানবার উপায় নেই। এগুলির উপর আমরা একান্ত নির্ভর করি, কিন্তু এদের অভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা যে অসম্ভব হত তা খেয়াল হয় না। এইসব বিষয়ের চেয়েও যা আশ্চর্য, যার জন্য মানবসভ্যতা ক্রমশ উন্নতিলাভ করেছে, যার প্রভাবে শুধু ঐশ্বর্যবৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি আর চিত্তেরও উৎকর্ষ হয়েছে, যার উপযুক্ত প্রয়োগে হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতি একসত্তায় পরিণত হবে—এমন একটি বিষয়ের উদ্ভাবন পুরাকালে হয়েছিল, এবং তার প্রসার এখনও হচ্ছে। এই অসীম শক্তিশালী পরম সহায়ের নাম 'সাহিত্য'।

Literature শব্দের মৌলিক অর্থ—লিখিত বিষয়। 'সাহিত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ—সহিতের ভাব বা সম্মেলন, যার ফলে বহু মানব একক্রিয়ান্বয়ী বা এক ভাবে ভাবিত হয়। এমন সার্থক আর ব্যাপক নাম বোধ হয় অন্য ভাষায় নেই। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় অঙ্গভঙ্গী ও শব্দভঙ্গী, তার পর এল বাক্য। সুভাষিত বাক্য যখন বলা হল এবং শুনে মনে রাখা হল তখনই সাহিত্যের উৎপত্তি; শ্রুতি আর স্মৃতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য। প্রথম যুগে যখন বাক্যই সম্বল ছিল তখন সাহিত্যের দেবী হলেন বাণী বা বাগ্‌দেবী।

সংগীত আর লেখার উৎপত্তির পর বাগ্‌দেবী বীণাপুস্তকধারিণী হলেন। এখন সাহিত্যের দেবী রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তকে অধিষ্ঠান করে বিশ্বব্যাপিনী হয়েছেন।

প্রথমে যখন লেখার উদ্‌ভাবন হল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অতি স্থূল—নিজের জিনিস চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা, দান-বিক্রয়াদির দলিল করা ইত্যাদি। তারপর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার জন্য অনুশাসনলিপির প্রচলন হল। ক্রমশ লিপির প্রয়োগ আরও ব্যাপক হল, যে সাহিত্য পূর্বে শ্রুতিবদ্ধ ছিল তা লিপিবদ্ধ এবং অবশেষে মুদ্রিত হওয়ায় প্রচারের আর সীমা রইল না।

মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশী লোকে তা শুনতে পায় না, যারা শোনে তারাও চিরদিন মনে রাখতে পারে না। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সকল বিদ্যাই গুরুমুখে শুনে বার বার আবৃত্তি করে স্মৃতিপটে নিবদ্ধ করতে হত। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও স্মরণশক্তির অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা যায়, কিন্তু শ্রুতবিদ্যা কণ্ঠস্থ করা সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। লেখা অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, দরকার হলেই পড়া যেতে পারে। রচয়িতার মৃত্যু হয় কিন্তু তাঁর লেখা বহু শত বৎসর পরেও জীবিত থাকে। লেখা যদি ছাপা হয় তবে তার প্রভাব সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হতে পারে।

আমি একটি উত্তম কাব্য বা গল্প বা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা তথ্যমূলক গ্রন্থ পড়ছি। পড়তে পড়তে লেখকের ভাব, রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি আর জ্ঞান আমাতেও সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক যা অনুভব করেছেন, কল্পনা করেছেন, দেখেছেন, বা জেনেছেন, আমিও তা যথাসাধ্য উপলব্ধি করছি। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাধনযন্ত্র কি? শুধুই কাগজের উপর কালির চিহ্নশ্রেণী। শ্রুতিগ্রাহ্য বাঙ্‌ময় সাহিত্য দৃষ্টিগ্রাহ্য সংকেতময় হয়েছে। মুখের ভাষাও সংকেত, কিন্তু মাতৃভাষা শেখবার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের আছে। শিশুকালে কথা বুঝতে আর বলতে সহজেই শিখেছি, লেশমাত্র আয়াস হয় নি। কিন্তু বাক্যের কৃত্রিম প্রতীক স্বরূপ অক্ষরমালা আয়ত্ত করতে কতই না কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে লেখার অর্থ একবারেই অগ্রাহ্য ছিল, একমাত্র লক্ষ্য এক-একটি চিহ্নের পরিচয় এবং তার নাম। তার পর ধীরে ধীরে চিহ্নপরম্পরা আয়ত্ত হল, পাঠের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন রইল না, লিখিত বাক্যের উচ্চারণ সহজ হল, অবশেষে ক্রমশ অর্থবোধ এল। শিশু রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পাঠ

করে সাহিত্যের যে প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন সকল ভাগ্যবান শিশুই তা একদিন পায়। পাখি যেমন করে তার বাচ্চাকে উড়তে শিখিয়ে আকাশচারী করে, মানুষও সেই রকমে তার সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচারী অর্থাৎ বিদ্যার্জনের যোগ্য করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে সংকেতের কৃত্রিমতা আর লক্ষ্য হয় না, পড়া ও লেখার শক্তি ওঠা-হাঁটার মতই স্বভাবে পরিণত হয়।

এদেশে অসংখ্য হতভাগ্য অক্ষর পরিচয়েরও সুযোগ পায় না, অনেকে কোনও রকমে অক্ষর চেনে কিন্তু অর্থ বোঝে না। সামান্য লেখাপড়া শিখেও যে শক্তিলাভ হয় তার মর্ম আমরা সহজে বুঝি না, ছেলেবেলায় অনেকের সঙ্গা থেকে যা পাওয়া যায় তা তুচ্ছ মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যখন রাঁধবার কাজে বহাল করি তখন সে একটাকা বেশী মাইনে চেয়েছিল, কারণ সে চতুঃশাস্ত্রে পন্ডিত। জানতে চাইলাম কি কি শাস্ত্র। উত্তর দিলে—পড়তে জানি, লিখতে জানি, যোগ দিতে পারি, এ-বি-সি-ডি চিনি। লোকটির শাস্ত্রজ্ঞান যতই অল্প হোক, সে তার নিরক্ষর আত্মীয়স্বজনের তুলনায় শিক্ষিত—এই অসামান্যতার গৌরব সে বুঝেছিল।

স্মরণশক্তি এবং বিচারশক্তির সাহায্যের জন্য মানুষ নানারকম প্রতীক বা সংকেতের উদ্‌ভাবন করেছে। পদার্থবিজ্ঞানী তাঁর আলোচ্য পদার্থের ধর্ম ও সম্বন্ধের প্রতীকস্বরূপ বিবিধ অক্ষর প্রয়োগ করেন। রসায়নী শাখাপ্রশাখাময় ফরমুলার দ্বারা বস্তুর গঠন নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই সব সংকেত অপরিহার্য কিন্তু এদের প্রকাশশক্তি অতি সংকীর্ণ। কোনও বস্তু যখন উপর থেকে নীচে পড়ে তখন তার বেগের ক্রমবৃদ্ধির হার বোঝাবার জন্য g অক্ষরটি চলে। কিন্তু এই অক্ষর দেখলে কোনও বস্তুর পতন আমাদের মনে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয় না। জলের সংকেত H_2O দেখলে তৃষ্ণাহারক পানীয় বা বৃষ্টিধারা বা মহাসাগর কিছুই মনে আসে না। সংগীতের জন্য স্বরলিপি উদ্‌ভাবিত হয়েছে। তা দেখে অভিজ্ঞ জন তাল-মান-লয়ের বিন্যাস বুঝতে পারেন, কিন্তু তাতে গান বাজনা শোনার ফল হয় না। হয়তো খুব অভ্যাস করলে স্বরলিপি পড়েই সংগীতের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত এরকম অভ্যাসের প্রয়োজন কোনও কালে হবে না। সংগীত যতই কাম্য হোক তা এমন আবশ্যক নয় যে শ্রুতিগত সাক্ষাৎ উপলব্ধির অভাবে সংকেতজনিত কল্পনার শরণ নিতে হবে।

সত্যমূলক বা কাল্পনিক কোনও ব্যাপার প্রতিরূপিত করবার যত উপায় আছে তার মধ্যে নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, কারণ তা দেখাও যায় শোনাও যায়। তার পরেই মুখর চলচ্চিত্রের স্থান। শুনতে পাই এখন আর talkie যথেষ্ট নয়, smellie উদ্ভাবিত হচ্ছে, যাতে চিত্রার্পিত ঘটনার আনুষঙ্গিক গন্ধও পাওয়া যাবে। পরে হয়তো tastie আর touchie-র আবিষ্কারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তর্পণ পূর্ণ হবে, ভোজের দৃশ্যে দর্শককে খাওয়ানো এবং দাঙ্গার দৃশ্যে কিঞ্চিৎ প্রহার দেওয়া হবে। কিন্তু অভিনয় বা সিনেমা কোনটিও সহজলভ্য নয়, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সংকেতও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষতুল্য নয়। লিখিত সাহিত্যই একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কোনও আড়ম্বরের দরকার হয় না, নূতন সংকেতও অভ্যাস করতে হয় না।

সাহিত্যের যা বিষয় তা এতই বিচিত্র আর জটিল যে তার প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। কবিবর্ণিত নিসর্গদৃশ্য বা মানবচরিত্র, অথবা ভূগোলবর্ণিত বিভিন্ন দেশ-নদী-পর্বত-সাগরাদি, আমরা ইচ্ছা করলেই দেখতে পারি না। ঐতিহাসিক ঘটনা বা গ্রহনক্ষত্রের রহস্য আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়। মৃত মহাপুরুষদের মুখের কথা শোনবার উপায় নেই। বিজ্ঞান বা দর্শনের সকল তথ্যের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ অনেক বিদ্যা অল্পাধিক পরিমাণে শিখতেই হবে, নতুবা মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে। হিতোপদেশে আছে—

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

—অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্র যার নেই সে অন্ধই। শাস্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা শেখবার এই প্রবল প্রয়োজন থেকেই সংকেতময় লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। যা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য হতে পারে না তা সভ্য মানবের পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে চিরস্থায়ী এবং সকলের অধিগম্য হয়েছে। একজন যা জানে তা সকলে জানুক—সাহিত্যের এই সংকল্প মুদ্রণের আবিষ্কারে পূর্ণতা পেয়েছে।

যে ভাষা অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয় সেই ভাষাও সংকেতের সমষ্টি। এই সংকেত শব্দাত্মক ও বাক্যাত্মক; কিন্তু বিজ্ঞানাদির পরিভাষার

তুল্য স্থির নয়, প্রয়োজন অনুসারে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা। প্রথমটি কেবল আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, আর দুটি থেকে প্রকরণ অনুসারে গৌণ অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের যেমন ত্রিশক্তি, বাক্যের তেমন উপমা রূপক প্রভৃতি বহুবিধ অলংকার। সাহিত্যের বিষয়ভেদে শব্দ ও বাক্যের অভিপ্রায় এবং প্রকাশশক্তি বদলায়। স্থূল বিষয়ের বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল না হলে চলে না, তাতে শব্দের অভিধা বা বাচ্যার্থই আবশ্যক, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা বাধাস্বরূপ। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, কদাচিৎ একটু রূপকও চলতে পারে, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অন্যান্য অলংকার একবারেই অচল। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—এ ভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্তু ভূগোলের নয়।

যন্ত্রাদি বা মানবদেহের গঠন বোঝাবার জন্য যে নকশা আঁকা হয় তা অত্যন্ত সরল, তার প্রত্যেক রেখার মাপ মূলানুযায়ী, তা দেখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান, আকৃতি আর আয়তন সহজেই মোটামুটি বোঝা যায়। যন্ত্রবিদ্যা শারীরবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্য নকশা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা শুধুই একসমতলাশ্রিত মানচিত্র বা diagram, তাতে মূলবস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় না। তার জন্য এমন ছবি চাই যাতে অঙ্গের উচ্চতা নিম্নতা দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়। ছবিতে চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মে রেখা বিকৃত করেন, উচ্চাবচতা বা আলো-ছায়ার ভেদ প্রকাশের জন্য মসীলেপের তারতম্য করেন, ফলে মাপের হানি হয় কিন্তু বস্তুর রূপ ফুটে ওঠে। ঠিক অনুরূপ প্রয়োজনে লেখককে ভাষার সরল পদ্ধতি বর্জন করতে হয়। যেখানে বর্ণনার বিষয় মানবপ্রকৃতি বা হর্ষ বিষাদ অনুরাগ বিরাগ দয়া ভয় বিস্ময় কৌতুক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তি, সেখানে শুধু শব্দের বাচ্যার্থ আর নিরলংকার বৈজ্ঞানিক ভাষায় চলে না। নিপুণ রচয়িতা সে স্থলে ত্রিবিধ শব্দবৃত্তি এবং নানা অলংকার প্রয়োগে ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ও পাঠকের বোধগম্য হয়।

অনেক আধুনিক লেখক নূতনতর সাংকেতিক ভাষায় কবিতা লিখছেন। এই বিদেশাগত রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলছে, অধিকাংশ পাঠক এসব কবিতা বুঝতে পারেন না, অন্তত আমি পারি না। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হত না। চিত্রে

cubism আর sur-realism-এর তুল্য এই সংকেতময় কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রলাপ, না অনাস্বাদিতপূর্ব রসসাহিত্য? বোধ হয় মীমাংসার সময় এখনও আসে নি। নূতন পদ্ধতির লেখকরা বলেন—এককালে রবীন্দ্রকাব্যও সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলাও উপহাস্য ছিল; ভাবী গুণগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে আমরা রাজী আছি। হয়তো এঁদের কথা ঠিক, কারণ নূতন সংকেতে অভ্যস্ত হতে লোকের সময় লাগে। হয়তো এঁদের কথা ভুল, কারণ সংকেতেরও সীমা আছে। নূতন কবিদের কেউ কেউ হয়তো সীমার মধ্যেই আছেন, কেউ বা সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বিতর্ক ভাল, তার ফলে সদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা অথবা অসদ্‌বস্তুর উচ্ছেদ হতে পারে। যাঁরা বিতর্কে যোগ দিতে চান না তাঁদের পক্ষে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা।



বাংলা বানান

(১৩৫১/১৯৪৪)

কয়েক মাস আগে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় বাংলা বানান সম্বন্ধে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর উত্থাপিত এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করছি।

সাত-আট বৎসর পূর্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার-সমিতি তাঁদের প্রস্তাব প্রকাশিত করেন তখন শিক্ষিতজনের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য হয়েছিল। কেউ খুব রাগ দেখিয়েছিলেন, কেউ বলেছিলেন যে সমিতি যথেষ্ট সাহস দেখান নি—সংস্কার আরও বেশী হওয়া উচিত, আবার অনেকে মোটের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—যে সব বানানের মধ্যে ঐক্য নেই সেগুলি যথাসম্ভব নির্ধারিত করা, এবং যদি বাধা না থাকে তবে স্থলবিশেষে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কেবল দুটি নিয়ম করা হয়েছে— রেফের পর দ্বিত্ববর্জন ('কর্ম, কার্য'), এবং ক-বর্গ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে বিকল্পে ং প্রয়োগ ('ভয়ংকর, সংগীত, সংঘ')। এই দুই বিধিই ব্যাকরণসম্মত। অসংস্কৃত (অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী) শব্দের জন্য কতকগুলি বিধি করা হয়েছে, কিন্তু অনেক বানানে হাত দেওয়া হয় নি, কারণ সমিতির মতে পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে হওয়াই বিধেয়। যাঁরা বানান সম্বন্ধে উদাসীন নন তাঁদের অনুরোধ করছি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (৩য় সংস্করণ) একখানা আনিয়ে পড়ে দেখবেন। বানান-সমিতি যেসব বিষয়ে বিধান দেন নি বা বিশেষ কিছু বলেন নি, এই প্রবন্ধে তারই আলোচনা করছি।

সাধুভাষায় বানানের অসাম্য খুব বেশী দেখা যায় না। বহু বৎসর পূর্বে এই ভাষা যে অল্প কয়েক জনের হাতে পরিণতি পেয়েছিল তাঁরা তখনকার শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বাংলা দেশের সব জেলার সাহিত্যসেবী তাঁদের অনুকরণ করে চলতেন, সেজন্য সাধু ভাষার বানান মোটের উপর সুনির্দিষ্ট হতে পেরেছে। চলিত ভাষার প্রচলন যখন আরম্ভ হল তখন এদেশে

সাহিত্যচর্চা এবং লেখকদের আত্মনির্ভরতা বেড়ে গেছে। বহু লেখক চলিতভাষার প্রকাশশক্তি দেখে আকৃষ্ট হলেন, কিন্তু লেখার উৎসাহে তাঁরা নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য যত্ন নিলেন না, মনে করলেন—এ আর এমন কি শক্ত। এই ভাষায় ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ভিন্ন প্রকার, অন্য কতকগুলি শব্দেও কিছু প্রভেদ আছে, এবং এই সমস্ত শব্দের বানান পূর্বনির্ধারিত নয়। পাঠ্যপুস্তকেও চলিতভাষা শেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এই কারণে চলিতভাষায় বানানের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

চলিতভাষা এবং কলকাতা বা পশ্চিমবাংলার মৌখিক ভাষা সমান নয়, যদিও দু-এর মধ্যে কতকটা মিল আছে। লোকে লেখবার সময় যত সতর্ক হয় কথা বলবার সময় তত হয় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি যাঁর কথা আর লেখার ভাষা সমান। লেখার ভাষা, বিশেষত সাহিত্যের ভাষা, কোনও জেলার মধ্যে আবদ্ধ হলে চলে না, তার উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান। এজন্য চলিতভাষাকে সাধুভাষার তুল্যই নিরূপিত বা standardized হতে হবে। মুখের ভাষা যে অঞ্চলেরই হোক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লেখার বা সাহিত্যের ভাষা পড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। সাহিত্যের ভাষা সর্বজনীন, তার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলের সমান না হলেও ক্ষতি হয় না। চলিতভাষা সাহিত্যের ভাষা, সুতরাং তার বানান অবহেলার বিষয় নয়।

অনেকে বলেন, উচ্চারণের অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত। হলে ভাল হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যত তা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। কার উচ্চারণের বশে বানান হবে? জেলায় জেলায় প্রভেদ, অনেক শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গী 'মিচে কতা' (মিছে কথা) বলেন, অনেক পূর্ববঙ্গী 'তারাতারি' (তাড়াতাড়ি) বলেন, কিন্তু লেখবার সময় সকলেই প্রামাণিক বানান অনুসরণের চেষ্টা করেন। দৈবক্রমে কলকাতা বাংলা দেশের রাজধানী এবং বহু সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র। এই কারণে কলকাতার মৌখিক ভাষা একটা মর্যাদা পেয়েছে এবং তার উপাদান ব্যক্তি বা দলবিশেষ থেকে আসে নি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গড় (average) উচ্চারণ থেকেই এসেছে। যে অল্পসংখ্যক লেখকদের চেষ্টায় চলিতভাষার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি, তাঁদের প্রভাব অবশ্য কিছু বেশী। আদি লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভাবও নগণ্য

নয়। তা ছাড়া সাধুভাষার অসংখ্য শব্দ তাদের পূর্বনিরূপিত বানান সমেত এসেছে। চলিতভাষা একটা synthetic ভাষা এবং কতকটা কৃত্রিম। এই কারণে তার বানান সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু উচ্চারণ পাঠকদের অভ্যাস এবং রুচির উপর ছেড়ে দিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাধুভাষায় লেখা হয় 'করিতেছে, বসিবে', পড়া হয় 'কোরিতেছে, বোসিবে'। চলিতভাষায় অতিরিক্ত ও-কার, যুক্তাক্ষর এবং হস্-চিহ্ন দিয়ে 'কোর্চ্ছে, বোস্‌বে' ইত্যাদি লেখবার কোনও দরকার দেখি না, 'করছে, বসবে' লিখলেই কাজ চলে। সুপ্রচলিত শব্দের বানানে অনর্থক অক্ষরবৃদ্ধি করলে জটিলতা বাড়ে, সুবিধা কিছুই হয় না। শিক্ষার্থীকে অন্যের মুখে শুনেই উচ্চারণ শিখতে হবে। অবশ্য নবাগত বিদেশী শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত।

বাংলায় শব্দের শেষে যদি অযুক্তাক্ষর থাকে এবং তাতে স্বরচিহ্ন না থাকে, তবে সাধারণত হসন্তবৎ উচ্চারণ হয়। শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরেও প্রায় এই রকম হয়। আমরা লিখি 'চটকল, আমদানি, খোশমেজাজ', হস্‌চিহ্নের অভাবে উচ্চারণ আটকায় না। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, খুব বেশী নয়। উচ্চারণের এই সাধারণ রীতি অনুসারে অধিকাংশ শব্দে হস্‌চিহ্ন না দিলেও কিছুমাত্র বাধা হয় না। অনেকের লেখায় দেখা যায়—'কুচ্‌কাওয়াজ, টি-পট্‌, সুট্‌কেস্‌'। এই রকম হস্‌চিহ্নের বাহুল্যে লেখা আর ছাপা কণ্টকিত করায় কোনও লাভ নেই। যদি ভবিষ্যতে বাংলা অক্ষর সরল করবার জন্য যুক্তব্যঞ্জন তুলে দেওয়া হয়, তখন অবশ্য হস্‌চিহ্নের বহুপ্রয়োগ দরকার হবে।

আজকাল ও-কারের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে সাধুভাষাতেও 'কোরিলো' লিখছেন। এতে বিদেশী পাঠকের কিছু সাহায্য হতে পারে, কিন্তু বাঙালীর জন্য এরকম বানান একেবারে অনাবশ্যক। আমরা ছেলেবেলায় যে রকমে শিখি—বর্গীয় জ-এ ইঁও গ-গঁ, 'শীত'-এর উচ্চারণ হসন্ত কিন্তু 'ভীত' অকারান্ত, 'অভিধেয়' আর 'অবিধেয়' শব্দের প্রথমটির অ ও-তুল্য কিন্তু দ্বিতীয়টির নয়, সেই রকমেই শিখব—'করিল' আর 'কপিল'-এর বানান একজাতীয় হলেও উচ্চারণ আলাদা। যাঁরা পদ্যে অক্ষর সংখ্যা সমান রাখতে চান, তাঁদের 'আজো, আরো' প্রভৃতি বানান দরকার হতে পারে, কিন্তু

সাধারণ প্রয়োগে 'আজও, আরও' হবে না কেন? ও-কারের চিহ্ন লিখতে যে সময় আর জায়গা লাগে, আস্ত 'ও' লিখতে তার চেয়ে বেশী লাগে না। আমরা লিখি—'সেদিনও বেঁচে ছিল, ভূতপ্রেতও মানে না, অতও ভাল নয়, দুধও খায় তামাকও খায়'। 'ও' প্রত্যয় নয়, একটি অব্যয়শব্দ, মানে—অপি, অধিকন্তু, also, even। অব্যয় শব্দের নিজের রূপ নষ্ট করা অনুচিত। ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা নেই, আমরা 'তামা-কও' পড়ি না, 'তামাক্-ও' পড়ি; সেই রকম লিখব 'আজই, আজও', পড়ব 'আজ্-ই, আজ্-ও'। সর্বত্র সংগতিরক্ষা আবশ্যক।

'কারুর' শব্দটি আজকাল খুব দেখা যাচ্ছে। এটিকে slang মনে করি। সাধু 'কাহারও' থেকে চলিত 'কারও', কথার টানে তা 'কারু' হতে পারে। কিন্তু আবার একটা র যোগ হবে কেন?

য় অক্ষরটির দু-রকম প্রয়োগ হয়। 'হয়, দয়া' প্রভৃতি শব্দের y-তুল্য আদিম উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু 'হালুয়া, খাওয়া' প্রভৃতি শব্দে য় স্বরচিহ্নের বাহনমাত্র, তার নিজের উচ্চারণ নেই, আমরা বলি 'হালুআ, খাওআ'। 'খাওয়া, যাওয়া, ওয়ালা' প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দের বর্তমান বানান আমাদের এতই অভ্যস্ত যে বদলাবার সম্ভাবনা দেখি না, যদিও যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি আ দিয়ে লেখেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও অনেক ক্ষেত্রে লিখতেন, এবং প্রাচীন বাংলা লেখাতেও য়া স্থানে আ চলত। কিন্তু নবাগত বিদেশী শব্দের বানান এখনও স্থিরতা পায় নি, সেজন্য সতর্ক হবার সময় আছে। Wavell, Boer, swan, drawer প্রভৃতি শব্দ বাংলায় 'ওআভেল, বোআর, সোআন, ড্রআর' লিখলে য়-এর অপপ্রয়োগ হয় না। War এবং ware দুই-এরই বানান 'ওয়ার' করা অনুচিত, প্রথমটি 'ওঅর', দ্বিতীয়টি 'ওয়ার'। 'মেয়র, চেয়ার, সোয়েটার' লিখলে দোষ হয় না কারণ য় য়া য়ে স্থানে অ আ এ লিখলেও উচ্চারণ প্রায় সমান থাকে।

'ভাই-এর, বউ-এর, বোম্বাই-এ' প্রভৃতিতে য়ে স্থানে এ লিখলে উচ্চারণ বদলায় না, কিন্তু লেখা আর বানান সহজ হয়, ব্যাকরণেও নিষেধ নেই। কেউ কেউ বলেন, দুটো স্বরবর্ণ পর পর উচ্চারণ করতে glide দরকার সে জন্য য় চাই। এ যুক্তি মানি না। 'অতএব' উচ্চারণ করতে তো বাধে না, য় না থাকলেও glide হয়।

সংস্কৃত শব্দে অনুস্বার অথবা অনুনাসিক বর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তজ্জাত

বাংলা শব্দে প্রায় চন্দ্রবিন্দু আসে, যেমন 'হংস পঙ্ক পঞ্চ কণ্টক চন্দ্র চম্পা' থেকে 'হাঁস পাঁক পাঁচ কাঁটা চাঁদ চাঁপা'। কয়েকটি শব্দে অকারণে চন্দ্রবিন্দু হয়, যেমন 'পেচক, চোচ' থেকে 'পেঁচা, চোঁচ'। তা ছাড়া অনেক অজ্ঞাতমূল শব্দেও চন্দ্রবিন্দু আছে, যেমন 'কাঁচা গোঁজা ঝাঁটা'। পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য দেখা যায়। অনেকে 'একঘেঁয়ে, পায়ে ফোঁড়া, থান ইঁট' লেখেন, যদিও চন্দ্রবিন্দুহীন বানানই বেশী চলে। 'কাঁচ, হাঁসি, হাঁসপাতাল' অনেকে বলেন, কিন্তু লেখবার সময় প্রায় চন্দ্রবিন্দু দেন না। পূর্ববঙ্গী অনুনাসিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নন, সেজন্য বানানের সময় মুশকিলে পড়েন, যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দু দেন না, আবার অস্থানে দিয়ে ফেলেন। সন্দেহ হলে অভিধান দেখে মীমাংসা হতে পারে কিন্তু যদি পূর্বসংস্কার দৃঢ় থাকে তবে সন্দেহই হবে না, ফলে বানান ভুল হবে। আর এক বাধা—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত লোকও সকল ক্ষেত্রে একমত নন। যদি বিভিন্ন জেলার কয়েক জন বিদ্বান ব্যক্তি একত্র হয়ে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা রফা করেন এবং সংশয়জনক সমস্ত শব্দের বানান দিয়ে একটি তালিকা তৈরী করেন তবে তার বশে সহজেই বানান নিরূপিত হবে।

চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে যা বলা হল, ড় সম্বন্ধেও তা খাটে। পূর্ববঙ্গে ড় আর র প্রায় অভিন্ন, সেজন্য লেখার বিপর্যয় ঘটে। পশ্চিমবঙ্গেও অনেক শব্দে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রেও তালিকার প্রয়োজন।

মোট কথা—(১) অসংস্কৃত শব্দের বানান সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত-জনের উচ্চারণের বশে করতে হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার প্রয়োজন আছে। অন্ধভাবে জনকতকের বানানকেই প্রামাণিক গণ্য করলে অন্যায় হবে। (২) বানানে অতিরিক্ত অক্ষরযোগ অনর্থকর, তাতে জটিলতা আর বিশৃঙ্খলা বাড়ে। (৩) সর্বত্র উচ্চারণের নকল করবার দরকার নেই, পাঠক প্রকরণ (context) থেকেই উচ্চারণ বুঝবে। (৪) সাধুভাষার বানান আপনিই কালক্রমে অনেকটা সংযত হয়েছে, কিন্তু মৌখিকের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় চলতি ভাষায় সহজে তা হবে না—যদি না লেখকেরা উদ্‌যোগী হয়ে সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন।

❑

বাংলা ছন্দের শ্রেণী

(১৩৫২/১৯৪৫)

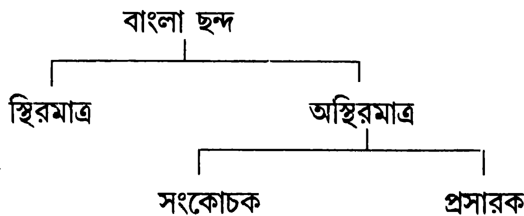
'পরিচয়'-এর শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় জানতে চেয়েছেন ছন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। বিষয়টি বৃহৎ, ছন্দের সমগ্র তথ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি, সেজন্য সবিস্তার আলোচনা আমার সাধ্য নয়। বৎসরাধিক পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছন্দের শ্রেণী সম্বন্ধে পত্রযোগে কিছু আলাপ হয়েছিল। তাঁকে আমার মতামত যা জানিয়েছিলাম তাই এই প্রবন্ধের ভিত্তি।

ছন্দের মূল উপাদান মাত্রা, এবং তার বাহন syllable। সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দে syllable ও হরফ দুইই বোঝায়, তা ছাড়া ইংরেজী আর সংস্কৃতের syllable একই রীতিতে নিরূপিত হয় না। এই গোলযোগের জন্য syllable-এর অন্য প্রতিশব্দ দরকার। প্রবোধবাবু 'ধ্বনি' চালিয়েছেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে কিছু আপত্তি করবার আছে। Word যদি 'শব্দ' হয়, syllable যদি 'ধ্বনি' হয়, তবে sound বোঝাতে কি লিখব? ব্যাকরণে vowel sound, gutteral sound ইত্যাদির প্রতিশব্দ দরকার হয়। নূতন পরিভাষা স্থির করবার সময় যথাসম্ভব দ্ব্যর্থ পরিহার বাঞ্ছনীয়। বহুকাল পূর্বে কোনও প্রবন্ধে syllable-এর প্রতিশব্দ 'শব্দাঙ্গ' দেখেছিলাম। এই সংজ্ঞায় দ্ব্যর্থের আশঙ্কা নেই, কিন্তু শ্রুতিকটু। সেজন্য এখন প্রবোধবাবুর 'ধ্বনি'ই মেনে নিচ্ছি। আশা করি পরে আরও ভাল সংজ্ঞা উদ্‌ভাবিত হবে।

ধ্বনি দুই প্রকার, মুক্ত (open) ও বদ্ধ (closed)। মুক্তধ্বনির শেষে স্বরবর্ণ থাকে, তা টেনে দীর্ঘ করা যেতে পারে, যেমন তু। বদ্ধধ্বনির শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ বা ং ঃ বা দ্বিস্বর (diphthong) থাকে, তা টানা যায় না, যেমন উৎ, সং, তঃ, কই, সৌ। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্ত ধ্বনি এবং বদ্ধধ্বনি গুরু বা দুই মাত্রা গণ্য হয় (ধী, উৎ), এবং হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তধ্বনি লঘু বা এক মাত্রা গণ্য হয় (ধি, তু)। ইংরেজীতে সংস্কৃতের তুল্য সুনির্দিষ্ট দীর্ঘ স্বর নেই, কিন্তু বহু শব্দে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য গুরুধ্বনি হয় (fee)। বদ্ধধ্বনিতে যদি

accent পড়ে তবেই গুরু, নতুবা লঘু। বাংলা ছন্দের যে সুপ্রচলিত তিন শ্রেণী আছে তাদের মাত্রানির্ণয় এক নিয়মে হয় না। ধ্বনির লঘুগুরুতার মূলে কোনও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, তা প্রচল বা convention মাত্র, এবং ভাষা ভেদে বিভিন্ন।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীভাগ এই রকম করা যেতে পারে—



'স্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলায় না, যেমন বাংলা মাত্রাবৃত্ত। এতে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে, অক্ষরছন্দ (বা বৃত্ত) এবং মাত্রাছন্দ (বা জাতি)। এই দুই শ্রেণীই স্থিরমাত্র। সংস্কৃত মাত্রাছন্দের সঙ্গে বাংলা মাত্রাবৃত্তের সাদৃশ্য আছে; প্রভেদ এই, যে বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণভেদ নেই। ইংরেজী ছন্দকেও স্থিরমাত্র বলা যেতে পারে, কারণ তাতে accent-এর স্থান সাধারণত সুনির্দিষ্ট। সংস্কৃত অক্ষরছন্দের সঙ্গে ইংরেজী ছন্দের এইটুকু মিল আছে—ইন্দ্রবজ্রা মন্দাক্রান্তা প্রভৃতিতে যেমন লঘু গুরু ধ্বনির অনুক্রম সুনিয়ন্ত্রিত, ইংরেজী iambus, trochee প্রভৃতিতেও সেইরূপ।

'অস্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলাতে পারে। এর দুই শাখা ঃ

(ক) 'সংকোচক'—যে ছন্দে স্থানবিশেষে বদ্ধধ্বনির মাত্রা সংকোচ হয়, অর্থাৎ গুরু না হয়ে লঘু হয়, যেমন বাংলা অক্ষরবৃত্তে। মোটামুটি বলা যেতে পারে, এই শ্রেণীর ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি শব্দের অন্তে গুরু কিন্তু আদিতে ও মধ্যে সাধারণত লঘু। 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত'—এখানে— -রাজ -মার -গীত গুরু কিন্তু নিস- তব- অভ- সং- লঘু। উক্ত নিয়মটি সম্পূর্ণ নয়, ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়। 'বীরবর, ভারতমাতা' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দে এবং 'জামরুল, মুসলমান' প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দে আদ্য ও মধ্য বদ্ধধ্বনির সংকোচ হয় না, গুরুই থাকে। এই

ব্যতিক্রমের কারণ—যুক্তাক্ষরের অভাব। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

(খ) 'প্রসারক'—যে ছন্দে বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু; আবার স্থানবিশেষে মাত্রা প্রসারিত করে মুক্তধ্বনিকেও গুরু করা হয়। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'—এখানে মাত্রাবৃত্তের তুল্য সকল বদ্ধধ্বনিই গুরু, অধিকন্তু 'পড়ে' আর 'এল'-র শেষ ধ্বনিকেও টেনে গুরু করা হয়েছে।

সংক্ষেপে—স্থিরমাত্র (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংকোচক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, কিন্তু বদ্ধধ্বনি কোথাও গুরু কোথাও লঘু। প্রসারক (ছড়া-জাতীয়) ছন্দে মুক্তধ্বনি কোথাও লঘু কোথাও গুরু, এবং বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু।

এই ত্রিবিধ ছন্দশ্রেণীর মধ্যে মাত্রাবৃত্তের নিয়ম সর্বাপেক্ষা সরল, সেইজন্য তার আর আলোচনা করব না। অন্য দুই শ্রেণীর সম্বন্ধে কিছু বলছি।

'অক্ষরবৃত্ত' নামটি সুপ্রচলিত, শুনেছি প্রবোধবাবু এই নামের প্রবর্তক, কিন্তু সম্প্রতি তিনি অন্য নাম দিয়েছেন—'যৌগিক ছন্দ'। মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে একেই আমি 'সংকোচক ছন্দ' বলছি। 'অক্ষরবৃত্ত' নামের অর্থ বোধ হয় এই—এতে চরণের অক্ষর অর্থাৎ হরফের সংখ্যা প্রায় সুনিয়ত, যেমন পয়ারের প্রতি চরণে চোদ্দ অক্ষর, মাত্রাসমষ্টিও চোদ্দ। এই অক্ষরের হিসাবটি কৃত্রিম। ছন্দ কানের ব্যাপার, মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দে পদ্যের লেখ্য রূপ অর্থাৎ বানান বা অক্ষরসংখ্যার উপর নজর রাখা হয় না, মাত্রাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু পদ্যকার যখন সংকোচক ছন্দ রচনা করেন তখন শ্রাব্য রূপ আর লেখ্য রূপকে পরস্পরের অনুবর্তী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শব্দ ও অর্থ সমান হলেও 'ঐ' এক অক্ষর, 'ওই' দুই অক্ষর, পদ্যকার সংখ্যার উপর দৃষ্টি রেখে 'ঐ' বা 'ওই' লেখেন। উচ্চারণ একজাতীয় হলেও স্থলবিশেষে শব্দের বানান অনুসারে মাত্রা বদলায় অথবা মাত্রার প্রয়োজনে বানান বদলায়। মাত্রাবৃত্তে 'শর্করা' আর 'হরকরা' দুইই চার মাত্রা, কিন্তু সংকোচক ছন্দে প্রথমটি তিন এবং দ্বিতীয়টি চার মাত্রা। 'সর্দার, বাগ্দেবী' তিন অক্ষর, কিন্তু মাত্রার প্রয়োজনে 'সরদার, বাগ্‌দেবী' লিখে চার অক্ষর করা হয়। যাঁরা গদ্যে, 'আজও, আমারই' লেখেন তাঁরাও পদ্যে, 'আজো, আমারি' বানান করেন, পাছে অক্ষর বাড়ে। পদ্যকার ও পদ্যপাঠক দুজনেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুক্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি রেখে মাত্রা নির্ণয় করেন। এরকম

করবার প্রয়োজন আছে এমন নয়। যদি বানান না বদলে 'সরদার'কে স্থানভেদে চার মাত্রা বা তিন মাত্রা করবার রীতি থাকত তবে পাঠকের বিশেষ বাধা হত এমন মনে হয় না। কিন্তু যে কারণেই হোক রীতি অন্যবিধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণ লিখেছেন—'দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।' তিনি প্রচলিত রীতির বশেই অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য 'দিগ্‌দিগন্তে' লিখেছেন, মাত্রাবৃত্ত লিখলে সম্ভবত 'দিগ্‌দিগন্তে' বানান করতেন।

অতএব কানের উপর নির্ভর করে অক্ষরবৃত্তের সম্পূর্ণ নিয়ম রচনা করা চলে না, বানান অনুসারেও (অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ং ঃ ইত্যাদির অবস্থান অনুসারেও) করতে হবে। সেকালের কবিরা অক্ষর সংখ্যার উপর বিশেষ নজর রাখতেন না—'সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ॥' (*চৈতন্যচরিতামৃত*)। এরকম পদ্য এখন লিখলে doggerel গণ্য হবে। বোধ হয় ভারতচন্দ্রের আমল থেকে মাত্রাসংখ্যা আর অক্ষরসংখ্যার সাম্য সম্বন্ধে পদ্যকারগণ সতর্ক হয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা সংস্কৃত অক্ষরছন্দের আদর্শে এই সাম্যরক্ষার চেষ্টা করেছেন। হয়তো আর এক কারণ—পাঠককে কিছু সাহায্য করা। ইংরেজী পদ্যেও syllable-সংখ্যা ঠিক রাখার জন্যে miss'd lack'd প্রভৃতি বানান চলে, যদিও কানে missed আর miss'd দুইই সমান।

যদি বাংলায় যুক্তাক্ষর উঠে যায় বা রোমান লিপি চলে, তা হলেও সম্ভবত বর্তমান রীতি অন্য উপায়ে বজায় রাখবার চেষ্টা হবে, 'সরদার' লেখা হবে sardar, কিন্তু মাত্রাসংকোচ বোঝাবার জন্য হয়তো 'সর্দার' স্থানে লেখা হবে sa'dar।

প্রবোধবাবু ছড়া-জাতীয় ছন্দের নাম দিয়েছিলেন 'স্বরবৃত্ত', এখন তিনি তাকে 'লৌকিক ছন্দ' বলেন। শেষের নামটি ভাল তথাপি মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে আমি এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই। প্রবোধবাবুর মতে, 'এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চার পর্ব (চতুর্থটি অপূর্ণ), প্রতি পর্বে চার ধ্বনি, এবং প্রথম ধ্বনিতে প্রস্বর (accent) থাকে।' শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর ব্যাকরণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ—'সাম্‌নেকে তুই ভয় করেছিস পেছন তোরে ঘিরবে'। আমি মনে

করি বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে' ইত্যাদি চরণে প্রথম ধ্বনি 'আ', পাঠকালে তাতে accent পড়ে না। 'কাশ'-এ accent আছে বলা যেতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা গুরুধ্বনি। 'প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে...কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে'—এই দুই চরণের প্রথম ধ্বনি (প্রি-, কা-)তে accent দেওয়া যায় না। প্রতি পর্বে সাধারণত চার ধ্বনি তা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যতিক্রমও হয় ('শিখিয়ে দিত, তিন কন্যে')। এই রকম ছড়াজাতীয় বা লৌকিক ছন্দের একটি লক্ষণ—শেষ পর্ব ছাড়া প্রতি পর্বে ছ মাত্রা, কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছ মাত্রা হতে পারে। অতএব এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণ আর কিছু। এই লক্ষণ—মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে মুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন—'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে'। 'বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি ছড়ায় 'বৃষ্টি' তিন মাত্রা, শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে'ও তিন মাত্রা হয়েছে। এইরকম মাত্রাপ্রসার হয় বলেই এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই।

পদ্যকার বানানের উপর দৃষ্টি রেখে সংকোচক ছন্দ রচনা করেন, হয়তো তার এক কারণ পাঠককে সাহায্য করা—এ কথা পূর্বে বলেছি। প্রসারক শ্রেণীর লৌকিক ছন্দেও স্থানে স্থানে ধ্বনির মাত্রা বদলায়, কিন্তু চিহ্নাদির দ্বারা পাঠককে সাহায্য করবার চেষ্টা হয় নি। এর কারণ—সেকালে এই ছন্দ পণ্ডিত জনের অস্পৃশ্য ছিল, লিখে রাখাও হত না, লোকে অতি সহজে মুখে মুখেই শিখত।



রবীন্দ্র পরিবেশ

(১৩৫৫/১৯৪৮)

আমাদের জীবনযাত্রায় নানারকম বস্তু দরকার হয়, কিন্তু শুধু দরকার বুঝেই আমরা তাদের মর্যাদা দিই না। যেসব বস্তু আমরা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করি তাদের উদ্‌ভাবক বা নির্মাতা মহাপ্রতিভাশালী হলেও আমাদের কাছে নিতান্ত পরোক্ষ, তাঁরা একেবারেই আড়ালে থাকেন, ভোগের সময় তাঁদের কথা ভাবি না। রেলগাড়ি না হলে আমাদের চলে না, কিন্তু গাড়িতে চড়ে তার প্রবর্তক স্টিভেনসনকে কজন স্মরণ করে? কালক্রমে বহু যন্ত্রী রেলগাড়ির বহু পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু এমন আপত্তি শোনা যায় নি যে তাতে স্টিভেনসনের মর্যাদাহানি হয়েছে। পক্ষান্তরে যে বস্তু স্থূল সাংসারিক ব্যাপারে অনাবশ্যক, কিন্তু আনন্দ দেয় বা রসোৎপাদন করে, তার রচয়িতা রচনার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রচয়িতাকেও স্মরণ করি, রচনা থেকে রচয়িতার তিলমাত্র বিচ্ছেদ সইতে পারি না। যন্ত্রের অদলবদল নির্বিবাদে হতে পারে, কারণ যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের কেবল স্থূল স্বার্থের সম্বন্ধ। কিন্তু কবি বা চিত্রকরের রচনার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ, তাই এমন স্পর্ধা কারও নেই যে তাঁদের উপর কলম চালান।

রসসৃষ্টি ও রসস্রষ্টার এই যে অঙ্গাঙ্গিভাব, এরও ইতরবিশেষ আছে। রচয়িতার পরিচয় আমরা যত বেশী জানি ততই রচনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্বন্ধ উপলব্ধি করি। যাঁরা বেদ বাইবেল রচনা করেছেন তাঁরা অতিদূরস্থ নক্ষত্রতুল্য অস্পষ্ট, তাঁদের পরিচয় শুধুই বিভিন্ন ঋষি আর প্রফেটের নাম। বেদ বাইবেল অপৌরুষেয় কারণ রচয়িতারা অজ্ঞাতপ্রায়। বাল্মীকি কালিদাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিংবদন্তী আছে বলেই পাঠকালে আমরা তাঁদের স্মরণ করি। শেকস্পীয়ার সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাই সম্বল করে পাঠক তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যদিও তিনিই তন্নামে খ্যাত নাটকাদির লেখক কিনা সে বিতর্ক এখনও থামে নি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্বন্ধে লোকের যতটুকু জ্ঞান ছিল সম্প্রতি তাঁর নোটবুক আবিষ্কৃত হওয়ায় তা অনেক বেড়ে গেছে, এখন

তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব বহুমুখী প্রতিভার ইতিহাস জড়িত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা যত এবং যেভাবে জানি, আর কোনও রচয়িতার পরিচয় কোনও দেশের লোক তেমন করে জানে কিনা সন্দেহ। আমাদের এই পরিচয় কেবল তাঁর সাহিত্যে সংগীতে চিত্রে ও শিক্ষায়তনে আবদ্ধ নয়, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি ধর্ম কর্ম অনুরাগ বিরাগ সমস্তই আমরা জানি এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়রাও জানবে। এই সর্বাঙ্গীণ সপ্রেম পরিচয়ের ফলে তাঁর রচনা আর ব্যক্তিত্বের যে সংশ্লেষ ঘটেছে তা জগতে দুর্লভ।

ইওরোপ আমেরিকায় এমন লেখক অনেক আছেন যাঁদের গ্রন্থবিক্রয়সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের রচনা যে মাত্রায় জনপ্রিয় তাঁরা স্বয়ং সে মাত্রায় জনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পান নি। বাইরনের অগণিত ভক্ত ছিল, তাঁর বেশভূষার অনুকরণও খুব হত, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে প্রীতিলাভ হয় নি। বার্নাড শ বই লিখে প্রচুর অর্থ ও অসাধারণ খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি অশেষ কৌতূহলের পাত্র হয়েছেন, লোকে তাঁর নামে সত্য মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে; কিন্তু তিনি জনবল্লভ হতে পারেন নি।

এদেশে একাধিক ধর্মনেতা ও গণনেতা যশ ও প্রীতি এক সঙ্গেই অর্জন করেছেন, যেমন চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু নেতা না হয়েও যে লোকচিত্তে দেবতার আসন পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্ভব হয়েছে। কেবল রচনার প্রতিভা বা কর্মসাধনার দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হয় নি, লোকোত্তর প্রতিভার সঙ্গে মহানুভবতা ও কান্তগুণ মিশে তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়াসনে বসিয়েছে। এদেশে যা তিনি পেয়েছেন তা শুধু সম্মান নয়, যথার্থই পূজা।

গুরু বললে আমরা সাধারণত যা বুঝি—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষাদাতা—তার জন্য যে বাহ্য ও আন্তর লক্ষণ আবশ্যক তা সমস্তই তাঁর প্রভূত মাত্রায় ছিল। কিন্তু যিনি লিখেছেন—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার'—তাঁর পক্ষে সামান্য গুরু হওয়া অসম্ভব। যে অগুহ্য মন্ত্র তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন তার সাধনা যোগাসনে জপ করলে হয় না, ভক্তিতে বিহ্বল হলেও হয় না। তার জন্য যে জ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্ম আবশ্যক তা তিনি নিজের আচরণে দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি অগণিত ভক্তের প্রশস্ত অর্থে গুরুদেব। তাঁর

লোকচিত্তজয়ের ইতিহাস অলিখিত, কিন্তু অজ্ঞাত নয়। কৃতী গুণীকে তিনি উৎসাহদানে কৃতীতর করেছেন, ভীরু নির্বাক অনুরাগীকে সাদরে ডেকে এনে অভয়দানে মুখর করেছেন, ভক্ত প্রাকৃত জনকে বোধগম্য সরস আলাপে কৃতার্থ করেছেন। মূঢ় অসূয়ক তাঁর সৌজন্যে পদানত হয়েছে, ক্রূর নিন্দক তাঁর নীরব উপেক্ষায় অবলুপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধ চৈতন্যাদিতে কালক্রমে দেবত্বারোপ হয়েছে। কালিদাস শুধুই কবি, তথাপি নিস্তার পান নি, কিংবদন্তী তাঁকে বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বানিয়েছে। রবীন্দ্রচরিতের এরকম পরিণাম হবে এমন আশঙ্কা করি না। সর্ববিধ অতিকথার বিরুদ্ধে তিনি যা লিখে গেছেন তাই তাঁকে অমানবতা থেকে রক্ষা করবে।

রবীন্দ্ররচনা অতি বিশাল, রবীন্দ্রবিষয়ে যে সাহিত্য লিখিত হয়েছে তাও অল্প নয়, কালক্রমে তা আরও বাড়বে। কবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে তাঁদের অনেকে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর বাঁচবেন এবং তাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রতত্ত্ব বিবর্ধিত হবে। তা ছাড়া কবির বহু সহস্র পত্র, অসংখ্য প্রতিকৃতি, স্বরচিত অনেক চিত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে, তাঁর গানে দেশ প্লাবিত হয়েছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও যন্ত্রধৃত হয়ে স্থায়িত্ব পেয়েছে। এই সমস্তের সমবায়ে এবং তাঁর স্বরচিত ভারতীক্ষেত্রে যে বিপুল রবীন্দ্র-পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে রবীন্দ্রাত্মার নিবিড় সংযোগ অক্ষয় করে রাখবে। তিনি মহা অজানায় প্রস্থান করলেও আমাদের কাছে চিরকাল জীবিতবৎ প্রত্যক্ষ থাকবেন। এমন অমরত্বলাভ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে।

❑

শেক্‌স্পীয়ারের নাটক পড়িয়া
পাঠক বলিল— ধন্য ধন্য।
পণ্ডিত কহে— সবুর করহ,
শোধন করিব ত্রুটি অগণ্য।
যষ্টি তুলিয়া বলে সুধীজন —
কি আস্পর্ধা-ওরে জঘন্য॥

স্টিভেনসনের রেলগাড়ি চড়ে
যাত্রী বলিল— কি আশ্চর্য!
মিস্ত্রী বলিল— আছে ঢের দোষ,
সারিব সে সব, ধরহ ধৈর্য।
ধনী জন কহে— লেগে যাও দাদা,
যত টাকা লাগে দিতেছি কর্জ॥

পরশুরাম (১৯৪৫)

বিচিন্তা

এই প্রবন্ধগুলি গত সাত বৎসরে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। গল্প নয়, 'রম্যরচনা'ও নয়, সাধারণের ভাল লাগবে কিনা জানি না। কিন্তু বাঙালী পাঠকের রুচি আজকাল প্রসারিত হয়েছে, অন্তত জনকয়েকের চিন্তার খোরাক যোগাবে এই আশায় প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

ফাল্‌গুন, ১৩৬২।

—রাজশেখর বসু।

ইহকাল পরকাল

(১৩৫৫/১৯৪৮)

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—অন্ধকার ঘরে একজন অন্ধ একটি কালো বেরালকে ধরবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বেরাল সে ঘরেই নেই; একেই বলে দার্শনিক গবেষণা।*

দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাঁধাধরা নয়, তাই এই উপহাস। বৈজ্ঞানিক মত প্রায় সর্বসম্মত। কোনও এক মতে যদি মোটামুটি কাজ চলে তবে সকল বিজ্ঞানীই তা মেনে নেন, এবং পরে যদি আরও ব্যাপক ও যুক্তিসম্মত নূতন মত আবিষ্কৃত হয় তবে বিনা দ্বিধায় পূর্বের ধারণা ছেড়ে দিয়ে নূতন মতের অনুবর্তী হন। পূর্বে লোকে মনে করত যে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধারণা অনুসারেও গ্রহণ প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষিক ব্যাপারের গণনা করা যেত, সেজন্য সেকালের বিজ্ঞানীরা তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন বুঝেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তে অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অবশেষে দেখা গেল যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহই তাকে বেষ্টন করে ঘোরে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জ্যোতিষগণনা সরল হয় এবং সমস্ত অসংগতির অবসান হয়। তখন সকল বিজ্ঞানীই নূতন মত মেনে নিলেন। নিউটনের মহাকর্ষবাদ এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু আইনস্টাইনের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসম্মত মনে হওয়ায় সকল বিজ্ঞানীই এখন তা মেনে নিয়েছেন, যদিও সব রকম স্থূল গণনায় নিউটনের সূত্রেই কাজ চলে।

দার্শনিক তত্ত্বে এরকম সর্বসম্মতি দেখা যায় না। বিজ্ঞানশিক্ষার্থী তাঁর পাঠ্যপুস্তকে যেসব তথ্যের বর্ণনা পান তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তথ্যের যাঁরা আবিষ্কর্তা বা মতের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের নাম পুস্তকে থাকে বটে, কিন্তু তা নিতান্ত গৌণ। পক্ষান্তরে দার্শনিক পাঠ্যপুস্তকে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

* শোপেনহয়ারএর এই লাইনটির সৈয়দ মুজতবা আলী সংস্করণ—অমা যামিনীর অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান। —স:।

পাওয়া যায় না; শংকর বা রামানুজ বা বৌদ্ধাচার্যগণ কি বলেছেন, স্পিনোজা হিউম বার্ক্‌লি হেগেল প্রভৃতির মত কি—এই সব আলোচনাই থাকে, সত্যজিজ্ঞাসু পাঠককে দিশাহারা হতে হয়। আমাদের টোলের বা কলেজের ছাত্ররা যা পড়েন তা দার্শনিক তথ্য নয়, দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস। বিজ্ঞান আর দর্শনের এই প্রভেদের কারণ—বিজ্ঞান প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ে কারবার করে, তার সহায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তদাশ্রিত অনুমান; কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কিনা তা বারবার পরীক্ষা বা নিরীক্ষার পর স্থির করা হয়। জূল বললেন, এতটা শক্তি রূপান্তরিত হয়ে এতটা তাপ উৎপন্ন করে; তিনি পরীক্ষা করে তা দেখিয়ে দিলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানী অনুরূপ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে জূলের সিদ্ধান্ত ঠিক। গীতায় আছে, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নব বস্ত্র পরে, সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নব শরীর গ্রহণ করে; কিন্তু গীতাকার প্রমাণ দিলেন না। বার্ক্‌লি বললেন, ঈশ্বরের চৈতন্যই সকল পদার্থের আধার, কিন্তু কোন্ উপায়ে ঐশ্বরিক চৈতন্য উপলব্ধি করা যায় তা বললেন না। দার্শনিক মতের প্রমাণ নেই—অন্তত আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে এমন প্রমাণ নেই, তাই পরস্পরবিরুদ্ধ নানা মতের উৎপত্তি হয়েছে এবং লোকে রুচি অনুসারে পুনর্জন্ম স্বর্গ-নরক নির্বাণ দ্বৈতবাদ মায়াবাদ দেহাত্মবাদ প্রভৃতি যা খুশি মেনে নেয়।

বিজ্ঞান আর দর্শনের মাঝে একটি প্রান্তভূমি আছে, পণ্ডিতরা বহু দিন থেকে সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। এই গহন প্রদেশে এখনও ইচ্ছামত পরীক্ষা বা নিরীক্ষা চলে না, তাই তত্ত্বান্বেষীকে প্রধানত অনুমান আর কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। যাঁরা কঠোর যুক্তিবাদী তাঁরা অতি সতর্ক হয়ে যথাসাধ্য অপক্ষপাতে রহস্য ভেদের চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এই অনুসন্ধানে এখনও বেশী মতৈক্যের আশা নেই এবং কল্পনার বিলাস অবাধে চলছে। তারই নমুনাস্বরূপ কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

·

বিদ্যাসাগর বোধোদয়ে লিখেছেন (ভাষাটি ঠিক মনে নেই)—'আমরা ইতস্তত যে সমুদায় বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ কহে।' আর একটু বিশদ করে বলা যেতে পারে—আমরা যেসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথক পৃথক বিষয়ের সংস্রবে আসি তাদের নাম পদার্থ। মানুষ জন্তু গাছ নক্ষত্র পাহাড় নদী বাড়ি ইট শস্যকণা জীবাণু সবই পদার্থ। পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও

বিনাশ হতে পারে, কিন্তু অনেক পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ দেখবার সুযোগ আমাদের নেই, যেমন নক্ষত্র, হিমালয় পর্বত। পদার্থ মাত্রই নিরন্তর বদলাচ্ছে, আজ যেমন আছে কাল তেমন থাকবে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর, সেজন্য আমাদের অগোচর।

একটি দার্শনিক সংজ্ঞা আছে—একদেশসম্বন্ধ। আমি যখন কোনও গাড়িতে চড়ি বা বিছানায় শুই তখন আমার সর্ব দেহ দিয়ে গাড়ি বা বিছানার সমস্তটা ব্যাপ্ত করে থাকি না, এক অংশেই থাকি, তাই তার সঙ্গে আমার একদেশসম্বন্ধ হয়। মায়ের সঙ্গে কোলের ছেলের, আমার সঙ্গে আমার হাতে ধরা কলমের এই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অল্পকালস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, একবার ঘুচে গিয়ে আবার স্থাপিত হতে পারে, চিরকালের জন্য লুপ্তও হতে পারে। একদেশসম্বন্ধের ন্যায় এককালসম্বন্ধও আমরা কল্পনা করতে পারি। আমার পিতা এখন মৃত। তিনি আর আমি কয়েক বৎসর একই কালে বিদ্যমান ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার এককালসম্বন্ধ ছিল। দুজন লোক যদি একই মুহূর্তে জন্মায় এবং এক সঙ্গেই মরে তবে বলা যেতে পারে যে তাদের সমকালসম্বন্ধ আছে, কিন্তু এমন সম্বন্ধ দুর্ঘট। কোনও সময়ে জগতে যত লোক জীবিত থাকে তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় বা সাক্ষাৎকার না হলেও এককালসম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ মৃত্যুতে ছিন্ন হয়, একদেশসম্বন্ধের ন্যায় পুনর্বার স্থাপিত হতে পারে না। জীবন-মৃত্যু মিলন-বিরহ আমাদের পক্ষে চিত্তবিক্ষোভকর গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু উদাসীন তত্ত্বদর্শী বলেন—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্‌বদ্‌ভূতসমাগমঃ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব)

—মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক খণ্ড কাষ্ঠ অপর এক কাষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার দূরে চলে যায়; প্রাণিগণের মিলন-বিরহও সেইরূপ।

আমরা কি শুধুই 'কাষ্ঠং কাষ্ঠং'? মৃত্যুর পরে কি পুনর্বার মিলনের সম্ভাবনা নেই? হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান এক বাক্যে বলেন, অবশ্যই আছে, আত্মা মরে না, পরজন্মে অথবা স্বর্গে বা নরকে আবার মিলন হতে পারবে। এই ধারণায় মন তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী এমন শূন্যগর্ভ আশ্বাসে ভোলেন না। তিনি বলেন, ইহকালে আমাদের অস্তিত্ব কি রকম তাই আগে জানা দরকার, পরকালের কথা পরে ভাবব। শাস্ত্রে

আছে—'আত্মানং বিদ্ধি', আত্মাকে জান। আত্মা বললে ঠিক কি বোঝায় তা জানি না; তার বদলে আমার প্রত্যক্ষ স্থূল সত্তাকে বোঝবার চেষ্টা করব।

বোধোদয়ের মতে আমি একটি চেতন পদার্থ, ধরাধামে আমার অস্তিত্ব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। বাল্যকালে আমি যেরকম ছিলাম এখন সেরকম নেই, শরীর আর মতিগতি অনেক বদলেছে। এই পরিবর্তমান আমি কি একই পদার্থ? বহু লোকে বলেন, দেহের আর মনের যতই অদলবদল হক তোমার আত্মা বরাবর একই আছে, পরলোকেও থাকবে। যাঁরা বলেন তাঁরা কেউ পরলোক-ফেরত নন, সুতরাং তাঁদের কথার মূল্য নেই। গীতায় আছে, জীব আদিতে ও মরণান্তে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত; অর্থাৎ জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরে জীবের অবস্থা অজ্ঞাত, কেবল জীবিতাবস্থাই জ্ঞাত। অতএব এই প্রত্যক্ষ জীবিতাবস্থারই বিচার করে দেখা যাক আমার সত্তা কিরকম। আমার ছেলেবেলার ছবির সঙ্গে বুড়ো বয়সের ছবির অল্প মিল থাকতে পারে, কিন্তু দুটি বিভিন্ন ক্ষণিক বিষয়ের প্রতিরূপ। আমার স্বভাব শক্তি রুচি বিদ্যাবুদ্ধিরও এইরকম পরিবর্তন হয়েছে। বস্তুত আমি একটি পদার্থ নই, অসংখ্য পদার্থের পরম্পরা, যেমন সিনেমার ছবি। মনে করুন হীরাবাই-নাটকের সিনেমা-ফিল্ম দশ হাজার ফুট লম্বা। তার সমস্ত রীলকে বলা যেতে পারে হীরাবাই ফিল্ম, কিন্তু এক টুকরোকে এ নাম দেওয়া যায় না। ফিল্মের রীল যখন কৌটায় থাকে তখন খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে, অর্থাৎ তার দু-চার ঘন-ফুট দেশব্যাপ্তি আছে। কিন্তু তার ছবি যখন পর্দায় দেখানো হয় তখন তার প্রায় ২০০ বর্গ-ফুট দেশব্যাপ্তি হয় এবং সেই সঙ্গে প্রায় দু ঘণ্টা কালব্যাপ্তি হয়। দেশে কালে ব্যাপ্ত এই চিত্র পরম্পরাই হীরাবাই-নাটকের যথার্থ প্রতিরূপ; ফিল্মের রীল সেই প্রতিরূপের উৎপাদক মাত্র।

অতএব আমার যথার্থ সত্তা আমার সমগ্র জীবন। শুধু দেশে কালে ব্যাপ্ত আমার শরীর নয়, আমার চিত্ত ও কর্মও এই সত্তার অঙ্গীভূত। যদি সত্তর বৎসর বাঁচি তবে এই সময়ের মধ্যে আমার শারীরিক মানসিক যত পরিবর্তন হয়েছে, আমি সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ যা ভোগ করেছি, সুকর্ম দুষ্কর্ম যা করেছি, সব সুদ্ধ নিয়ে আমার সত্তা। আমাকে পদার্থ বললে ছোট করা হবে, আমি সত্তর বৎসর ব্যাপী একটি ঘটনাপ্রবাহ। এ ভিন্ন যদি আমার অন্যবিধ সত্তা মানা হয় তবে তা ক্ষণিক, অসম্পূর্ণ, অথবা অপ্রমাণিত।

আপাতদৃষ্টিতে হিমালয় যতই অটল অচল মনে হক, তারও পরিবর্তন ঘটছে, অতএব হিমালয় একটি ঘটনাপ্রবাহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এইরকম, তাই 'জগৎ' আর 'সংসার' নাম। গঙ্গার যে জলরাশি এই মুহূর্তে দেখছি পর মুহূর্তে তা চলে গেছে, তার স্থানে অন্য জলরাশি এসেছে, তটরেখাও ক্রমশ বদলাচ্ছে, গঙ্গার কোনও অংশই স্থায়ী নয়। এই কারণেই গ্রীক পণ্ডিত হেরাক্লাইটস বলেছিলেন, একই নদী দুবার পার হওয়া যায় না। নির্বাত স্থানে প্রদীপের শিখা একটি স্থির পদার্থ বলে মনে হয়। তেলের বাষ্প আর বাতাসের অক্সিজেন একসঙ্গে মিশে জ্বলছে এবং এই দুই উপাদান নিরন্তর বদলাচ্ছে; এই ঘটনাপ্রবাহকেই আমরা দীপশিখা রূপে দেখি।

প্রদীপ নিবে গেলে তার শিখা কোথায় যায়? মৃত্যুর পরেও কি আত্মার অস্তিত্ব থাকে? আমরা কিছুই জানি না। নদী আর প্রদীপ অচেতন তাই তাদের আত্মার কথা আমাদের মনে আসে না। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চেতন অবস্থায় যে অহংজ্ঞান থাকে, আমি পূর্বে এই করেছিলাম, এখন এই করছি, এই ছিলাম, এখন এই হয়েছি—এই ধারাবাহিক জ্ঞান বা স্মৃতিই আমার ব্যক্তিত্ব, তাকেই আত্মা মনে করতে পারি। মহাভারতের উপমা অনুসারে বলা যেতে পারে—মহাকালসমুদ্রে ঘটনাপ্রবাহরূপ অসংখ্য কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আমি তাদেরই একটি। অন্যান্য যে সকল সচেতন কাষ্ঠ আমার সংসর্গে আসে—অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যখন আমার এককালসম্বন্ধ হয় তখন তাদের আমি জীবিত মনে করি। যে কাষ্ঠ সরে যায় তাকে মৃত মনে করি। আমি স্বয়ং যখন আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে চলে যাই তখন তারা আমাকে মৃত মনে করে। তার পরে আমার চেতনা বা ব্যক্তিত্ববোধ থাকে কিনা তা বলা আমার সাধ্য নয়।

এই পর্যন্ত মেনে নিতে বিশেষ বাধা হয় না, কিন্তু পরে যা বলছি তা বিভিন্ন পণ্ডিতের অনুমান বা কল্পনা মাত্র। সিনেমার ছবি একবার দেখানো হলেই তার বিনাশ হয় না; চিত্রপ্রবাহরূপ যে ঘটনার একবার অবসান হয়েছে আবার তা দেখানো যেতে পারে, কারণ, তার মূলীভূত ফিল্মের তো বিনাশ হয় নি। আমাদের জীবনরূপ চলচ্চিত্রের মূলস্বরূপ কি কিছু নেই? বিজ্ঞানী বলেন, আমরা যে লাল নীল প্রভৃতি রং দেখি তা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র, আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ভেদই আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রং বলে মনে হয়।

সেই রকম বলা যেতে পারে, যে মহাকাল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, আমাদের মনের গুণে (বা দোষে)ই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের ভেদজ্ঞান হয়। যা বর্তমান তারই অস্তিত্ব আছে, যা অতীত আর ভবিষ্যৎ তার অস্তিত্ব এখন নেই—এমন মনে করব কেন? সমস্তই সিনেমা-ফিল্মের রীলের ন্যায় যুগপৎ বিদ্যমান, সমস্তই নিত্য; আমার মনের শক্তি সীমাবদ্ধ তাই কালকে খণ্ড খণ্ড করে উপলব্ধি করি। বহু পণ্ডিতের মতে দেশ ও কাল illusion বা অধ্যাস বা মায়া মাত্র।

একদেশসম্বন্ধ ছিন্ন হলে আবার তা স্থাপিত হতে পারে, সেইরকম এককালসম্বন্ধ কি পুনঃস্থাপিত হতে পারে না? কালসমুদ্রে বিয়োজিত দুই কাষ্ঠের পুনর্মিলন কি অসম্ভব? যদি অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সমস্তই একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে তবে আপাতদৃষ্টিতে কালব্যবধান যতই থাকুক, এক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আর এক ঘটনাপ্রবাহের পুনর্বার সংযোগ অসাধ্য নাও হতে পারে।

পনর-বিশ বৎসর পূর্বে J. W. Dunne কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন—An Experiment with Time, The New Immortality, The Serial Universe ইত্যাদি। এইসকল গ্রন্থে তিনি কাল এবং সংবিৎ (consciousness) সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করেছেন এবং বলেছেন যে চেষ্টা করলে স্বপ্নযোগে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বিষয় কিছু কিছু জানা যায়, অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বর্তমান ব্যক্তিগত ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ করা যায়। তিনি অনেক যুক্তি দিয়ে এবং অঙ্ক কষে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সংবিৎ বা চেতনা চিরস্থায়ী, অর্থাৎ আমরা সকলেই অমর। উক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হলে বিলাতের সুধীসমাজে একটি প্রবল সাড়া পড়েছিল, খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এবং অনেক বিজ্ঞানীও বলেছিলেন যে এই মত উপেক্ষার যোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণের আগ্রহ বেশীদিন রইল না, এখন আর Dunne-এর নাম বড় একটা শোনা যায় না। সম্ভবত তাঁর নির্দেশিত উপায়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা সন্তোষজনক ফল পান নি।

দিব্যদৃষ্টি আর ত্রিলোক-ত্রিকাল-দর্শিতার কথা পুরাণে আছে। Clairvoyance, telepathy, medium-এর মধ্যতায় মৃতজনের সঙ্গে আলাপ, ইত্যাদিতে আস্থাবান লোকেরও অভাব নেই। কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী মুখের

কথায় বিশ্বাস করেন না, অতি সাধু লোকের সাক্ষ্যও অভ্রান্ত মনে করেন না। বাজিকর আর ভণ্ড লোকে অনেক অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী উকিল জজ বা পুলিসের পক্ষেও তার রহস্যভেদ সুসাধ্য নয়। সম্প্রতি আমেরিকায় Rhine এবং ইংলান্ডে Soal প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করেছেন, যাতে প্রতারণা অসম্ভব। এঁদের গবেষণার উপকরণ—কতকগুলি কার্ড, যাতে নানা রকমের চিহ্ন আঁকা আছে। এই কার্ডগুলি যন্ত্রের সাহায্যে একে একে একজন লোককে দেখানো হয় এবং দূরবর্তী অন্য ঘরে আর একজন লোক আন্দাজে সেই অদেখা কার্ডের বর্ণনা দেয়। অধিকাংশ স্থলে অনুমানে ভুল হয়, কিন্তু বহুবার বহু লোককে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কিছু কিছু মিলে যায়। সব মিলই আকস্মিক এমন বলা যায় না, কারণ, Probability বা সম্ভাবনা-গণিত অনুসারে আকস্মিক মিল যত হতে পারে তার চেয়ে বেশী মিল দেখা গেছে। এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে জনকতক লোকের অল্পাধিক মাত্রায় telepathy বা দূরবেদনের ক্ষমতা আছে এবং সম্ভবত সকল লোকেরই ঈষৎ মাত্রায় আছে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা গেছে যে দ্বিতীয় লোকটি অন্য ঘরে প্রদর্শিত কার্ডের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কার্ড অনুমান করেছে, অর্থাৎ সে অতীত বা ভবিষ্যৎ দর্শন করেছে।

এইপ্রকার পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গেছে তা বৃহৎ নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের মতে তার গুরুত্ব আছে। পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ইহকাল-পরকালের স্পষ্ট সম্বন্ধ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু কয়েকজন দার্শনিক আর বিজ্ঞানী এই সামান্য প্রমাণ অবলম্বন করে দেশ-কাল-আত্মা সম্বন্ধে নানারকম সিদ্ধান্ত করেছেন, আবার অন্যে তাঁদের ভুলও দেখিয়েছেন। মানুষ বহুকাল থেকে আকাশে ডানা মেলে ওড়বার স্বপ্ন দেখেছে, চেষ্টা করতে গিয়ে বারবার বিফল হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন যে বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রে (অর্থাৎ এয়ারোপ্লেনে) মানুষ কখনও উড়তে পারবে না, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হয়েছে। অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে সতর্ক গবেষণা সবে আরম্ভ হয়েছে, তা সফল হবে কি বিফল হবে এখনই বলা অসম্ভব। ভবিষ্যতে হয়তো অনেক আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কৃত হবে; অন্ধকার ঘরে কালো বেরাল ধরা না পড়লেও অন্তত তার কিঞ্চিৎ লোম হস্তগত হবে; কিন্তু এখনই উৎফুল্ল হবার কারণ নেই।

❑

কবির জন্মদিনে

(১৩৫৫/১৯৪৮)

আজ যাঁকে জন্মদিন উপলক্ষে স্মরণ করছি তাঁকে আমরা কবিবর বলি না, মহাকবিও বলি না, শুধুই কবি বলি, কারণ, যা যত বড় তার নাম ততই ছোট, যেমন দেশ কাল মন প্রাণ বিদ্যা বুদ্ধি। কবি শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ—ক্রান্তদর্শী, অর্থাৎ যাঁর কাছে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রকাশ পায়। এই অর্থ মনে রাখলে আর কোনও বিশেষণ যোগ করা দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজেকে এতই অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার কখনও অন্ত হবে না। লোকে তাঁর কৃতির যে অংশ নিয়ে সাধারণত চর্চা করে তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য। বাংলা পদ্য আর গদ্য রীতির যে পরিবর্তন মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে; তাঁর জন্যই আমাদের মাতৃভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষার আসন পেয়েছে; তিনি জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—এই সব কথাই বার বার আমাদের মনে উদয় হয়। সাহিত্য বললে আমরা যা বুঝি তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং তার উপাদান অসংখ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে একটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলছি।

যে দেশে যে ধর্ম প্রচলিত তার প্রভাব সে দেশের সাহিত্যের উপর অবশ্যই পড়ে। বাংলা সাহিত্যের বদনাম শোনা যায় যে এ কেবল হিন্দুরই সাহিত্য, সুতরাং অহিন্দু বাঙালীর অনুপযুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যের উপর খ্রীষ্টধর্ম ও বাইবেলের প্রভাব প্রচুর, তবুও তা সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত জনের প্রিয় হল কেন? এর কারণ, ইউরোপীয় মধ্যযুগের অন্তে রেনেসাঁসের সময়ে পণ্ডিতগণ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছিলেন, সমগ্র ইওরোপের ঐতিহ্যকেই তাঁরা নিজের বলে গণ্য করেছিলেন। গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়েও তাঁরা অবাধে পেগান দেবদেবীর পুরাণকথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের ধর্মহানি হয় নি। পিউরিটান হয়েও মিলটন গ্রীক

বাগ্‌দেবীর বন্দনা করেছেন। কেবল ধর্মবিশ্বাস দ্বারা সাহিত্য শাসিত হয় না—এই ধারণা হয়তো খুব স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ইওরোপের গুণী সমাজ বুঝেছিলেন যে জাতীয় সংস্কৃতির কথা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সাহিত্যে তার উল্লেখ থাকলেই ধর্মবিশ্বাসের হানি হয় না। হয়তো অনেকে মনে করতেন যে পেগান ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে তো খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যও আছে, তাতেই প্রথমটির দোষ খণ্ডন হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্মের গোঁড়ামি অনেকটা কমে গেছে, তার ফলে শিক্ষিত সমাজ পেগান ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য সমদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েও নির্ভয়ে পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কাব্য লিখেছিলেন। তিনি এই কাজ বিনা বাধায় করতে পেরেছিলেন, কারণ ধর্মান্তরিত হলেও পূর্বধর্মের প্রতি বিদ্বেষগ্রস্ত হন নি, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং তাঁর স্বধর্মীরা তাঁর রচনার কোন খবরই রাখতেন না। তারপর রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ভাল হক বা মন্দ হক দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ফেলবার নয়, জাতীয় সভ্যতার ধারা বজায় রাখবার জন্য সাহিত্যে তাকে যথোচিত স্থান দিতে হবে, এবং স্থান দিলেই তার ফলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রশ্রয় পাবে এমন নয়। 'গোরা' গল্পের নায়কের মতে সমস্ত প্রাচীন সংস্কারই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং পানুবাবুর মতে সে সমস্তই বিষতুল্য বর্জনীয়। এই দু রকম গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে উদার দৃষ্টিতে কি করে সাহিত্য রচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তাঁকে বাঁ দিক আর ডান দিক থেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে হয়েছে, কারণ সকল পাঠকের সাহিত্যিক উদার দৃষ্টি নেই।

ইউরোপীয় রাজনীতিকদের মুখে এখনও আমরা শুনতে পাই যে Christian ideal বা খ্রীষ্টীয় আদর্শ না মানলে কোন রাষ্ট্রের নিস্তার নেই। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও যে মহৎ আদর্শ থাকতে পারে তা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন না। সেই রকম এদেশের অনেকে মনে করেন যে সনাতনী বা ইস্‌লামী আদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ পুরাণাদি প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপযুক্ত স্থান দিয়েও সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপর টেনে এনেছেন এবং দেখিয়েছেন যে উৎকৃষ্ট

ইউরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যকেও সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক করা যায়। এই লক্ষণের ফলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য অনেক অহিন্দু পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে। আশা করা যায়, এই পথে অগ্রসর হয়েই ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য সর্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় হতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে আধুনিক ও যুক্তিবাদী, তথাপি তাঁর কাব্য নাটক আর গল্পে এদেশের প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন, তিনি লোকব্যবহারেও যে অনুরূপ যোগসূত্র রেখেছিলেন তার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ কীর্তি আর আভিজাত্যের গণ্ডি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখেন নি, কোনও আলাপপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেন, দেশের জনসমষ্টির তুলনায় তাঁদের সংখ্যা খুব কম, তথাপি শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অগণিত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ একমুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। কার কোন্ বিষয়ে কতটুকু দৌড় তা বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে, অনেক সময় উপদ্রবও করেছে। তাঁর কাছে ঘোমটাবতী পল্লীবধূর জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নিজেকে আবশ্যকমত প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করবার এই শক্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার একটি কারণ। 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'—এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজ স্বভাবের এক দিকের পরিচয় দিয়েছেন।



বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু

(১৩৫৭/১৯৫০)

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল ধর্মমত। রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেক মনীষী পাদরীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন। তার পর রাজনীতির চাপে ধর্মের সমালোচনা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ফ্যাশন ও রুচি নিরন্তর বদলায়, কালক্রমে পুরনো বিষয়ও রুচিকর বা কৌতূহলজনক হতে পারে। এই বিশ্বাসে আধুনিক বিলাতী খ্রীষ্টীয় সমাজের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুসমাজের কিঞ্চিৎ তুলনা করছি। হিন্দুর সম্বন্ধে যা লিখছি তা প্রধানত বাঙালীর উদ্দেশ্যে হলেও বহু অবাঙালী সম্বন্ধেও খাটে। সম্প্রতি 'হিন্দু' শব্দের অর্থ প্রসারিত হয়েছে—ভারত-জাত-ধর্মাবলম্বী সকলেই হিন্দু। এই প্রবন্ধে কেবল সনাতনপন্থী হিন্দু অর্থে 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ করছি।

রিলিজন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। হিন্দুধর্ম বললে যা বোঝায় তা ঠিক রিলিজন নয়, কিন্তু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম ধর্মকে রিলিজন বলা চলে। ক্রীড অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা মূলমন্ত্র না থাকলে রিলিজন হয় না। খ্রীষ্টধর্মের ক্রীড আছে, যথা—ট্রিনিটি বা ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যিশুর অলৌকিক জন্ম, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর ক্রুসারোহণ, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, মানুষের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিশুশরণের আবশ্যকতা, ইত্যাদিতে বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্মেরও ক্রীড আছে। অনেকে মনে করেন হিন্দুরও আছে, যথা—বেদ, জাতিভেদ, পুনর্জন্ম ও মূর্তিপূজায় আস্থা, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, ইত্যাদি। কিন্তু এর একটিও হিন্দুত্বের সুনির্দিষ্ট বা অপরিহার্য লক্ষণ নয়। আমরা 'বেদবাক্য' বলি, কিন্তু তা কেবল কথার কথা। সাধারণ হিন্দু বেদের কোনও খবরই রাখে না, সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। আজকাল জাতিভেদ পুনর্জন্ম প্রভৃতি না মানলেও হিন্দুত্বের হানি হয় না। যে নিজেকে হিন্দু বলে, দু-একটি নৈমিত্তিক কর্ম (যেমন শ্রাদ্ধ) সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে, এবং যার সঙ্গে হিন্দু নামে খ্যাত অন্যান্য লোকের অল্পাধিক সামাজিক সম্বন্ধ থাকে সেই হিন্দু। আচার ব্যবহার হিন্দুর লক্ষণ নয়। নিত্য

নিষিদ্ধ খাদ্য খেলে, বিজাতীয় পোশাক পরলে, সিভিল বিবাহ বা মেম বিবাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে।

বিলাতের (ব্রিটেনের) অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্মের দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত— প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক। প্রথম শাখার লোকই বেশী, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র চার্চ বা ধর্মসংঘ আছে। সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী সংঘ চার্চ অভ ইংলান্ড। বিভিন্ন প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের ক্রীডের প্রধান অংশ এক হলেও খুঁটিনাটি নিয়ে বিবাদ আছে, সেজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গির্জা আলাদা, পাদরী-নিয়োগের পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু ক্যাথলিকদের দলাদলি নেই, বিলাতের তথা সকল দেশের ক্যাথলিক একই ধর্মসংঘের অন্তর্গত এবং ধর্মকর্মে পোপের শাসনই চূড়ান্ত বলে মানে।

ব্রিটিশ রাজ্যে সকল ধর্মাবলম্বী নানা বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করলেও চার্চ অভ ইংলান্ডের প্রতি কিছু পক্ষপাত করা হয়। পূর্বে এই সংঘ যে সরকারী অর্থসাহায্য পেত তা এখন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সংঘের সম্পত্তি নানাপ্রকার কর থেকে মুক্ত। চার্চ অভ ইংলান্ডের অনেক বিশপ হাউস অভ লর্ডস-এ সদস্যরূপে আসন পান। ব্রিটেনকে লোকায়ত রাষ্ট্র বা secular state বলা চলে না, অন্তত ভারতের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্বীকৃত হয়েছে বিলাত তেমন নয়। বিলাতের রাজাই চার্চ অভ ইংলান্ডের প্রধান, তাঁর অন্যতম উপাধি Defender of the Faith। পাকিস্তানী নেতারা যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলামী নীতির প্রতিষ্ঠা চান, ব্রিটিশ নেতারাও তেমনি বলে থাকেন যে Christian Ideal না মানলে রাষ্ট্রের মঙ্গল নেই। বিলাতী রেডিওতে প্রত্যহ যে ধর্মকথা প্রচারিত হয় তা প্রধানত প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টধর্ম, ক্যাথলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ প্রশ্রয় পান না। কয়েক বৎসর থেকে নাস্তিক, অজ্ঞাবাদী (agnostic) ও যুক্তিবাদী (rationalist) সম্প্রদায় তর্ক করছেন যে ব্রিটিশ প্রজা কেবল প্রোটেস্টান্ট নয়, কেবল খ্রীষ্টানও নয়। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নানা সম্প্রদায় বিলাতে বাস করে, তারা নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার পাবে না কেন? প্রবল আন্দোলনের ফলে কর্তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় অখ্রীষ্টান যুক্তিবাদী সম্প্রদায়কেও কিছু কিছু প্রচারের অধিকার সম্প্রতি দিয়েছেন। পাদরীরা তাতে মোটেই খুশী হন নি।

কয়েক বৎসর পূর্বেও বিলাতে রবিবারে থিয়েটার সিনেমা বল-নাচ

ফুটবল ম্যাচ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল, পাছে ওই দিনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। গত যুদ্ধের সময় সৈন্যদের আবদারের ফলে এই নিয়মের কড়াকড়ি এখন অনেকটা কমেছে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাদরী বাহাল থাকেন, সপ্তাহে একদিন উপাসনায় যোগ দেওয়া ও ধর্মকথা শোনা সৈন্যদের অবশ্যকর্তব্য। অবিশ্বাসী সৈন্যরা নিষ্কৃতি পেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক বাধা। সম্প্রতি বিলাতের সমস্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। যে শিক্ষক খ্রীষ্টধর্মে নিষ্ঠাহীন অথবা যিনি নিষ্ঠার ভান করতে পারেন না তাঁর চাকরির আশা অল্প।

বিলাতে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জন্য যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল চেষ্টা এবং নিষ্ঠাবান জনসাধারণের উৎসাহ দেখা যায়, ভারতে হিন্দুধর্মের জন্য সেরকম কিছু নেই। এদেশের গুরু ও পুরোহিতের সঙ্গে কতকটা মিল থাকলেও বিলাতী পাদরীদের প্রভাব আরও বেশী ও ব্যাপক। চার্চ অভ ইংলান্ড, স্কটিশ চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। এইসব ধর্মসংঘের কর্তৃত্বেই পাদরীদের শিক্ষা, নিয়োগ, বদলি, শাসন, পদোন্নতি এবং বেতনের ব্যবস্থা হয়।

এদেশে ব্রাহ্মদের একাধিক সমাজ আছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম বলতে পারেন যে তিনি অমুক সমাজের। এই বিষয়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সনাতনপন্থী হিন্দুর পৃথক পৃথক সমাজ বা ধর্মসংঘ নেই। মঠ অনেক আছে, মঠের সম্পত্তি এবং উপাসকেরও অভাব নেই, কিন্তু মঠের নাম অনুসারে গৃহস্থ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক পরিচয় দেবার রীতি নেই। মঠ ও চার্চ একজাতীয় সংঘ নয়। এদেশের গুরু ও পুরোহিতদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হক, তাঁরা স্বাধীন, কোনও সংঘের শাসন তাঁদের মানতে হয় না।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে উদাসীন হওয়া সহজ ছিল না। পইতা না থাকা এবং সন্ধ্যাবন্দনা না করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত গণ্য হত। অব্রাহ্মণকেও নানা রকম অনুষ্ঠান পালন করতে হত। প্রকাশ্যে মুরগি খাওয়া চলত না, কিন্তু মদ খাওয়া মার্জনীয় ছিল। কুলগুরু এবং পুরোহিতদের প্রতিপত্তি এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু মঠধারী বা সন্ন্যাসী গুরুর বাহুল্য ছিল না। কালক্রমে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম ছাড়া হিন্দুকে কোনও কালেই কোনও রকম ক্রীড মানতে হয় নি এবং আজকাল অনেক অনুষ্ঠানও বর্জন করা চলে।

যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র—এ কথা আধুনিক খ্রীষ্টানকেও মানতে হয়। *কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা বিষ্ণুর অংশ, কিংবা শুধুই মানুষ বা কাল্পনিক* পুরুষ—আধুনিক হিন্দু যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে।

সেকালের তুলনায় একালের হিন্দুর অনেক অন্ধ সংস্কার দূর হয়েছে, কিন্তু এখনও যা আছে তা পর্বতপ্রমাণ। অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু ফলিত জ্যোতিষ ও মাদুলি-কবচে বিশ্বাস করে, তার প্রমাণ নিত্য নূতন নূতন রাজজ্যোতিষীর অভ্যুত্থান এবং খবরের কাগজে তাঁদের বড় বড় বিজ্ঞাপন। স্বামী, বাবা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদাতা গুরুর উদ্ভব হয়েছে, এঁদের শিষ্যও অসংখ্য। এই শিষ্যরা কেবল ধর্মকামনায় বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা শোকদুঃখে সান্ত্বনার জন্য গুরুবরণ করেন না; অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের চাকরির উন্নতি, ভাল জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্তিও গুরুর অলৌকিক শক্তিবলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিছু কিছু গুরুর প্রভাব আছে, কিন্তু এখানকার মত ব্যাপক নয়। ব্রিটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ভাগ্যগণনা ও মাদুলি-কবচের ব্যবসায় প্রতারণারূপে গণ্য এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। কিন্তু আস্থাবান লোক সেখানেও কিছু আছে; তাদের জন্য গোপনে এই সকল ব্যবসায় চলে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এদেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধ বিশ্বাস বিলাতী শিক্ষিত সমাজের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু হিন্দুর সৌভাগ্য এই, যে ক্রীডের বন্ধন থেকে সে চিরকাল মুক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এডোআর্ড গিবন তাঁর বিখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true, by the philosopher as equally false and by the magistrate as equally useful. And thus toleration produced not only mutual indulgence, but even religious concord. ... The

philosophers of antiquity ... viewing with a smile of pity and indulgence the various errors of the vulgar, practised the ceremonies of their fathers, devoutly frequented the temples of the gods; and sometimes condescending to act a part on the theatre of superstition, they concealed the sentiments of an atheist under the secredotal robes. Reasoners of such a temper were scarcely inclined to wrangle about their respective modes of faith or worship. It was indifferent to them what shape the folly of the multitude might choose to assume; and they approached with the same external reverence the altars of the Libyan, the Olympian or the Capitoline Jupiter.

প্রাচীন রোমান ফিলসফারদের ধর্মমত সম্বন্ধে গিবন যা লিখেছেন তা অসংখ্য আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধেও খাটে। এই মিলের কারণ—রোমান ও হিন্দু নাগরিক দুইই পেগান ও ক্রীডশূন্য। সাধারণত দেখা যায়, পৌরুষেয় অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্মই ক্রীডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান ও শিখ ধর্মে ক্রীড আছে। কিন্তু অপৌরুষেয় ধর্ম, যেমন গ্রীক ও রোমানদের পেগান ধর্ম এবং সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রীডবর্জিত। যারা তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে এবং সেই সঙ্গে এক পরমাত্মাকে মানতেও যাদের বাধে না, তারা সহজেই মাঝে মাঝে পুরাতন দেবতা বর্জন এবং নূতন দেবতা গ্রহণ করতে পারে। অন্য ধর্মের প্রতি তাদের আক্রোশও থাকে না। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি এখন আর পূজা পান না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতার আসন পেয়েছেন, ভারতমাতা ও বঙ্গমাতাও দেবতারূপে গণ্য হয়েছেন। রূপকের আশ্রয়ে জন্মভূমিকে দুর্গা কমলা ও বাণীর সঙ্গে একীভূত কল্পনা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ, কিন্তু একেশ্বরপূজকের তা ক্রীডবিরুদ্ধ। এই কারণেই 'বন্দেমাতরম্' অন্যতর জাতীয় সংগীতরূপে গণ্য হয়নি, লোক ভোলাবার জন্য তাকে শুধু 'সমান মর্যাদা' দেওয়া হয়েছে। বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের খাসির মাংস অথবা খ্রীষ্টান ইউকারিস্ট সংস্কারে নিবেদিত রুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এসকল বস্তু খাদ্য মাত্র। কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমান এবং গোঁড়া ব্রাহ্মর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ খাওয়া

সহজ নয়, তাঁরা মনে করেন এ প্রকার খাদ্যে পৌত্তলিক বিষ আছে, খেলে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

মধ্যযুগে ইওরোপে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তার ভিত্তি বাইবেল এবং আরিস্টট্‌ল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। এই অদ্ভুত সমন্বয়ের বিরুদ্ধে কোনও খ্রীষ্টান কিছু বললে তার প্রাণসংশয় হত। ষোড়শ শতাব্দে ভিয়েনা নগরে সের্ভেটস নামে এক শারীরবিজ্ঞানী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতি সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁর আরও গুরুতর অপরাধ—বাইবেলে জুডিয়া প্রদেশের যে বর্ণনা আছে তার প্রতিবাদে তিনি বলেন, জুডিয়ায় দুগ্ধ-মধুর স্রোত বয় না, এ স্থান মরুভূমির তুল্য। এ প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে—এই মত প্রকাশের জন্য গ্যালিলিওকে কারাগারে যেতে হয়েছিল, অবশেষে তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় অন্যরকম লিখে অতি কষ্টে মুক্তি পেয়েছিলেন।

আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, যেমন—সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করে, বাসুকি বা দিগ্‌গজগণের মস্তকের উপর পৃথিবী আছে, ইত্যাদি। ষষ্ঠ শতাব্দে আর্যভট্ট বলেছেন, পৃথিবীই আবর্তন করে। দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য বলেছেন, পৃথিবীর যদি কোন মূর্তিবিশিষ্ট আধার থাকত তবে সেই আধারের জন্য অন্য আধার এবং পর পর অসংখ্য আধার আবশ্যক হত; পৃথিবী নিজের শক্তিতেই আকাশে আছে। আর্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য ক্রীডহীন হিন্দুসমাজে জন্মেছিলেন তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁদের পুড়ে মরতে হয়নি।

বাইবেলের মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে জগতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঈশ্বর ছ দিনের মধ্যে আকাশ ভূমি পর্বত এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল তাঁর গ্রন্থে লিখলেন যে পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বৎসর। কিছুকাল পরে ডারউইন প্রচার করলেন যে বহুকালব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন জীব থেকে নব নব জীবের উৎপত্তি হয়েছে। লায়েল ও ডারউইনের উক্তিতে সর্ব শ্রেণীর খ্রীষ্টান (মায় প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টোন) খেপে উঠলেন। তখন পাষণ্ডদের পোড়াবার রীতি উঠে

গিয়েছিল, তাই লায়েল ডারউইন ও তাঁদের শিষ্যরা বেঁচে গেলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে নূতন মত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে মান্যগণ্য বাইবেল-বিশ্বাসী অনেক আছেন যাঁরা আধুনিক ভূবিদ্যা ও অভিব্যক্তিবাদ মানেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিলাণ্ডের কয়েকটি স্থানে বিদ্যালয়ে বাইবেল-বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি বিষয়ক অনেক কথা আছে। এদেশের কোনও গোঁড়া হিন্দু আবদার করেন নি যে স্কুল-কলেজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিজ্ঞান শেখানো বন্ধ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে হিন্দু উদারতা দেখায় নি, তার ফলে তাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ধর্মের মার্গবিচারে বা পারমার্থিক বিষয়ে তার বুদ্ধি সংকীর্ণ নয়, যত মত তত পথ—এই সত্য তার জানা আছে, সেজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মমতের বিরোধ অসম্ভব।

নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের সংখ্যা বিলাতে ক্রমশ কমছে। পাদরীরা খেদ করছেন যে গির্জায় পূর্বের মত লোকসমাগম হয় না, প্রতি বৎসরেই উপাসকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বহু শিক্ষিত লোক এখন কেবল নামেই খ্রীষ্টান, তাঁরা খ্রীষ্টীয় ক্রীড এবং বাইবেল-বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর উপর আস্থা হারিয়েছেন। অনেকে বুঝেছেন যে খ্রীষ্টের উপদেশে এমন কিছু নেই যা তাঁর পূর্বে আর কেউ বলেন নি, এবং যে সদ্‌গুণাবলীকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ বলা হয় তা খ্রীষ্টধর্মের একচেটে নয়। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। বাইবেল-ব্যাখ্যায় অনেক পাদরী এখন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ সাহস করে বলছেন যে ক্রীডে অলৌকিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ যা আছে তা বর্জন না করলে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষা পাবে না। কিন্তু সনাতনপন্থী খ্রীষ্টানদের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমে এলেও এখনও খুব আছে। সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের ডীন ইংগের উদার মতের জন্য তাঁর অনেক ভক্ত হয়েছে, কিন্তু গোঁড়ার দল তাঁর উপর খুশী নয়। বার্মিংহামের বিশপ বার্নিজ তাঁর গ্রন্থে ক্রীড সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ণ ও অপ্রিয় কথা লিখেছেন। এঁরা প্রতিষ্ঠাশালী লোক, নয়তো চার্চ অভ ইংলাণ্ডের কর্তারা এঁদের পদচ্যুত করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য আজকাল বিলাতে প্রবল চেষ্টা হচ্ছে এবং অর্থব্যয়ও প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ দুটি রাজনীতিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—কমিউনিজম ও নাৎসিবাদ। এই দুই ধর্মে দেবতার প্রয়োজন নেই, ক্রীডই সর্বস্ব। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে অনেক কমিউনিস্ট ও নাৎসির সাদৃশ্য দেখা যায়। নাৎসিবাদ এখন মৃতপ্রায়, কিন্তু কমিউনিজম অন্য সকল ধর্মকে কালক্রমে গ্রাস করবে এমন সম্ভাবনা আছে। এর প্রতিকারের জন্য নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। আমাদের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভৃতি উন্নত জাতির অন্ধ সংস্কার অত্যন্ত অল্প। তথাপি ধর্মের মার্গবিচারে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি এখনও বাধামুক্ত হয় নি। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় নগণ্য, আমাদের যান্ত্রিক ঐশ্বর্য অতি অল্প, অন্ধসংস্কারেরও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতের ধর্মবুদ্ধি নিগড়বদ্ধ নয়। এদেশের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে যে নৈতিক দার্শনিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব আছে তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, প্রত্যেক হিন্দু নিজের রুচি অনুসারে ধর্মমত গঠন করতে পারে। কোন চার্চ বা সংঘ তার উপর চাপ দিয়ে বলে না—দশ অবতার তোমাকে মানতেই হবে, গায়ত্রী জপতেই হবে, শিবরাত্রিতে উপবাস করতেই হবে, নতুবা তোমার হিন্দুত্ব বজায় থাকবে না।

ধর্মবুদ্ধির এই স্বাধীনতা—যা ক্রীডধারী খ্রীষ্টান প্রভৃতির নেই, এতে হিন্দুর কোন্ উপকার হয়েছে? বিশেষ কিছুই হয় নি। কালিদাস বলেছেন, গুণসন্নিপাতে একটিমাত্র দোষ ঢেকে যায়। এর বিপরীতও সত্য—রাশি রাশি ত্রুটি থাকলে একটি মহৎগুণ নিষ্ফল হয়ে যায়। হিন্দু যদি তার ত্রুটির বোঝা কমাতে পারে তবে তার স্বাধীন উদার ধর্মবুদ্ধি স্ফূর্তিলাভ করবে, তার ফলে একদিন হয়তো সে দ্বন্দ্বহীন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজে পাবে,—অনুদার ক্রীডাশ্রয়ী ধর্ম বা ক্রীডসর্বস্ব রাজনীতিক ধর্মের পক্ষে যা অসম্ভব।



ভেজাল ও নকল

(১৩৫৭/১৯৫০)

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।

বললাম, দেখ নন্দ, দুধে অল্প স্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার বহু কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে, সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।

—নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।

—আজ্ঞে এক পোর বেশী জল কোন দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।

এবারে বোধ হল নন্দ সত্য কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, একেবারে খাঁটী দুধ কি দরে দিতে পার?

—আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।

—বরাবর খাঁটী দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?

—তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরিব লোক।

—আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম যত খুশি বাড়াতে পার কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?

—তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।

—কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটী দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়।

অবজ্ঞার হাসি হেসে নন্দ বললে, খাঁটী কোথায়, মোষের দুধে জল মিশিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

—মনের কথা বলে ফেল নন্দ।

—তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হল ব্যবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেক্টারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছা-পোষা গরিব মানুষ, এ সব খরচ যোগাতে হবে তো!

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেক্টার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেক্টারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। অতএব এইসব সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্যে আরও জল দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেক্টার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা নিজের চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা।

শিউরাম পাঁড়ে এক কালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, বাবু, বঢ়িয়া ভঁইসা ঘিউ আনিয়েসি, সস্তা আছে, ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ভেজাল কতটা দিয়েছ?

—বনস্পতি? আরে রাম রাম।

—দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা বলো না, পাপ হবে।

শিউরাম সহাস্যে বললে, গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।

—তার পর তুমি কত মিশিয়েছ?

—সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।

—চেহারা আর গন্ধ দেখে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া

তিন টাকায় এক সের হবে।

—এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বনাবেন?

—দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।

দুধ-ঘিএর কালোবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘিএর নকল আছে, কিন্তু শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটী ভঁয়সা ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম ঘনতেল (hydrogenated oil) কিনে তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁজ। চীনাবাদাম তিল তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অতি অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে অল্প গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায় ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে* যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের চিরপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতি-

* রেশন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার সময় লিখিত।

স্থাপকতা কি কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মিশানোর জন্য? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও তাতে থাকে? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুলবিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হত? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেধরা, শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ, প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। শুখনো মটর সবুজ রঙে ছুবিয়ে বস্তাবন্দী করা হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা বিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটে অধ্যক্ষদের সামনেই এই অপবস্তু বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কিনা দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন? সে উত্তর দেয়—খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী আর মিউনিসিপাল কর্তাদের

উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুখিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ্ লবঙ্গ দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেবার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল আর নকল চলছে ঔষধে। কুইনিন এমেটিন আড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী ও বিলাতী ঔষধ এবং প্রসাধন·দ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক ভদ্র গৃহস্থ জেনে শুনে এই পাপ ব্যবসায়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানেও এই কারবার অবাধে চলছে।

ভেজাল ও নকল এ দেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটী জিনিসের জন্য 'সাহেব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত নীচতায় আমরা গ্লানি বোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জনসাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক কর্তব্যবোধ কম, একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল নকল কালোবাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে পরম নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে। সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁরা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস বেচবার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অনুকল্প খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জনসাধারণ অবুঝ, অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি আর মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু টাপিওকা প্রভৃতির উপযোগিতা প্রচার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এইসব খাদ্যে জীবন-রক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি সরকারী খবর প্রকাশিত হয়েছে যে কোন এক ল্যাবরেটরিতে ভুট্টা টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (ইন্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম, অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা-টাপিওকা থেকে চাল তৈরিও সেইরকম। সরকার যে বস্তুর কথা বলেছেন, তাকে সিন্থেটিক রাইস বললে সত্যের অপলাপ হয়, তা ইমিটেশন রাইস বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত সেইরকম পদ্ধতিতে চালের মতন দানা তৈরি হচ্ছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে হয়তো দরিদ্র লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একবারে বর্জন করতে হবে। সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়। ❑

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

(১৩৫৭/১৯৫০)

সকল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রকার ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয় এবং অনর্থক বার বার দেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। যেমন লোকবিশেষের তেমনই জাতি বা শ্রেণী বিশেষেরও মুদ্রাদোষ আছে। দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা জানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিস দেয়। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলোয়—চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী মেয়ে নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে—সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বৃদ্ধদেরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অবৃদ্ধরা তা বলতে পারবেন।

জাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের ভাষায় সম্প্রতি যে সকল মুদ্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন শব্দদ্বৈত। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে।' তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন—গদ্‌গদ, বর্বর, জন্মজন্মনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দদ্বৈত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, হাড়ে হাড়ে—এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক। বুকে বুকে, কাঠে কাঠে—পরস্পর সংযোগ বাচক। সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে—নিয়তবর্তিতা বাচক। চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া—দীর্ঘকালীনতা বাচক। অন্য অন্য, লাল লাল, যারা যারা, ঝুড়ি ঝুড়ি—বিভক্ত বহুলতা বাচক। টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে—প্রকর্ষ বাচক। যাব যাব, শীত শীত, মানে মানে—ঈষদূনতা মৃদুতা বা অসম্পূর্ণতা বাচক। পয়সা টয়সা, বোঁচকা বুঁচকি,

গোলা গুলি, কাপড় চোপড়—অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক।

হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অল্পাধিক শব্দদ্বৈত আছে। বিদেশীর দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। শুনেছি, সেকালে চীনাবাজারের দোকানদার সাহেব ক্রেতাকে বলত, টেক টেক নো টেক নো টেক, একবার তো সী। একজন ইংরেজ পর্যটক লিখেছেন, মাদ্রাজ প্রদেশে কোনও এক হোটেলে হুইস্কির দাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর পেয়েছিলেন —টেন টেন আনা ওআন ওআন পেগ। বিদেশীর কাছে যতই অদ্ভুত মনে হক শব্দদ্বৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না। কিন্তু যদি অনাবশ্যক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে দিয়ে বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক' বলেছেন সেই শ্রেণীর অনেক জোড়া শব্দ সম্প্রতি অকারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এগুলির বিশেষ লক্ষণ—জোড়ার শব্দদুটি অসমান কিন্তু প্রায় অনুপ্রাসযুক্ত এবং প্রত্যেকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ জোড়া শব্দও অনেক আছে, যেমন—মণি-মুক্তা, ধ্যান-ধারণা, জল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়-ক্ষতি, সুখ-সুবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি জোড়া শব্দ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রয়োগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি শব্দই যথেষ্ট। কেবল দুঃখ বা কেবল দুর্দশা, কেবল ক্ষয় বা কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই রকম শব্দ যদি সর্বদাই জোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ।

দুজন সুস্থ সবল লোক যদি সর্বদা পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করে তবে দুজনেরই চলনশক্তির হানি হয়, একের অভাবে অন্য জন স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। প্রত্যেক শব্দেরই স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশ শক্তি আছে যার নাম অভিধা। এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে করে যদি সর্বদা আর একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কাজ চলতে পারত সেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আজকাল জনসাধারণের ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ভাল বা মন্দ, যে প্রয়োগ লোকে বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে আত্মসাৎ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে 'পরিস্থিতি,

বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্যকরী উপায়', ইত্যাদি শোনা যায়।

সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধূলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে বেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধূলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে—মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছি। খেলাধূলা দেখতে যাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলার সঙ্গে অনর্থক ধূলা যোগ করবার দরকার কি?

শব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম এখন নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে। শুধু নেতাজী রোড বা সুভাষ রোড করলে কিছুমাত্র অসম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর লিখতে সুবিধা হত। সম্প্রতি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের নাম নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ করা হয়েছে। শুধু নীলরতন কলেজ করলে কি দোষ হত? বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বদলে বঙ্কিমচন্দ্র বা বঙ্কিম স্ট্রীট করলে অমর্যাদা হত না। যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর দরকার হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ। কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে সাধারণে তাঁদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভক্তজন তাঁদের স্কন্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছেন। অনেকে মনে করেন প্রত্যেকবার নামোল্লেখের সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি রাজনারায়ণ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র না লিখলে তাঁদের অসম্মান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্রাট প্রভৃতি তুচ্ছ বিশেষণের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, দরকার হলে নামের পরিবর্তে তাঁকে শুধু কবি বা কবিগুরু আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়।

যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে। দরোয়ানের চৌগোঁপ্পা পাগড়ি আর জমকালো পোশাক, ফিল্ড-মার্শালের ভালুকের চামড়ার প্রকাণ্ড টুপি, সন্ন্যাসী বাবাজীর দাড়ি জটা গেরুয়া আর সাতনরী রুদ্রাক্ষের মালা—এ সমস্তই মহিমা বাড়াবার কৃত্রিম উপায়। আধুনিক শংকরাচার্যদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি শংকরাচার্যের শ্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি শ্রীতেই তুষ্ট।

বাণ গৌড়ী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষরডম্বর। এই আড়ম্বরের প্রবৃত্তি

এখনও আছে। অনেক বাক্যে অকারণে শব্দবাহুল্য এসে পড়েছে, লেখকরা গতানুগতিক ভাবে এই সব সাড়ম্বর বাক্য প্রয়োগ করেন। 'সন্দেহ নাই'—এই সরল প্রয়োগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলছে—'সন্দেহের অবকাশ নাই'। 'চা পান' বা 'চা খাওয়া' চলে না, 'চা পর্ব' লেখা হয়। 'মিষ্টান্ন খাইলাম' স্থানে 'মিষ্টান্নের সদ্‌ব্যবহার করা গেল'। মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু যদি বার বার দেখা যায় তবে তা মুদ্রাদোষ।

শব্দের অপচয় করলে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে 'ব্যর্থ হইবে' লিখলে চলে সেখানে দেখা যায় 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে'। অনেকে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন', 'যোগ দিলেন' স্থানে 'অংশগ্রহণ করিলেন' বা 'যোগদান করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন' লেখেন। 'হিন্দীভাষী' লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেখা হয় 'হিন্দীভাষাভাষী', 'কাজের জন্য (বা কর্মসূত্রে) বিদেশে গিয়াছেন'—এই সরল বাক্যের স্থানে দুরূহ অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়—'কর্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছেন'। ব্যপদেশের মানে ছল বা ছুতা। 'পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল' স্থানে লেখা হয়—'পূর্বাহ্নেই...'। পূর্বাহ্নের একমাত্র অর্থ—সকালবেলা।

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বশে চলবার কোনও দরকার নেই—এই কথা অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিকৃত সংস্কৃতপ্রীতি দেখা যায়। বাংলা 'চলন্ত' শব্দ আছে, তবু তাঁরা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ 'চলমান' লেখেন, বাংলা 'আগুয়ান' স্থানে অশুদ্ধ 'অগ্রসরমান' লেখেন, সুপ্রচলিত 'পাহারা' স্থানে 'প্রহরা' লেখেন। বাকীর সংস্কৃত বক্রী নয়, পাঁঠার সংস্কৃত পণ্টক নয়, পাহারার সংস্কৃতও প্রহরা নয়।

অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ঝোঁক দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করেন। একজন গল্পকারের লেখায় চার পৃষ্ঠায় পঁচিশ বার 'রীতিমত' দেখেছি। অনেকে বার বার 'বৈকি' লিখতে ভালবাসেন। কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্ভে 'হাঁ' বসান। আধুনিক লেখকরা 'যুবক যুবতী' বর্জন করেছেন, 'তরুণ তরুণী' লেখেন। বোধ হয় এঁরা মনে করেন এতে বয়স কম দেখায় এবং লালিত্য বাড়ে। অনেকে দাঁড়ির বদলে অকারণে বিস্ময়চিহ্ন (!) দেন। অনেকে দেদার বিন্দু (...) দিয়ে লেখা

ফাঁপিয়ে তোলেন।* অনাবশ্যক হস্‌-চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করা বহু লেখকের মুদ্রাদোষ। ভেজিটেবল ঘিএর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে তাতে দেখেছি—'তিন্‌টি ডিম্‌ ভেঙ্গে নিন্‌, তাতে এক্‌টু নুন্‌ দিন্‌।'

আর একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রাদোষ বললে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচার-ব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তর ভাল জিনিস পেয়েছি। দু শ বৎসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথায় ও লেখায় কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কি বর্জনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

পাঁচ বছরের মেয়েকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—কুমারী দীপ্তি চ্যাটার্জি। সুশিক্ষিত লোকেও অম্লানবদনে বলে—মিস্টার বাসু (বা বাসিউ), মিসেস রয়, মিস ডাট। মেয়েদের নামে ডলি লিলি রুবি ইভা প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। যার নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখে Sheila। অনিল হয়ে যায় O'neil, বরেন হয় Warren। এরা স্বনামের ধন্য হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতাসূচক তা খেয়াল হয় না। সংক্ষেপের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি না করে বন্দ্যো করলে দোষ কি? সেই রকম মুখো চট্ট গঙ্গো ভট্টও চলতে পারে। সম্প্রতি অনেকে নামের মধ্যপদ লোপ করেছেন, নাথ চন্দ্র কুমার মোহন ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন। ভালই করেছেন। দিব্যেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন ফ্যাশন নয়। পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে ক্ষতি কি? মিস-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বৎসর পূর্বেও কুমারী সধবা বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌমার্য তো ঘোষণা করা হয় না।

প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের নাম আর

* একজনের লেখা প্রকাশের বিলম্বের কারণে শ্রদ্ধেয় জলধর সেন জানিয়েছিলেন—দাঁড়াও, ফুটকি কম পড়েছে, এক পো ফুটকি অর্ডার দিয়েছি। —সঃ।

জি কর কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজি অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—Better Bengal Society। বাংলা দেশ এবং বাঙালীর উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?

মেরুদণ্ডহীন অলস সুকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, সন্তানের নামকরণে তা প্রকাশ পায়। দোকানদারেরও স্বপনপসারী তরুণকুমার হবার সাধ হয়েছে। আমাদের পাড়ার একটি দরজীর দোকানের নাম—দি ড্রিমল্যান্ড স্টিচার্স। অন্যত্র স্বপন লন্ড্রিও দেখেছি। তরুণ হোটেল, তরুণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এবং ইয়ং গ্র্যাজুয়েট নামধারী দোকান বিস্তর আছে। পাঁচ-ছ বৎসর আগে বউবাজারে একটি দোকান ছিল—ইয়ং মোসলেম গ্র্যাজুয়েট ফ্রেন্ড্স। এক সঙ্গে তারুণ্য ইসলাম আর পাশ করা বিদ্যার আবেদন।



বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

(১৩৫৮/১৯৫১)

যার দ্বারা নিশ্চয় জ্ঞান হয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ আছে। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য। সাংখ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য (বা শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য। অন্যান্য দর্শনে আরও কয়েক প্রকার প্রমাণ মানা হয়।

প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference) এবং আপ্তবাক্য (authority) —এই ত্রিবিধ প্রমাণই আজকাল সকল দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে থাকেন। আপ্তবাক্যের অর্থ—বেদাদিতে যা আছে, অথবা অভ্রান্ত বিশ্বস্ত বাক্য। অবশ্য শেষোক্ত অর্থই বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীর গ্রহণীয়।

বিজ্ঞানী যখন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য নির্ণয় করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করেন। যখন পূর্বনির্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে অন্য তথ্য নির্ধারণ করেন তখন অনুমানের আশ্রয় নেন; যেমন, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর গতির নিয়ম হতে গ্রহণ বা জোয়ার-ভাটা গণনা। বিজ্ঞানী প্রধানত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁকে আপ্তবাক্য অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হয়।

আদালতের বিচারকের কাছে বাদী-প্রতিবাদীর রেজিস্টারী দলিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি যখন সাক্ষীদের জেরা শুনে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তখন অনুমানের সাহায্য নেন। যখন কোনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত নেন, যেমন রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত, তখন তিনি আপ্তবাক্য আশ্রয় করেন।

Scientific mentality—এই বহু প্রচলিত ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে বাংলায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলা যেতে পারে। এর অর্থ, গবেষণার সময় বিজ্ঞানী যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এবং সংস্কার ও পক্ষপাত দমন করে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, সকল ক্ষেত্রেই সেই প্রকার বিচারের চেষ্টা। বিজ্ঞানী জানেন যে তিনি

যা স্বচক্ষে দেখেন বা স্বকর্ণে শোনেন তাও ভ্রমশূন্য না হতে পারে, তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ এবং অপরাপর বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষে পার্থক্য থাকতে পারে। তিনি কেবল নিজের প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত মনে করেন না, অন্য বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষও বিচার করেন। তিনি এও জানেন যে অনুমান দ্বারা, বিশেষত আরোহ (induction) পদ্ধতি অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তার নিশ্চয় (certainty) সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। বলা বাহুল্য, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁরা সকলেই সমান সতর্ক বা সূক্ষ্মদর্শী নন।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যতটা ধ্রুব ও অভ্রান্ত গণ্য হত এখন আর তত হয় না। বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্প (hypothesis)ও ছিদ্রহীন না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। তাঁরা স্বীকার করেন যে সকল সিদ্ধান্তই সম্ভাবনা (probability)র অধীন। অমুক দিন অমুক সময়ে গ্রহণ হবে—জ্যোতিষীর এই নির্ধারণ ধ্রুব সত্যের তুল্য, কিন্তু কাল ঝড় বৃষ্টি হবেই এমন কথা আবহবিৎ নিঃসংশয়ে বলতে পারেন না।

চার-পাঁচ শ বৎসর পূর্বে যখন মানুষের জ্ঞানের সীমা এখনকার তুলনায় সংকীর্ণ ছিল তখন কেউ কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ গণ্য হতেন। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। যিনি খুব শিক্ষিত তিনি শুধু দু-একটি বিষয় উত্তমরূপে জানেন, কয়েকটি বিষয় অল্প জানেন, এবং অনেক বিষয় কিছুই জানেন না। যিনি জ্ঞানী ও সজ্জন তিনি নিজের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকেন, এবং তার বহির্ভূত কিছু বলে অপরকে বিভ্রান্ত করেন না।

বিজ্ঞানী এবং সর্ব শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। অনেকে মনে করে, অধ্যাপক ডাক্তার উকিল এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি বিশেষজ্ঞ 'জানি না' বলেন তবে প্রশ্নকারী ক্ষুণ্ণ হয়, কেউ কেউ স্থির করে এঁর বিদ্যা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণে যেসব বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার অধিকাংশ স্বাস্থ্যবিষয়ক, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল দেখা যায়।

তুচ্ছ অতুচ্ছ সরল বা দুরূহ যেসকল বিষয় সাধারণে জানতে চায় তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।—ধূমপানে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় কি না? পাতি বা কাগজি লেবু কোন্‌টায় ভাইটামিন বেশী? মিছরির ফুড-ভ্যালু কি চিনির

চাইতে বেশী? রবারের জুতো পরলে কি চোখ খারাপ হয়? নূতন সিমেন্টের মেঝে ঘামে কেন? উদয়-অস্তের সময় চন্দ্র সূর্য বড় দেখায় কেন? সাপ নাকি শুনতে পায় না? কেঁচো আর পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে কি না? দাবা খেললে আর অঙ্ক কষলে বুদ্ধি বাড়ে কি না? বাসন মাজার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দে গা শিউরে ওঠে কেন?

যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও হয় নি তার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হলেও তা অল্পশিক্ষিত লোককে বোঝানো যায় না, সরল প্রশ্নের উত্তরও অতি দুর্বোধ হতে পারে। যাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি সবগুলির উত্তর নাও জানতে পারেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারীকে যা তা বলে ভোলানো উচিত নয়। যদি উপযুক্ত উত্তর দেওয়ায় বাধা থাকে তবে সরলভাবে বলা উচিত, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও নির্ণীত হয় নি', অথবা 'প্রশ্নটির উত্তর বোঝানো কঠিন', অথবা 'উত্তর আমার জানা নেই।' দুঃখের বিষয়, অনেকে মনে করেন, যা হয় একটা উত্তর না দিলে মান থাকবে না। উত্তরদাতার এই দুর্বলতা বা সত্যনিষ্ঠার অভাবের ফলে জিজ্ঞাসুর মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়। আমেরিকান লেখক William Beebe তাঁর 'Jungle Peace' নামক গ্রন্থে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন—These words should be ready for instant use by every honest scientist–'I don't know.'

প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করবার আগে যদি তন্ন তন্ন বিচার করতে হয় তবে জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ সতর্ক ও যুক্তি-পরায়ণ হয়ে থাকা সহজ নয়। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক কার্যে অনেক সময় অপ্রমাণিত সংস্কারের বশে বা চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে চলেন। এতে বিশেষ দোষ হয় না যদি তাঁরা উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই সংস্কার ও অভ্যাস বদলাতে প্রস্তুত থাকেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের বাইরে আসেন তখন তিনিও সাধারণ লোকের মতন অসাবধান হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই অনেক সময় কুযুক্তি বা হেত্বাভাস আশ্রয় করেন। আবার সময়ে সময়ে অশিক্ষিত লোকেরও স্বভাবলব্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দেখা যায় এবং চেষ্টা করলে অনেকেই তা আয়ত্ত করতে পারেন। অল্পদর্শিতা, অসতর্কতা ও অন্ধ সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের বিচারে যেরকম ভুল হয় তার কয়েকটি

উদাহরণ দিচ্ছি।—

যদুবাবু সুশিক্ষিত লোক। তিনি ব্ল্যাক আর্ট নামক ম্যাজিক দেখে এসে বললেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড! জাদুকর শূন্য থেকে ফুলদানি টেবিল চেয়ার খরগোশ বার করছে, নিজের মুণ্ড উপড়ে ফেলে দু হাত দিয়ে লুফছে, একটা নরকঙ্কালের সঙ্গে নাচতে নাচতে পলকের মধ্যে সেটাকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করছে। শত শত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? অলৌকিক শক্তি ভিন্ন এমন ব্যাপার অসম্ভব।' যদুবাবু এবং অন্যান্য দর্শকরা প্রত্যক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। রঙ্গমঞ্চের ভিতরটা আগাগোড়া কালো কাপড়ে মোড়া। ভিতরে আলো নেই, কিন্তু মঞ্চের ঠিক বাইরে চারি ধারে উজ্জ্বল আলো, তাতে দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগে। ভিতরের কোন বস্তু বা মানুষ কাল কাপড়ে ঢাকা থাকলে অদৃশ্য হয়, ঢাকা খুললেই দৃশ্য হয়। জাদুকর কাল ঘোমটা পরলে তাঁর মুণ্ড অন্তর্হিত হয়, তখন তিনি একটা কৃত্রিম মুণ্ড নিয়ে লোফালুফি করেন। তাঁর সঙ্গিনী কাল বোরখা পরে নাচে, বোরখার উপর সাদা কঙ্কাল আঁকা থাকে। বোরখা ফেলে দিলেই রূপান্তর ঘটে।

মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়ার কথা অনেক শোনা যায়। বিশ্বাসী ভক্তরা বলেন, 'অমুক বাবার দৈবশক্তি মানতেই হবে, শূন্য থেকে নানারকম গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন। আমার কথা না মানতে পার, কিন্তু বড় বড় প্রফেসররা পর্যন্ত দেখে অবাক হয়ে গেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য তো অবিশ্বাস করতে পার না।' এইরকম সিদ্ধান্ত যাঁরা করেন তাঁরা বোঝেন না যে প্রফেসর বা উকিল জজ পুলিস অফিসার ইত্যাদি নিজের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হতে পারেন, কিন্তু 'অলৌকিক' রহস্যের ভেদ তাঁদের কর্ম নয়। জড় পদার্থ ঠকায় না, সেজন্য বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে যা প্রত্যক্ষ করেন তা বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যদি ঠকাবার সম্ভাবনা থাকে তবে চোখে ধুলো দেওয়া বিদ্যায় যাঁরা বিশারদ (যেমন জাদুকর), কেবল তাঁদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হতে পারে। রামায়ণে সীতা বলেছেন, 'অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ'—সাপের পা সাপেই চিনতে পারে তাতে সংশয় নেই। কিন্তু বিচক্ষণ ওস্তাদের পক্ষেও বাবা স্বামী ঠাকুর প্রভৃতিকে পরীক্ষা করা সাধ্য নয়, কারণ তাঁদের কাপড়-চোপড় বা শরীর তল্লাশ করতে চাইলে ভক্তরা মারতে আসবেন। বৈজ্ঞানিক বিচারের একটি নিয়ম—কোনও ব্যাপারের ব্যাখ্যা যদি সরল বা পরিচিত উপায়ে

সম্ভবপর হয় তবে জটিল বা অজ্ঞাত বা অলৌকিক কারণ কল্পনা করা অন্যায়।

রামবাবু স্থির করেছেন যে বেলিন্ডা জেলার লোকে চোর হয়, কারণ, তাঁর এক চাকর ওই জেলার লোক, সে ঘড়ি চুরি করে পালিয়েছে। তার ভাগনে শ্যামবাবুর বাড়ি কাজ করে, সেও রোজ বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরায়। শ্যামবাবু বলেছেন, বেলিন্ডা জেলার লোককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অল্প কয়েকটি ঘটনা বা খবর থেকে রামবাবু আরোহ (induction) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই জেলার সকলেই চোর।

তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন যে এই বৎসরে গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি এবং মহাগুরুনিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে, তাঁর আশি বছরের পিতামহীও মরেছেন। এই দুই আশ্চর্য মিল দেখে ফলিত জ্যোতিষের উপর গণেশবাবুর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। জ্যোতিষ গণনা কত বার নিষ্ফল হয় তার হিসাব করা গণেশবাবু দরকার মনে করেন না।

রত্নের সঙ্গে আকাশের গ্রহের সম্বন্ধ আছে, রত্নধারণে ভালমন্দ ফল হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়, অম্বুবাচীতে অন্যদিনের তুলনায় বেশী বৃষ্টি হবেই, অশ্লেষা মঘায় যাত্রা করলে বিপদ হয়, ইত্যাদি ধারণা বহু শিক্ষিত লোকেরও আছে। কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয়ের যা যথার্থ উপায়—পরিসংখ্যান (statistics), তা এ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করেন নি।

বিপিনবাবু স্বজাতির উপর চটা। তিনি এক সভায় বললেন, বাঙালী অতি দুশ্চরিত্র। তার ফলে তাঁকে খুব মার খেতে হল। বিপিনবাবু এরকম আশঙ্কা করেন নি। পূর্বে তিনি আলাদা আলাদা কয়েকজনকে ওই কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে ধমক দিয়েছিল, কেউ তর্ক করেছিল, কেউ পাগল ভেবে হেসেছিল, কেউ বা বলেছিল, হাঁ মশায়, আপনার কথা খুব ঠিক। বিপিনবাবু ভাবতে পারেন নি, পৃথক পৃথক লোকের উপর তাঁর উক্তির প্রতিক্রিয়া যেমন হবে, সমবেত জনতার উপর তেমন না হতে পারে। তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করলে জানতে পারতেন, বস্তুর এক-একটি উপাদানের গুণ ও ক্রিয়া যে প্রকার, বস্তুসম্ভারের গুণ ও ক্রিয়া সে প্রকার না হতে পারে।

সাধারণ লোকের বিচারে যে ভুল হয় তার একটি কারণ, প্রচুর প্রমাণ না পেয়েই একটা সাধারণ নিয়ম স্থির করা। এককালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেই জরায়ুজ। কিন্তু পরে ব্যতিক্রম দেখা গেল যে

duck-bill (ornithorhyncus) নামক জন্তু স্তন্যপায়ী অথচ অণ্ডজ। অতএব, শুধু এই কথাই বলা চলে যে অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব জরায়ুজ। ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, সাদা বেরালের নীল চোখ থাকলে সে কালা হয়। এখন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি, কিন্তু সাদা লোম, নীল চোখ আর শ্রবণশক্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণসম্বন্ধও আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব শুধু বলা চলে, যার লোম সাদা আর চোখ নীল সে বেরাল খুব সম্ভবত কালা।

মিত্র আর মুখুজ্জে কুটিল, দত্ত আর চট্ট বজ্জাত, কাল বামুন কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান সমান মন্দ হয়—ইত্যাদি প্রবাদের মূলে লেশমাত্র প্রমাণ নেই, তথাপি অনেক লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশের অতি উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও ফলিত জ্যোতিষ আর মাদুলি-কবচে অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়। খবরের কাগজে 'রাজজ্যোতিষী'রা যেরকম বড় বড় বিজ্ঞাপন দেন তাতে বোঝা যায় যে তাঁরা প্রচুর রোজগার করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান ও দর্শনে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধটি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়া উচিত। তা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি।—

'কোনও একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কিনা এবং ঘটনাটা প্রকৃত কিনা তাহা...জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধান কার্যই বোধ করি তাঁহার প্রধান কার্য। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়।... অবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য।... তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না। ... নিজের উপরেও তাঁহার বিশ্বাস অল্প।... কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে... এই ভয়ে তিনি সর্বদা আকুল। ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান ততটুকু পান না। তাহার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান।... একটা ঘটনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র ঘটনায় যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া

যাইব অথবা গণকঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

'একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে।...ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে।... পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে। যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ মিলিয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে, তেমন কিছুই নাই। হাজারের বদলে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।'

এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরেজী নাম begging the question, অর্থাৎ যা প্রশ্ন তাই একটু ঘুরিয়ে উত্তর রূপে বলা। প্রশ্ন—কাঠ পোড়ে কেন? উত্তর—কারণ, কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য মানে যা পুড়তে পারে। অতএব উত্তরটি এই দাঁড়ায়—কাঠ পুড়তে পারে সেইজন্যই পোড়ে। প্রশ্নটিকেই উত্তরের আকারে সাজিয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন —ডাক্তারবাবু, নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন? উত্তর—তোমার dyspnoea হয়েছে। রোগের নাম শুনে রোগীর হয়তো ডাক্তারের উপর আস্থা বেড়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি হল না; নামটির মানেই কষ্টশ্বাস। আরও উদাহরণ—গাঁজা খেলে নেশা হয় কেন? কারণ, গাঁজা মাদক দ্রব্য। রবার টানলে বাড়ে কেন? কারণ, রবার স্থিতিস্থাপক। ডি-ডি-টিতে পোকা মরে কেন? কারণ জিনিসটি কীটঘ্ন। খবরের কাগজে

এবং রাজনীতিক বক্তৃতায় এইপ্রকার যুক্তি অনেক পাওয়া যায়। যথা—'প্রজা যদি নিজের মতামত অবাধে ব্যক্ত করতে না পারে তবে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হয়, কারণ, রুদ্ধ জনমত অশেষ অনিষ্টের মূল।'

অনেক সময় পূর্বের ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ মনে করা হয়। এরূপ যুক্তিই কাকতালীয় ন্যায় বা post hoc, propter hoc। আমার ফিক ব্যথা ধরেছে, একটা বড়ি খেয়ে আধঘণ্টার মধ্যে সেরে গেল। এতে ঔষধের গুণ প্রমাণিত হয় না, ব্যথা আপনিও সারতে পারে। একটা নারকেল গাছ পুঁতেছিলাম, বার বৎসরেও তাতে ফল ধরল না। বন্ধুর উপদেশে এক বোতল সমুদ্রের জল গাছের গোড়ায় দিলাম। এক বৎসরের মধ্যে ফল দেখা গেল। এও প্রমাণ নয়, হয়তো যথাকালে আপনি ফল ধরেছে। বার বার মিল না ঘটলে কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা প্রায়ই বলেন, যদি গণনা ঠিক হয় তবে মিলতেই হবে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরাও বলে থাকেন, যদি ঔষধ-নির্বাচন ঠিক হয় তবে রোগ সারতেই হবে। যদি শতবার অভীষ্ট ফল না পাওয়া যায় তাতেও তাঁরা হতাশ হন না; বলেন, গণনা (বা ঔষধ) ঠিক হয় নি। যদি একবার ফললাভ হয় তবে উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এই দেখ, বলেছিলাম কি না? যথার্থ গণনার (বা ঔষধের) কি অব্যর্থ ফল!

সকলেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেজন্য অসংখ্য ক্ষেত্রে আপ্তবাক্য মেনে নিতে হয়। কার উপদেশ গ্রহণীয় তা লোকে নিজের শিক্ষা আর সংস্কার অনুসারে স্থির করে। পাড়ায় বসন্ত রোগ হচ্ছে। সরকার বলছেন টিকা নাও, ভটচাজ্যি মশায় বলছেন শীতলা মায়ের পূজা কর। যারা মতি স্থির করতে পারে না বা ডবল গ্যারান্টি চায় তারা টিকাও নেয় পুজোর চাঁদাও দেয়। বাড়িতে অসুখ হলে লোকে নিজের সংস্কার অনুসারে চিকিৎসার পদ্ধতি ও চিকিৎসক নির্বাচন করে। রেসে বাজি রাখবার সময় কেউ বন্ধুর উপদেশে চলে, কেউ গণৎকারের কথায় নির্ভর করে।

গত এক শ দেড় শ বৎসরের মধ্যে এক নূতন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে—বিজ্ঞাপন। অশিক্ষিত লোকে মনে করে যা ছাপার অক্ষরে আছে তা মিথ্যা হতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মতন পরম

জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে। একই বস্তুর মহিমা প্রত্যহ নানা স্থানে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চতুর বিজ্ঞাপক স্পষ্ট মিথ্যা বলে না; আইন বাঁচিয়ে নিজের সুনাম রক্ষা করে, মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের প্রভাবে সাধারণের চিত্ত জয় করে। যে জিনিসের কোনও দরকার নেই অথবা যা অপদার্থ তাও লোকে অপরিহার্য মনে করে। অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিজ্ঞাপনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সাধারণের তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপন দেখে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়, অমুক স্নো মাখলে রং ফরসা হয়, অমুক তেলে ব্রেন ঠাণ্ডা হয়, অমুক সুধায় নার্ভ চাঙ্গা হয়, অমুক ফাউন্টেন পেন না হলে চলবে না, অমুক কাপড়ের শার্ট বা শাড়ি না পরলে আধুনিক হওয়া যাবে না। এক বিখ্যাত বিলাতী ব্যবসায়ী ঘোষণা করছেন—Beware of night starvation, খবরদার, রাত্রে যেন জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডেপিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনিও ভাবেন, তাই তো, রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খেয়েই শোয়া ভাল। চায়ের বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়—এমন উপকারী পানীয় আর নেই, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, কাজের আগে মাঝে ও পরে, শীত করলে, গরম বোধ হলে, সর্বাবস্থায় চা-পান হিতকর।

বিজ্ঞাপন কেমন পরোক্ষভাবে মানুষের বিচারশক্তি নষ্ট করে তার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহুকাল পূর্বের কথা, তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।* আমার পাশের টেবিলে একজন ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র একটা লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে তার সঙ্গে নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও কি হচ্ছে?' উত্তর দিলেন, 'এই কেশতৈলে মারকিউরি আর লেড আছে কিনা দেখছি।' প্রশ্ন—'কেশতৈলে ওসব থাকবে কেন?' উত্তর—'এরা বিজ্ঞাপনে লিখছে, এই কেশতৈল পারদ সীসক প্রভৃতি বিষ হইতে মুক্ত। তাই পরীক্ষা করে দেখছি কথাটা সত্য কিনা।' এই ছাত্রটি যা করছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম কাকদন্তগবেষণ, অর্থাৎ কাগের কটা দাঁত আছে তাই খোঁজ করা। পরে ইনি এক সরকারী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক হয়েছিলেন।

* প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, ১৯০১। —সঃ

যেমন সন্দেশ রসগোল্লায়, তেমনি কেশতৈলে পারা বা সীসে থাকবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা। অজ্ঞ লোকে ভাববে, কি সর্বনাশ, তবে তো অন্য তেলে এই সব থাকে! দরকার কি, এই গ্যারান্টি দেওয়া নিরাপদ তেলটিই মাখা যাবে।

ধর্মমত আর রাজনীতিক মতের সত্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য। প্রমাণের অভাবে উত্তেজনা আর আক্রোশ আসে, মতবিরোধের ফলে শত্রুতা হয়, তার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মত সহজেই সর্বগ্রাহ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হলেও শত্রুতা হয় না। সোভিএট বিজ্ঞানী লাইসেংকোঁর প্রজনন বিষয়ক মত নিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে উগ্র বিতর্ক হয়েছে তার কারণ প্রধানত রাজনীতিক।

যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক, তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার করে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।



বাঙালীর হিন্দীচর্চা

(১৩৫৮/১৯৫১)

পনর বৎসর পরে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে এই সংকল্প ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় অনেকে রাগ করেছেন, আরও অনেকে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী উদাসীন হয়ে আছেন। পনর বৎসর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, অতএব রাগের বশে হিন্দীকে বয়কট করা, ভয় পেয়ে নিরাশ হওয়া, অথবা পরে দেখা যাবে এই ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকা—কোনওটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেউ কেউ মনে করেন, পনর বৎসর পরেও সরকারী সকল কার্য হিন্দী ভাষায় নির্বাহ করা যাবে না, তখন ইংরেজীর মেয়াদ আরও বাড়াতে হবে; হয়তো কোনও কালেই ইংরেজী-বর্জন চলবে না। এই রকম ধারণার বশে নিরুদ্যম হয়ে থাকাও হানিকর। অচির ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবেই—এই সম্ভাবনা মেনে নিয়ে এখন থেকে আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য।

এ পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানত শুধু একটি ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছি—ইংরেজী। যাঁরা অধিকন্তু সংস্কৃত ফারসী ফ্রেঞ্চ জার্মন প্রভৃতি শেখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প। ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য তিনটি—জীবিকানির্বাহ, ভিন্নদেশবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, এবং নানা বিদ্যায় প্রবেশ লাভ। হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কেবল ইংরেজির সাহায্যে জীবিকানির্বাহ চলবে না; সরকারী চাকরি, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তি, এবং সামরিক ও রাজনীতিক কার্যে হিন্দী অপরিহার্য হবে। ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে প্রধানত হিন্দীতেই আলাপ করতে হবে। কিন্তু যাঁরা উচ্চশিক্ষা চান অথবা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যোগ রাখতে চান তাঁদের অধিকন্তু ইংরেজীও শিখতে হবে। মোট কথা, এখন যেমন ইতর ভদ্র অনেক লোক ইংরেজী না শিখেও কৃষি শিল্প কারবার বা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, ভবিষ্যতে হিন্দী না শিখেও তা পারবে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যেসব বৃত্তিতে অভ্যস্ত তা বজায় রাখার জন্য হিন্দী শিখতেই হবে। তা ছাড়া অল্পাধিক ইংরেজীও চাই। অর্থাৎ, এক শ্রেণীর শুধু মাতৃভাষা আর

এখনকার মতন নামমাত্র বাজারী হিন্দী জানলেই চলবে; আর এক শ্রেণীর মাতৃভাষা ছাড়া ভালরকম হিন্দী এবং একটু ইংরেজী জানলেই চলবে; এবং উচ্চশিক্ষার্থীর অধিকন্তু ইংরেজী উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হবে।

দুটির জায়গায় তিনটি ভাষা শিখতে হবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। গণিত বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করতে যে যত্ন নিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম যত্নে ভাষা শেখা যায়। হিন্দী আর বাংলার সম্পর্ক অতি নিকট, সে কারণে বাঙালীর পক্ষে হিন্দী শেখা সহজ। ইওরোপ আমেরিকা ও জাপানে বহু লোক তিন-চারটি বা ততোধিক ভাষা শেখে। যাঁরা রাজনীতিক বা বাণিজ্যিক দূত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে যান তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় দখল না থাকলে চলে না। যে বাঙালী এইপ্রকার পদের প্রার্থী তাঁকে বহু ভাষা শিখতেই হবে।

হিন্দীর আধিপত্যে আমাদের মাতৃভাষার ক্ষতি হবে এই ভয় একেবারে ভিত্তিহীন। ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ভাল মন্দ অনেক বাক্যরীতি বা ইডিয়ম বাংলায় এসে পড়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজী ভাব ও পদ্ধতি আত্মসাৎ করেই পুষ্ট হয়েছে, কিন্তু নিজের বিশিষ্টতা হারায় নি। হিন্দী দ্বারাও বাংলাভাষা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হবে, কিন্তু অভিভূত হবে না। অনেককাল থেকেই কিছু কিছু হিন্দী শব্দ বাংলায় আসছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে, কিন্তু তাতে বাংলার জাত যাবে না। বাংলা থেকেও বিস্তর শব্দ হিন্দীতে যাচ্ছে। বাংলার তুলনায় ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি খুব বেশী, সেই কারণেই বাংলার উপর তার অসামান্য প্রভাব। হিন্দীর সে সমৃদ্ধি নেই, সেজন্য তার প্রভাব কখনও বেশী হবে না—রাজনীতিক মর্যাদা যতই থাকুক।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কেবল পাঠশালায় আর স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা পড়ানো হত। তখনকার শিক্ষাবিধাতারা মনে করতেন, বাংলা তো আপনিই শেখা যায়, তার জন্য বেশী কিছু করতে হবে কেন। এই উপেক্ষা সত্ত্বেও সেকালের বাঙালী লেখক মাতৃভাষার উন্নতি করেছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁদের কীর্তির জন্যই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য কলেজেও শিক্ষণীয় হয়েছে। এখন বাংলা চর্চা করেই এম এ, পি-এচ ডি উপাধি পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাওয়ায় বাংলা ভাষা জাতে উঠেছে, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পাঠ্যরূপে সমাদর পেয়েছে। কিন্তু কলেজী শিক্ষার গুণে বা

বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টার ফলে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষায় বা সাহিত্যের কোনও উন্নতি হয়েছে এমন বলা যায় না। সেকালের লেখকরা পাঠশালায় বা স্কুলের নিম্নশ্রেণীতেই বাংলা শিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষায় শুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং নূতন লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। এখন অসংখ্য লেখক, তাঁদের অনেকে কলেজে বাংলা পড়েছেন। এখন রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে গেছে, আধুনিক প্রয়োজনে ভাষা নব নব ভাবের ধারক হয়েছে, তার প্রকাশ শক্তিও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সেকালে যে সতর্কতা ছিল, ইংলান্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভাষার উপর যে শাসন আছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার একান্ত অভাব দেখা যায়।

সেকালের উপেক্ষা, একালের অসতর্কতা, এবং ইংরেজীর প্রবল প্রভাব —এই তিন বাধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব নেই, বাঙালী লেখকের সহজাত সাহিত্যপ্রীতি ও নৈপুণ্যের জন্যই বাংলা ভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে গণ্য হয়েছে। হিন্দীর প্রতিপত্তি যতই হক তাতে বাংলা ভাষার অনিষ্ট হবে না।

যেসব সরকারী কর্মচারীর কর্মকাল শেষ হয়েছে বা শীঘ্র হবে, তাঁদের হিন্দী না শিখলেও চলবে। যাঁরা যুবক, এখনও বহুকাল কর্মরত থাকবেন, তাঁদের অনেককেই হিন্দী শিখতে হবে, নতুবা তাঁদের উন্নতি ব্যাহত হবে। আর, যারা অল্পবয়স্ক তাদের সযত্নে হিন্দী শেখাতেই হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ প্রতিযোগে পরাস্ত না হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের আরম্ভকালে মুসলমানরা বাদশাহী জমানা আর ফারসী ভাষার অভিমানে ইংরেজীকে উপেক্ষা করেছিল। তার জটিল পরিণাম কি হয়েছে তা সকলেই জানেন। অন্ধ বিদ্বেষ বা অদূরদর্শিতার বশে হিন্দীকে উপেক্ষা করলে বাঙালীর অশেষ দুর্গতি হবে।

ভাগ্যক্রমে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উর্দু রাষ্ট্রভাষা রূপে নির্বাচিত হয় নি। সংবিধান সভায় যাঁরা হিন্দীর পক্ষে লড়েছিলেন তাঁরা এখন 'শুদ্ধ হিন্দী' অর্থাৎ সংস্কৃতশব্দবহুল হিন্দীর প্রতিষ্ঠার জন্য সোৎসাহে চেষ্টা করছেন। ভারতের প্রধান ভাষাগুলির যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী। হিন্দী ভাষায় যদি আরবী-ফারসী শব্দ কমানো হয় এবং সংস্কৃত শব্দ বাড়ানো হয় তবে দু-তিন কোটি

উর্দুভাষীর অসুবিধা হলেও অবশিষ্ট বহু কোটি ভারতবাসীর সুবিধা হবে। হিন্দী ভাষায় যদি 'ইম্‌তহান, দরখ্‌ত, পৈদাইশ, বনিস্‌বত, মুহব্বত, স্যাহী' ইত্যাদির পরিবর্তে 'পরীক্ষা, বৃক্ষ, উৎপত্তি, অপেক্ষা, প্রীতি, মসি' ইত্যাদি লেখা হয় তবে বাঙালী আসামী ওড়িয়া গুজরাটী মরাঠী ও দক্ষিণ-ভারতবাসী সকলেরই বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫১ অনুচ্ছেদে আছে —হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য মুখ্যত সংস্কৃত থেকে এবং গৌণত অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করা হবে।

হিন্দী ভাষা একটা বোঝা হয়ে হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে এই ভেবে উদ্‌বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর একটা লাভের দিকও আছে, তা বাঙালী লেখকদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। ব্যবসায় বুদ্ধির যতই অভাব থাকুক একটি বিষয়ে বাঙালী এখনও এগিয়ে আছে। বাংলা সাহিত্য হিন্দী প্রভৃতির চেয়ে সমৃদ্ধ, পরিমাণে না হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। বাংলা কাব্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদির মর্যাদা যতই থাকুক, পাঠক বেশী নয়। কিন্তু পণ্য হিসাবে বাংলা গল্পগ্রন্থের আদর আছে। অনেক বাংলা গল্পের হিন্দী গুজরাটী তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, অনেক অবাঙালী সাগ্রহে মূল বাংলা গ্রন্থ পড়ে থাকেন। উদারস্বভাব অবাঙালী পাঠক বাংলা গল্পের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না।

ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা গল্পের উৎকর্ষ বাংলা ভাষার জন্য নয়, বাঙালী লেখকের স্বাভাবিক পটুতার জন্য। বাঙালী সাহিত্যিক যদি হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে হিন্দীতে লেখেন তবে তাঁর পুস্তক সর্বভারতে প্রচারিত হবে, ক্রেতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। যাঁরা অল্প বয়স থেকে হিন্দী শিখছেন তাঁদের যদি ভবিষ্যতে শখ হয় তবে অনায়াসে হিন্দীতে গল্প লিখতে পারবেন। এর জন্য অপর প্রদেশের সমাজে মিশতে হবে, তাঁদের আচারব্যবহার জানতে হবে। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তা সুসাধ্য। যদি কেবল বাঙালী সমাজ নিয়ে হিন্দীতে গল্প লেখা হয় তা হলেও তার ভারতব্যাপী কাটতি হবে। লেখকের ক্ষমতা আর পাঠকের রুচির সামঞ্জস্য করে বলা যেতে পারে যে, গল্পের পাত্র-পাত্রী যদি কতক বাঙালী আর কতক অন্যপ্রদেশবাসী হয় তবেই সব চেয়ে ভাল ফল হবে। যারা বাংলা গল্প লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং বিহারী উত্তরপ্রদেশী প্রভৃতি সমাজের সঙ্গে

পরিচিত, স্থবির না হলে তাঁরা হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে এই কাজে নামতে পারেন। ফরাসী জার্মন চেক হাঙ্গেরীয় পোল প্রভৃতি অনেক বিদেশী ইংরেজীতে লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের ভাষায় সময়ে সময়ে ভুল হয়, তার জন্য একটু আধটু উপহাসও সইতে হয়। কিন্তু রচনার গুণাধিক্যে তাঁদের ছোট ছোট ত্রুটি চাপা পড়ে যায়।

বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এঁদের জনকতক যদি হিন্দী লেখায় মন দেন তা হলে বাংলা সাহিত্য নিঃস্ব হবে না। এঁদের প্রভাবে হিন্দী ভাষাও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার নিকটতর হবে। নগেন্দ্র গুপ্ত, প্রভাত মুখো এবং চারু বন্দ্যো তাঁদের অনেক গল্পে বিহারী ও উত্তরপ্রদেশী পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করেছেন। এইসকল গল্প হিন্দীতে লেখা হলে ভারতব্যাপী সমাদর পেত। উপেন্দ্র গঙ্গো, শরদিন্দু বন্দ্যো, বিভূতি মুখো এবং বনফুলের অনেক গল্পে অবাঙালী নরনারীর মনোজ্ঞ চিত্র আছে। এঁরা বহুকাল বাংলা দেশের বাইরে বাস করেছেন, সেখানকার সমাজের খবর রাখেন, অল্পাধিক হিন্দী জানেন, এবং সকলেই ভূরিলেখক। মাতৃভাষা চর্চায় ক্ষান্ত না হয়েও এঁরা মাঝে মাঝে মাতৃষ্বসার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।



সাহিত্যিকের ব্রত

(১৩৫৮/১৯৫১)

সাহিত্যের স্থূল অর্থ একজনের চিন্তা অনেককে জানানো। বিষয় অনুসারে সাহিত্য মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণী তথ্যমূলক, তার উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যার আলোচনা, স্থান কাল ঘটনা বা পদার্থের বিবরণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রচারমূলক, তার উদ্দেশ্য ধর্ম সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সংক্রান্ত মতের অথবা পণ্যদ্রব্যের মহিমা খ্যাপন। তৃতীয় শ্রেণী ভাবমূলক, রসোৎপাদন বা চিত্তবিনোদনই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তার সঙ্গে অল্পাধিক তথ্য আর প্রচারও থাকতে পারে। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের বিষয় ও ক্ষেত্র নিরূপিত, তাতে অবান্তর বিষয় আলোচনার স্থান নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীরও প্রতিপাদ্য ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অবান্তর প্রসঙ্গেরও সাহায্য নেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্দেশ্য রসোৎপাদন, কিন্তু ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, উপজীব্য অসংখ্য, সাধনের উপায়ও নানাপ্রকার। কাব্য নাটক গল্প এবং belles letters জাতীয় সন্দর্ভ এই শ্রেণীতে পড়ে। সেকালে কাব্য বা সাহিত্য বললে এইসব রচনাই বোঝাত। আজকাল কাব্যের অর্থ সংকুচিত হয়েছে, সাহিত্যের অর্থ প্রসারিত হয়েছে। এখনও সাহিত্য-শব্দ প্রধানত পুরাতন অর্থে চলে, তথাপি শেষোক্ত শ্রেণীর একটি নূতন দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা হলে ভাল হয়। বোধ হয় 'ললিত সাহিত্য' চলতে পারে।

সাধারণত রচনার প্রকৃতি বা বিষয় অনুসারে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন কবি, নাট্যকার, গল্প লেখক, ইতিহাস লেখক, শিশুসাহিত্য লেখক ইত্যাদি। এককালে কদাচিৎ জাতি অনুসারে লেখককে বিশেষিত করা হত, যেমন মহিলা কবি, মুসলমান কবি; কিন্তু এখন আর তা শোনা যায় না। জীবিকা অনুসারেও লেখককে চিহ্নিত করার রীতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অন্নদাশংকর আর অচিন্ত্যকুমারকে হাকিম-সাহিত্যিকের শ্রেণীতে এবং তারক গঙ্গোপাধ্যায় কোনান ডয়েল আর বনফুলকে ডাক্তার-সাহিত্যিকের শ্রেণীতে ফেলা হয় না।

যিনি ললিত সাহিত্য লেখেন তাঁর বিশেষ বিশেষ মতামত থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য তাঁকে কোন মার্কা-মারা দলভুক্ত মনে করার কারণ নেই। লেখক নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগবলের প্রভাব মানতে পারেন, বিলাতী সভ্যতার পরম ভক্ত বা সোভিএট তন্ত্রের একান্ত অনুরাগী হতে পারেন, কিন্তু এই সব লক্ষণ অনুসারে ললিত সাহিত্যের উৎকর্ষ মাপা হয় না। লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু রসবিচারের সময় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সেকালের তুলনায় একালে ললিত সাহিত্যের উপজীব্য অনেক বেড়ে গেছে। স্বদেশী, রাজদ্রোহ, অসহযোগ, অগস্ট-বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগের আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড, বাস্তুত্যাগীর দুর্দশা, দেশব্যাপী অসাধুতা—সমস্তই কাব্য গল্প ও প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। সহৃদয় লেখক নরনারীর সাহস ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, অন্যায় দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নির্যাতন দেখে কাতর হয়েছেন, এবং বিগত ও বর্তমান ঘটনাবলী থেকে বীর করুণ বীভৎস ও ভয়ানক রসের উপাদান নিয়ে নিজের উপলব্ধিকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। এ প্রকার রচনার সঙ্গে লেখকদের রাজনীতিক মনের কোনও সম্বন্ধ নেই।

ললিত সাহিত্যের এই নিরপেক্ষতা সম্প্রতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ফাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘের উদ্ভব হয়েছিল। তার কিছুকাল পরে কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ গঠিত হয়। কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীদেরও সংঘ আছে। হিন্দু-মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজা-পার্টি থেকে লেখক-সংঘ গঠনের চেষ্টা হচ্ছে কিনা জানি না।

কাব্য নাটক বা গল্প অবলম্বন করে মতপ্রচারের রীতি নূতন নয়। এদেশের অনেক প্রাচীন কাব্যে দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। টমকাকার কুটীর এবং নীলদর্পণ একাধারে ললিত সাহিত্য ও প্রচারগ্রন্থ। বসন্তের টিকা না নেওয়ার পরিণাম কি ভয়ানক হতে পারে তা রাইডার হ্যাগার্ড ব্রিটিশ সরকারের ফরমাশে লেখা একটি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এমিল ব্রিও যৌন ব্যাধি সম্বন্ধে নাটক লিখেছেন। ইওরোপ আমেরিকার অনেক গল্প আর নাটকে সামাজিক ও রাজনীতিক মতের প্রচার আছে।

কোনও কাব্য নাটক বা গল্পে যদি মতবিশেষের সমর্থন থাকে তাতে আপত্তি

করবার কিছু নেই। ললিত সাহিত্যের লেখক অবসরকালে চা সিগারেট বা কেশতৈলের বিজ্ঞাপন লিখতে পারেন, কিংবা তাঁর গল্পের মধ্যেই অহিংসা কংগ্রেসনিষ্ঠা হিন্দুজাতীয়তা বা কমিউনিস্ট আদর্শের প্রশংসা করতে পারেন। লেখক অলেখক নির্বিশেষে রাজনীতিক সংঘ, গোষ্ঠী বা ক্লাব গঠনের অধিকারও সকলের আছে। কিন্তু যাঁরা মতের লেবেল দিয়ে লেখক-সংঘ গঠন করেন, সাধারণে তাঁদের একটু সন্দিগ্ধভাবে দেখে, মনে করে এঁদের চোখে রাজনীতির ধুলো লেগেছে, এঁরা সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ দৃষ্টি হারিয়েছেন।

রাজনীতিক নাম দিয়ে সাহিত্য-সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা না গেলেও কিছু কিছু অনুমান করা যায়। সাহিত্যসেবীর দলবদ্ধ হয়ে রাজনীতিক লেবেল ধারণ একরকম ব্রত। এই ব্রতধারীদের সংকল্প—এঁরা নিজ নিজ রচনার দ্বারা যথাসম্ভব দলীয় মতের প্রচার এবং বিপক্ষ মতের খণ্ডন করবেন। দল না বেঁধেও এঁরা এই কাজ করতে পারতেন, কিন্তু সংঘের অনুশাসন না থাকলে একনিষ্ঠ সমক্রিয়তা আসে না।

এই দলবন্ধনের ফলে প্রচারের সুবিধা হতে পারে। কিন্তু ললিত সাহিত্যের রচয়িতা পাঠক ও বিচারকের পক্ষে যে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত আবশ্যক তা লেবেলের জন্য ব্যাহত হয়। সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের গন্ধ এসে পড়ে, মনে হয় লেখকের স্বাধীনতা নেই, তিনি দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। যে পাঠক কমিউনিস্ট তন্ত্রের অনুরাগী তিনি কংগ্রেসী লেখকের রচনায় বুর্জোআ স্বার্থবুদ্ধি দেখতে পান। যিনি কংগ্রেসী পন্থায় বিশ্বাসী তাঁর কাছে মার্কা-মারা কমিউনিস্ট লেখকের রচনা অবোধ্য বা দুষ্ট অভিসন্ধি যুক্ত মনে হয়। যে লেখক দলভুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন তিনি পাঠকবর্গের কাছে অধিকতর সুবিচার পেয়ে থাকেন।

রাজনীতি ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যাতে দলগত বিবাদ নেই, যার সঙ্গে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, যার গুরুত্ব অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়েও বেশী। কালোবাজার, প্রতারণা, অমানুষিক স্বার্থপরতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও ছোট বড় যেসব পাপ আমাদের বর্তমান সমাজে মহামারীর মতন ব্যাপ্ত হচ্ছে তার প্রতিবিধানের জন্য সকল সাহিত্যিকই চেষ্টা করতে পারেন।

পূর্বে শোনা যেত যে আমাদের জাতিগত যত দোষ তার মূল হচ্ছে পরাধীনতা, দেশ স্বাধীন হলেই সকল দোষ ক্রমশ দূর হবে। স্বাধীনতা এসেছে

কিন্তু দোষ আগের চেয়ে বেড়েই চলেছে, যা পূর্বে ছিল না তাও দেখা দিয়েছে। এই দোষবৃদ্ধির এক কারণ আমাদের রাষ্ট্রশাসনে অভিজ্ঞতার অভাব, তার চেয়ে বড় কারণ যুদ্ধজনিত জগদ্‌ব্যাপী বিপর্যয়। যে সব পাশ্চাত্ত্য জাতি বহুকাল স্বাধীনতায় অভ্যস্ত তাদেরও নৈতিক অধোগতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের মতন হয় নি। আসল কথা, আমরা যতই ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, আমাদের ধর্মবোধ অর্থাৎ সামাজিক কর্তব্যবোধ বহুকাল থেকেই ক্ষীণ, যেটুকু ছিল যুদ্ধের ধাক্কায় তাও নষ্ট হয়েছে, অনভ্যস্ত প্রভুশক্তি আর নব নব ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে দেশের অনেকে নিরঙ্কুশ স্বার্থসর্বস্ব হয়েছে, অনেক সাধু লোকও অভাবের তাড়নায় বা অপরের দৃষ্টান্তে অসাধু হয়েছে।

সকলের চোখের সামনে নিত্য যে সব অন্যায় ঘটছে তার প্রতিরোধের প্রয়োজন আজ সমস্ত রাজনীতিক বিবাদের উপরে। কংগ্রেস রাজত্বের বদলে সমাজতন্ত্রী হিন্দুমহাসভা কিষান-মজদুর-প্রজা বা কমিউনিস্ট শাসন এলেই আমাদের চরিত্র শুধরে যাবে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। আমাদের বর্তমান দুর্দশার অনেকটার জন্য আমরা দায়ী নই তা ঠিক, কিন্তু যে দোষ আমাদের প্রকৃতিগত, তার প্রতিকার আমাদেরই হাতে, কোনও সরকারের তা দূর করার শক্তি নেই।

ধর্মের অর্থ সমাজহিতকর বিধি, ধর্মপালনের অর্থ সামাজিক কর্তব্যপালন। এই ধর্মবোধ লুপ্ত হওয়ায় সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে, অসংখ্য বীভৎস লক্ষণ সমাজদেহে ফুটে উঠেছে। ধনপতির তোষণ, দরিদ্রের শোষণ, কালোবাজারের প্রসার, সরকারী অর্থের অপব্যয়, উচ্চস্তরের কলঙ্ক চেপে রাখা, ইত্যাদি বড় বড় অপকীর্তির কথা অনেক পত্রিকায় থাকে, লোকের মুখে মুখেও রটনা হয়। কিন্তু যে সব অনাচার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে তার দিকে বিশেষ মন দেওয়া হয় না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকে সজ্ঞানে এবং আরও অনেকে ভেড়ার পালের মতন অজ্ঞানে দুষ্ট লোককে ভোট দেয়। যে লোক দুষ্কর্ম করে ধনী হয়েছে তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার জন্য সাধু লোকেও লালায়িত। অমুক অমুক দুষ্কর্ম করে বড়লোক হয়েছে, তুমিই বা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে থাকবে কেন—এই রকম প্ররোচনা অনেক গৃহস্থ তাঁর পরিবারবর্গের নিকট পেয়ে থাকেন। ঘুষ দেওয়া আর নেওয়া চিরকালই ছিল কিন্তু এখন সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। ছাত্রেরা না পড়েই পাস করতে এবং গায়ের জোরে ডিক্‌টেটর হতে চায়। সরস্বতী পূজা আর দোলের সময় যে

কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় তাতে মনে হয় আমরা বন্য জাতির সগোত্র। শহরের অনেক রাস্তা নৈশ পায়খানায় পরিণত হয়েছে। বাড়ির উপরতলা থেকে কাগজে মোড়া ময়লা অকস্মাৎ পথচারীর গায়ে এসে পড়ে। বোম্বাই আর মাদ্রাজের সঙ্গে কলকাতার রাস্তা বাজার খাবারের দোকান ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আমাদের পৌর নিগম কত অক্ষম, শহরবাসীর পরিচ্ছন্নতা বোধ কত অল্প। যে সব খ্যাতনামা পুরুষের মূর্তি দেশবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজ্ঞাপনের কাগজ এঁটে তার অপমান করা হয়, আমরা তাতে দৃক্‌পাত করি না; অবশেষে যখন স্টেট্‌সম্যান কাগজে এই অনাচারের খবর ছাপা হয় তখন আমাদের হুঁশ হয়। ভদ্র গৃহস্থ ঔষধ আর প্রসাধন দ্রব্যের আধার অতি সাবধানে লেবেল নষ্ট না করে তুলে রাখে এবং জালিয়াতের প্রতিনিধি ফেরিওয়ালার কাছে তা বেশী দামে বেচে। জাল ভেজাল আর নকল দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গুরুতর অপকীর্তির তুলনায় উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হয়তো তুচ্ছ, কিন্তু এইসব সামান্য লক্ষণ থেকেই বোঝা যায় যে সমাজের আপাদমস্তক ব্যাধিত হয়েছে।

আমরা এখনও নিজের অক্ষমতার জন্য ইংরেজ, কেন্দ্রীয় সরকার আর অন্যপ্রদেশবাসীকে গাল দিয়ে মনে করি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ছেলেবেলায় একটি দেশপ্রেমের কবিতা পড়েছিলাম, তার কেবল প্রথম লাইনটি মনে আছে—মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহু-গ্রাসে যেই দিন। তারপর যা আছে তার ভাবার্থ—সেই রাহুগ্রাসের পরেই ভারতের সুখসূর্য অস্তমিত হল। সাবুদ্দিন মহাপাপী হতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ সংহতিহীন ভারতবাসীর পাপ কত বড় লেখক তা বলেন নি। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত আমাদের রক্ষার ভার বিদেশীর হাতে ছিল, এখন আমরা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আত্মরক্ষা সকলকেই শিখতে হবে, আমাদের জোরেই সরকারের জোর—এই সত্য এখনও দেশবাসীর বোধগম্য হয় নি। আমাদের যে খ্যাতি আছে তা প্রতিঘাতসমর্থ শান্ত অহিংস বীরের খ্যাতি নয়, কাপুরুষের খ্যাতি। হিন্দু অতি নিরীহ, মার খেতেই জানে, বাঙালী কাঁদতেই জানে—তর্ক করে এইসব অপবাদ দূর করা যায় না, আচরণ দ্বারা খণ্ডন করতে হবে।

ব্যক্তিগত রাজনীতিক মত যাই থাকুক, আমাদের সকল লেখকই তাঁদের রচনা দ্বারা দেশব্যাপী মোহ আলস্য আর দুষ্প্রবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে

পারেন। এর চেয়ে বড় ব্রত এখন আর কিছু নেই। জনকতক রাজনীতি নিয়ে বিতণ্ডা করুন, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকরা সামাজিক কর্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত করবার চেষ্টা করুন। আমাদের প্রয়োজন—হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক—যাঁরা সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন।. দু-তিন বৎসর পূর্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছোট প্রবন্ধে বিলাসী বাঙালীকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। মনে হয় প্রমথনাথ বিশীরও এই ধরনের লেখা পড়েছি। সম্প্রতি কবিশেখর কালিদাস রায় বর্তমান অবিনয় অসংযম আর অসামাজিকতা সম্বন্ধে একটি সার্থক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি প্রধানত ছাত্র আর অল্পবয়স্কের উদ্দেশে লেখা, কিন্তু তাঁর মৃদু বেত্রাঘাত আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের সকলেরই পিঠে পড়েছে।



ভারতীয় সাজাত্য

(১৩৫৮/১৯৫১)

ভারতবাসী মুসলমানের বিরুদ্ধে এই নালিশ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে যদিও তাদের উৎপত্তি ও নিবাস এই দেশে এবং হিন্দুদের সঙ্গেই রক্তের যোগ বেশী তথাপি তারা আরব-ইরান-তুর্কিকে পিতৃভূমি এবং ওইসব দেশের লোককে নিকটতর আত্মীয় মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের ঐক্যই মিলনের প্রধান সেতু। মাতৃভূমি ভারতের সঙ্গে তারা সম্বন্ধ গণনা করে গজনির সুলতানদের আক্রমণকাল থেকে, তার আগেকার ভারতকে তারা স্বদেশ মনে করে না। এদেশের অন্যধর্মী লোকের সঙ্গে তাদের শুধু রাজনীতির সম্পর্ক আছে, সাজাত্যবোধ এবং সংস্কৃতির যোগ নেই।

উক্ত নালিশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের বলতে পারে—তোমাদের আলাদা পিতৃভূমি নেই তথাপি তোমরা একটা কাল্পনিক পিতৃলোক বানিয়েছ এবং তা থেকেই ধর্ম আর সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছ। ভারতের যারা অতিপ্রাচীন অধিবাসী তাদের তোমরা অসভ্য অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষা করেছ। তোমরা প্রচার করে থাক যে ভারতীয় মুসলমান হিন্দুরই স্বজাতি, অথচ তাদের ম্লেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে রেখেছ, অপমানও করেছ। যাদের সঙ্গে তোমাদের বংশগত সম্পর্ক নগণ্য সেই আর্য জাতি এবং বেদ-পুরাণোক্ত ঋষিগণকেই তোমরা আপন জন মনে কর। কোনও ভারতীয় মুসলমান যদি নিজেকে সৈয়দ অর্থাৎ পয়গম্বরের বংশধর বলে তবে তোমরা মনে মনে হাস, অথচ তোমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরা অম্লানবদনে বলে থাকে যে তারা কশ্যপ ভরদ্বাজ শক্তি প্রভৃতি আর্য ঋষিদের গোত্রজাত, তোমাদের ক্ষত্রিয়রা মনে করে তারা চন্দ্র-সূর্যবংশের সন্তান। আসল কথা, আমাদের ধর্ম ঐতিহ্য সংস্কার রুচি আদর্শ ও রীতিনীতি যেমন বহু অংশে বিজাতীয়, তোমাদেরও তেমনি। তফাত এই যে আমাদের ইতিহাসের একটা সুনির্দিষ্ট আরম্ভ আছে—ইসলামের অভ্যুদয়, কিন্তু তোমাদের তা নেই। সেজন্য পুরাকালে পিছিয়ে গিয়ে বেদ-পুরাণের উপকথার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা নিজেদের ইতিহাস খুঁজছ।

কোনও জাতি যদি চিরকাল অভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে বাস করে তবেই তার ধর্ম সমাজব্যবস্থা সংস্কৃতি ইত্যাদি স্বতন্ত্র ও অনন্যভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাধারণত তা দেখা যায় না, এক জাতির উপর অন্যান্য জাতির প্রভাব নানাভাবে এসে পড়ে। রক্তের মিশ্রণ, বিজাতির অধীনতা বা বিধর্ম গ্রহণ যদি নাও হয় তথাপি পরিবর্তন আসতে পারে। আরব জাতি মুসলমান হবার পরেও প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞান বিনা দ্বিধায় আত্মসাৎ করেছিল এবং মধ্যযুগের ইওরোপ আরবদের কাছ থেকেই গ্রীক বিদ্যা লাভ করেছিল। বর্তমান ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিসকল প্রধানত খ্রীষ্টান, পেগান গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে তাদের ধর্মগত যোগ নেই, বংশগত যোগও বিশেষ কিছু নেই, তথাপি তাদের সংস্কৃতির উপর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির অপরিসীম প্রভাব এসে পড়েছে। ইওরোপ আমেরিকার শিক্ষিত জন সকলেই স্বীকার করেন যে অতিপ্রাচীন বিভিন্ন জাতি থেকে তাঁদের উৎপত্তি হয়েছে, পশ্চিম এশিয়া থেকে তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম পেয়েছেন, গ্রীস রোম থেকে সভ্যতার বীজ স্বরূপ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যা পেয়েছেন, তাঁদের সংস্কৃতির অবশিষ্ট অংশ তাঁরা নিজের যত্নে এবং প্রতিবেশী জাতিদের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন।

সেকালের ভারতবাসী পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে ও জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করত। ষাট-সত্তর বৎসর আগেকার বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় ম্যাক্সম্যুলার প্রভৃতির লেখা পড়ে স্থির করেছিলেন যে আর্যাবর্তের অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় বাঙালী (বিশেষত ভদ্র বাঙালী) আর্যজাতিসম্ভূত। ইংরেজ জার্মন তাঁদেরই প্রাচীন জ্ঞাতি, কিন্তু তারা ভ্রষ্ট আর্য, বৈদিক আর্যই আদি আর্য।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর আর্যতার মোহ দূর হয়েছে। জাতিবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অনেকে এখন বুঝেছেন যে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলেই সংকর, অতিপ্রাচীন অস্ট্রাল মোঙ্গল ভূমধ্য প্রভৃতি জাতি থেকে তাদের উৎপত্তি, কিঞ্চিৎ নর্ডিক রক্তও কারও কারও দেহে আছে। এই সংকরত্ব সর্বত্র সমান নয়, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এবং বংশগতির নিয়মে ভারতবাসী নানাপ্রকার দেহলক্ষণ পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নরজাতির থেকে তারা শুধু দৈহিক উপাদান পায় নি, তাদের সংস্কার অর্থাৎ জাতকর্ম বিবাহ অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতির রীতি, নানাপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধ, ভারতীয় লিপি, জ্যোতিষ, দার্শনিক মত, কৃষিপদ্ধতি, বাস্তুকর্ম, মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি, লোহাপাথর

থেকে লোহা তৈরি, বন্য ঘোড়া বশ করে তার পিঠে চড়া আর রথে জোতা, কাপড় সেলাই করে জামা-ইজার তৈরি প্রভৃতি অসংখ্য প্রথা বিদ্যা আর কৌশল লাভ করেছে।

ভারতীয় হিন্দুর পৃথক পিতৃভূমি নেই, অর্থাৎ ভারতের বাইরে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে হিন্দুধর্ম প্রথমে উদ্‌ভূত হয়েছিল এবং যেখানে এখনও হিন্দু আছে। বৈদিক আর্যগণের আদিভূমি উত্তর মেরুর কাছে বা চীন-তুর্কিস্থানে বা উত্তর-পারস্যে হতে পারে, কিন্তু এখন সেখানে হিন্দু নেই। মুসলমানের যেমন আরব ইরান তুর্কি আছে হিন্দুর সেরকম কিছু নেই, তার ফলে হিন্দুর সাজাত্যবোধ এবং সমস্ত ঐতিহ্য ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। হিন্দুর ধর্ম ভারতেই উৎপন্ন হয়েছে, তার উপাদান শুধু বেদ আর তন্ত্র নয়, বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রীষ্টান এবং বহু আদিম জাতির ধর্মও তাকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুর রক্ত, সংস্কার, ধর্ম কিছুই অবিমিশ্র নয়। ভারতে উদ্‌ভূত অতি জটিল হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে গত দেড় শ বৎসরে ইওরোপীয় সংস্কৃতিরও যোগ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

স্বধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মচ্যুতির অকারণ আশঙ্কা জড়িত থাকে। গোঁড়া হিন্দু ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, কৃত্য-অকৃত্য, কাল-অকাল প্রভৃতি বিচার করে সাবধানে জীবনযাপন করে। মিথ্যা কথা, প্রতারণা বা পরস্বাপহরণে ধর্মচ্যুতি হয় না, কিন্তু গ্রহণের সময় খেলে বা বিধবাকে গহনা পরতে দিলে হয়। সাধুতার চেয়ে লোকাচার বড় এই ধারণা সকল ধর্মের গোঁড়া লোকের মধ্যে আছে। যারা স্মরণীয় কালের মধ্যে ধর্মান্তর নিয়েছে অথবা সমাজের এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠেছে তাদের মধ্যে পূর্বধর্মের ছোঁয়াচ লাগবার প্রবল আশঙ্কা দেখা যায়। পৌত্তলিকতা প্রতিরোধের জন্য মুসলমান ধর্মে যত কঠিন বিধি আছে খ্রীষ্টধর্মের কোনও শাখায় ততটা দেখা যায় না। এই সব বিধিনিষেধের আদি কারণ মুসলমান সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। এর মূলে এই আশঙ্কা থাকতে পারে যে পূর্বপুরুষদের উৎসববহুল সরস ধর্মের প্রতি লোকের একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ আছে, একটু অসতর্ক হলেই পতন হবে। হিন্দুর অনেক নিয়মের মূলেও হয়তো এই ধারণা আছে যে লঙ্ঘন করলেই অনার্যতার মোহময় পঙ্কে পড়তে হবে। শিক্ষিত বাঙালী খ্রীষ্টানদের মধ্যেই এই শুচিবাতিক দেখা যেত, কিন্তু এখন বোধ হয় কমে গেছে। এককালে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উপর অনেক সামাজিক নির্যাতন

হয়েছে। দেশী খ্রীষ্টানদের উপর তেমন কিছু হয় নি, কারণ তাঁরা সাহেব পাদরীর আশ্রিত। অসহায় ব্রাহ্মরা আত্মরক্ষার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের সংশ্রব যথাসম্ভব পরিহার করতেন এবং স্বধর্মচ্যুতির ভয়ে পৌত্তলিকতার সকল চিহ্ন এড়িয়ে চলতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিত হিন্দুর গোঁড়ামি আর অনুদারতা আজকাল অনেক কমে গেছে, ব্রাহ্মদেরও স্বতন্ত্রভাব এবং ধর্মচ্যুতির আতঙ্ক পূর্বের মতন নেই।

রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' পুস্তকে 'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের এই অর্থ দিয়েছেন—

হিন্দু সমাজে যে সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন—

আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া। সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নয়। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া। তবে কি মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো? নিশ্চয়ই পারি।... বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীষ্টান, আর এক ভাই মুসলমান, ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্রে বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনই দুঃসাধ্য নহে...কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর।... মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক অর্থে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে অর্থ এখন চলবার কোনও সম্ভাবনা নেই। হিন্দু শব্দের আধুনিক অর্থ দাঁড়িয়েছে—ভারতজাত-ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ জৈন শিখ ব্রাহ্ম সনাতনী—এরা হিন্দু, কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দু নয়। যদি এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার্থের প্রচলন নাও হত

তথাপি কোনও মুসলমান হিন্দু নামের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইত না। রবীন্দ্রনাথ যে সাজাত্যবোধ কামনা করেছিলেন তা এখন 'ভারতীয়' নামের উপর গড়ে উঠতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে nationality বা সাজাত্যের কারণ—নিবাস, উৎপত্তি (origin), ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য (tradition), সংস্কৃতি ও স্বার্থের ঐক্য। কোনও রাষ্ট্রে এই ঐক্য পুরোপুরি না থাকলেও সাজাত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ঐতিহ্যের ঐক্য নেই, ধর্মও সমান নয় (প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ইহুদী), ভাষার ঐক্য প্রয়োজনের বশে হয়েছে। কানাডারও ওই অবস্থা, সেখানে ভাষারও ঐক্য নেই। সুইটজারলান্ডেও উৎপত্তি ভাষা আর ধর্ম সমান নয়। সোভিএট রাষ্ট্রে নিবাস আর স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর ঐক্য নেই, ধর্ম সেখানে দুর্বল সেজন্য গণ্য নয়। তথাপি এই সব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সাজাত্য লাভ করেছে। সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ভাষার যতই ভেদ থাকুক, প্রদেশের (রাজ্যের বা স্টেটের) মধ্যে ভেদ সর্বত্র নেই, পশ্চিমবঙ্গে মোটেই নেই, স্বার্থও সকলের সমান।

ভারত-পাকিস্থান বিরোধ মিটতে হয়তো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু ভারতীয় প্রজার মধ্যে প্রীতি ও সাজাত্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দেরি করা চলবে না। হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে এ কথা চাপা দিয়ে লাভ নেই। এই অপ্রীতির কারণ নিয়ে দুই পক্ষের অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। কার দোষ কত তার আলোচনা না করে এখন মিলনের উপায় খোঁজাই দরকার। পরিবার গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র সর্বত্রই মিলনের সূত্র প্রধানত মানসিক বা ভাবগত—সমান মন্ত্র, সমান উদ্দেশ্য, সমান মন, সমান আকূতি। যদি ধর্ম সমান হয় এবং নিষ্ঠা মোহমুক্ত হয় তবে মিলন সহজেই হতে পারে। কিন্তু যেখানে ধর্ম পৃথক এবং নিষ্ঠা মোহগ্রস্ত সেখানে বিরোধ আসে। মধ্যযুগের ইওরোপে প্রায় সমস্ত বিরোধের মূলে ছিল ধর্মান্ধতা। সেই ধর্মান্ধতা এখন নেই, তার স্থানে এসেছে স্বার্থান্ধতা।

বেদ স্মৃতি কোরান শরিয়ত প্রভৃতিতে যা লেখা আছে তাই ধর্ম—এ কথা সত্য নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে লোকে যেমন আচরণ করে তাই তার ধর্ম। মূঢ় হিন্দুর ধর্মে বলে, মুসলমানেরা দেশের কণ্টক, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো না; ভগবান কল্কী যথাকালে অবতীর্ণ হয়ে ধূমকেতুর ন্যায় করাল করবাল দিয়ে ম্লেচ্ছনিবহ সংহার করবেন। মূঢ় মুসলমানের ধর্মে বলে,

কাফেরকে বধ করলে বা জোর করে কলমা পড়ালে বা তাদের মেয়ে কেড়ে নিলে পাপ হয় না, পুণ্যই হয়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে হিন্দুর ধর্মান্ধতা অনেক কমেছে, মুসলমানেরও ক্রমশ কমবে। সংস্কারমুক্ত হিন্দু মুসলমান যদি পুরোহিত আর মোল্লার আসন অধিকার করে উদার ধর্মমত প্রচার করেন তবে শীঘ্রই সুফল দেখা দিতে পারে।

সাজাত্যের যে সকল কারণ পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। এই দুটির দ্বারা ধর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতির অনেক ঐক্য আছে, অনৈক্য যা দেখা যায় তার মূলে আছে ঐতিহ্যের ভিন্নতা। ঐতিহ্যের যদি সমন্বয় ও প্রসার হয় তবে সংস্কৃতির ভেদ কমে যাবে, ধর্মের নামে যে অপধর্ম চলছে তার সংস্কার হবে।

ভারতের পরম্পরাগত যে ঐতিহ্য তাতে হিন্দু আর মুসলমানের সমান অধিকার। ভ্রান্তির বশে মুসলমান তার পূর্বপুরুষদের এই ঋক্‌থ বর্জন করেছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় আর সাহিত্যে শুধু হিন্দুর ওয়ারিসী স্বত্ব নেই, তাতে শুধু বহুদেববাদ আর পৌত্তলিকতা আছে একথাও সত্য নয়। মিশ্রণ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হতে পারে না। নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টানও সাগ্রহে গ্রীক রোমান ঐতিহ্য চর্চা করেন, এমন মনে করেন না যে পেগান শাস্ত্র পড়লে বা পেগান সংস্কৃতির চর্চা করলে তাঁর ধর্মনাশ হবে। মিশর ও ইরান দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের অমুসলমান পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও ঐতিহ্য আলোচনা করে গৌরব বোধ করেন, এ ভয় তাঁদের নেই যে এতে ইসলামের হানি হবে। বলা যেতে পারে যে পেগান গ্রীক আর রোমান এখন নেই, মিশরের বহুদেববাদীরাও লোপ পেয়েছে, ইরানের অতি প্রাচীন ধর্মের লেশমাত্র নেই, সেখানে জরথুস্ত্রপন্থী যারা আছে তারা সংখ্যায় নগণ্য; সুতরাং এই সব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলে মুসলমানের আদর্শনাশের ভয় নেই। কিন্তু ভারত? এখানে যে হিন্দুরা জলজীয়ন্ত হয়ে বর্তমান রয়েছে, পুরাকালের সমস্ত বিষয় আঁকড়ে ধরে আছে। মুসলমান যদি তার পূর্বপুরুষদের সম্পদে হাত দিতে চায় তবে মাছির মতন মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়বে।

এই যুক্তিহীন আতঙ্ক শিক্ষিত মুসলমানরা দূর করতে পারেন। হিন্দু যখন

ভারতীয় বিদ্যার বা কলার চর্চা করে তখন নির্বিচারে করে না, তার আধুনিক রুচি আর শিক্ষা অনুসারেই করে। মুসলমানও তাই করবে। হিন্দুর দৃষ্টিতে যা অনবদ্য মুসলমান তা অবদ্য মনে করতে পারে। হিন্দুর বিশ্বাস থাকতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; তাঁর চার হাত ছিল, তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মুসলমানের কাছে এসব কথা অশ্রদ্ধেয় হতে পারে, কিন্তু তার জন্য গীতা পড়া চলবে না কেন? আরব্য উপন্যাস আর ওমর খৈয়াম পড়ে হিন্দু আনন্দ পায়, সুফী সাহিত্য তার ভাল লাগে; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়েও মুসলমান আনন্দ পেতে পারে।

কয়েকজন উদারস্বভাব বাঙালী মুসলমান তাঁদের রচনার দ্বারা হিন্দুর চিত্ত জয় করেছেন। কবি কাইকোবাদ তাঁর একটি কাব্যে হিন্দু নায়িকার মুখে কালীর স্তব দিয়েছেন, তাতে কবির ধর্মনাশ হয় নি, উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সর্বজনপ্রিয় কবিতায় হিন্দু আর ইসলামী ভাবের সমন্বয় করে যশস্বী হয়েছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর লেখার নূতন ভঙ্গীর জন্য অল্পকালের মধ্যে অসংখ্য পাঠকের প্রিয় হয়েছেন। তিনি নিজে যেমন সংস্কারমুক্ত বিশ্বনাগরিক, তাঁর রচনাও সেই রকম; সংস্কৃত ফারসী আরবী ইংরেজী জার্মন প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ আর বাক্য চয়ন করে স্বচ্ছন্দ নিপুণতায় তাঁর লেখায় সন্নিবিষ্ট করেছেন।

মুসলমান এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলেই যথেষ্ট হবে না। ভারতের বাইরে থেকে মুসলমান যে ঐতিহ্য নিয়েছে, যার ফলে তার সংস্কৃতি বিশেষ রূপ পেয়েছে, হিন্দুকে তা অবশ্যই জানতে হবে, নতুবা ব্যবধান দূর হবে না। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই এইপ্রকার পরস্পর পরিচয় আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই বিষয়ে উদ্‌যোগী হতে পারেন।



বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

(১৩৫৮/১৯৫১)

যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যারা ইংরেজী জানে না বা অতি অল্প জানে। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোক এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজী জানে এবং ইংরেজী ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। গুটিকতক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে, যেমন টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, ক্রোটন, জেব্রা। অনেক রকম স্থূল তথ্যও তাদের জানা থাকতে পারে, যেমন জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চাইতে আলিউমিনিয়ম হালকা, লাউ কুমড়ো জাতীয় গাছে দুরকম ফুল হয়। এই রকম সামান্য জ্ঞান থাকলেও সুশৃঙ্খল আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর পাঠক ইংরেজী ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেজন্য বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়। ছেলেবেলায় আমাকে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি পড়তে হয়েছিল। 'এক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইবে'—এর মানে বুঝতে বাধা হয় নি, কারণ ভাষাগত বিরোধী সংস্কার ছিল না। কিন্তু যারা ইংরেজী জিওমেট্রি পড়েছে তাদের কাছে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি সুশ্রাব্য ঠেকবে না, তার মানেও স্পষ্ট হবে না। যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত। আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজ কার্যে দেশী পরিভাষা চালাচ্ছেন, তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন, কারণ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলায় বিজ্ঞান শেখে তখন ভাষার জন্য তার বাধা হয় না, শুধু বিষয়টি যত্ন করে বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে তাকে বেশী চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন তাকে পূর্ব সংস্কার দমন করে (অর্থাৎ ইংরেজীর প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত বর্জন করে) প্রীতির

সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশী চেষ্টা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্‌যোগের এই ত্রুটি ছিল যে তাঁরা একযোগে কাজ না করে স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন, তার ফলে সংকলিত পরিভাষার সাম্য হয় নি, একই ইংরেজী সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষাসমিতি নিযুক্ত করেছিলেন* তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কয়েকজন লেখক একযোগে কাজ করেছিলেন, তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।

পরিভাষা রচনা একজনের কাজ নয়, সমবেত ভাবে না করলে নানা ত্রুটি হতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন খুব বড় নয়, আরও শব্দের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু দরকার মতন বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক রচনা চলতে পারে। যত দিন উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচিত না হয় তত দিন ইংরেজী শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত সমিতি বিস্তর ইংরেজী শব্দ বজায় রেখেছেন। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজী নামই বাংলা বানানে চলবে, যেমন অক্সিজেন, প্যারাডাই-ক্লোরোবেনজিন। উদ্‌ভিদ ও প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজী (বা সার্বজাতিক, international) নামও বাংলায় চালানো যেতে পারে, যেমন ম্যালভাসী, ফার্ন, আরথ্রোপোডা ইনসেক্টা।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলে কোনও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন। ইওরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য এবং সাধারণে তা সহজেই বোঝে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা তেমন নয়, বয়স্কদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতন গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবে

* এই সমিতির সভাপতি ছিলেন—রাজশেখর বসু। —সঃ

না। অবশ্য কালক্রমে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে এই অসুবিধা দূর হবে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি, অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। অনেক লেখক মনে করেন, ইংরেজী শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজী sensitive শব্দ নানা অর্থে চলে, যেমন sensitive person, wound, plant, balance, photographic paper, ইত্যাদি। বাংলায় অর্থভেদে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত, যেমন অভিমানী, ব্যথাপ্রবণ, উত্তেজী, সুবেদী, সুগ্রাহী। Sensitized paper-এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ অতি উৎকট, কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন। সুগ্রাহী কাগজ লিখলে ঠিক হয়।

অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage,—'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পৌঁছায় নি।' এ রকম বর্ণনা বাংলা ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু এঞ্জিনের নক্শা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয় নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction—'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না।' এ রকম মাছিমারা নকল না করে 'নাইট্রোজেনের কোনও পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।

অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন 'অমেরুদণ্ডী'র বদলে লেখা যেতে পারে, যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু 'আলোকতরঙ্গ'এর বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছু মাত্র সহজ হয় না। পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনও বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয়

তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্প পরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থলবিশেষে ইংরেজী নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।

আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'দেশ'এর অর্থ ভারত ইত্যাদি, অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা'—এখানে লক্ষণায় দেশের অর্থ দেশবাসীর। 'অরণ্য'এর আভিধানিক অর্থ বন, কিন্তু 'অরণ্যে রোদন' বললে ব্যঞ্জনার অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাধারণ সাহিত্যে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভাল। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, রূপকও স্থলবিশেষে চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জন করাই উচিত। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক—এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী এই প্রবাদটি যে কত ঠিক তার প্রমাণ আমাদের সাময়িক প্রশ্নাদিতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি—'অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।' এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর। সম্পাদকের উচিত অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া।



জীবনযাত্রা

(১৩৫৯/১৯৫২)

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high thinking—এই বাক্যটি এক কালে খুব শোনা যেত। এখন তার বদলে শোনা যায়—জীবনযাত্রার মান বা standard of living বাড়াতে হবে। এই দুই আপাতবিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত না করেও জীবনযাত্রা কতটা সরল করা যায়? তার নিম্নতম মান কি?

গ্রীক সন্ন্যাসী ডায়োজিনিস একটা পিপের মধ্যে রাত্রিযাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং লোকে দয়া বা ভক্তি করে যা দিত তাতেই তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। এই রিক্ত জীবনযাত্রা তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয় নি। বাংলায় 'উঞ্ছ' শব্দ হীন নীচ বা তুচ্ছ অর্থে চলে। কিন্তু এর মূল অর্থ—ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারীর অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে আছে—এক উঞ্ছব্রতী সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্রাহ্মণ ফলমূল জীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রবল নৈয়ায়িক' বুনো রামনাথের কথা লিখেছেন, যিনি বনের ভিতর ছাত্র পড়াতেন এবং সস্ত্রীক শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ইনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর কোনও অনুপপত্তি (অভাব) নেই।

যাঁরা নিস্পৃহ সন্ন্যাসী এবং যাঁদের পোষ্য কেউ নেই, অথবা যাঁদের পোষ্যবর্গ অত্যল্পে তুষ্ট, তাঁদেরও জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক। সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আদ্য সাধন, যা না হলে উচ্চ চিন্তা জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় চাই। যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে রুগ্ন বা দুর্বল লোকে তা পারে না।

উচ্চ চিন্তা বা জ্ঞানচর্চা এবং সর্বভূতের হিতসাধন বা লোকসেবা—এই

দুইএর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক তা নেই। একালের আদর্শ অনুসরণের জন্য যে অল্পতম জীবনোপায় বা necessaries of life আবশ্যক তাও বদলে গেছে, সেকালের উঞ্ছব্রত এখন অসাধ্য। যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা না হলে জীবনযাত্রা চলে না।

অত্যল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধারণ মানুষ ভোগবিলাস চায়। অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ চিন্তা ও সৎকর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। তথাপি দেখা যায়, ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকেই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়। এই কারণে সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা সর্ব দেশে সর্বকালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে।

অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। আদর্শের অনুসরণ দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার অবসর নেই। কোনও লোক জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করুক বা না করুক, সে রাজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা মজুর যাই হক, মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্য কতকগুলি বিষয় তার অবশ্যই চাই, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান কি? দেশভেদে শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ হবে। বৃত্তিভেদেও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের আহার আশ্রমিকের সমান হলে চলবে না। এই রকম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেনে নিয়েও সর্বসাধারণের জন্য জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? ফর্দ করে বা অঙ্কপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্তু জীবনযাত্রার যা প্রধান মাপকাঠি—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ, তার দ্বারা একটা স্থূল ধারণা করা যেতে পারে।

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের আধুনিক নাম বুর্জোআ) স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে। বিগত ষাট-সত্তর বৎসরে এই সমাজে জীবনযাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধের যে পরিবর্তন দেখেছি তা বিচার করলে হয়তো মান নির্ধারণের সূত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে* ছিলাম। বিহারীর

* দরভঙ্গা।

তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রায় আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন তাঁরও অন্নবস্ত্র আর বাসস্থানের অভাব হত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো তক্তাপোশ আর গোটাকতক বেঢপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দূরে, বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হত। লোকে কদাচিৎ ঔষধার্থে চা খেত। সিগারেট তখন নূতন উঠেছে, গুটিকতক বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্থরা প্রায় সকলেই তামাক খেতেন। সুগন্ধ মাথার তেল দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউন্টেন পেন হাতঘড়ি ছিল না, যারা ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেটঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জানা ছিল। আমোদের ব্যবস্থা—কালীপুজোর সময় শখের থিয়েটার, কালেভদ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান গল্প তাস পাশা দাবার আড্ডা। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'তে দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হত। বাংলা গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকৃষ্ট বইও লোকে সাগ্রহে পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের যাঁরা আজকাল কলকাতায় বা অন্য শহরে বাস করেন তাঁদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। এঁরা সেকালের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এঁদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন দুর্মূল্য হয়েছে এবং এঁরা অনেক বিষয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহার নিকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমোদের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর ধুতি পঞ্জাবিতে তুষ্ট নয়, দামী প্যান্ট আর নানা রকম শৌখিন জামা চাই। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রসাধন দ্রব্য দরকার। মেয়েদের যেমন অন্তত এক গাছা চুড়ি পরতে হয় ছেলেদের তেমনি হাতঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে অনেকবার চা চাই। সস্তা গুড়ুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে চলে না। গ্রামোফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের

হালচাল জানবার জন্য রোজ একাধিক খবরের কাগজ পড়তে হয়।

নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অনুভূতি থেকে বলতে পারি—একালের তুলনায় সেকালে মধ্যবিত্তের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ—যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দূতীদের দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লড্ডু আর পানীয় খেলেন অমনি তাঁর মনে হল যে এত দিন বৃথাই কেটেছে।

সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে যদি মন্ত্রবলে হঠাৎ একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়িভাড়া আর চাকর রাখার খরচ দেখে তিনি আঁতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানা রকম আধুনিক সুবিধা ও আরামভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে ফেলা হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল জিনিস খেয়ে বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কলের জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক পত্রিকা, সেফটি ক্ষুর, কামাবার সাবান, অজস্র চা এবং ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তাঁর বয়স কম হয় তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরাঁর খাবার, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ, নাচ-গানের জলসা, দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হুল্লোড়, আর টাটকা রাজনীতিক খবরের অভাবে ছটফট করবেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি দেখা যেত, সাধারণের জন্য টেলিফোন ছিল না। তাতে বড় কর্মচারী উকিল ডাক্তার বা ব্যবসাদার কোনও অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছুকালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব অপরকেও রাখতে হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, রাশিয়া বিস্তর সামরিক বিমান করেছে অতএব আমেরিকাকেও করতে হবে। আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে অতএব রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলেই সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্লেনে না গেলে অনেকের চলে না। আজ যদি জনকতক ধনী হেলিকপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে

যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্য অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগের জন্যই যে নূতন নূতন জিনিস অপরিহার্য হয়েছে এমন নয় অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্যও হয়েছে। খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সরকার আইন করে ভূরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, মদের দামও খুব বেড়ে গেছে কিন্তু উচ্চ সমাজের পার্টিতে বা আড্ডায় স্ত্রী-পুরুষের অল্পাধিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পয়সা খরচ করে বলনাচ শিখছে। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছিল তখন বিদেশী জিনিস ব্যবহারে যে সংকোচ এবং বিলাসিতায় যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে যা ছিল না বা থাকলেও যা আবশ্যক গণ্য হত না এখন তা অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের লোক কুইট ইন্ডিয়া বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি অনাবশ্যক গণ্য করা হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ বা জীবনোপায় দাঁড়ায়—যথোচিত (অর্থাৎ বাহুল্যবর্জিত) খাদ্য বস্ত্র আবাস, এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম আর পরিমিত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। ...

আমেরিকায় এবং ইওরোপের অনেক দেশে জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখনও যা বড়মানুষি বা বাড়াবাড়ি, পাশ্চাত্ত্য দেশে তা necessary, যেমন, মোটরকার, রিফ্রিজারেটর, বিজলী-উনন, ধুলো-ঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল, মদ, টিনে রাখা খাবার, নানা রকম পোশাক, মুখ ঠোঁট আর নখের রং, নাচঘর, নাইট ক্লাব ইত্যাদি। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে—এই উপদেশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে

থাকেন। তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার তুলনা করে কৃপাবশে এই কথা বলেন। জীবনযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হবে, এদেশের শ্রমিক অল্প বেতনে কাজ করে বিদেশী শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগ করবে না—এই স্বার্থবুদ্ধিও উপদেশের পিছনে থাকতে পারে।

ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়, সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। ইওরোপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় এদেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও বেশী। ব্রিটেনে নানা রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ কমছে, ধনীর জীবনযাত্রার মান নামছে। এদেশের সরকারও আয়কর ইত্যাদির দ্বারা এবং বিদেশী বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্ বস্তু জীবনযাত্রার জন্য একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত বিচার হয় নি, এবং তদনুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার চেষ্টাও হয় নি।

সম্প্রতি এদেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থেকে অধঃপাতে যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি। তাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজার মধ্যে ভাগ করে দিলেও দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু দুর্নীতি যেমন সংক্রামক, বিলাসিতাও সেই রকম, সে কারণে উপেক্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতার লোভ। এদেশের ভদ্রসন্তান শ্রমসাধ্য জীবিকা চায় না সেজন্য তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাস-বাসনা আছে কিন্তু সদুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটরি রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে নেবার বিশেষ সুবিধা নেই, ইতরভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহযবনিকার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে দরিদ্র সোভিএট প্রজা বিদেশী ধনী রাষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়।

পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে—want more, work more, earn more, অর্থাৎ আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, ক্রমশ জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের শাস্ত্র উলটো কথা বলে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শান্তি আসে না, পৃথিবীতে যত ভোগ্য বিষয় আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই—এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি। এ কারণে সর্বত্র লোভ অসন্তোষ আর প্রতিযোগ বাড়ছে, যার পরিণাম পরদেশলিপ্সা ও যুদ্ধ।

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ জনের মোটর গাড়ি আছে, প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেমা আছে, সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এত মাত্রা তড়িৎ, এত পাউন্ড মাখন, এত পাউন্ড সাবান, এত গ্যালন পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও তাই হওয়া উচিত—এই প্রকার অন্ধ আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন-সামর্থ্য বুঝেই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্যক তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক সুবিধা এখন স্থগিত রাখতে হবে।

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানো হয় তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর (যেমন বস্ত্রের) দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয়। এই দুষ্টচক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে।

আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বস্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির শিক্ষা আমরা হৃদয়ংগম করেছি—এইসব কথা আত্মপ্রতারণা মাত্র। জাতীয় চরিত্রের সংশোধন না হলে আমাদের নিস্তার নেই। সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম পরিকল্পনা করছেন যার সুফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। এখন যারা অল্পবয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। তার জন্য এমন শিক্ষক চাই যাঁর যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের অবস্থায় তুষ্ট। শুধু বিদ্যা নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল থেকে তিনি

আচার ও বিনয় (discipline) শেখাবেন, মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় সদভ্যাস ও সৎকর্মের প্রেরণা দেবেন। আমাদের সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আবদার মঞ্জুর করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের মর্যাদা বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাঁর কাজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝবার মত দূরদৃষ্টি সরকার বা জনসাধারণের হয় নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত হয়ে আছেন।



জন্মশাসন ও প্রজাপালন

(১৩৬০/১৯৫৩)

পুরাণে আছে, মানব ও দানবের পীড়নে বিপন্না বসুন্ধরা যখন ত্রাহি ত্রাহি রব করতে থাকেন তখন নারায়ণ কৃপাবিষ্ট হয়ে ভূভার হরণ করেন। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই পুরাণোক্তির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—কোনও প্রাণিসংঘ যদি পরিবর্তিত প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে না পারে অথবা নিজের সমাজগত বিকারের প্রতিবিধান করতে না পারে তবে তার ধ্বংস হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মে পুরাকালের অনেক জীব এবং সমৃদ্ধ মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পৃথিবী এখন একসত্তা, তার একটি অঙ্গ রুগ্ন হলে সর্ব দেহের অল্পাধিক বিকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেকালে এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগ অল্পই ছিল। নেপোলিয়নের আমলে প্রায় সমস্ত ইওরোপ যুদ্ধে লিপ্ত হলেও এশিয়া তাতে জড়িয়ে পড়ে নি। চল্লিশ বৎসর পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্র ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে তফাতে থাকত। চীন দেশে বা ভারতে দুর্ভিক্ষ হলে বিলাতের বণিক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হত, কিন্তু জনসাধারণ তার জন্য উৎকণ্ঠিত হত না। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় প্রজার বিশেষ অনিষ্ট হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের এই পৃথগ্‌ভাব এখন লোপ পেতে বসেছে। জার্মনি আর জাপানে স্থানাভাব, জীবনযাত্রা ও শিল্পের উপাদানও যথেষ্ট নেই, তার ফলে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হল। ভারত আর এশিয়ার অন্যান্য স্থানের দারিদ্র্য দেখে আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে, পাছে সমস্ত প্রাচ্য দেশ কমিউনিস্টদের কবলে যায়।

বহুদেশের লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। কবি হেমচন্দ্রের ভারতভূমি ছিল 'বিংশতি কোটি মানবের বাস', এখন খণ্ডিত ভারতেরই লোক সংখ্যা ৩৬ কোটি এবং প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ বাড়ছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২০ বৎসর আগে প্রায় ১৮৫ কোটি ছিল, এখন ২০০ কোটির বেশী হয়েছে। সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের প্রজাবৃদ্ধির হার অনেক বেশী, কিন্তু এক দেশে অন্নাভাব আর স্থানাভাব হলে সকল

দেশের পক্ষে তা শঙ্কাজনক। পৃথিবীতে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ভূমি এবং খনিজ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ যা আছে তার যথোচিত বিভাগ হলে সমস্ত মানবজাতির উপস্থিত প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু রাজনীতিক ও অন্যান্য কারণে তা অসম্ভব। ভারতের নানা স্থানে বাঙালী পঞ্জাবী ও সিন্ধী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ব্রিটেন জার্মনি ও ইটালির বাড়তি প্রজাও অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় আশ্রয় পাচ্ছে, কিন্তু সেসব দেশে ভারতীয় বা জাপানী প্রজার বসতি নিষিদ্ধ। যেখানে প্রচুর তেল কয়লা প্রভৃতি খনিজ বস্তু বা খাদ্যসামগ্রী আছে সেখান থেকে মাল পাঠিয়ে অন্য দেশের অভাব অবাধে পূরণ করা যায় না। পৃথিবী একসত্তা হলেও একাত্মা হয় নি।

প্রায় দেড় শ বৎসর পূর্বে মালথস বলেছিলেন, খাদ্যের উৎপাদন যে হারে বাড়ানো যেতে পারে তার তুলনায় জনসংখ্যা বেশী গুণ বেড়ে যাবে, অতএব জন্মশাসন আবশ্যক, নতুবা খাদ্যাভাব হবে। এদেশের অনেকে মনে করেন, লোকসংখ্যা যতই বাড়ুক তার জন্য আতঙ্কের কারণ নেই, যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার যোগাবেন। ভারতে ভূমির অভাব নেই, একটু চেষ্টা করলেই চাষবাসের যোগ্য বিস্তর নূতন জমি পাওয়া যাবে, জলসেক আর সারের ভাল ব্যবস্থা হলে ফসল বহু গুণ বেড়ে যাবে। আর জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ভাল নয় বটে, কিন্তু তার প্রতিকার সংযমের দ্বারাই করা উচিত, কৃত্রিম উপায়ের প্রচলন হলে ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রশ্রয় পাবে। এঁরা মনে করেন উপদেশ দিয়েই জনসাধারণকে সংযমী করা যেতে পারে।

যাঁরা দূরদর্শী জ্ঞানী তাঁরা এই যদ্‌ভবিষ্য নীতি মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। খুব চেষ্টা করলে কৃষিযোগ্য ও বাসযোগ্য জমি বাড়বে এবং খাদ্য বস্ত্র ও শিল্পসামগ্রীর অভাব মিটবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাদ্যবস্ত্রাদি বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। যদি বর্তমান হারে লোকসংখ্যা বেড়ে যায় তবে এমন দিন আসবে যখন এই বিপুলা পৃথিবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, বিজ্ঞানের চূড়ান্ত চেষ্টাতেও ফল হবে না। অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমায় নয়, ভাবী মহাযুদ্ধে নয়, গ্রহনক্ষত্রের সংঘর্ষেও নয়; বর্তমান সভ্যসমাজের রীতিনীতিতেই এমন বিকারের বীজ নিহিত আছে যার ফলে অচির ভবিষ্যতে মানবজাতি সংকটে পড়বে।

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র যদি স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে সর্ব মানবের হিতার্থে

একযোগে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে সংকট নিবারিত হতে পারে। কিন্তু তার আশা নেই, সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই যথাসাধ্য স্বয়ম্ভর হতে হবে, প্রজাসংখ্যা আর জীবনোপায় (necessaries of life)এর সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সংকট যে বহুদূরবর্তী নয় সে বিষয়ে দূরদর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নেই, কিন্তু তার স্বরূপ আর প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁরা এখনও বিশদ ধারণা করতে পারেন নি। সংকটের যেসব লক্ষণ ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার প্রতিকারের সদুপায় বা কদুপায় যা হতে পারে তার একটা স্থূল আভাস দেবার জন্য দুটি কাল্পনিক দেশের বিবরণ দিচ্ছি—মনুজরাজ্য ও দনুজরাজ্য। মনে করা যাক দুই দেশেরই জনসংখ্যা পর্যাপ্ত, কৃষি ও বাসের যোগ্য ভূমি এবং জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক দ্রব্যও যথেষ্ট আছে, যদি আরও কিঞ্চিৎ প্রজাবৃদ্ধি হয় তাতেও অনটন হবে না।

মনুজরাজ্যে ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর প্রজাই আছে। রোগপ্রতিষেধ, চিকিৎসা, শিক্ষাপ্রসার, শিল্পপ্রসার, জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ইত্যাদি প্রজাকল্যাণের সকল চেষ্টাই করা হয়। কালক্রমে দেখা গেল প্রজাবৃদ্ধি অত্যধিক হচ্ছে। দেশের শাসকবর্গ কৃষি ও শিল্পবৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন, জন্মশাসনের যেসব নিশ্চিত উপায় আছে তাও জনসাধারণকে শেখাতে লাগলেন। শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে শীঘ্রই তা বহুপ্রচলিত হল, কিন্তু অশিক্ষিত ও দরিদ্র নিম্নশ্রেণী শিখতে চাইল না। শিক্ষিত জনের তুল্য তাদের চিত্তবিনোদনের নানা উপায় নেই, ইন্দ্রিয়সেবাই সর্বাপেক্ষা সুলভ বিলাস, তাতে কিছুমাত্র বাধা তারা সইতে পারে না। দশ-বিশ বৎসর পরেই দেখা গেল পূর্বের তুলনায় ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার কমে আসছে এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পূর্ববৎ বাড়ছে। শাসকবর্গ এর জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন না. মনে করলেন নিম্নশ্রেণীও কালক্রমে শিক্ষিত হয়ে ভদ্রজনের আচরণ অনুসরণ করবে। ভদ্রের সংখ্যা কমে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা বংশগত নয়, শিক্ষার ফলে ইতর জনও ভদ্রত্ব ও তদুচিত গুণাবলী লাভ করবে। একটা আশঙ্কা এই আছে যে সর্বসাধারণের মধ্যে জন্মনিরোধ প্রচলিত হলে ভবিষ্যতে প্রজাসংখ্যা অত্যন্ত কমে যেতে পারে। কিন্তু তার প্রতিকার সুসাধ্য, উপযুক্ত প্রচারের ফলে এবং বহু সন্তানবতীকে পুরস্কার দিলে জন্মের হার বেড়ে যাবে। ভবিষ্যৎ সৈন্যসংগ্রহের

উদ্দেশ্যে হিটলার আর মুসোলিনি সেই চেষ্টা করেছিলেন।

মনুজরাজ্যে যথোচিত খাদ্য আবাস আর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় অকালমৃত্যু কমে গেল, লোকের আয়ু বাড়তে লাগল। জন্মশাসনের ফলে জনসংখ্যা যত কমবে আশা করা গিয়েছিল তা হল না। তা ছাড়া যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া কলেরা যক্ষ্মা প্রভৃতিতে এখন বেশী লোক মরছে না, শিশুমৃত্যু খুব কমে গেছে, লোকে অনেক কাল বাঁচছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় বৃদ্ধরা আগের তুলনায় বেশী দিন খাটতে পারছে বটে, তথাপি বিস্তর অকর্মণ্য বৃদ্ধ সমাজের ভারবৃদ্ধি করছে। যারা জন্মাবধি পঙ্গু বা দুর্বল, যারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, সুচিকিৎসার ফলে তারাও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকছে এবং তাদের অল্প কয়েকজন কাজের যোগ্য হলেও অধিকাংশই সমাজের গলগ্রহ হয়ে আছে। সকল ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে, জন্মশাসনে অভীষ্ট ফল হচ্ছে না, অর্কমণ্য বৃদ্ধ আর পঙ্গুও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে। অবশেষে অতিপ্রজতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্থানাভাব খাদ্যাভাব বস্ত্রাভাব প্রভৃতি নানা অভাব প্রকট হয়ে উঠল, মনুজরাজ্যে মৎস্যন্যায়ের লক্ষণ দেখা গেল। বিজ্ঞজন ভাবতে লাগলেন, এ যে হিত করতে গিয়ে অহিত হল! সেকালের অব্যবস্থাই ভাল ছিল, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী অচিকিৎসা শিশুমৃত্যু ইত্যাদির ফলে প্রজার অতিবৃদ্ধি হতে পারত না।

কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইএ সার্বজাতিক জন্মশাসন-সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীরাধাকৃষ্ণন বলেছেন, মানবের হিতার্থে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণই সভ্যতা। প্রাণিজগতে কারা বেঁচে থাকবে তা প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ...ব্যাধি বন্যা দুর্ভিক্ষাদি নিবারিত করে আমরা প্রজার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছি, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি, তার ফলে সংকট দেখা দিয়েছে। জন্মশাসন ভিন্ন এই সংকটের প্রতিকার হবে না। সম্প্রতি British Association for the Advancement of Scienceএর সভাপতি প্রফেসর এ ভি হিল তাঁর ভাষণে বলেছেন—All the impulses of decent humanity...religion and traditions of medicine insist that suffering should be relieved। তার পর তিনি বলেছেন—In many parts of the world improved sanitation and fighting of insect borne diseases lowered infantile death rates and prolonged

span of life and led to vast increase of population. ...There is much discussion on human rights. Do they extend to unlimited reproduction, with a consequent obligation falling on those more careful? সমস্যা এই দাঁড়াচ্ছে—যদি যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু রোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা হয় এবং যথেষ্ট জন্মনিরোধ না হয় তবে জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। প্রফেসর হিল অবশেষে হতাশ হয়ে বলেছেন—If ethical principles deny our right to do evil in order that good may come, are we justified in doing good when the foreseeable consequence is evil? অর্থাৎ হিতচেষ্টার পরিণাম যদি সমাজের পক্ষে অনর্থকর হয় তবে সে চেষ্টা কি আমাদের করা উচিত? মনুজরাজের কর্ণধারগণ এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি।

দনুজরাজ্যের শাসকবর্গ সমাজহিতৈষী, কিন্তু নির্মম। অল্প স্থানে যদি অনেক চারা গাছ উৎপন্ন হয় তবে ক্ষেত্রপাল বিনা দ্বিধায় অতিরিক্ত গাছ উপড়ে ফেলে দেয় যাতে বাকী গাছগুলির উপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক ঘোড়া গরু কুকুর ইত্যাদি সযত্নে পালন করে, কিন্তু অসাধ্য রোগ হলে অতি প্রিয় জন্তুকেও প্রায়ই মেরে ফেলে। ভারতবাসী গৃহপালিত জন্তুর তেমন যত্ন নেয় না, কিন্তু অকর্মণ্য রুগ্ন জন্তুকে মারতে তার সংস্কারে বাধে, যদিও কসাইকে গরু বাছুর বেচতে তার আপত্তি নেই। বহু বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর আজ্ঞায় তাঁর আশ্রমের একটি রোগার্ত বাছুরকে ইনজেকশন দিয়ে মারা হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তার তীব্র নিন্দা করে লিখেছিলেন—গান্ধীজী বাছুরের কষ্টনাশের জন্য তাকে মারেন নি, নিজের কষ্টের জন্যই মেরেছেন। কৃষিচর্যায় সকল দেশেই যা করা হয়, পীড়িত ও বিকল জন্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে রীতি আছে, দনুজরাজ্যে মানুষের বেলাতেও তাই করা হয়। চিররুগ্ন পঙ্গু অক্ষম অসাধ্যরোগাতুর জরাগ্রস্ত এবং কুকর্মা লোককে সেখানে মেরে ফেলা হয়। বয়স বেশী হলেই যেমন কর্মচারীকে অবসর নিতে হয়, দনুজরাজ্যের বৃদ্ধদের তেমনি ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। অল্পসংখ্যক হতভাগ্যদের সেখানে বাঁচতে দেওয়া যায়, যাতে ভাগ্যবান প্রজারা কিঞ্চিৎ করুণাচর্চার সুযোগ

পায়। বহু দেশে যেমন মহাস্থবির হলেও রাজ্যপাল আর মন্ত্রীরা চাকরিতে বাহাল থাকেন, তেমনি দনুজরাজ্যে বাছা বাছা গুণী বৃদ্ধরা বেঁচে থাকবার লাইসেন্স পান। সেখানকার প্রজানিয়মন-পর্ষদ অর্থাৎ Board of Population Control জনসংখ্যার উপর কড়া নজর রাখেন। যদি তাঁরা দেখেন যে জন্মনিরোধের বহু প্রচলন সত্ত্বেও অভীষ্ট ফল হচ্ছে না, অথবা কোনও কারণে খাদ্যবস্ত্রাদির অত্যন্ত অভাব হয়েছে, তবে তাঁরা নির্মমভাবে প্রজাসংক্ষেপের যথোচিত ব্যবস্থা করেন। মোট কথা দনুজরাজ্যের একমাত্র লক্ষ্য—পরিমিতসংখ্যক প্রজার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধন, মমতা বা অনুকম্পা সেখানে প্রশ্রয় পায় না।

দনুজরাজ্যের প্রজারা তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট, কারণ তাতেই তারা অভ্যস্ত। তারা মনে করে, মনুজরাজ্যের শাসনপ্রণালী অতি সেকেলে আর অবৈজ্ঞানিক। সেখানে অযোগ্য জনকে বাঁচাতে গিয়ে সমগ্র সমাজকে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে, সুস্থ কর্মঠ প্রজার ন্যায্য প্রাপ্যর একটা বড় অংশ রুগ্ন অক্ষম অবাঞ্ছিত প্রজাকে দেওয়া হচ্ছে। পরিমিতসংখ্যক প্রজার পক্ষে যে জীবনোপায় পর্যাপ্ত হত, অপরিমিত প্রজার অভাব তা দিয়ে পূরণ করা যাচ্ছে না। ভ্রান্ত নীতির ফলে সেখানে সমাজের সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে মনুজরাজ্যের লোকে মনে করে, দনুজরাজ্যের শাসকবর্গ ধর্মভ্রষ্ট ইহসর্বস্ব নরপিশাচ, সেখানকার প্রজারা মনুষ্যাকৃতি পিপীলিকা।

চণ্ডীদাস বলেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য। মহাভারতে হংসরূপী প্রজাপতির উক্তি আছে—গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—এই মহৎ গুহ্য তত্ত্ব তোমাদের বলছি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। ভারতের এই প্রাচীন মানুষবাদ এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য humanism কি একই? মানুষ কারা? কার দাবি আগে, আমার প্রিয়জনের, না আদর্শরূপে কল্পিত প্রবাহক্রমে নিত্য মানবসমাজের? মহাভারতে সনৎকুমারের বাক্য আছে—যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম—যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য (অবলম্বনীয়)। এই জীবগণ কারা? Greatest good of the greatest number—বেন্থামের এই উক্তি আর সনৎকুমারের উক্তি কি সমার্থক? মহাভারতে কৃষ্ণ

বলেছেন—ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ—ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এই জন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। প্রজা যদি অত্যধিক হয় তবে কোন্ ধর্ম তাদের ধারণ করবে? যারা সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত এবং পরিমিত মাত্রায় বংশরক্ষা করে তারা আগাছার মত উৎপন্ন অপরিমিত প্রজার ভার কত কাল বইবে? ভাগবতে রন্তিদেব বলেছেন—কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্—এই কামনা করি যেন দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের কষ্ট দূর হয়। প্রজার অতিবৃদ্ধি হলে দুঃখতপ্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের কষ্টলাঘবের জন্য সুস্থ প্রজা কতটা স্বার্থত্যাগ করবে?

প্রাচীন ধর্মজ্ঞগণ যা চাইতেন, আধুনিক সমাজহিতৈষীরাও তাই চান—মানুষের অত্যন্ত হিত হক, দুঃখার্তদের কষ্ট দূর হক। কিন্তু সমস্যা এই—অবাধ প্রজাবৃদ্ধি এবং অযোগ্য প্রজার বাহুল্য হলে সমগ্র সমাজ ভারাক্রান্ত ও ব্যাধিত হয়। সকলের হিত করতে গেলে প্রত্যেকের ভাগে অল্পই পড়ে, অগণিত হতভাগ্যের প্রতি দয়া করতে গেলে সুস্থ সবল ও সুযোগ্য প্রজারা তাদের ন্যায্য ভাগ পায় না। অতএব জন্মশাসন অবশ্যই চাই। সংযম অথবা স্বাভাবিক বন্ধ্যকাল (safe period) পালনের উপদেশ দিলে কিছুই হবে না, কারণ অধিকাংশ মানুষ পশুর তুলনায় অত্যধিক অসংযমী। গর্ভাধান রোধের যেসব সুপরীক্ষিত নিশ্চিত ও নিরাপদ উপায় আছে তাই শেখাতে হবে। কিন্তু যদি জন্মশাসনেও অভীষ্ট ফল না হয় তবে সমাজরক্ষার জন্য ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে।

সমাজের সংকট ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে, মামুলী ব্যবস্থায় তা বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অশুভস্য কালহরণম্ নীতি গ্রহণ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে অশুভ দ্রুতবেগে এগিয়ে আসবে। যে ধর্ম সমাজকে ধারণ করে, প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত করে, এবং দুঃখতপ্তগণের আর্তিনাশ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের উপযোগী সেই সমঞ্জস ধর্মের তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, কিন্তু তার অন্বেষণ উপেক্ষা করা চলবে না।

❑

বাংলা ভাষার গতি

(১৩৬০/১৯৫৩)

বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড় শ বৎসর আগে, গদ্য রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যময়, তাতে নবরসের প্রকাশ হতে পারলেও সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হত না। গদ্য বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিলাতী ইতিহাসে যেমন এলিজাবেথীয় ভিক্‌টোরীয় ইত্যাদি যুগ, সেই রকম বাংলা সাহিত্যিক ইতিহাসের কাল বিভাগের জন্য বলা হয় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনও প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয় নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র সাহিত্য-শাসক ছিলেন, তাঁর আমলে লেখকরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, সেজন্য তৎকালীন সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যধিক প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনও রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের হানি হয় নি। তাঁর তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের যে অংশ বহিরঙ্গ বা ভাষার আকৃতিগত তারই কিছু আলোচনা করছি।

চলিতভাষার প্রসার

চলিতভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ বোধ হয়, হুতোম পেঁচার নক্‌শা। অনেকে বলেন, আলালের ঘরের দুলালও চলিতভাষায় লেখা। এ কথা ঠিক নয়, কারণ এই বইএ প্রচুর গ্রাম্য আর ফারসী শব্দ থাকলেও সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের সাধুরূপই দেখা যায়। রেনল্ড্‌সএর গল্প অবলম্বনে লিখিত হরিদাসের গুপ্তকথা নামক একটি বই পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে খুব চলত। এই বই চলিতভাষায় লেখা কিন্তু তাতে সাধুর মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমযুগের

গল্পের নরনারী সাধুভাষায় কথা বলত। তারপর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখক তাঁদের পাত্র-পাত্রীদের মুখে চলিতভাষা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁরা নিজের বক্তব্য সাধুভাষাতেই লিখতেন। আরও পরে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্য রচনা চলিতভাষাতেই লিখতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তাই এখন চলিতভাষার প্রামাণিক বা স্ট্যান্ডার্ড রীতি রূপে গণ্য হয়।

আজকাল বাংলায় যা কিছু লেখা হয় তার বোধ হয় অর্ধেক চলিতভাষায়। সাধুভাষা এখন প্রধানত খবরের কাগজে, সরকারী বিজ্ঞাপনে, দলিলে আর স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়। অধিকাংশ গল্প এখন চলিত ভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু সকলে এ ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি, তার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। সাধুভাষা এখনও টিকে আছে, তার কারণ চলিতভাষায় যথেচ্ছাচার দেখে বহু লেখক তা পরিহার করে চলেন। 'বল্ল, দিলো, কোর্ছে' প্রভৃতি অদ্ভুত বানান এবং 'কারুরকে, তাদেরকে, ঘরের থেকে' প্রভৃতি গ্রাম্য প্রয়োগ বর্জন না করলে চলিতভাষা সাধুর সমান দৃঢ়তা ও স্থিরতা পাবে না। লেখকদের মনে রাখা আবশ্যক যে চলিতভাষা কলকাতা বা অন্য কোনও অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নয়, সাহিত্যের প্রয়োজনে উদ্ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional ভাষা। এই ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দিষ্ট ধাতুরূপ ও শব্দরূপ মানতে হবে এবং সাধুভাষার সঙ্গে বিস্তর রফা করতে হবে।

বানানের অসাম্য

বাংলা বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বিস্তর অভিযোগ পত্রিকাদিতে ছাপা হয়েছে। সকলেই বলেন, নিয়মবন্ধন দরকার। ঠিক কথা, কিন্তু কে নিয়মবন্ধন করলে লেখকরা তা মেনে নেবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্বভারতী? বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ? প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র সেই নিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করে তাঁদের সম্মতি জানিয়েছিলেন।* তারপর থেকে

* বিবিধ বিভাগে বাংলা বানানের নিয়ম দ্রষ্টব্য। —সঃ

রবীন্দ্ররচনাবলী মোটামুটি সেই বানানে ছাপা হচ্ছে, অনেক লেখকও তার কিছু কিছু অনুসরণ করে থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ লেখক এই নিয়মগুলির কোন খবরই রাখেন না, রাখলেও তাঁরা চিরকালের অভ্যাস বদলাতে চান না। আসল কথা, নিয়ম রচনা যিনিই করুন, সকলের তা পছন্দ হবে না, লেখকরা নিজের মতেই চলবেন। বাঙালীর নিয়মনিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিক নেতা বা ধর্মগুরুর আজ্ঞা বাঙালী ভাবের আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না।

বাংলা বানানে সামঞ্জস্য শীঘ্র দেখা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। অ্যা য়্যা এ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বানান চলতে থাকবে, যাঁরা নূতনত্ব চান তাঁরা ‘বংগ, আকাংখা, উচিৎ, কোরিলো, বিশেষতো’ লিখবেন এবং দেদার ও-কার আর হস্-চিহ্ন অনর্থক যোগ করবেন। হিন্দীভাষী সোজাসুজি বানান করে লখনউ, কিন্তু বাঙালী তাতে তুষ্ট নয়, লেখে লক্ষ্ণৌ। অকারণ য-ফলা দিয়ে লেখে স্যার, অকারণ ও-কার দিয়ে লেখে পেলো। নিয়মবন্ধনে ফল হবে না। যত রকম বানান এখন চলছে, তার কতকগুলি কালক্রমে বহুসম্মত ও প্রামাণিক গণ্য হয়ে স্থায়িত্ব পাবে, বাকীগুলি লোপ পাবে।

পূর্ববঙ্গের প্রভাব

সেকালে যখন সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ে বোঝা যেত না তাঁরা কোন্ জেলার লোক। কলকাতার রমেশচন্দ্র দত্ত, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চাটগাঁয়ের নবীনচন্দ্র সেন, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ ডিউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। তাঁদের রচনায় গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ না থাকায় ভাষার ভেদ হত না। কিন্তু আজকাল চলিতভাষায় যা লেখা হয় তা পড়লে প্রায় বোঝা যায় লেখক পূর্ববঙ্গীয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয়। ‘আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা, কেমন জানি (কেমন যেন), সুন্দর মতো’ ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু এসব প্রয়োগ অশুদ্ধ নয়, অতএব বর্জনীয় বলা যায় না। পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত -গুলি আর -টা প্রয়োগ করেন, অকারণে ‘নাকি’ লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে -রা যোগ করেন। (‘আকাশ হতে জলেরা ঝরে পড়ছে’), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক -কে বিভক্তি লাগান (‘বইগুলিকে গুছিয়ে রাখ’)। তাঁরা নিজের

উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সওয়া' (১১/৪) স্থানে 'দেয়া নেয়া সোয়া' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন। এই সব প্রয়োগও নিষিদ্ধ করা যাবে না। বিলাত আর মার্কিন দেশের ভাষা ইংরেজী কিন্তু অনেক নামজাদা লেখকের রচনায় ওয়েল্‌স স্কচ বা আইরিশ ভাষার ছাপ দেখা যায়, মার্কিন ইংরেজী অনেক সময় খাস ইংরেজের অবোধ্য ঠেকে। পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপত্তি করা চলবে না।

তথাপি মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার সঙ্গেই সাহিত্যিক চলিতভাষার সাদৃশ্য বেশী। সকল লেখকই তাঁদের প্রাদেশিক সংস্কার পরিহার করে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। এতে কোনও জেলার গৌরব বা হীনতার প্রশ্ন ওঠে না, বিশেষত দৈববিপাকে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন সমস্ত বাঙালী হিন্দুর আশ্রয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেক সময় অজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর (এবং পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি জেলাবাসীর) লেখায় অপ্রামাণিক বানান এসে পড়ে, যেমন অস্থানে চন্দ্রবিন্দু বা যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব, ড় আর র-এর বিপর্যয়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তাঁর এক বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন—ঘাঁড়ে ফোঁড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। যোগেশচন্দ্র উত্তরে লেখেন—আপনার ঘাড় আর ফোড়ায় চন্দ্রবিন্দু দেখিয়া আমি আরও কষ্ট পাইলাম। অনেকে 'চেইন, ট্রেইন, মেরেইজ (marriage)' লেখেন। এঁদের একজনের কাছে শুনেছি, 'চেন' লিখলে 'চ্যান' পড়বার আশঙ্কা আছে, তার প্রতিষেধের জন্য ই দেওয়া দরকার। আরও কয়েকজন যুক্তি দিয়েছেন, খাস ইংরেজের উচ্চারণে ই-ধ্বনি আছে। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার বানানে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, অতএব কাছাকাছি বানানেই কাজ চালাতে হবে। 'চেইন' লিখলে সাধারণ পাঠকের মুখে ই-কার অত্যধিক প্রকট হয়ে পড়ে, সেজন্য 'চেন' লেখাই উচিত। লেখকের মুখের ভাষায় প্রাদেশিক টান থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু লেখবার সময় সকলেরই সতর্ক হয়ে প্রামাণিক বানান অনুসরণ করা উচিত।

শব্দ ও অর্থের শুদ্ধি

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের তুলনায় এখনকার লেখকরা বেশী ভুল করেন, যাঁরা বাংলায় এম এ পাস করেছেন তাঁরাও বাদ যান না। সেকালে লেখকের

সংখ্যা অল্প ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্য লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। একালে লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে। অশুদ্ধির একটি প্রধান কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা পূর্বের তুলনায় খুব কমে গেছে।

অনেকে বলে থাকেন, ভাষা ব্যাকরণের অধীন নয়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নিয়ম চালাবার দরকার নেই। এ কথা সত্য যে জীবিত ভাষা কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণের শাসন পুরোপুরি মানে না, স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে, সেজন্য কালে তার ব্যাকরণ বদলাতে হয়। শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দাবলী শব্দার্থ আর বাক্যরচনার রীতিও বদলায়। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যে সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা চলে না। লাটিন গ্রীক যে অর্থে মৃতভাষা সংস্কৃত সে অর্থে মৃত নয়। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরও শব্দ নেওয়া হয় এবং ব্যাকরণের বিধি অনুসারে নূতন শব্দ তৈরি করা হয়। শুধু বাংলা ভাষা নয়, আসামী ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী গুজরাটী ভাষাও সংস্কৃত থেকে শব্দ নেয়। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার এবং শব্দরচনার চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে বাংলা ভাষার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী, শব্দের বানান আর অর্থ বিকৃত করলে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হবে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা দুর্বোধ হবে।

সজ্ঞানে শব্দের অপপ্রয়োগ করতে কেউ চায় না, কিন্তু মহামহা-পণ্ডিতেরও ভুল হতে পারে। প্রখ্যাতনামা নমস্য লেখকের ভুল হলে খাতির করে বলা হয় আর্ষপ্রয়োগ, কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রামাণিক বলে গণ্য হয় না। ভুল জানতে পারলে অনেকে তা শুধরে নেন, কিন্তু যাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তিনি ছাড়তে চান না। ভুল প্রয়োগের সমর্থনে অনেক সময় কুযুক্তি শোনা যায়। বাংলায় 'চলন্ত' আর 'পাহারা' আছে কিন্তু অনেকে তাতে তুষ্ট নন, সংস্কৃত মনে করে 'চলমান' আর 'প্রহরা' লেখেন। যখন শোনেন যে সংস্কৃত নয় তখন বলেন, বাংলা স্বাধীন ভাষা, সংস্কৃতের দাসী নয়; চলমান আর প্রহরা শ্রুতিমধুর, অতএব চলবে। 'কার্যকরী' স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু বোধ হয় সুমিষ্ট, তাই 'কার্যকরী উপায়, কার্যকরী প্রস্তাব' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়।

'কর্মসূত্রে' স্থানে 'কর্মব্যপদেশে', 'ধূমজাল' স্থানে 'ধূম্রজাল', 'শয়িত' বা

শয়ান স্থানে 'শায়িত', 'প্রসার' স্থানে 'প্রসারতা', 'কৌশল' বা পদ্ধতি অর্থে 'আঙ্গিক', 'প্রামাণিক' অর্থে 'প্রামাণ্য', 'ক্ষীণ' বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক রচনায় প্রচুর দেখা যায়। এই সব শব্দের বদলে শুদ্ধ শব্দ লিখলে রচনার মিষ্টত্বের লেশমাত্র হানি হয় না। ভাষার শুদ্ধিরক্ষার জন্য সতর্কতা আবশ্যক—এ কথা শুনলে নিরঙ্কুশ লেখকরা খুশী হন না। তাঁদের মনোভাব বোধ হয় এই—যা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আর পাঁচজনেও যা লিখছে তা অশুদ্ধ হলেও মেনে নিতে হবে। আমি যদি গলা-ধাক্কা অর্থে গলাধঃকরণ লিখে ফেলি এবং আমার দেখাদেখি অন্যেও তা লিখতে আরম্ভ করে তবে সেই নূতন অর্থই মানতে হবে।

ইংরেজীর প্রভাব

ইংরেজী অতি সমৃদ্ধ ভাষা। মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য সাবধানে ইংরেজী থেকে শব্দ আর ভাব আহরণ করলে কোনও অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যা আমাদের আছে তাকে অবহেলা করে যদি বিদেশী শব্দ বা বাক্যের নকল চালানো হয়, তবে অনর্থক দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং মাতৃভাষা বিকৃত হবে। Medium-এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম'এর প্রয়োজন আছে, যথাস্থানে তার প্রয়োগ সার্থক। কিন্তু ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে লেখা হয়—'বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা।' 'বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা' লিখলে হানি কি? সম্প্রতি দেখেছি—'এই সভায় অনেক ব্যক্তিত্বর সমাগম হয়েছিল'। ইংরেজী personalityর আক্ষরিক অনুবাদ না করে 'বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম' লিখলে কি চলত না? Promise আর signatureএর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'এর অপ্রয়োগ আজকাল খুব দেখা যায়। —'নারীমাত্রেই মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।' 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।' একজনের লেখায় দেখেছি—'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থাৎ took no notice)। এই রকম অন্ধ অনুকরণ যদি চলতে থাকে তবে বাংলা ভাষা শীঘ্রই একটা উৎকট সংকর ভাষায় পরিণত হবে।

উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর

নীরদ চৌধুরীর বহু বিতর্কিত ইংরেজী বইএ এই রকম একটা কথা আছে—বাঙালী বিনা আড়ম্বরে কিছু লিখতে পারে না। যুদ্ধ বেধেছে, এই

সোজা কথার বদলে লিখবে—রুদ্র তাঁর প্রলয়নাচন নাচতে আরম্ভ করেছেন। চৌধুরী মহাশয় কিছু অত্যুক্তি করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বাংলা কাগজে আগুন লাগা বা অগ্নিকাণ্ডর খবর লেখা হয়—বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা। জলে ডুবি বা জলমজ্জনকে বলা হয় সলিল সমাধি। 'ব্যর্থ হইল' লিখলে যথেষ্ট হয় না, লেখা হয়—'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।' বাংলাভাষী স্থানে লেখা হয় 'বাংলাভাষা-ভাষী।' সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে অনেকে পারেন না।

বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা অনর্থকর। বক্তব্য সহজে বোঝা যাবে মনে করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন।—'কোষ্ঠকাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কাজ করে।' 'যে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলোককণার থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে।' যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার করে স্পষ্টতা আর শৃঙ্খলিত যুক্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে। যাঁরা স্কুল কলেজের জন্য বিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের সেরকম চেষ্টা না করাই ভাল।



জাতিচরিত্র

(১৩৬০/১৯৫৩)

ভাইকাউন্ট স্যামুএল একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিক। এককালে সার হারবার্ট স্যামুএল নামে ইনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তিরাশি বৎসরে পদার্পণ করে ইনি পার্লামেন্টে হাউস্ অভ লর্ডসে নিজ দেশের নৈতিক অবস্থা (The State of Britain's Morals) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। তার ভাবার্থ এই—

ব্রিটেনের রাজনীতিক আর্থনীতিক আন্তর্জাতিক প্রভৃতি নানা সমস্যা আছে, কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয়—আমাদের জাতীয় চরিত্র। যাঁরা এসম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁদের অনেকে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় আছে। আমাদের নির্বাচক মণ্ডলে যে তিন কোটি ভোটদাতা আছে তাদের বুদ্ধি ও কর্তব্যনিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে ছাড়া কমেনি। কিন্তু দেশবাসীর এক অংশের যে চারিত্রিক অবনতি দেখা যাচ্ছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের বড় বড় শহরে যেসব দুষ্ক্রিয়ার আড্ডা আছে তা ব্রিটিশ সভ্যতার কলঙ্ক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কিছুকাল এদেশে অপরাধীর সংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে অর্ধেক জেলখানা বন্ধ রাখলেও চলত। কিন্তু এখন তার উলটো হয়েছে, বিশেষত অল্পবয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। খবরের কাগজে প্রতিদিন যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয় তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। পূর্বের তুলনায় লাম্পট্য খুব বেড়ে গেছে, ব্যভিচার তুচ্ছ পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিবাহভঙ্গ এখন একটা নিত্যনৈমিত্তিক সামান্য ঘটনা বলে গণ্য হয়। আরও ভয়ানক কথা—the vices of Sodom and Gomorrah appear to be rife among us। বাইবেলে আছে, ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। এখন তা হবার নয়, কিন্তু বর্তমান সমাজে এই পাপের পরিণাম আরও মারাত্মক ভাবে দেখা দেবে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি বিষাক্রান্ত হবে। অনেকে মনে করেন এসব কথা সাধারণের আলোচ্য নয়। কিন্তু ধর্মনীতি যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সমগ্র জাতিকে তার ফলভোগ করতে

হবে। স্বর্গ নরক সম্বন্ধে জনসাধারণের পূর্বে যে ধারণা ছিল তা এখন নেই, দুই মহাযুদ্ধের ফলে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেও লোকের আর আস্থা নেই। শারীরবিদ্যা আর মনোবিদ্যার নূতন নূতন মতবাদের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ কমে গেছে। এখন শোনা যায়, প্রত্যেক মানুষের আচরণ তার জন্মগত gene সমূহের (আদিম জন্মকোষের কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম উপাদানের) ফল, অতএব বেশী দোষ ধরা ঠিক নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ত্রুটি উদার ভাবে বিচার করাই উচিত।

পরিশেষে স্যামুএল বলেছেন, আমাদের সদাচার বা কদাচারের মূলে আছে ব্যক্তিগত আদিম জন্মকোষের বৈশিষ্ট্য—এইটেই সব কথা নয়। যে সামাজিক পরিবেশে আমরা জন্মগ্রহণ করি তার রীতিনীতি এবং লোকমত অনুসারেই আমাদের চরিত্র প্রধানত গঠিত হয়। সকল দেশের মানবসমাজের বহু যুগের চিন্তার ফলে যা উদ্ভূত হয়েছে সেই সর্বজনীন ধর্মনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর—এই সহজ বুদ্ধি আমাদের ফিরে আসা আবশ্যক।

ফরাসী আর মার্কিন জাতির দোষও অনেক পত্রিকায় আলোচিত হয়। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা স্থায়ী হয় না তার কারণ ফরাসী জাতি অব্যবস্থিতচিত্ত। শাসকবর্গের অসাধুতা লাম্পট্য আর অকর্মণ্যতার জন্যই গত যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল। সম্প্রতি Earnest Raynaud নামক একজন ফরাসী সম্পাদক New York Times পত্রিকায় লিখেছেন—সুরাসক্তিতে ফরাসী জাতি অদ্বিতীয়, মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো মিলে প্রতি বৎসরে যা উদরস্থ করে তাতে খাঁটি আলকোহলের পরিমাণ দাঁড়ায় জন পিছু গড়ে সাত গ্যালন (প্রায় ৮৪ বোতল ব্রান্ডি বা হুইস্কির সমান)। ফ্রান্সের এক পঞ্চমাংশ লোক মদ তৈরি বা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দেশব্যাপী সুরাপ্লাবন রোধ করবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপরিষদে শৌণ্ডিকরাই সর্বেসর্বা, তাদের অমতে কিছু করা সরকারের অসাধ্য। খবরের কাগজ নীরব, কারণ অপ্রিয় সত্য লিখলেই বিজ্ঞাপনের আয় বন্ধ হবে। সম্প্রতি একজন মন্ত্রী মদ্যপতিদের দমন করতে গিয়ে পদচ্যুত হয়েছেন।

কয়েক মাস পূর্বে Times Literary Supplementএ আমেরিকার নাগরিক জীবনের কঠোর সমালোচনা ছাপা হয়েছে। জুয়া জুলুম আর ধনবাহুল্য—এই হচ্ছে মার্কিন সভ্যতার অঙ্গ। ধনীরা আত্মরক্ষার জন্য

গ্যাংস্টার বা গুণ্ডাদের টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা রাখে। রাষ্ট্রচালনার সকল ক্ষেত্রে ঘুষ চলে, সেনেটর জজ মেয়র শেরিফ সেনাপতি কেউ বাদ যান না। ধনী অপরাধীরা অনায়াসে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে। ...ইত্যাদি।

বড় বড় পাশ্চাত্ত্য জাতির দোষের ফর্দ শুনে আমাদের উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। আমরা শান্ত শিষ্ট সোনার চাঁদ, নৃশংসতা ব্যভিচার লাম্পট্য সুরাসক্তি আমাদের মধ্যে কম, অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল—এমন মনে করা ঘোর মূর্খতা। বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের জন্য জওহরলাল আছেন, বিধান রায় আছেন, তাঁদের শায়েস্তা রাখার জন্য কমিউনিস্ট প্রজা-সোশালিস্ট প্রভৃতি দল আছে, দুর্মুখ খবরের কাগজ আছে, অতএব আমরা রাম-শ্যাম-যদুর দল নিশ্চিন্ত হয়ে যা পারি রোজগার করব আর অবসর কালে সিনেমা ফুটবল নাচ গান গল্প উপন্যাস সর্বজনীন পুজো প্রভৃতি সংস্কৃতিচর্চায় মেতে থাকব—এই মনোবৃত্তি অনর্থকর। যে স্বাধীনতা আমরা সাত শ বছর পরে অতি কষ্টে পেয়েছি তা বজায় রাখতে পারব কিনা, ব্রিটিশ ভারতের চাইতে সমৃদ্ধতর ভারত গড়তে পারব কিনা—এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া যায় না। আমরা, অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ যদি নিজের অসংখ্য ত্রুটি শোধনের চেষ্টা না করি এবং প্রজার কর্তব্যে অবহেলা করি তবে কোনও রাষ্ট্রনেতা বা রাজনীতিক দল আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।

ভারতবাসী মোটের উপর শান্তিপ্রিয় অহিংস। এ দেশেও নেশাখোর, জুয়াড়ী, সাধারণ আর অসাধারণ লম্পট আছে, চোর ডাকাত খুনে ঘুষখোর আছে, যুদ্ধের পর তাদের উপদ্রব বেড়েও গেছে, কিন্তু জনসংখ্যায় এইসব অপরাধীর অনুপাত বেশী নয়। ব্যভিচার খুব কম, ভবিষ্যতে হয়তো কিছু বাড়বে, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তা সইতে হবে। কয়েকটি বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতির তুলনায় ভাল, কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ে অতি মন্দ। সমগ্র ভারতের অবস্থা আলোচনা না করে শুধু বাংলা দেশের (পশ্চিম বাংলার) কথাই ধরা যাক।

স্যামুএল বলেছেন, ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় আছে। দেশরক্ষার জন্য অপরিহার্য এই দুই গুণ আমাদের কতটা আছে? অনেক বাঙালী ছেলেমেয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে তা সত্য, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এদেশের বিপ্লবীরা বহু বৎসরে ব্রিটিশ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সে

পদ্ধতিতে আক্রামক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না। বর্তমান সরকারকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে পুলিসের সঙ্গে লড়াই, ট্রাম-বাস পোড়ানো, বোমা ছোড়া, দোকান লুঠ ইত্যাদি কর্মের জন্য বীরপুরুষ ঢের আছে তা ঠিক। কিন্তু আজ যদি কোন বক্তিয়ার খিলজি সতর বা সাত হাজার সৈন্য নিয়ে দেশ আক্রমণ করে তবে ক জন বাঙালী তাদের বাধা দেবে? যাঁদের প্ররোচনায় আমাদের ছেলেরা 'চলবে না চলবে না, মানতে হবে মানতে হবে' বলে গর্জন করে, সেই অন্তরালস্থ নেতারা তখন কি করবেন? শত্রুর দলে যোগ দেবেন না তো? তখন কি শুধুই গোর্খা-শিখ-গাঢ়োআলী পল্টন আমাদের হয়ে লড়বে আর আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দুর্গানাম জপ করব?

হুজুকে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুণ্ডামি করা আর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়, শিক্ষাও আবশ্যক। দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি দলে দলে বাঙালীর ছেলে সাগ্রহে যোগ দেয় তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত, এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে—এ কথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

দেশের উপর একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল ছড়িয়ে আছে, প্রজা বা শাসক কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভয় করেন, পরীক্ষার সময় যারা নকল করে তাদের বাধা দিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করতে সাহস করেন না, পাছে সে আত্মহত্যা করে অথবা তার সঙ্গীরা সদলে এসে প্রতিশোধ নেয়। ব্রিটিশ আমলে পুলিস বেপরোয়া ছিল, তার এই ভরসা ছিল যে প্রবলপ্রতাপ মনিব পিছনে আছেন। কিন্তু এখন পুলিস দ্বিধায় পড়েছে, কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বলপ্রয়োগ চলবে তা তার বর্তমান মনিবরা স্থির করতে পারেন না। চোর ডাকাত প্রভৃতি মামুলী অপরাধীর বেলায় ঝঞ্ঝাট নেই, কিন্তু আজকাল যেসব নূতন নূতন বেআইনী ব্যাপার হচ্ছে তার বেলায় নির্ভয়ে কর্তব্য পালন অসম্ভব। অফিস ও কারখানার কর্মীরা মনিবদের আটকে রাখে, ধর্মঘটীরা রাজপথে লোকের যাতায়াতে বাধা দেয়, স্কুল কলেজ বা অফিস প্রভৃতি কর্মস্থান অবরোধ করে, গুণ্ডারা ট্রাম-বাস পোড়ায়। এসব ক্ষেত্রে পুলিস উভয় সংকটে পড়ে। নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে অকর্মণ্য বলা হবে, কর্তব্য পালন করলে নিষ্ঠুর অত্যাচারী

বলা হবে। অধিকাংশ খবরের কাগজ অপক্ষপাতে কিছু লিখতে সাহস করে না, পাছে কোনও দল চটে। তারা দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে, ফলে পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়। দশ-বার বছরের ছেলে যখন বলে, নেমে যান মশাইরা, এ গাড়ি পোড়ানো হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুর মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং অন্যায় কর্মে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝঞ্ঝাটে দরকার কি বাপু—এই হচ্ছে জনসাধারণের নীতি। পাশ্চাত্ত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনায় এই ক্লীবতা আর কর্তব্যবিমুখতা অনেক বড় অপরাধ।

শাসকবর্গ যদি ঘোর অত্যাচারী হয় এবং প্রতিকারের অন্য উপায় না থাকে তবে রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কোনও দলের অসন্তোষ কারণ ঘটলেই যদি সেই দল উপদ্রব করে তবে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং তার ফলে জনসাধারণ সংকটে পড়ে। লোকে শান্তি চায়, অধিকাংশ লোকের এ বুদ্ধিও আছে যে দুষ্টদমনের জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক এবং মাঝে মাঝে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার ফলে নির্দোষেরও অপঘাত হতে পারে, যেমন যুদ্ধকালে অনেক অযোদ্ধাও মারা যায়। আমাদের শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণও তা বোঝেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে ভয় পান। বোধ হয় ভবিষ্যৎ নির্বাচনের কথা ভেবেই তাঁরা মতি স্থির করতে পারেন না। জনসাধারণের যদি ধারণা হয় যে কংগ্রেসী সরকার অত্যাচারী তবে তাঁদের ভোট দেবে কে? যে ছোকরার দল আজ হইহই করে উপদ্রব করছে, নির্বাচনের সময় তাদেরই তো সাহায্য নিতে হবে, তারাই তো 'ভোট ফর অমুক' বলে চেঁচাবে। অতএব তাদের চটানো ঠিক নয়। খবরের কাগজকেও উপেক্ষা করা চলবে না, তারা জনসাধারণকে খেপিয়ে দিতে পারে। শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি নিজ দলের লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে নির্ভয়ে কর্তব্যপালন করেন তবেই বর্তমান অবস্থার প্রতিকার হবে। জনকতক নেতা না হয় নির্বাচনে পরাস্ত হবেন কিন্তু জনসাধারণ যদি সুশাসনের ফল উপলব্ধি করে তবে ভবিষ্যতে তারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে ভুল করবে না।

যেমন অন্য দেশে তেমনি এদেশেও অধিকাংশ লোকের কোনও নির্দিষ্ট রাজনীতিক মত নেই। রাস্তার পোস্টার, প্রচারকদের বুলি, আর দলীয় খবরের কাগজের দ্বারাই তারা সাময়িক ভাবে প্রভাবিত হয়। বাঁধাধরা

রাজনীতিক মত না থাকলে কোনও ক্ষতি হয় না, রাজনীতির চাইতে ঢের বেশী দরকার প্রজার যথার্থ স্বার্থবুদ্ধি এবং বিভিন্ন দলের উক্তি-প্রত্যুক্তি বিচার করবার ক্ষমতা। যে কিষান-মজদুর-রাজের কথা অনেক নেতা বলে থাকেন তার মানে কি? কিষান-মজদুর সেক্রেটারিয়েটে বসে রাজ্য চালাবে, না জনকতক নেতা তাদের প্রতিনিধি সেজে কর্তৃত্ব করবেন? সাম্যবাদের জয় হলেও তো দেশে মূর্খ অকর্মণ্য ধূর্ত আর স্বার্থপর লোক থাকবে, রাজ্যচালনের ভার কারা নেবে তা স্থির করবে কে? বিদেশী গুরুর আজ্ঞাবহ শিষ্যরা? কমিউনিস্টরা ব্রিটেন-আমেরিকার বিস্তর দোষ ধরে, কিন্তু রাশিয়ার তিলমাত্র দোষের কথা বলে না কেন? কংগ্রেসের পন্থা কি? বার বার গান্ধীজীর নাম নিলে আর মাঝে মাঝে খাদি পরলেই কি কংগ্রেসী হওয়া যায়?

সাত বৎসর আগেও কংগ্রেসের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, জনসাধারণ কিছু বুঝুক না বুঝুক কংগ্রেসের বশে চলত। কিন্তু এখন অন্তত পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কমে গেছে, লোকে মনে করে কংগ্রেসী সরকার রাজস্বের অপব্যয় করেন, স্বজন পোষণ করেন, ধনপতিদের বশে চলেন। এই ধারণার উচ্ছেদ না হলে কংগ্রেসী সরকারের শীঘ্রই পতন হবে।

প্রবাদ আছে—প্রজা যেমন, তার ভাগ্যে শাসনও তেমনি জোটে। আমাদের জনসাধারণের কর্তব্যজ্ঞান না বাড়লে শাসনের উৎকর্ষ হবে না। দেশে শিক্ষিত জনের সংখ্যা যতই অল্প হক, তাঁরাই উদ্‌যোগী হয়ে জনসাধারণকে সুবুদ্ধি দিতে পারেন, যাতে তারা প্রজার অধিকার আর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় উদাসীন, তাঁদের অধিকাংশ নিজের ধান্দা বা শখ নিয়ে ব্যস্ত। যারা অল্পবয়স্ক তারা নিত্য নব নব বর্বরতায় মেতে আছে—বাগ্‌দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, হোলির উন্মত্ত হুল্লোড়, যে-কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে লাউড স্পীকারের অপপ্রয়োগ আর পটকার আওয়াজ। এদের সুরুচি আর সংযম শেখাবার গরজ কারও নেই।

আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের মতন নেশাখোর নই, কিন্তু একটা প্রবল মানসিক মাদক এদেশের জনসাধারণকে অভিভূত করে রেখেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তার কবল থেকে মুক্ত নয়। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমাদের ধর্মের অর্থ প্রধানত বাহ্য অনুষ্ঠান, নানা রকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, এবং ভক্তির চর্চা। অর্থাৎ পুরোহিত মারফত পূজা, কবচ-মাদুলি, আর যদি ভক্তি থাকে তবে ইষ্টদেবের আরাধনা। পৃথিবীর অনেক দেশেই

ধর্মচর্চা এই রকম। কিন্তু যদি সাধারণ জীবনযাত্রাও অন্ধ সংস্কারের বশে চলে তবে জাতির অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

নানা বিষয়ে এদেশের লোকের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। নেপালবাবার দৈব ঔষধের লোভে অসংখ্য লোকের কষ্টভোগ আর কুম্ভস্নানপুণ্যের দুর্বার আকর্ষণে বহু লোকের প্রাণহানি এই মোহের ফল। ফলিত জ্যোতিষ একটি প্রাচীন সংস্কার, যেমন মারণ উচ্চাটন বশীকরণ। কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবুও লোক মনে করে এ একটা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা। ভাগ্যগণনা কত ক্ষেত্রে সফল হয় আর কত ক্ষেত্রে বিফল হয় কেউ তা বিচার করে না। অনেক খবরের কাগজে প্রতি সপ্তাহে জ্যোতিষিক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশ করে সাধারণের অন্ধবিশ্বাসে ইন্ধন যোগানো হয়। আমাদের যেটুকু পুরুষকার আছে দৈবের উপর নির্ভর করে তাও বিনষ্ট হচ্ছে।

মহাভারতের কৃষ্ণ ধর্মের এই অর্থ বলেছেন—ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ—ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এজন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধিসমূহই ধর্ম। প্রজার যা সর্বাঙ্গীণ হিত তাই সমাজের হিত। প্রজা বলবান বিদ্যাবান্ বুদ্ধিমান নীতিমান বিনয়ী (disciplined) হবে, আত্মরক্ষায় ও দেশরক্ষায় প্রস্তুত থাকবে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করবে, সর্বপ্রকারে জনহিত চেষ্টা করবে—এই হল ধর্ম, এতেই লোকের কর্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। অধিকন্তু যে লোক ঈশ্বরপরায়ণ হয়, অর্থাৎ বিশ্ববিধানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে, মানুষের স্বাভাবিক ভাববৃত্তি বা emotion তৃপ্ত করতে পারে, তার ধর্মাচরণ সর্বতোভাবে সার্থক হয়। যিনি কর্মবিমুখ হয়ে শুধু ভক্তিরসে ডুবে থাকেন তিনি ধর্মাত্মা বা মুক্তপুরুষ হলেও একদেশদর্শী, তাঁর ধর্মসাধনা পূর্ণাঙ্গ নয়, সাধারণের পক্ষে আদর্শস্বরূপও নয়। যিনি শুধু দেহচর্চা বা বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকেন তিনিও ধর্মের অংশমাত্র চর্চা করেন। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সকলের জন্য নয়, প্রত্যেকে নিজের রুচি আর প্রবৃত্তি অনুসারেই ধর্মাচরণ করতে পারে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ করে ধন্য হতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ যদি কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করে এবং ধর্মের অন্যান্য অঙ্গ উপেক্ষা করে কেবল ভক্তির চর্চা করে, তবে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে 'অনুশীলন' প্রসঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর পরেও বহু মনীষী অনুরূপ উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক যুগে

বোধ হয় বিবেকানন্দই একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি সর্ব ভারতে কালোপযোগী বলিষ্ঠ ধর্মের প্রচার করেছেন। এদেশে সম্প্রতি বহু ধর্মোপদেষ্টা সাধুর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের ভক্তও অসংখ্য। তাঁরা প্রধানত ভক্তিতত্ত্ব এবং ভগবানের লীলাই প্রচার করেন। বহু ভক্ত তাঁদের কথায় শোকে শান্তি পায়, দয়া ক্ষমা অলোভ প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রেরণা পায়। কিন্তু তাঁদের ধর্মব্যাখ্যান এমন নয় যাতে আমাদের জাতিচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে। ভক্তগণের মতে তাঁদের কেউ কেউ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অনুগত জনের আর্থিক উন্নতি করতে পারেন, রোগ সারাতে পারেন, মকদ্দমা জেতাতে পারেন, নানা রকম ভেল্‌কি দেখাতেও পারেন। কয়েক জনের শিষ্যরা প্রচার করে থাকেন যে তাঁদের ইষ্টগুরু ভগবানের অবতার বা পূর্ণ ভগবান। গুরু তা অস্বীকার করেন না, blasphemyর জন্য শিষ্যকে ধমকও দেন না। আমাদের অন্য অভাব যতই থাকুক অবতারের অভাব নেই। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশ—এই হল অবতারের আসল কাজ। তার দিকে এঁরা একটু দৃষ্টি দেন না কেন?

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত—এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। যে ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের হিতকর এবং জাতিচরিত্রের উন্নতিসাধক, সেই সর্বসম্মত সর্বাঙ্গীণ ধর্মই আমাদের লোকায়ত (secular) রাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষকরাই এই ভার নেবেন, ছাত্রের বাল্যকাল থেকেই তাকে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আর রাষ্ট্রীক কর্তব্য শেখাবেন। এখন যারা অল্পবয়স্ক, ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্রগঠনের ব্যবস্থায় বিলম্ব করা চলবে না। যখন শ্রমিকের দল ধর্মঘট করে তখন উপস্থিত সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে রফা করেন, অনিচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই অর্থের হয়তো আরও সৎপ্রয়োগ হতে পারত। কিন্তু শিক্ষকদের কর্মের ফল সদ্য দেখা যায় না, সে কারণে সরকার বোঝেন না যে রাষ্ট্রের অন্যান্য বহু শাখাকে বঞ্চিত করেও শিক্ষককে তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে তাঁর অভাব না থাকে এবং শিক্ষার কার্যে তিনি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

❑

সমদৃষ্টি

(১৩৬১/১৯৫৪)

ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করছি, বাবা প্রশ্ন করলেন, কি বই পড়ছ?

উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

—কোন্‌খানটা?

—মোগল সম্রাটের বংশ। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, তাঁর পুত্র আকবর, তারপর জাহানগির শাজাহান আরংজিব—

—হয়েছে হয়েছে। নিজের পিতামহর নাম জান?

শুনেছিলাম আমার ঠাকুদ্দা নেপোলিয়ন আর রণজিৎ সিংহের আমলের লোক, কিন্তু তাঁর নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না। বললাম, ভুলে গেছি।

—লিখে নাও। তোমার পিতামহ কালিদাস বসু, প্রপিতামহ গুরুদাস, বৃদ্ধ প্রপিতামহ রত্নেশ্বর, অতিবৃদ্ধ রামসন্তোষ, অতি-অতিবৃদ্ধ রামভদ্র।*

গড়গড় করে ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নাম করে বাবা বললেন, মুখস্থ করবে, ভুলে যেয়ো না যেন। এঁরা মোগল বাদশাদের চাইতে তোমার ঢের বেশী আপন জন।

আপন জন হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে নগণ্য পেটি বুর্জোআ। একটু আধটু ভাল মন্দ কাজ করে থাকবেন, কিন্তু এঁদের ভাগ্যে সুকীর্তি বা কুকীর্তি কিছুই লাভ হয় নি। এঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ বা দিগ্‌বিজয় করেন নি, ধর্মসংস্থাপন বা রাজ্যশাসন করেন নি, তাজমহল গড়েন নি, বাপকে কয়েদ আর ভাইদের খুন করেন নি। এই পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল না, শুধু বাবার আজ্ঞায় নাম মুখস্থ করতে হল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। বাবার বংশপ্রীতি অসাধারণ ছিল। ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত বংশবিবরণ ছাপিয়েছিলেন। সেই চটি বই একখানা আমাকে দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে পড়বে, হিস্টরির চাইতে কম দরকারী নয়।

বড় হয়ে শুনলাম, সাত পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড, তার পরে আরও সাত

* পিতা স্বয়ং—চন্দ্রশেখর।

পুরুষ পর্যন্ত সমানোদক। অর্থাৎ পরলোকস্থ ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের অন্তর্গত সকলকে মাঝে মাঝে পিণ্ড দিতে হয়, আরও সাতপুরুষকে শুধু জল দিয়ে তর্পণ করলেই চলে। আরও আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কিছু না দিলেও দোষ হয় না।

যাঁদের চোখে দেখেছি, স্নেহ পেয়েছি, এবং তাঁদের মুখে যাঁদের বিবরণ শুনেছি তাঁরাই আমার সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমার জ্ঞাত শ্রদ্ধাভাজন আপন জন, সেজন্য সপিণ্ড। পূর্বে যে সাত পুরুষ ছিলেন তাঁদের নাম ছাড়া হয়তো কিছুই জানা নেই, তাঁরা আমার সমানোদক। তাঁদের ঊর্ধ্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুধুই জ্ঞাতি। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে এইভাবে আত্মবর্গের বিভাগ করা হয়েছে। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই থেকে মানুষের উৎপত্তি, কিন্তু অধিকাংশ সমাজে মানুষ পিতৃকুলে বাস করে, সেজন্য বংশগণনায় পিতৃকুলই ধরা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পুংসম্পর্ক বাদ দিয়েও কোনও কোনও স্ত্রীপ্রাণীর গর্ভাধান করতে পেরেছেন। হয়তো ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষেও মাতাই মুখ্য এবং পিতা গৌণ ও ক্ষেত্রবিশেষে অনাবশ্যক গণ্য হবেন।

উৎপত্তিকালে আমরা পিতা মাতা থেকে যেসব দৈহিক উপাদান পাই তার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ক্রোমোসোম, জীন, বা যাই হক, চলিত কথায় তাকেই রক্তের সম্পর্ক বলা হয়। পিতা মাতা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা রক্ত-সম্পর্কের অর্ধেক অংশ পাই। সিকি অংশ পিতামহ-মহী মাতামহ-মহী প্রত্যেকের কাছ থেকে পাই। ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ থেকে ১/৬৪ অংশ এবং চতুর্দশ পুরুষ থেকে ১/৮১৯২ অংশ পাই। একবিংশতিতম পুরুষ থেকে যা পাই তা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ডাইলিউশনের মতন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর সূত্রে আমাদের বংশধারা বজায় থাকে এবং তাতেই আত্মীয়তাবোধ তৃপ্ত হয়।

যোগসূত্র যেমনই হক, সম্পর্ক যত নিকট আত্মীয়তাবোধ ততই বেশী। কিন্তু স্থলবিশেষে এই বোধ আরও প্রসারিত হয়। বিলাতের অভিজাতবর্গ উইলিয়ম-দি-কংকরার, রবার্ট ব্রুস ইত্যাদি থেকে বংশ গণনা করতে পারলে অত্যন্ত গৌরব বোধ করেন। আমাদের দেশেও অদ্বৈত মহাপ্রভু, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতির বংশধর নিজেকে ধন্য মনে করেন। গল্প আছে, কোনও এক বড়লাটের মুখে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ শুনে একজন

রাজপুত নৃপতি বলেছিলেন, আমার বংশমর্যাদা আপনার চাইতে ঢের বেশী; আমি সূর্যবংশজাত আর আপনি বানরের বংশধর।

সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আত্মীয়রাই সবচেয়ে আপন জন। তার পর যথাক্রমে সগোত্র, সবর্ণ, সজাতি, স্বদেশবাসী বা সধর্মী। সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা, চর্চা বা হুজুকের ফলেও আত্মীয়তাবোধের তারতম্য হয়। গোঁড়া বাঙালী ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে বাঙালী শূদ্রের তুলনায় অবাঙালী ব্রাহ্মণ বেশী আত্মীয়। এ দেশের অনেক মুসলমান মনে করে ভারতীয় হিন্দুর চাইতে ইরানী আরবী তুর্কী মুসলমানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশী। রাজনীতিক কারণে বা প্রাদেশিক বিরোধের ফলে এইপ্রকার ধারণার পরিবর্তন হতে পারে।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর আর্যতার মোহ ছিল। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশ খাঁটি আর্য অর্থাৎ ইংরেজ জার্মনের সজাতি ছিলেন, এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশের রোদ বৃষ্টিতে আধুনিক বাঙালীর চেহারা বদলে গেছে। আর্যতা বজায় রাখবার জন্য এবং উচ্চতর বর্ণে প্রমোশন পাবার জন্য অনেকের উৎকট আগ্রহ ছিল। অব্রাহ্মণরা পইতে নিয়ে ধন্য হতেন, কেউ কেউ অগ্নিহোত্রীও হতেন। আমরা শুনতাম, ব্রহ্মার কায় থেকে কায়স্থ, হাড় থেকে হাড়ী, বাক্ থেকে বাগ্‌দী, চামড়া থেকে চামার হয়েছে। এখনও অনেকে কৌলিক পদবীতে তুষ্ট নন, নামের শেষে শর্মা বর্মা জুড়ে দিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

ইতিহাস আর নৃবিদ্যার গবেষণার ফলে আমাদের আর্যতার অভিমান দূর হয়েছে, আমরা এখন বুঝেছি যে বাঙালী (এবং অধিকাংশ ভারতীয়) অতিমিশ্র সংকর জাতি, সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য নানা নৃজাতির রক্ত ও সংস্কৃতি আমাদের দেহে মনে ও সংস্কারে বিদ্যমান আছে। আমাদের সকলের সাংকর্য এবং বংশগত (inherited) দেহলক্ষণ সমান নয়, সেজন্য আকৃতির বিলক্ষণ প্রভেদ দেখা যায়। কালো বামুন, কটা শূদ্র, নর্ডিক, মঙ্গোলীয়, সাঁওতাল, হাবশী, সব রকম চেহারাই আমাদের ইতর ভদ্রের মধ্যে অল্পাধিক আছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা নিজেকে ইওরোপীয় জানতে পেরে প্রথমে স্তম্ভিত তার পর নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আমরাও সেই রকম আবিষ্কারের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলছি, যাক বাঁচা গেল, কর্তার ভূত আমাদের

কাঁধ থেকে নেমে গেছেন, এখন আমরা আত্মপরিচয় মোটামুটি জেনেছি। দ্রাবিড়, কিরাত (মঙ্গোলয়েড), নিষাদ (অস্ট্রিক), আল্পীয় প্রভৃতি নানা জাতির রক্ত আমাদের দেহে আছে, নর্ডিক রক্তেরও ছিটেফোঁটা আছে। যাঁরা সবিশেষ জানতে চান তাঁরা কেন্দ্রীয় নৃবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের 'ভারতীয় জাতি পরিচয়' পুস্তিকা পড়ে দেখবেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আমাদের কুলগর্ব খর্ব হয়েছে কিন্তু এই আশ্বাসও পেয়েছি যে, উৎপত্তি যেমনই হক, কৃতিত্বের সম্ভাবনা সব জাতিরই সমান, শুধু জন্মের ফলে কেউ herren volk হয় না। কর্ণের মতন আমরা সকলেই বলতে পারি—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।

এচ জি ওয়েল্‌স তাঁর First and Last Things গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—যত পিছনে যাওয়া যায় ততই আমাদের পূর্বপুরুষ (ও তৎস্ত্রী)-দের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমার পিতা মাতা দুজন, পিতামহ-মহী মাতামহ-মহী চারজন, প্রপিতামহ প্রভৃতি আটজন। এই রকম দ্বিগুণোত্তর হিসাব করলে দেখা যাবে—পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২০০ কোটির চাইতে আমার শততম পূর্বস্ত্রীপুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশী। এই হিসাবে অতিগণনা আছে, কারণ পূর্বজগণের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বিস্তর হয়েছিল। তথাপি বলা যেতে পারে—যাঁরা আমার শততম পূর্বজ, এবং তাঁদের মধ্যে যাঁদের বংশধর এখনও জীবিত আছে, তাঁরা শুধু আমার নয়, বর্তমান সমস্ত মানবের পূর্বজনকজননী। ওয়েল্‌সের এই সিদ্ধান্তে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবজাতির মধ্যে যে বংশগত সম্বন্ধ এবং রক্তের যোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত লোকই আমার জ্ঞাতি, সপিণ্ড বা সমানোদক না হলেও সমপ্রভব বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমান মানবজাতির নাম দিয়েছেন হোমো সাপিয়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞমানব। এই জাতির বয়স অনেকের মতে লক্ষ বৎসরের কাছাকাছি। আমাদের চতুঃসহস্রতম পূর্বপুরুষরা হয়তো অবিজ্ঞ অবমানব ছিলেন, সাধারণ লোকে যাকে মিসিং লিংক বলে। আরও পিছিয়ে গেলে বনমানুষ বানর এবং নিম্নতর অসংখ্য প্রকার জীব দেখা দেবে। শাস্ত্রে ব্রহ্মা থেকে জীবোৎপত্তি ধরা হয়েছে, সে হিসাবে আব্রহ্মস্তম্ব মায় ব্যাকটিরিয়া পর্যন্ত আমার জ্ঞাতি। বহু কোটি বৎসর পূর্বে যে সমুদ্রজলে আদিম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তাতে

লবণের পরিমাণ এখনকার চেয়ে কম ছিল। সেই অল্পলবণাক্ত কারণবারি আজ পর্যন্ত প্রাণিদেহের রক্তরসে বা প্লাজমায় বিদ্যমান থেকে সর্বপ্রাণীর বংশগত সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

মানুষ এবং ইতর প্রাণীর যে সন্তানস্নেহ ও স্বজাতিপ্রীতি দেখা যায় তা স্বভাবজাত, বংশপর্যায় গণনা না করেই উদ্ভূত হয়েছে। আদিম মানুষের পরপ্রীতি বা পরার্থপরতা বেশী ছিল না, সমাজের অভিব্যক্তির ফলে ক্রমে ক্রমে স্বজনপ্রীতি, মানবপ্রীতি আর ইতরজীবপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক সভ্য মানুষ যুদ্ধ করে, মৃগয়া খেলা বিলাস খাদ্য ও অন্য নানা উদ্দেশ্যে প্রাণিহত্যা করে। তথাপি এই ধারণা ধীরে ধীরে উদ্ভূত হচ্ছে—সর্বমানবপ্রীতি ও সর্বজীবপ্রীতিই আদর্শ ধর্ম।

আদর্শ আর আচরণ সমান হয় না, সেইজন্যই বলা হয়েছে—জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা মনে করেন খ্রীষ্টের দশ অনুশাসনই শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি, কিন্তু কার্যত তাঁরা অনেক অনুশাসন মানেন না। গোঁড়া হিন্দু মুখে বলেন গোমাতা, কিন্তু গোখাদক পাশ্চাত্ত্য জাতির তুল্য গোসেবা এদেশে দেখা যায় না। আদর্শ আর আচরণের প্রভেদ সব সমাজেই আছে, তথাপি বলা যায় আদর্শ যত উন্নত ততই আচরণের উৎকর্ষের সম্ভাবনা আছে।

আত্মীয়তাবোধের যখন চরম প্রসার হয় তখন সর্বভূতে সমদৃষ্টি আসে। এই সাম্যের উপলব্ধি ভারতীয় জ্ঞানী ও সাধকদের মধ্যে যেমন হয়েছে অন্য দেশে তেমন হয়নি। অভিব্যক্তিবাদ আর সর্বজীবের বংশগত সম্বন্ধ না জেনেও এদেশের আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষরা বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (*গীতা*)

—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে পণ্ডিতরা সমভাবে দেখেন।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ (*মনু*)

—যে সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের ভিতর সর্বভূতকে দেখতে পায় সেই আত্মযাজী স্বরাজ্য লাভ করে।

যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম॥ (*মহাভারত*)

—যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য (অবলম্বনীয়)।

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥ (*ভাগবত*)

—আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্মনিবৃত্তিও চাই না, দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের আর্তিনাশই চাই।

যেন কেন প্রকারেণ যস্য কস্যাপি জন্তুনঃ।
সন্তোষং জনয়েদ্‌ধীমাংস্তদেবেশ্বরপূজনম্॥ (*ভাগবত*)

—যিনি ধীমান তিনি যে কোনও প্রকারে যে কোনও জন্তুর সন্তোষ উৎপাদন করবেন, তাই ঈশ্বরপূজা।

এদেশে সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও অহিংসার বাণী বহু ভাবে বহু মুখে প্রচারিত হয়েছে, তার ফলে ভারতবাসীর (বিশেষত হিন্দু জৈন প্রভৃতির) চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য এসেছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আমরা অপেক্ষাকৃত অহিংস্র মৃদুস্বভাব ও পরমতসহিষ্ণু। প্রাচীন মিশরীয়গণ যেমন কয়েকটি প্রাণীকে দেবতুল্য গণ্য করত, হিন্দুও গরুকে সেইরকম মর্যাদা দেয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে অকর্মণ্য ও মরণাপন্ন পালিত জন্তুকে মেরে ফেলা হয়, এদেশে সে প্রথা নেই। হিন্দুর মৃগয়াপ্রবৃত্তিও কম। এখনকার তুলনায় প্রাচীন ভারতে আমিষাহার বেশী প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের প্রভাবে তা কমে গেছে। মহাভারতে মনুর উক্তি আছে—যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে মন্ত্রপূত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবিঃস্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য মাংস বৃথামাংস এবং অভক্ষ্য। সম্রাট অশোক প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে যত নিরামিষাশী আছে অন্য দেশে তত নেই, তবে স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে যে পাশ্চাত্ত্য বিলাসিতার স্রোত এসেছে তার ফলে নিরামিষাশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমিষাহার প্রচলিত হচ্ছে।

উক্ত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বলা চলে না যে অন্যদেশবাসীর তুলনায় ভারতবাসী অধিকতর সমদর্শী। এদেশে অস্পৃশ্যতা আছে, উচ্চ বর্ণের অভিমান এবং নীচ বর্ণের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা আছে। যার ধর্ম ভাষা আকৃতি পরিচ্ছদ খাদ্য ইত্যাদি ভিন্নপ্রকার তাকে আমরা আপন জন মনে করতে পারি না। ইংরেজীতে একটি ব্যঙ্গোক্তি আছে—সব মানুষ সমান, কিন্তু কেউ কেউ

বেশী সমান। আমাদের সমদর্শিতা সম্বন্ধেও এই কথা বলে চলে।

ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক সাধু অনেক ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু ভক্তি আর অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার যত হয়েছে জনহিতব্রত আর সমদর্শিতার প্রচার তেমন হয়নি। আশার কথা, ভারত সরকার এদিকে মন দিয়েছেন এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সকল সভ্য সমাজেই সমদর্শিতা আদর্শরূপে অল্পাধিক স্বীকৃতি পেয়েছে, আদর্শ আর আচরণের প্রভেদও সর্বত্র আছে। শ্বেত আর অশ্বেত জাতির মর্যাদা সমান নয় এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশে খুবই প্রবল। তথাপি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ধীরে ধীরে উদার হচ্ছে এবং ইতরপ্রাণীর প্রতিও যে মানুষের কর্তব্য আছে এই ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বহু বৎসর পূর্বে টমাস হেনরি হাক্সলি লিখেছিলেন—মানবজাতির দুরকম নীতি বা আদর্শ আছে এবং এই দুইএর দ্বন্দ্ব চিরকাল চলছে। একটি হচ্ছে ধর্মনীতি বা সাধারণ মরালিটি, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অহিংসা দয়া সত্য অলোভ সমদর্শিতা পরোপকার প্রভৃতি এর অঙ্গ এবং প্রধান প্রধান সকল ধর্মেই এই সকল বৃত্তি প্রশংসিত হয়েছে। অপর নীতিটি অত্যন্ত প্রাচীন, জীবোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সহজাত সংস্কাররূপে উদ্ভূত হয়েছে। হাক্সলি এই নীতির বিশেষণ দিয়েছেন কস্‌মিক, অর্থাৎ নৈসর্গিক। এই নীতির লক্ষ্য স্বার্থসাধন এবং তার জন্য যে পরিমাণ পরপ্রীতি আবশ্যক শুধু তারই চর্চা। এই নিসর্গনীতি অনুসারে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইতর জীবের গোষ্ঠীবন্ধন এবং আদিম মানব সমাজের উদ্ভব হয়েছে। কৌটিল্য আর মেকিয়াভেলি এই নীতিই বিবৃত করেছেন এবং নেপোলিয়ন হিটলার মুসোলিনি প্রভৃতি তা অবলম্বন করে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রের ব্যবহারে যে কুটিলতা দেখা যায় তাও এই নীতির ফল।

ধর্মনীতি বলে—পরের অনিষ্ট কর না। নিসর্গনীতি বলে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য করতে পার। শেষোক্ত নীতি অনুসারেই সেকালে এদেশের রাজারা দিগ্‌বিজয় করতেন। পরাক্রান্ত জাতি দুর্বলের উপর এখনও আধিপত্য করে, প্রবল ব্যবসায়ী দুর্বল প্রতিযোগীর জীবিকা নষ্ট করে। রাজনীতিক উদ্দেশ্যে এবং পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য সংবাদপত্রাদির সাহায্যে অজস্র অসত্য প্রচার করা হয়। যুদ্ধকালে বিপক্ষের গ্রামনগরাদি ধ্বংস এবং নিরপরাধ

অসংখ্য প্রজার সর্বনাশ করা হয়। সমাজ রক্ষার জন্য অপরাধী দণ্ড পায় কিন্তু তার পরিবারের যে দুর্দশা হয় তার প্রতিকার হয় না।

আদিম যুগ থেকে মানুষ নানা উদ্দেশ্যে প্রাণিপীড়ন করে আসছে। আত্মরক্ষার জন্য অনেক প্রাণী হত্যা করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আমিষাহারী। মাছ ধরা, পাখি হরিণ ইত্যাদি মারা অনেকের বিচারে নির্দোষ আমোদ। রেশম তসর গরদ ইত্যাদির জন্য অসংখ্য কীট হত্যায় আমাদের আপত্তি নেই, হিন্দুর বিচারে কৌষেয় বস্ত্র আর মৃগচর্ম অতি পবিত্র। বলদকে নপুংসক করে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে আমাদের বাধে না। মধুর লোভে আমরা মৌমাছির কষ্টসঞ্চিত ভাণ্ডার লুঠ করি, অনেক ক্ষেত্রে বুভুক্ষু বাছুরকে বঞ্চিত করে দুধ খাই। তুচ্ছ শখের জন্য আকাশচারী পাখিকে বন্দী করি। আধুনিক সভ্য সমাজে অনর্থক প্রাণিপীড়ন গর্হিত গণ্য হয়, কিন্তু আত্মরক্ষা, খাদ্য, মৃগয়া, বিলাস, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবহিংসায় দোষ ধরা হয় না।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্ণ অহিংসা এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, হাক্সলি-কথিত নিসর্গনীতি বর্জন করে উচ্চতম ধর্মনীতি অনুসারে জীবনযাপন করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তা অসম্ভব। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরভাব এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা শীঘ্র দূর হবে না, জনসাধারণের পক্ষেও নিঃস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় ধর্মনীতি আর নিসর্গনীতির মধ্যে রফা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আধুনিক হিউম্যানিজ্‌ম বা মানবধর্মে এই রফার চেষ্টা আছে। এই ধর্মে জ্ঞান ও ভক্তির চর্চায় বাধা নেই, কিন্তু প্রধান লক্ষ্য—সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের অবিরোধে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থসাধন এবং সেই স্বার্থের অবিরোধে যথাসম্ভব জীবে দয়া। মহাভারতে হংসরূপী প্রজাপতি বলেছেন—ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। চণ্ডীদাস বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য। এই দুই উক্তির গূঢ় অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে আধুনিক হিউম্যানিজ্‌মএর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এই ধর্ম এখন পর্যন্ত একটি সমস্যাসংকুল অতি অস্পষ্ট আদর্শ মাত্র। এর নির্বাচন বা enunciation হয় নি, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ও হয় নি। তথাপি আশা হয় এই ধর্মের ক্রমবিকাশের ফলে সাধারণ মানুষ যথাসম্ভব সমদর্শিতা লাভের উপায় আবিষ্কার করবে।

❑

অশ্রেণিক সমাজ

(১৩৬১/১৯৫৪)

'ক্লাসলেস সোসাইটি' বা অশ্রেণিক সমাজের কথা এদেশের ও বিদেশের অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু তার লক্ষণ কেউ স্পষ্ট করে বলেছেন বলে মনে হয় না। শ্রেণী অনেক রকম আছে, ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য সমাজের শ্রেণীভেদ সমান নয়। সব রকম ভেদের লোপ অথবা কয়েক রকমের লোপ যাই কাম্য হক, উপায় নির্ধারণের আগে বিভিন্ন ভেদের স্বরূপ বোঝা দরকার।

এমন আদিম জাতি থাকতে পারে যাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ মোটেই নেই অথবা খুব কম। সভ্য সমাজ যদি পুরোপুরি অশ্রেণিক হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা কল্পনা করা যেতে পারে। জীবনযাত্রার মান সকলের সমান হবে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারও যদি অধিক অর্থাগম হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হিতার্থে বাজেয়াপ্ত হবে। সকলেই সমান পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন হবে, বিবাহ ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে সুন্দর-কুৎসিত বা পণ্ডিত-মূর্খের ব্যবধান থাকবে না। সকলেই শিক্ষা জীবিকা বিবাহ আর চিকিৎসার সমান সুযোগ পাবে। অবশ্য বিদ্যা বুদ্ধি আর বলের বৈষম্য থাকবেই। কিন্তু তার জন্য আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবে না। দুঃসাধ্য রোগ বা বার্ধক্যের ফলে যারা অকর্মণ্য তাদের রক্ষা বা অরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক লোক যদি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয় বা নির্যাতন ভোগ করে তবে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমভোগী সংঘ গঠন করে। রোমান সাম্রাজ্যে অত্যাচারিত খ্রীষ্টানদের সমাজ প্রায় অশ্রেণিক ছিল। নাৎসি-বিতাড়িত অনেক ইহুদি পরিবারও নির্বাসনে এসে শ্রেণীভেদ পরিহার করেছিল। কিন্তু অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেদবুদ্ধি আবার পূর্ববৎ হয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজে একই ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। অব্রাহ্মণের বাড়িতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না। যাঁরা অল্প গোঁড়া তাঁরা বৈদ্যকায়স্থাদি ভদ্রশ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, কিন্তু পৃথক পঙ্‌ক্তিতে

বসেন। যাঁরা আর একটু উদার তাঁরা বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ভোজে পঙ্‌ক্তিবিচার করেন কিন্তু অন্যত্র করেন না। যাঁরা আরও সংস্কারমুক্ত তাঁরা কোনও ক্ষেত্রেই করেন না। ভোজন ব্যাপারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, তবে এই ভেদ ক্রমশ কমে আসছে।

আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু স্বজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সর্বনিম্ন বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিচিত অব্রাহ্মণকে দেখলে আগেই নমস্কার করেন। কেউ কেউ এতই পতিত যে শূদ্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেও তাঁদের বাধে না। যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর তাঁরা নমস্কার পাবার পর প্রতিনমস্কার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিনমস্কার করেন না, বড়জোর একটু হাত বা মাথা নাড়েন। প্রথম শ্রেণীর বিপ্র অতি বদান্য, প্রণাম পেলেই পদধূলি দেবার জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

উচ্চবর্ণের বা আভিজাত্যের অভিমান অসংখ্য লোকের আছে। যাঁরা অতি সজ্জন, অপরকে ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায় যাঁদের কিছুমাত্র নেই, এমন লোকেরও আছে। এঁরা শাস্ত্রবিধি বা নিজ সমাজের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করতে চান না, মনে করেন তাতে পাপ বা জাতিপাত বা মর্যাদাহানি হয়। অনেকে নির্বিচারে কেবল সংস্কার বা অভ্যাসের বশেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। যাঁরা অল্পাধিক সংস্কারমুক্ত তাঁদের প্রত্যবায়ের ভয় না থাকলেও নিজ সমাজের ভয় আছে, সেজন্য অবস্থা বুঝে নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করেন। যাঁরা আরও উদার ও সাহসী তাঁরা বর্ণানুসারে শ্রেণীবিচার করেন না, শুধু দেখেন পঙ্‌ক্তির লোকের বেশ ও আচরণ সভ্যজনোচিত কিনা। যাঁরা পূর্ণমাত্রায় সমদর্শী তাঁরা কিছুই বিচার করেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে ধর্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব সংস্কারমুক্ত ছিলেন, বর্ণভেদের কঠোরতা মানতেন না। একথা যে মিথ্যা তা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন না। এঁরা উচ্চনীচ সকলের জন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ধর্মমতের সংকীর্ণতা নিরসনের চেষ্টা

করেছেন, কিন্তু সমাজব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেননি। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুবর্তীরাই এদেশে সমাজসংস্কারের প্রবর্তক। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার বিবেকানন্দ আরম্ভ করে গেছেন। আজকাল প্রতিপত্তিশালী ধর্মোপদেষ্টা গুরুর অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা কেউ বিবেকানন্দর তুল্য সাহসী জনহিতব্রতী নন, সামাজিক দোষ শোধনের কোনও চেষ্টাই করেন না।

এককালে এদেশের ভদ্রশ্রেণীই উচ্চশিক্ষা আর ভদ্রোচিত জীবিকার সুযোগ পেত। দারিদ্র্যের জন্য এবং ক্ষমতাবান আত্মীয়-বন্ধুর অভাবে ভদ্রেতর শ্রেণী এই সুযোগ পেত না। শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য এখন ক্রমশ কমে আসছে, কালক্রমে একেবারে লোপ পাবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা আর প্রচারের ফলে জাতিগত বর্ণগত ও বংশগত ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা আর অমার্জিত আচরণের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। শুচিতার ধারণা সকলের সমান নয়। এদেশের লোক আহারের পর আচমন করে, মলত্যাগের পর জলশৌচ করে, অতি দরিদ্রও প্রত্যহ স্নান করে। এই সব বিষয়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য জাতি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। অনেক ইওরোপীয় নারী তার সন্তানের মুখ থুতু দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়, বিড়াল যেমন করে।

কয়েকটি বিষয়ে শুচিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতবাসীর কদভ্যাস অনেক আছে। যে অপরিচ্ছন্নতা দারিদ্র্যের ফল তা ধরছি না, কিন্তু যাঁরা অর্থবান ও ভদ্রশ্রেণীভুক্ত তাঁদেরও অনেক বিষয়ে শুচিতার অভাব দেখা যায়। বড় সওদাগরী আপিসে সাহেব আর দেশী কর্মচারীর জন্য আলাদা সিঁড়ি আছে। এখনকার দেশী সাহেবরাও বোধ হয় এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন। পার্থক্যের কারণ কি তা সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়। ভারতবাসীর বিচারে নিষ্ঠীবনের স্পর্শই ঘৃণ্য, দৃশ্য নয়, যত্র তত্র থুতু ফেলার অভ্যাস বহু লোকের আছে। দেশী সিঁড়ির স্থানে স্থানে আধার আছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল হয় না, আধার ছাপিয়ে দেওয়ালে পর্যন্ত পানের পিকের দাগ লাগে। সাহেবী সিঁড়ির এই বীভৎস কলঙ্ক নেই। যারা পরিচ্ছন্নতা চায় তাদের পৃথক সিঁড়ি আর পৃথক সমাজ না হলে চলে না।

ক্লাব বা আড্ডায় সমশ্রেণীর লোকেই স্থান পায়। বিলাতী ক্লাবে প্রবেশের নিয়ম খুব কড়া, যে কেউ ইচ্ছা করলেই সদস্য হতে পারে না। বাঙালীর

আড্ডায় সাধারণত নির্দিষ্ট কয়েক জনকেই দেখা যায়, কিন্তু নূতন লোকও স্থান পায় যদি তার আচার-ব্যবহার বিসদৃশ না হয়। ক্লাব বা আড্ডার যে রীতি, দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহেরও তাই। যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সাধারণত নিজ শ্রেণীর জন্যই করেন, এই কারণে নিম্ন জাতি মন্দিরপ্রবেশে বাধা পায়। কালক্রমে যদি প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের স্বত্বের প্রমাণ লোপ পায় তবে সরকারী আদেশে আপামর সকলেই প্রবেশাধিকার পেতে পারে। ভারতের অনেক বিখ্যাত মন্দিরে তাই হয়েছে। কিন্তু যত দিন সে ব্যবস্থা না হয় তত দিন শ্রেণীবিচার বজায় থাকে। চণ্ডীমণ্ডপ, ভাগবতসভা, ব্রাহ্মসমাজ বা গির্জায় যদি কোন অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিতবেশ লোক আসতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও সে বাধা পায়।

জাতিবিচার বা অপরিচ্ছন্নতায় আপত্তি না থাকলেও নানা কারণে ভেদজ্ঞান আসে। আকৃতি পরিচ্ছদ ভাষা খাদ্য সংস্কৃতি বিত্ত সমাজ ধর্ম দেশ রাজনীতি প্রভৃতির জন্যও শ্রেণীভেদ হয়। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই (যেমন মুসলমান ও ইওরোপীয় সমাজে) সেখানেও সৈয়দ ও মোমিন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, মলিনবেশ শ্রমজীবী আর white collar মসীজীবীর সমাজ পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক হোটেলে এশিয়া-আফ্রিকার লোক স্থান পায় না। কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইন করে এই পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লোকমতের পরিবর্তন হয় নি। চণ্ডাল যদি শিক্ষিত সজ্জন ধনী ও ভদ্রবেশী হয় তথাপি সে নিষ্ঠাবান উচ্চবর্ণ হিন্দুর বিচারে অপাঙ্‌ক্তেয়। এশিয়া-আফ্রিকার লোকের উপরেও পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুরূপ ঘৃণা আছে।

এদেশে ধনী ও বিলাসী সমাজ সমশ্রেণী ভিন্ন বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে চান না, পাছে শ্বশুরালয়ে মোটা চালচলনে কন্যার কষ্ট হয় বা ঘরের মর্যাদাহানি হয়। অল্পবিত্ত হিন্দু যৌথ পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ খুব কম দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দম্পতির নিজের আত্মীয়বর্গ থেকে পৃথক হয়ে বাস করবার সামর্থ্য আছে সেখানে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে।

ভারতের তুলনায় ইউরোপ-আমেরিকার ভদ্রসমাজে আচারগত ভেদ কম, তথাপি রাজনীতিক কারণে বিদ্বেষ দেখা যায়। ব্রিটিশ ও জার্মন জাতির উৎপত্তি ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বেশী নয়, কিন্তু যুদ্ধ বাধলেই জার্মনরা হুন আখ্যা পায়। গত যুদ্ধে 'মিত্র'পক্ষে থাকার সময় রাশিয়া জাতে উঠেছিল,

কিন্তু এখন আবার অর্ধসভ্য এশিয়াটিক হয়ে গেছে, তাদের শায়েস্তা করবার জন্য বিজ্ঞানবলী জার্মন বীর জাতির প্রয়োজন হয়েছে।

লোকে কেবল যুক্তি আর ন্যায়বুদ্ধির বশে চলে না, বহুকাল থেকে বংশপরম্পরায় যে সংস্কার বদ্ধমূল হয় তা দূর করা সহজ নয়। কালক্রমে শিক্ষা আর প্রচারের ফলে অনেক বিষয়ে ভেদজ্ঞান কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রেণীলোপের সম্ভাবনা অত্যল্প। বর্তমান সমাজে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অনুমান করা যেতে পারে। —

(১) বিদ্যা, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান নয়, কিন্তু জাতি বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে কোনও তারতম্য হয় না, প্রতিবেশ (environment) এবং শিক্ষার সুযোগ সমান হলে সকল শ্রেণীর লোকেই তুল্য সামর্থ্য দেখাতে পারে। শ্রেণীবিশেষের সহজাত মানসিক উৎকর্ষ বা বংশগত আভিজাত্য থাকতে পারে না—এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কালক্রমে শিক্ষিত জন মেনে নেবে। যাদের দৃঢ়বদ্ধ অন্ধ সংস্কার আছে (যেমন হিটলারের সহকারিগণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচবংশীয় আফ্রিকান্ডার জাতি, মার্কিন দেশের নিগ্রো বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং এদেশের অনেক উচ্চ বর্ণের লোক) তাদের ধারণার পরিবর্তন হতে বিলম্ব হবে।

(২) অনুকূল লোকমত এবং সরকারী চেষ্টার ফলে এ দেশে অস্পৃশ্যতা শীঘ্রই দূর হবে।

(৩) যৌথ পরিবার লোপের ফলে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ বহুপ্রচলিত হবে, ভিন্নপ্রদেশবাসীর মধ্যেও বিবাহ বৃদ্ধি পাবে।

(৪) আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি, আর ধর্মের পার্থক্যের জন্য অপরের প্রতি যে বিরাগ দেখা যায় তা শিক্ষার বিস্তার এবং অধিকতর সংসর্গের ফলে ক্রমশ কমে যাবে।

(৫) যাদের বিদ্যা রুচি বৃত্তি বা রাজনীতি সমান তারা এখনকার মত ভবিষ্যতেও সংঘ ক্লাব বা ইউনিয়ন গঠন করবে, কিন্তু এইপ্রকার দলবন্ধনের ফলে বর্ণভেদের তুল্য সামাজিক ভেদের উদ্ভব হবে না।

(৬) অনেক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র অনুসারে ধনী-দরিদ্রের ভেদ কমাবার চেষ্টা করছে। তার ফলে দারিদ্র্যজনিত হীনতা যথা অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অপরিচ্ছন্নতা, প্রভৃতি ক্রমশ দূর হবে এবং সামাজিক বৈষম্য কমবে। কিন্তু

ধনবৈষম্য একেবারে দূর হবে না, সোভিএট রাষ্ট্রেও হয়নি।

(৭) যে অপরিচ্ছন্নতা বহু দিনের কদভ্যাসের ফল তা দূর করার জন্য প্রবল প্রচার আবশ্যক, যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য হয়েছে। যাঁরা রাজনীতিক প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁরা জনসাধারণের কদভ্যাস নিবারণের জন্য কিছু সময় দিলে সমাজের মঙ্গল হবে। সংবাদপত্রেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

(৮) পূর্বের তুলনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে বিবাহ বেড়েছে, কিন্তু বহুপ্রচলিত হবার সম্ভাবনা কম। এইরূপ বিবাহের ফলে নূতন ইউরেশীয় সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে না, সন্তানরা পিতা বা মাতার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রূপবিচারের সময় লোকে সাধারণত সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কটা চোখ আর কটা চুল অধিকাংশ ভারতবাসীর পছন্দ নয়। এই প্রকার রুচিভেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ মোটের উপর বজায় থাকবে। তবে কালক্রমে রুচির পরিবর্তন হতে পারে। শুনতে পাই, পাশ্চাত্ত্য সমাজে নিগ্রো জাজ-সংগীতের মত নিগ্রো দেহসৌষ্ঠবেরও সমঝদার বাড়ছে।

মোট কথা, অচির ভবিষ্যতে পূর্ণমাত্রায় অশ্রেণিক সমাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই আশা করা যেতে পারে—মানুষের ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণ উদাসীন সেখানে রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হবে, তার ফলেও শ্রেণীভেদ কমবে। মানবস্বভাবের যে বৃহৎ অংশ জন্মগত নয়, শিক্ষা চর্যা আর পরিবেশের ফল, সেই অংশের গঠনে সম্ভবত ভবিষ্যতে সকলেই সমান সুযোগ পাবে, তবে এই সামাজিক পরিবর্তন সকল রাষ্ট্রে সমানভাবে ঘটবে না।



নিসর্গচর্চা

(১৩৬১/১৯৫৪)

কালিদাস যদি বাঙালী হতেন তবে বোধ হয় মেঘদূতের পূর্বমেঘ লিখতেন না কিংবা খুব সংক্ষেপে সারতেন, কিন্তু উত্তরমেঘ সবিস্তারে লিখতেন এবং তাতে বিস্তর 'মনস্তত্ত্ব' জুড়ে দিতেন। প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে বাঙালী অনেকটা উদাসীন, প্রাচীন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকের মতন নিসর্গপ্রীতি আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশী দেখা যায় না।

কলকাতা ইট কাঠ লোহা কংক্রীটের শহর, কর্জন পার্ক আর ইডেন গার্ডেন ধ্বংস করতে আমাদের কষ্ট হয় নি। কিন্তু জনসাধারণের উপেক্ষা সত্ত্বেও অনেক রাস্তার ধারে আর পার্কে এখনও গাছপালা আছে, তাতে বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র সমারোহ এখনও দেখা যায়। ইংরেজ সম্পাদিত স্টেট্‌সম্যান কাগজে মাঝে মাঝে তার বর্ণনা থাকে। বর্ষাকালে কলকাতার উপকণ্ঠে যে ভেক-সমাগম আর অষ্টপ্রহরব্যাপী মকমক আলাপ শোনা যায় তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ কয়েক বৎসর আগে উক্ত পত্রে পড়েছিলাম।

দেশী সংবাদপত্রে এসব বিবরণ থাকে না। বাঙালীর মনে সাপ ব্যাং শেয়াল পোকামাকড় প্রভৃতির কথা রসের সঞ্চার করে না, অথচ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এই সব প্রাণী প্রচুর সমাদর পেয়েছে এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকরাও এদের উপেক্ষা করেন না। প্রতিদিন বিকালে আমাদের মাথার উপর দিয়ে আকাশপথে এক দিক থেকে আর এক দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়, আমরা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি না। বাড়ির কাছে গাছপালা থাকলে চৈত্র বৈশাখ মাসে কাক শালিক তাতে বাসা বাঁধে, বর্ষা আর শীতের শেষে নানারকম প্রজাপতি আসে, আমরা তাদের গ্রাহ্য করি না। সেদিন এক ইংরেজী পত্রিকায় পড়েছি, এক শৌখিন ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির সামনে বাগান তৈরি করে একটি সাইন বোর্ডে টাঙিয়েছিলেন—Butterflies are welcome। বাঙালী এমন ছেলেমানুষী রসিকতা করে না।

অনেক বৎসর পূর্বে কোনও এক বাংলা সংবাদপত্রে একজন অনুযোগ করেছিলেন—দেশ এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন, কিন্তু আমাদের কবি আবৃত্তি করছেন—হৃদয় আমার নাচে রে, ময়ূরের মত নাচে রে! এই কি

নাচবার সময়? কবি এর সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রের অনেক বিজ্ঞ পাঠক বলবেন, জগদ্‌ব্যাপী অশান্তির জন্য আমরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছি, এখন শুধু দেশের আর বিদেশের রাজনীতিক সংবাদ চাই, পুলিসের গুলিতে কজন মরল জানতে চাই, রেশনের চাল কবে বাড়ানো হবে তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি চাই; এই দুর্দিনে তুচ্ছ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও দেখতে পাই কুৎসিত মকদ্দমার বিবরণ লোকে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। সাপের দুই পা, ছাগলীর গর্ভে মর্কটের জন্ম, অমুক স্বামীজীর অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি যজ্ঞে এক শ মন ঘৃতাহুতি, অমুক অবতারের জন্মোৎসবে বত্রিশটা স্পেশাল ট্রেনে ভক্তসমাগম—এইসব খবরও অনেক পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে। কিন্তু কবে কোথায় অশথগাছ হঠাৎ তামা-রঙের ঝকঝকে পাতায় ছেয়ে গেল, গুলমোর সোঁদাল বা জারুলের ফুল ফুটল, কোথায় ব্যাঙ ডাকল, আকাশে বক না হাঁস কিসের ঝাঁক উড়ে গেল—এসব তুচ্ছ ছেলেমানুষী খবরে লেখক বা পাঠকের আগ্রহ হবে কেন? আমাদের অধিকাংশ গল্পলেখক মিস্টার বাসু মিসেস চ্যাটার্জি বা কলেজের ছেলেমেয়ের প্রেমলীলা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কেউ প্রাচীন বিপ্লবীদের জের এখনও টানছেন, কেউ কেউ নব বিপ্লবীদের আসরে নামাবার চেষ্টা করছেন। এঁদের ছ-সাত শ পাতার গল্পে টমাস হার্ডির মতন নিসর্গবর্ণনার স্থান হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। এ যুগের অনেক কবি, বিশেষত যাঁরা অত্যাধুনিক নন—যেমন কবিশেখর কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ—এখনও নিসর্গচর্চা করেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতি বন্দ্যো বনফুল তারাশঙ্কর বিভূতি মুখো প্রভৃতি কয়েক জন লেখক তাঁদের গল্পে শুধু মানুষ-মানুষীর কথা লেখেন নি, বৃক্ষ লতা ইতর প্রাণী নদী প্রান্তরকেও সাদরে স্থান দিয়েছেন। বনফুলের 'ডানা' গল্পে পক্ষিচরিত আর নরনারীচরিত সমান তালে চলেছে। তথাপি বলা যায়, ইংরেজ ও প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদের তুলনায় আধুনিক বাঙালী লেখক নিসর্গচর্চায় বিমুখ।

উপনিষদের ঋষি সমগ্র নিসর্গে ব্রহ্মোপলব্ধি করে বলেছেন—

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।

—তুমি নীল পতঙ্গ, হরিদ্‌বর্ণ লোহিতাক্ষ তড়িদ্‌গর্ভে মেঘ, ঋতুসকল, সমুদ্রসকল।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অকৃত্রিম নিসর্গচিত্রণে বোধ হয় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ। বর্ষাবর্ণনায় তিনি লিখেছেন,

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নাবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি॥

—নানা আকারের নানা বর্ণের ভেক অবরুদ্ধ স্থানে দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিল, এখন তারা মেঘের শব্দে জাগরিত এবং নবজলধারায় সিক্ত হয়ে নানাপ্রকার রব করছে।

কীট্‌স তাঁর The Realm of Fancy কবিতায়· লিখেছেন,

Thou shall see the field-mouse peep
Meagre from its celled sleep
And the snake all winter thin
Cast on sunny bank its skin.

কালিদাস বোধ হয় স্বচক্ষে তিমি দেখেছিলেন তাই রঘুবংশে লিখেছেন,

অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈ-
রূর্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্

—ওই তিমিকুল মস্তকের রন্ধ্র দিয়ে উপর দিকে জলপ্রবাহ ক্ষেপণ করছে।

কিপলিং নেকড়ে বাঘের গান লিখেছেন,

As the dawn was breaking
the Sambhur belled
Once, twice, and again !
And a doe leaped up, and
a doe leaped up
From the pond in the wood
where the wild deer sup.
This I, scouting alone, beheld
Once, twice and again !

এই প্রকার বর্ণনার অনুরক্ত পাঠক এককালে অনেক ছিল, কিন্তু এখন বড় একটা দেখা যায় না। লোকের রুচি কি বদলে গেছে? বোধ হয় যায় নি, অবহেলায় চাপা পড়ে আছে।

খাবারওয়ালাকে যদি প্রশ্ন করি—মিষ্টান্নে রং দাও কেন, বিকট বিলিতী গন্ধ দাও কেন, সে উত্তর দেয়, খদ্দের এইরকম রং আর গন্ধ চায় যে। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। তীব্র কৃত্রিম গন্ধযুক্ত সবুজ রঙের গ্রীন ম্যাংগো সন্দেশ পছন্দ করে এমন লোক হয়তো আছে, কিন্তু আসল কথা, খাবারওয়ালা নিজের রুচি আর বুদ্ধি অনুসারে যে রং দেয়, গন্ধ দেয়, অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দেয়, ক্রেতা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, মনে করে, এই হচ্ছে আধুনিক ফ্যাশন। খাদ্যের স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ স্বাদ অনেকেরই ভাল লাগে, কিন্তু মিষ্টান্নকার তা বোঝে না। অনেক গল্পকারও পাঠকসাধারণের স্বাভাবিক সুস্থ রুচির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করেন না। লোকে বিকৃত প্রেম আর লালসার চিত্র চায়, রোমাঞ্চ চায়, সেজন্য আমাদের কথাগ্রন্থে তাই থাকে—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গল্পকার নিজের রুচি অনুসারেই লেখেন এবং তিনি যদি শক্তিমান হন তবে পাঠকবর্গের মনেও তাঁর রুচি সঞ্চারিত হয়। পাঠক ফরমাশ করে না, লেখকের কাছ থেকে যা পায় তাই হাল ফ্যাশন বলে মেনে নেয়।

রাজনীতিক সামাজিক আর্থিক প্রভৃতি নানা সমস্যা আমাদের আছে। সাময়িক পত্রে এবং অন্যান্য সাহিত্যে তার বহু আলোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাঠকের মন শুধু সমস্যা আর তত্ত্বকথার আলোচনায় তৃপ্ত হয় না, নানাবিধ রসের কামনা করে। বাংলা সাহিত্য উন্নতির পথে চলেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ায় লোকের কর্মক্ষেত্র বেড়ে গেছে, গল্পের পাত্ররা এখন শুধু জমিদারপুত্র কেরানী লেখক চিত্রকর নয়, পাত্রীরা শুধু গৃহপালিতা অল্পশিক্ষিতা কন্যা বা কুলবধূ নয়। বাঙালী অনেক রকম বিজ্ঞান শিখছে, দেশবিদেশে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ নৈসর্গিক তথ্যের সন্ধানে অভিযানও করছে। কিন্তু এখনও আমাদের কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন প্রেম। পরিবর্তন এই হয়েছে—প্রেমের আর স্বাভাবিক রূপ নেই, 'আবেদন' বৃদ্ধির জন্য তাতে বিলিতী রং আর গন্ধ যোগ করা হয়। অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য গল্পও প্রেমমূলক, কিন্তু প্রেমবর্জিত গল্প আর গল্পতুল্য সুখপাঠ্য লঘু সাহিত্যও প্রচুর আছে এবং পাঠকরা তা আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে। বাংলা শিশুপাঠ্য গল্প আর বিলিতীর নকল ডিটেকটিভ কাহিনী অনেক আছে, অল্প স্বল্প ভ্রমণকথাও আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের মতন বৈচিত্র্য এখনও দেখা যায় না।

শুধু কৌতূহলনিবৃত্তি বা উত্তেজনার জন্য লোকে খবরের কাগজ আর কথাগ্রন্থ পড়ে না, শান্তরসও অসংখ্য পাঠকের প্রিয়। শান্তরস অর্থে শুধু নামে রুচি বা ভক্তিরস নয়। বিস্তর বাঙালী স্ত্রীপুরুষ আজকাল এই রসে ডুবে আছে, তার বৃদ্ধির জন্য সাহিত্যিকদের চেষ্টা অনাবশ্যক। নামে রুচি ছাড়া জীবে দয়াও চর্চার যোগ্য। কিন্তু জীব শুধু দয়ার ভিখারী নয়, প্রীতি বিস্ময় আর কৌতূহলেরও পাত্র।

মানুষ জীবজগতের অংশ, উদ্‌ভিদ-প্রাণীর সঙ্গে তার আদিম আত্মীয় সম্পর্ক। আমাদের স্বজাতির মধ্যে শত্রুমিত্র আছে, উদ্‌ভিদ-প্রাণীর মধ্যেও মানুষের উপকারী অপকারী আছে, কিন্তু তার জন্য সমগ্র জীবজগতের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার হানি হয় নি।

অরণ্য জনপদ নগর যেখানেই বাস করুক, আবালবৃদ্ধবনিতা সুস্থচিত্ত মানুষ মাত্রেরই সহজাত নিসর্গপ্রীতি আছে। নাগরিক জীবনযাত্রায় তা অবদমিত হতে পারে কিন্তু লুপ্ত হয় না। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে আমাদের এই চিরন্তন সম্বন্ধ এবং প্রতিবেশী বৃক্ষ লতা গুল্ম পশুপক্ষী পতঙ্গাদির প্রতি স্নেহ বিস্ময় আর কৌতূহলের ভাব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনাবিল শান্তরসের উপাদান যুগিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য লেখক আর পাঠকরাও এই রসের পরম ভক্ত। কালিদাসের শকুন্তলা আর মেঘদূত প্রধানত নিসর্গচিত্রের জন্যই ইওরোপীয় পাঠকের মনোহরণ করেছে। আধুনিক বাঙালী লেখকরা যদি শান্তরসের এই হৃদ্য চিরন্তন উপাদান উপেক্ষা করেন তবে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বঞ্চিত হবে।



বিজ্ঞানের বিভীষিকা

(১৩৬২/১৯৫৫)

অনেক বৎসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রূকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ-এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিএট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওঁদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণু-বোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এঁদের যুক্তি এই রকম। —

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল, সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিনগন, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরিন, বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্‌ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্‌ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে।

মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃপ্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জ্বলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক—বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন—সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি ইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্টদের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজান্ডারের দিগ্‌বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই

পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে—মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে, আমি মানব কী লাগি একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত হন, এঁরা নিষ্কাম শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক দল নিজেদের বা পরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এরা সকাম ফলিতবিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্বই নিষ্কাম বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছিয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠছে—এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অন্য লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আপাতত নেই। সেগুন আর ঘেঁটু একই বর্গের গাছ, চামচিকার দেহে রাডারের মতন যন্ত্র আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে—ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুম্বক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয়—এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞান মাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে মাংস সুস্বাদু হয়—এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্তু জনকতক কুতূহলী আছেন যাঁরা কার্য আর কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তার পর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন—আঁচ যতই বাড়ানো হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক পাচক পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না, জানলে ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কাণ্ডজ্ঞান (common sense), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান—এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমনকি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জবিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধবিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সন স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টরপিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্‌ভাবকগণ ফললাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাছে বিজ্ঞান মুখ্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ —এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই তা ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে কেউ বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুণ্ডার জন্য ছোরা তৈরি হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরি স্থগিত থাকুক।

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব

সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক—এই আবদার করা বৃথা। হবুচন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণুবোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে—টি-এন-টি আর ফসফরস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো, ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেরই দোষ।

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন—কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ—শস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরা ঘোষণা করছেন যে পরমাণু-বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণু-বোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাস প্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির

যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ জি ওয়েলস্, ওয়েন্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

এক কালে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল—সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। আজকাল শোনা যায়—মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই মানবজীবন সার্থক হবে।* এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগসুখের বৃদ্ধি। ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, তারই পরিণামস্বরূপ অন্য দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি।

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। সকলের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাহুল্য আর বিলাসসামগ্রীর বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীতে বহু বার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার জন্যও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলেও সমস্যা

* 'জীবনযাত্রা' দ্রষ্টব্য। —সঃ

দেখা দিচ্ছে। যদি দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ না হয়, তবে জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে।* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির খাদ্য ও অন্যান্য জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ ছিল—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি বিষয়ের সাধনা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পঞ্চম পুরুষার্থ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের অবহেলার ফলে ভারতবাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সযত্নে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক—কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেন্টলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অসতর্ক বিন্যাস। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণুবংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডিডিটি প্রভৃতি কীটঘ্নের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে এমন মশক-বংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহুদূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হবে এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। মোট কথা, বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।

❑

* 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন' প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা আছে।

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

(১৩৬৩/১৯৫৬)

কালচার শব্দের প্রতিশব্দ কেউ লেখেন কৃষ্টি কেউ লেখেন সংস্কৃতি। কালচার আর কৃষ্টি দুই শব্দেরই ব্যুৎপত্তিতে কৃষি বা কর্ষণের ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দ পছন্দ করতেন না, তিনিই সংস্কৃতি চালিয়েছেন।

কোনও ইংরেজী শব্দের যখন বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় তখন ইংরেজী শব্দের পারিভাষিক অর্থ পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়। Oxford Pocket Dictionaryতে cultureএর বিশিষ্ট অর্থ—

Trained and refined state of the understanding and manners and tastes; phase of this prevalent at a time or place.

এই পারিভাষিক অর্থে বুদ্ধি আচরণ ও রুচির যে শিক্ষিত ও মার্জিত অবস্থা বোঝায় তা সংস্কৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নিহিত আছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে—'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল।' এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

আমি সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এই শব্দত্রয় ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। (১) দেহের সুখ বিধান যে কৃতির লক্ষ্য তাহা সভ্যতা। (২) যদ্দ্বারা মনের সুখ সাধন হয় তাহা সংস্কৃতি। (৩) যদ্দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কৃষ্টি। মহেন-জো-দড়োর আবিষ্কৃত পুরাকৃতি প্রাচীন সিন্ধুবাসীর সভ্যতার, ভরতনাট্যম্ প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির, এবং নয়টি অঙ্ক দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা প্রকাশ বৈদিক আর্যগণের কৃষ্টির পরিচয়।

ইংরেজী অভিধানে কালচার শব্দের যে বিশিষ্ট অর্থ দেওয়া আছে যোগেশচন্দ্র তাই বিশ্লিষ্ট করে সভ্যতা সংস্কৃতি আর কৃষ্টি এই তিন শব্দে ভাগ করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই বিশ্লেষণের ফলে কালচার বিষয়ক আলোচনা সহজ হবে। পার্থক্য সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি বলা যেতে পারে—

(১) ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধান, দেওয়ানী ফৌজদারী আইন, জলসেক

ব্যবস্থা, বাঁধ, সেতু, লোহা প্রভৃতির কারখানা, বিবিধ প্রাসাদ, রেলগাড়ি মোটর-কার টেলিফোন রেডিও, বিদ্যুৎশক্তির বিস্তার, স্কুল কলেজ হাসপাতাল, দেশীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার পরিচায়ক, যদিও বহু ক্ষেত্রে কৃতি বা উদ্‌ভাবনের গৌরব বিদেশীর। চা সিগারেট কেক বিস্কুট, ইওরোপীয় প্যান্ট শার্ট কোট, 'পঞ্জাবী' জামা, গান্ধী টুপি, বিলাতী গড়নের জুতা, মাদ্রাজী চপ্পল—এ সবও আমাদের বর্তমান সভ্যতার অঙ্গ।

(২) প্রাচীন ও আধুনিক দেবমন্দির স্তূপাদি, ভারতীয় সংগীত চিত্র ও মূর্তি-নির্মাণ কলা, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি ভারতের সংস্কৃতির পরিচায়ক। বাঙালীর বিশিষ্ট সংস্কৃতির উদাহরণ—কীর্তন ও বাউলের গান, রবীন্দ্রসংগীত, প্রাচীন পট ও আধুনিক চিত্র-পদ্ধতি এবং বাংলা-সাহিত্য।

(৩) ভারতীয় কৃষ্টির পরিচায়ক—সংস্কৃত বর্ণমালা (alphabet), ব্যাকরণ ছন্দঃ ও অলংকার শাস্ত্র, বিবিধ দর্শন শাস্ত্র, এবং নবায়ত্ত বিজ্ঞান। বাঙালীর বিশিষ্ট কৃষ্টির উদাহরণ—নব্যন্যায়, দায়ভাগ, শুভংকরের গণনা-পদ্ধতি এবং বিধবা ও অসবর্ণের বিবাহের প্রবর্তন চেষ্টা। অনাবশ্যক বোধে টিকি-বর্জন—এও বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টির লক্ষণ।

সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালে কালে পরিবর্তিত হয়। দেড় শ বৎসর আগে পর্যন্ত বাংলা দেশে এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়েছিল, তার পর ব্রিটিশ রাজত্বকালে অতি দ্রুত লয়ে ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তনের গতি আরও ত্বরিত হয়েছে।

কালচারের সর্বার্থক প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দই আজকাল বেশী চলছে, কিন্তু সাহিত্যিক আলোচনায় সংস্কৃতি যে অর্থে চলে তা যোগেশচন্দ্রের সংজ্ঞার্থেরই অনুরূপ। বাঙালীর সংস্কৃতি বললে যা বোঝায় তার প্রধান অঙ্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এখন তার কথাই বলছি।

প্রায় পাঁচ শ বৎসর এ দেশে মুসলমান রাজত্ব ছিল, তার ফলে হিন্দু সংস্কৃতিতে মুসলমান (বা পারসীক) প্রভাব কিছু কিছু এসে পড়েছে। বিস্তর ফারসী আরবী আর তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্গত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের কাল দু শ বৎসরেরও কম, কিন্তু সংস্কৃতিতে তার প্রভাব আরও ব্যাপক। এর কারণ ব্রিটিশ শাসনের উপর যতই বিদ্বেষ থাকুক, ব্রিটিশ সংস্কৃতি আর সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তার ফলে

আধুনিক বাংলা ভাষা ইংরেজীর অন্তর্বর্তী হয়ে পড়েছে, শিক্ষিত বাঙালী সমাজও ক্রমে ক্রমে ইওরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করছে।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে তার প্রভাব বাংলা ভাষার উপর অবশ্যই কিছু পড়বে, কিন্তু ইংরেজীর তুল্য নয়, কারণ হিন্দীর সে প্রতিপত্তি নেই। ইংরেজীর স্থান হিন্দী কখনও নিতে পারবে না। অন্ধ হিন্দীপ্রেমী ছাড়া সকলেই বুঝেছেন যে ইংরেজীর চর্চা লোপ পেলে আমাদের জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হবে। ভারত সংবিধানে অষ্টম তফসিলে যে চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার উল্লেখ আছে তার মধ্যে সংস্কৃত আছে অথচ ইংরেজীর নাম নেই। ইংরেজী অ্যাংলোইন্ডিয়ানদের ভাষা অতএব অন্যতম ভারতীয় ভাষা—এই কারণে তাঁদের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি ইংরেজীকে তফসিলভুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। আমাদের উচিত সর্বতোভাবে এই চেষ্টার সমর্থন করা।

অপর একটি প্রস্তাব বহুবার আলোচিত হয়ে চাপা পড়ে গেছে—ভারতের সমস্ত ভাষার জন্য রোমানলিপি বা scriptএর প্রবর্তন, অবশ্য বর্ণমালা বা alphabet যে ভাষার যেমন আছে তাই থাকবে। ভারতীয় লিপি চিরকাল সমান ছিল না। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে নাগরী হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার লিপি সেজন্য 'দেবনাগরী' নাম। সংস্কৃতের কোন সনাতনী লিপি নেই, দিল্লীর লৌহস্তম্ভের লিপি আর সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বহস্তাক্ষরের কোনও মিল নেই অথচ ভাষা উভয়েরই সংস্কৃত। প্রচলিত বিভিন্ন লিপির মায়া ত্যাগ করে সর্ব ভারতের মিলনের যোগসূত্ররূপে রোমান লিপি প্রবর্তনের জন্য প্রবল চেষ্টা আবশ্যক। তুরস্ক তা করে লাভবান হয়েছে, চীন দেশেও আয়োজন হচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলা ভাষা বাধা পায় নি, প্রশ্রয়ও পায় নি। ষাট বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার স্থান ছিল না তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। তার কারণ, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী সুধীজন নবদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, বাংলাসাহিত্যও ইংরেজীর তুল্য সমৃদ্ধ হতে পারে এই বিশ্বাসে তাঁরা সাহিত্য সাধনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত জনের প্রবল অনুরাগ ছিল, বিদেশী ভাষা থেকে রাশি রাশি ভাব আহরণ করে তাঁরা বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত করেছিলেন। জনকতক মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলেও বহু শিক্ষিত জন অপ্রমত্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালীর মাতৃভাষাপ্রীতি বেড়ে গেছে।

ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্যের যে গৌরব হিন্দীর তা নেই, সুতরাং ভবিষ্যতে হিন্দী কর্তৃক বাংলা অভিভূত হবে এই ভয় অমূলক। হিন্দী যদি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা হয়, বঙ্গ-বিহার যদি কোনও কালে যুক্ত হয়ে যায়, তবে অন্য লাভ ক্ষতি যাই হক বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের হানি হবার সম্ভাবনা নেই। বঙ্গ-বিহার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা যদি উৎকট হিন্দীপ্রেমের বশে বাংলা ভাষার উপর উপদ্রব শুরু করেন তবে বাঙালী কি এতই দুর্বল যে তা রোধ করতে পারবে না?

বাঙালী লেখকরা বহু কাল ধরে ইংরেজী ভাবরাশি আত্মসাৎ করেছেন, তার ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার জাতিনাশ হয় নি। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একটি অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে। নবীন বাঙালীর ইংরেজীজ্ঞান পূর্বের তুলনায় কমে যাচ্ছে। শুনতে পাই অনেক গ্র্যাজুয়েটও ইংরেজী গল্পের বই বুঝতে পারেন না, সেজন্য আজকাল অনুবাদ গ্রন্থের এত প্রচলন হয়েছে। শুধু ইংরেজী গ্রন্থ নয়, চিরায়ত বা ক্লাসিক বাংলা রচনাও ক্রমশ অবোধ্য হয়ে পড়ছে। যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেক শিক্ষিত লোককে বলতে শুনেছি—কপালকুণ্ডলা বুঝতে পারি না আর কালীসিংহের মহাভারত? ওরে বাপ রে! হয়তো কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রও অবোধ্য হয়ে পড়বেন।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার দখল যতই কমুক, ইংরেজী এখনও বাংলা ভাষার গুরুস্থানীয়, বরং গুরুভক্তি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং তার সঙ্গে মোহ এসেছে। বহুপ্রচলিত বাংলা বাক্যরীতি স্থানে ইংরেজী রীতি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। উপযুক্ত বাংলা শব্দ থাকলেও ইংরেজী মাছিমারা নকলে নূতন শব্দ চালানো হচ্ছে।* বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের যেটুকু শাসন ছিল তা লোপ পাচ্ছে, তার ফলে ভাষা উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যেমন নবীন শিক্ষিত জনের অবোধ্য, অনেক আধুনিক লেখকের ভাষাও তেমনি প্রবীণ পাঠকদের অবোধ্য হয়ে পড়েছে। আধুনিক বাঙালী লেখকদের এই প্রবৃত্তি অনেকের মতে অবাঞ্ছনীয় হলেও রোধ করা অসম্ভব; ভাল মন্দ নানা পথ দিয়ে ভাষা অগ্রসর হবে এবং যে রীতি অধিকাংশ সুধী-জনের সম্মত তাই কালক্রমে প্রতিষ্ঠা পাবে।

* 'কর্মনিষ্ঠা' স্থলে work cultureএর মাছিমারা অনুবাদ 'কর্মসংস্কৃতি'।

গত ৫ নভেম্বর Nature পত্রিকায় Dr John R Baker একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

Many scientific papers published in Great Britain are written in a style quite different from that adopted by good English authors...Three kinds of errors are—those of grammar, grandiloquence, and German construction.

ইংরেজী লেখকদের বিরুদ্ধে ইনি যে অভিযোগ এনেছেন আধুনিক অনেক বাংলা লেখকদের সম্বন্ধেও তা খাটে...ব্যাকরণের ভুল, আড়ম্বর এবং (জার্মনের বদলে) ইংরেজী বাক্যরীতি।

হিন্দীর কিছু প্রভাব বাংলা ভাষার উপর অবশ্যই আসবে। হিন্দীর মহত্ত্বের জন্য নয়, ভারতের সর্বাধিক প্রচলিত এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা বলেই আসবে। তার লক্ষণ এখনই দেখা যায়। অনেক বাঙালী লেখক 'নূতন' স্থানে 'নয়া' সমুদ্র স্থানে 'দরিয়া', 'স্বাধীনতা' স্থানে 'আজাদী' লিখতে ভালবাসেন। অনেকে 'প্রদেশ, বিপ্লব, শিল্প' স্থানে 'প্রান্ত, ক্রান্তি, উদ্যোগ' লিখছেন। কালক্রমে হয়তো 'অনুগ্রহ পূর্বক' স্থানে হিন্দী 'কৃপয়া', ডাকবাক্স স্থানে চিঠ্ঠি ঘুসেড়', 'জরুরী স্থানে 'ধড়াধড়' চলবে।* অনেক বাংলা বই-এর নাম মলাটের উপর নাগরী ছাঁদে লেখা হয়। বাঙালী যদি রাশি রাশি ইংরেজী ভেজাল হজম করতে পারে তবে একটু ভারতীয় ভেজাল সইবে না কেন?

❑

* পঞ্চাশ বৎসর পরে, রাষ্ট্রভাষা না হলেও আরব সাগর উপকূলোদ্ভব বাঙ্ময় আলেখ্যর প্রভাবে সাহিত্য বিজ্ঞাপন ও মৌখিক বাংলা এখন প্রগাঢ় হিন্দী রসাবিষ্ট। —স:

আমাদের পরিচ্ছদ

(১৮৭৮/১৯৫৬)

সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু এক বক্তৃতায় বলেছেন, ইওরোপীয় পোশাকের উপর এ দেশের লোকের অত্যন্ত ঝোঁক তিনি পছন্দ করেন না। কি রকম সাজ ভারতবাসীর উপযুক্ত তা তিনি খোলসা করে বলেন নি। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তিনি ইংলান্ডে গিয়েছিলেন তখন কাগজে তাঁর হ্যাট কোট টাই ট্রাউজার পরা ছবি বেরিয়েছিল। সম্প্রতি আমেরিকা ভ্রমণের ছবিতে তাঁর পরনে লংকোট টাই আর গান্ধীটুপি দেখা গেছে। ভারতবর্ষে তিনি চুড়িদার পাজামা আচকান আর গান্ধীটুপি পরে থাকেন। অতএব ধরে নিতে পারি সর্বাবস্থায় সাহেব সেজে থাকাই তাঁর অপছন্দ; ক্ষেত্র বিশেষে বিলাতী বা দেশী-বিলাতীর মিশ্র পোশাকে তাঁর সম্মতি আছে।

হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে যার মানে—নিজের রুচিতে খাবে আর পরের রুচিতে পরবে। নিজের রুচিতে সাজতে গেলে বাধা পাওয়া যায় তা আমি দেখেছি। একবার দরজীকে ফরমাশ করেছিলাম—আমার যে পঞ্জাবি করবে তার বুকের উপর বাঁ দিকে একটা মামুলী পকেট হবে, আর ভিতরে ডান দিকে আর একটা পকেট হবে; বাঁ দিকের পকেট বাইরে, আর ডান দিকেরটা ভিতরে। বুঝেছ? দরজী বলল, আজ্ঞে ঠিক বুঝেছি। যখন জামা তৈরি হয়ে এল তখন দেখলাম দুটো পকেটই বাঁ দিকে, একটা বাইরে আর একটা ঠিক তার পিছনে ভিতর দিকে। বললাম, এ কি করেছ মিয়া? মিয়া উত্তর দিল, দুটো দু দিকে থাকলে যে বেপ্যাটান হবে বাবু, তা তো দস্তুর নয়। দরজী নিষ্ঠাবান লোক, দস্তুর ভঙ্গের পাতক থেকে আমাকে রক্ষার জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। আর একবার পঞ্জাবির ফরমাশ দিয়েছিলাম যার বুক কোটের মতন সবটা খোলা যায়। দরজী এবারে আমার অনুরোধ রেখেছিল। কিন্তু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা বলল, এ কি রকম বেয়াড়া জামা! এ যে কোটজাবি, না কোট না পঞ্জাবি, ফেলে দাও এটা। আমি ফেলি নি, দু-তিন জন আমার দেখাদেখি কোটজাবি বানিয়েছিল।

সমস্ত ভারতের স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

নয়, কেবল বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথাই বলব, প্রথমে পুরুষের, শেষে মেয়ের। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের রুচি তিন কারণে প্রভাবিত হয়—(১) গতানুগতিক রীতি, (২) সাময়িক ফ্যাশন হুজুক বা বিখ্যাত লোকের আদর্শ এবং (৩) স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জ্ঞান। তা ছাড়া আর্থিক কারণ বা সুলভতা দুর্লভতা তো আছেই।

গতানুগতিক রীতি কালক্রমে বদলায়। আমার শৈশবে অর্থাৎ প্রায় সত্তর বৎসর আগে সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পরিচ্ছদ ছিল ধুতি পিরান চাদর আর বিলাতী গড়নের জুতো (শু বা পম্প)। পিরানের আকার আধুনিক পঞ্জাবির মতন, কিন্তু ঝুল কম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা পরতেন ধুতি, কোরতা বা খাটো আঙরাখা, চাদর আর চটি, অনেক সময় শুধু ধুতি চাদর চটি। কোরতায় বোতামের বদলে ফিতা থাকত, ঝুল কোমর পর্যন্ত। খাটো আঙরাখার গড়ন চাপকানের মতন কিন্তু ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত। কীর্তন-গায়করা এখনও কোরতা পরে থাকেন। গেঞ্জির চলন ৬০।৭০ বৎসর আগে হয়। সেকালে নাম ছিল গেঞ্জিফ্রক। ইংলান্ড আর ফ্রান্সের মাঝে যেসব দ্বীপ আছে তার একটার নাম Guernsey আর একটার Jersey। তা থেকেই জামার নাম গেঞ্জি আর জার্সি হয়েছে।

বিলাতফেরতরা তখন সর্বদা সাহেবী পোশাক পরতেন, সুরেন বাঁড়ুজ্যে এবং আরও দু-চার জন ছাড়া। উকিল ডেপুটি সবজজ আর বড় কর্মচারীরা ইজার চাপকানের উপর চোগা বা পাকানো চাদর পরতেন, মাথায় শামলা বা পিরালী পাগড়ি দিতেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে আছে, মহেন্দ্র চাপকান পরে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত। শীতকালে অবশ্য সকলেরই পোশাকের পরিবর্তন হত, মধ্যবিত্তরা ধুতির উপর গরম কোট এবং র‍্যাপার বা শাল পরতেন। অল্প কয়েক জন অতি সেকেলে লোক পারসী কোট (ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত) আর চায়না কোট (গলায় কলার নেই, ঢিলা গড়ন) পরতেন।

প্রায় ষাট বৎসর আগে অল্পবয়স্কদের মধ্যে পিরানের বদলে শার্টের প্রচলন হল। শার্টের উপর চাদর বা উড়ুনি ইচ্ছাধীন, কিন্তু কলকাতার যুবসমাজে কোটের উপর চাদর পরা বাঙাল বা খোট্টা-বাঙালীর লক্ষণ গণ্য হত। ক্রমশ শিক্ষিত লোকের অনেকের হুঁশ হল, শার্ট হচ্ছে সাহেবদের অন্তরীয়, কোটের নীচে পরবার। তখন তার বদলে এল পঞ্জাবি, অর্থাৎ বেশী ঝুলওয়ালা পিরান। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাজ নিরূপিত হয়ে গেল—

ধুতি আর পঞ্জাবি, তার উপর চাদর ইচ্ছাধীন। ধুতি-চাদর আমাদের বহু প্রাচীন পরিধেয়, কিন্তু 'পঞ্জাবি' নামেই বোঝা যায় এটি খাঁটি বাঙলা দেশের জিনিস নয়। পিরান শার্ট আর পঞ্জাব অঞ্চলের আজানুলম্বিত 'কমীজ'-এর মিশ্রণে পঞ্জাবি নামক জামার উৎপত্তি হয়েছে। ১৯২০-৩০ নাগাদ চাপকান চোগা শামলা পাগড়ি লোপ পেতে লাগল এবং সাহেবী সাজই সম্ভ্রান্ত পোশাক গণ্য হল, কিন্তু হ্যাট বহুপ্রচলিত হয় নি।

কাপড়ের দাম ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার ফলে বালক আর কিশোরদের মধ্যে হাফপ্যান্টের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। ধুতি পরা ছোট ছেলে এখন আর প্রায় দেখা যায় না, মেয়েরাও কিশোর বয়স পর্যন্ত ফ্রক পরে। যুবা আর প্রৌঢ়দের মধ্যে ধুতির বদলে পাজামা ইজার বা প্যান্টের প্রচলন ক্রমশ বাড়ছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশী রুচি লুপ্তপ্রায় হয়েছে, এখন হরেক রকম ইজার প্যান্ট শার্ট আর শার্ট-কোটের খিচুড়ি চলছে, অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদ কি দাঁড়াবে বলা অসম্ভব।

গত সত্তর বৎসরে আমাদের পরিচ্ছদের যে ক্রমিক পরিবর্তন হয়েছে তার একটি কারণ নকল, ফ্যাশন বা হুজুক, অন্য কারণ ধুতির মূল্যবৃদ্ধি। কি রকম পরিচ্ছদ আমাদের উপযুক্ত তা নূতন করে বিচারের পূর্বে কতকগুলি বিষয় মেনে নেওয়া যেতে পারে। যথা—

(১) সর্বাবস্থায় একই রকম পরিচ্ছদ চলতে পারে না, কর্মভেদে এবং ঋতুভেদে বেশের পরিবর্তন হবেই।

(২) ভারতের সকল প্রদেশের আবহাওয়া সমান নয়, সে কারণে পরিচ্ছদও সমান হতে পারে না। তথাপি সর্বভারতীয় মিলনের ক্ষেত্রে কিছু সাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জাতির পরিচ্ছদে খুব মিল আছে। ইংরেজী যেমন বিশ্বরাজনীতির ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইওরোপীয় পোশাকও তেমনি সর্বজাতির ভব্য পরিচ্ছদ হয়ে পড়েছে। ভারতবাসী যদি ইওরোপীয় পোশাক অল্পাধিক গ্রহণ করে তবে আপত্তির কারণ নেই। অবশ্য ইওরোপীয় পোশাকের সবটাই স্বাস্থ্যের অনুকূল আর সুবিধাজনক নয়, অনাবশ্যক উপকরণও তাতে আছে (যেমন নেকটাই), সে কারণে কিছু কিছু সংস্কার হওয়া উচিত।

ফ্যাশন অগ্রাহ্য করে শুধু স্বাস্থ্য আর সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি বাঙালীর পরিধেয় নির্ধারণ করা যায় তবে তা কি রকম হবে? অনেক কাল আগে একজন মান্যগণ্য ইংরেজ (নাম মনে নেই) কয়েক বৎসর বাঙলা দেশে বাস করে বিলাতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন—We are baked for four months, boiled for four months and allowed to cool for four months। এই বিবরণে অত্যুক্তি আছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে আমাদের মাতৃভূমি গ্রীষ্মকালে সর্বদা মলয়জশীতলা থাকে না, গুমট আর ভেপসা গরম দুইই আমাদের ভোগ করতে হয়। এ দেশের বাতাস পশ্চিম ভারতের মতন শুখনো নয়, সেজন্য তাপ প্রবল না হলেও ঘাম বেশী হয়। এখানে বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত প্রায় সাত মাস অল্পাধিক গরম, শীত ঋতুও মৃদু ও অল্পস্থায়ী। অতএব আমাদের পরিধেয় প্রধানত আর্দ্রোষ্ণ (humid and hot) বায়ুর উপযুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্য শীতকালে পরিবর্তন করতে হবে।

আরব দেশের লোক গ্রীষ্মের তাপ রোধের জন্য সাদা কাপড়ের চোগা পরে, পুরুষরাও সাদা ঘোমটা দিয়ে মাথা আর মুখের দু পাশ ঢাকে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের দু-এক মাস খালি গায়ে আর খালি মাথায় বাইরে গেলে তাতের জন্য কষ্ট হয়, ছাতা বা আর কিছু দিয়ে মাথা ঢাকতে হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত সাত মাসের বাকী সময় বাতাস আর্দ্রোষ্ণ থাকে, তখন অল্প পরিচ্ছদই স্বাস্থ্যকর। ইওরোপীয় পুরুষ খালি গায়ে মোটরে চলেছে এই দৃশ্য এখন কলকাতায় বিরল নয়। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকে সেকালে যা পরতেন এবং এখনও যা পরেন—ধুতি চাদর আর চটি—এই হলেই যথেষ্ট। তাত অথবা অল্প ঠাণ্ডার সময় চাদর দিয়ে গা ঢাকা যেতে পারে, ভেপসা গরমে চাদর কাঁধে রেখে গায়ে হাওয়া লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মানুষের রুচি সকল ক্ষেত্রে যুক্তির বশে চলে না। ভারত সরকার আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, আমাদের ভব্যতার ধারণাও বদলাচ্ছে, আগে যা বিলাস গণ্য হত এখন তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুধু ধুতি চাদর চটি এখন অচল, আমাদের গলা থেকে পা পর্যন্ত সবই ঢাকতে হবে।

ধুতির অনেক গুণ। সেলাই করতে হয় না, সহজে পরা যায়, সহজে খোলা যায়, গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে না, হাওয়া লাগতে দেয়, নিত্য কাচা যায়, ইস্তিরি না করলেও চলে। ধুতি শব্দের মূল রূপ ধৌতি, অর্থাৎ যা নিত্য ধৌত

করতে হয়। আধুনিক ভদ্র বাঙালী যেভাবে ধুতি পরে তা নির্দোষ নয়। সামনে এক গোছা কোঁচা নিরর্থক, তাতে শুধু বোঝা বাড়ায় আর হাওয়া আটকায়। প্রমাণ ধুতি যদি দশ হাতের বদলে আট হাত করা হয় তবে লজ্জা নিবারণে কিছুমাত্র বাধা হয় না, শরীরে বেশী হাওয়া লাগে, কাপড়ের ওজন ১/৫ ভাগ কমে, দামও কমে।

বাঙালীর কোঁচা একটা সমস্যা, পথে চলবার সময় অনেকেই বাঁ হাতে কোঁচার নিম্নভাগ ধরে থাকে। সেকালের ভারতীয় সুন্দরীদের হাতে লীলাকমল থাকত, মধ্যযুগের রাজাবাদশাদের হাতে গোলাপ ফুল বা শিকারী বাজপাখী থাকত, ভিকটোরীয় যুগের বিলাসিনীদের হাতে flirting fan থাকত। মানবজাতির কাণ্ডজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ওসব অনাবশ্যক প্রথা লোপ পেয়েছে। বর্তমান কর্মময় যুগে পথচারী বাঙালী কোঁচার দায়ে এক হাত পঙ্গু করেছে, এই দৃশ্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কোঁচার নীচের অংশটা কোমরে গুঁজলে ক্ষতি কি?

শৌখিন ধনী বাঙালী যাঁরা সাধারণত ইওরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করেন তাঁরাও বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সভায় ধুতি পরে আসেন। অনেকের পরনে আভিজাত্যসূচক ৫২ ইঞ্চি বা আরও বেশী বহরের সূক্ষ্ম ধুতি থাকে, হাঁটবার সময় কোঁচার স্তবকতুল্য নিম্নভাগ মাটিতে লুটয়। চণ্ডীদাসের নায়িকা যেমন নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলত, শৌখিন বাঙালী নাগরিক তেমনি কোঁচাটি লুটিয়ে ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে চলে। একজন সুপরিচিত ভদ্রলোককে বলেছিলাম —মাটিতে যত ময়লা আছে সবই যে কোঁচায় লাগছে! উত্তর দিলেন, লাগুক গে, কালই তো লনড্রিতে যাবে।

আজকাল অনেকের পরনে যে পাতলা কাপড়ের পায়জামা বা ইজার দেখা যায় তা নানা বিষয়ে ধুতির চাইতে শ্রেষ্ঠ। ওজন কম, দামও ধুতির কাছাকাছি, কোঁচার বালাই নেই। যাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়—যেমন ডাক্তার বিজ্ঞানী যন্ত্রী ইত্যাদি—তাদের পক্ষে ধুতির চাইতে পাজামা বা ইজার সুবিধাজনক।

সম্প্রতি মোটা কাপড়ের প্যান্ট বা ট্রাউজারের খুব চলন হয়েছে। শুনতে পাই, স্মার্টনেসের লক্ষণ হচ্ছে ঘোর রঙের প্যান্টের উপর সাদা বা ফিকা রঙের শার্ট। শার্ট পুরো হাতা হওয়া চাই, কিন্তু কনুই পর্যন্ত আস্তিন গোটানো থাকবে। গরিব গৃহস্থকেও ছেলের শখ মেটাবার জন্য দামী কাপড়ের প্যান্ট-শার্ট যোগাতে হয়।

অনেককে বলতে শুনেছি—ড্রিল কর্ডুরয় প্রভৃতি মোটা রঙিন কাপড়ের

প্যান্ট মোটের উপর ধুতির চাইতে সস্তা। কারণ, ময়লা হলে সহজে ধরা যায় না, কাচতে হয় না, বার বার ধোবার বাড়ি দিতে হয় না, সহজে ছেঁড়ে না, বহু কাল পরা চলে। এই যুক্তিতে ফাঁকি আছে। ধুতি যদি সাদা না হয়ে বাদামী খাকী বা ছাই রঙের হত, এবং রোজ কাচা না হত, তবে তাও দীর্ঘস্থায়ী হত। দোষ আমাদের প্রথার বা ফ্যাশনের, ধুতির নয়। ধুতি সাদা হওয়া চাই, রোজ কেচে শুদ্ধ করা চাই, কিন্তু মোটা রঙিন প্যান্ট কাচা হয় না, যত দিন তার মলিনতা চোখে দেখা না যায় তত দিন তার বাহ্যাভ্যন্তর শুচি।

পরিধেয় বস্ত্রে দুরকম ময়লা লাগে—দেহের ক্লেদ (ঘাম, তেল ইত্যাদি), এবং বাইরের বিশেষত বাতাসের ধুলো আর ধোঁয়া। শুকনো কাপড়ের চাইতে ভিজে কাপড়ে বাতাসের ময়লা বেশী লাগে। কাচা কাপড় যখন ভিজে অবস্থায় শুখোতে দেওয়া হয় তখন বাতাসের ধুলো আর ধোঁয়া তাতে আটকে যায়। এই কারণে প্রতিবার কাচার পর কাপড়ের মলিনতা বাড়ে, গাত্রজ মল দূর হলেও বায়ুস্থিত মল ক্রমশ জমা হতে থাকে। শহরের বাইরে কাপড় শীঘ্র ময়লা হয় না, কারণ সেখানে ধুলো ধোঁয়া কম। আমাদের চিরাগত প্রথা—ধুতি শাড়ি প্রত্যহ কেচে শুদ্ধ করে নিতে হবে। বার বার কাচার ফলে কাপড় জীর্ণ হয়, ধুলো-ধোঁয়ায় ময়লা হয়—এই অসুবিধা আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু মোটা প্যান্টের বেলায় আমাদের ধারণা অন্য রকম। দেহের ময়লা প্যান্টেও লাগে, প্রতিবার প্রস্রাবের সময় তাও দু-চার ফোঁটা লাগে, কিন্তু এ সব গ্রাহ্য করা হয় না।

অতএব দেহজ মল আর বায়ুজ মল দুয়ের মধ্যে একটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে কিংবা রফা করতে হবে। মোটা প্যান্ট নিত্য কাচা অসম্ভব, কিন্তু পাতলা পাজামা বা ইজার যদি মাঝে মাঝে কাচা হয় তবে কতকটা ধুতির তুল্য শুদ্ধ হতে পারে। মোটা প্যান্ট পরা ফ্যাশন-সম্মত হলেও যুক্তিসংগত নয়, অন্তত গরমের সময় নয়। সব দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের নিত্য পরিধানের জন্য পাতলা কাপড়ের পাজামা বা ইজার বা আট-হাতি ধুতি প্রশস্ত।

ধুতি আর পাজামার যে গুণ, পঞ্জাবিরও তা আছে, গায়ে লেপটে থাকে না, হাওয়া লাগতে দেয়। ভিতরে গেঞ্জি বা ফতুয়া পরলে পঞ্জাবি নিত্য কাচতে হয় না, ভিতরের জামা কাচলেই চলে। পঞ্জাবির ঝুল নিতম্ব পর্যন্ত হওয়াই ভাল, বেশী হলে অনর্থক বায়ুরোধ আর তাপবৃদ্ধি করে। পাতলা কাপড়ের কোট (বা কোট তুল্য পঞ্জাবি) আরও ভাল, কারণ সহজেই পরা

আর খোলা যায়, বেশী ঢিলা করবার দরকার হয় না।

ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের দরবারী পোশাক ছিল ইজার চাপকান চোগা আর শামলা বা পাগড়ি, সাহেব আর ইঙ্গ-বঙ্গের পক্ষে ড্রেস সুট। বর্তমান ভারত সরকার কর্তৃক বিহিত দরবারী পোশাক সাদা চুড়িদার পাজামা আর আচকান। দুটোই আপত্তিজনক। চুড়িদার পাজামা পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, পরতে আর খুলতে মেহনত হয়। আজানুলম্বিত আচকান পরলে অনর্থক কাপড়ের বোঝা বইতে হয়। ঠাণ্ডায় অসুবিধা না হতে পারে, কিন্তু গরমের সময় বায়ুরোধ করে। শ্রীরাজাগোপালাচারীর মতন ধুতি পঞ্জাবি অথবা বিভিন্ন প্রদেশে যে ভব্য পরিচ্ছদ প্রচলিত আছে তাই দরবারী পোশাক গণ্য হবে না কেন?

কনভোকেশনের সময় গ্রাজুয়েটদের যে পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়—কালো বা রঙিন কাপড়ের জোব্বা আর মাথায় থোপনা দেওয়া স্লেট—তা সার্বজাতিক হতে পারে; কিন্তু যেমন বিশ্রী তেমনি জবড়জঙ্গ। কয়েক বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে উৎসবাদি উপলক্ষে অধ্যাপকদের বিহিত পরিচ্ছদ ছিল ধুতি-পঞ্জাবির উপর বাসন্তী রঙের উত্তরীয়। এখনও সেই প্রথা আছে কিনা জানি না। সেই রকম সুলভ শোভন পরিচ্ছদ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তন করতে পারে।

সাধারণত বাঙালী মাথা ঢাকে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে কলকাতার একটি বিলাতী কম্পানি বাঙালীর জন্য বিশেষ এক রকম টুপি চালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটাও বেচতে পারে নি। মহাত্মা গান্ধী যেসব বস্তু উদ্‌ভাবন করেছেন তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বস্তু গান্ধীটুপি। সস্তা, হালকা, সহজে কাচা যায়, ঠাণ্ডা আর রোদ থেকে কতকটা মাথা বাঁচায়, টাক ঢাকে। গৈরিকধারীকে দেখলে যেমন মনে হয় লোকটি সাধু ধর্মাত্মা তেমনি গান্ধীটুপিধারীকে মনে হয় কংগ্রেসকর্মী বা দেশসেবক। যেসব রাজনীতিক সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একত্র হয় সেখানে বাঙালী গান্ধীটুপির প্রভাবে সহজেই দলে মিশে যেতে পারে, তাকে হংস মধ্যে বক মনে হয় না। কিন্তু যেখানে রোদ থেকে মাথা বাঁচানোই উদ্দেশ্য সেখানে হ্যাটই শ্রেষ্ঠ শিরস্ত্রাণ। বহুকাল পূর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন, রোদের সময় ধুতির সঙ্গে হ্যাট পরা যেতে পারে। পুলিসের শিরস্ত্রাণ যদি লাল পাগড়ির বদলে সোলা-হ্যাট করা হয় তবে ওজন কমবে, দামও বাড়বে না, মাথা গরম হবে না, অন্তত বাঙালী কনস্টেবলরা খুশী

হবে। এ দেশের সোলা-হ্যাট-শিল্প লোপ পেতে বসেছে, কারণ বিলাতে এখন তার আদর নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি পুলিসের জন্য সোলা-হ্যাটের প্রবর্তন করেন তবে অনেকের উপকার হবে।

কালিদাস নারীর অশিক্ষিতপটুত্বের উল্লেখ করেছেন। তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বঙ্গনারীর পরিচ্ছদ। বাঙালী পুরুষ অনুকরণে পটু, এককালে মোগলাই সাজের নকল করেছিল, তার পর ইওরোপীয় পোশাকও নিয়েছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারায় নি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে সে কাছা দিয়ে শাড়ি পরত, কবি হেমচন্দ্রের আমলে 'লাজে অবনতমুখী তনুখানি আবরি' জুজুবুড়ী সেজে থাকত। কিন্তু আধুনিকা বাঙালিনী সুপর্ণা বিহঙ্গীর ন্যায় শোভনচ্ছদা হয়েছে, চিরন্তন পরিচ্ছদ বজায় রেখেও স্বাস্থ্যের অনুকূল সুরুচিসম্মত সুদৃশ্য সজ্জা উদ্‌ভাবন করেছে। দেশে বিদেশে শাড়ি অজস্র প্রশংসা পেয়েছে। যেসব ভারত-ললনা আঠারো-হাতি শাড়ি কাছা দিয়ে পরে এবং যারা সালোআর-কমীজ-দোপাট্টায় অভ্যস্ত তারাও ক্রমশ বাঙালিনীর অনুসরণ করছে।

কিন্তু একটা কথা ভাববার আছে। শাড়ি-ব্লাউজ ঘরে বাইরে সুশোভন পরিচ্ছদ, কিন্তু আজকাল অনেক মেয়ে শিক্ষা বা জীবিকার জন্য যে ধরনের কাজ করে তার পক্ষে শাড়ি সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হতে পারে। যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক আর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে শাড়ির আঁচল একটা বাধা, বিপদের কারণও হতে পারে। সুবিধা আর নিরাপত্তার জন্য বোধ হয় ক্ষেত্র বিশেষে শাড়ির বদলে স্কার্ট বা স্ল্যাক্‌স জাতীয় পরিধেয়ই বেশী উপযুক্ত।

❑

১৯৫৩-৫৪ সালে আমাকে বলেছিলেন—হাফহাতা গেঞ্জির ওপর কফওয়ালা পুরোহাতা শার্ট—পায়ের ডিম পর্যন্ত ঝুলের আটহাতি ধুতির ভেতর গুঁজে পরা; তার ওপর কোট ও চাদর; পায়ে মোজা ও ফিতে বাঁধা শু—এই ছিল আমার বার মাসের আপিস যাওয়ার সাজ। —অর্থাৎ যখন ম্যানেজার, ১৯৩২ পর্যন্ত।

সবচেয়ে অদ্ভুত সাজের বর্ণনা দিয়েছিলেন এক মারোয়াড়ী 'সাহেব'এর—মাথায় হলদে সিলকের পাগড়ি, কপালে রক্ততিলক, কানে হীরের মাকড়ি, মুখভরা রক্তাক্ত পান; তার নীচে দামী শার্ট-নেকটাই-কোট; তার পর ধুতি এবং খালি পা! —কি অপরূপ illustration হতে পারে! আর অর্ধোদয় যোগে একটা গামছা পরে, একটা গায়ে, মাথায় হ্যাট, কমণ্ডলু হাতে গঙ্গাস্নানগামী 'গুপি সায়েব'এর কথা লিখেছেন পরশুরাম! —সঃ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৭৮/১৯৫৬)

আজ* যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, সাধারণে তাঁকে জানে—তিনি চিত্রকলায় নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন, নূতন ধরনের রূপকথা আর রূপনাট্য লিখেছেন। কেউ কেউ আরও জানে—তিনি গাছের আঁকাবাঁকা ডাল কেটে কাটুম কুটুম নাম দিয়ে অদ্ভুত মূর্তি গড়তেন এবং চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত নূতন চিত্রকলা আর নূতন সাহিত্যের স্রষ্টা, সুতরাং আজকের এই সভায় কোনও বিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ বা সাহিত্যিককে সভাপতি করাই উচিত ছিল। চিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সাহিত্যের জ্ঞানও নগণ্য। সভার আহ্বায়করা হয়তো স্থবির বলেই আমাকে ধরে এনেছেন। অতএব একজন সাধারণ অতিবৃদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বল করেই কিছু বলছি।

আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে যখন অবনীন্দ্রনাথ খ্যাত হন নি তখন শিক্ষিত লোকদের বলতে শুনেছি—এদেশের আর্ট অতি কাঁচা, ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিতে বিস্তর গলদ। আমাদের উচিত ইটালি থেকে ভাল sculptor আনিয়ে শিব দুর্গা রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি গড়ানো এবং তার আদর্শে এদেশের মূর্তিকার আর চিত্রকারদের শিক্ষিত করা। সে সময়ে বউবাজারের আর্ট স্টুডিওর ছবি ঘরে ঘরে দেখা যেত, কিছুকাল পরে রবি বর্মার ছবি আরও জনপ্রিয় হল। সাধারণে মনে করত, যে ছবি বা বিগ্রহ ফোটোগ্রাফের মতন যথাযথ বা ইওরোপীয় পদ্ধতির অনুযায়ী তাই উৎকৃষ্ট। সেই প্রচলিত ধারণা অগ্রাহ্য করে অবনীন্দ্রনাথ চিত্ররচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এদেশের প্রাচীন কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, ভারত পারস্য চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের চিরাগত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য করলেন, এবং নিজের উদ্‌ভাবিত নূতন পদ্ধতিতে আঁকতে লাগলেন।

---

* রবীন্দ্রভারতী-ভবনে জন্মোৎসব সভায় পঠিত। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৬৩।

অসাধারণ কিছু করতে গেলেই গঞ্জনা সইতে হয়। অবনীন্দ্রনাথও নিন্দিত হলেন, তার আগে রবীন্দ্রনাথ যেমন হয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে কয়েকজন প্রভাবশালী গুণজ্ঞ ছিলেন, যেমন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের চেষ্টায় অবনীন্দ্র-চিত্রাবলী ক্রমশ বহু-প্রচারিত হল। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েও শিক্ষিত সমাজ নবদৃষ্টি লাভ করলেন।

এখন আমাদের শিক্ষিত জন বুঝেছেন যে আর্টের সীমা সংকীর্ণ নয়, চিত্র আর বিগ্রহ বাস্তবের অনুযায়ী না হলেও সার্থক হতে পারে। মানুষ শুধু প্রকৃতিসৃষ্ট বাস্তব রূপে তৃপ্ত হয় না, নিজেও রূপ সৃষ্টি করতে চায়, গুণী শিল্পী প্রাকৃতিক রীতি লঙ্ঘন করেও নব নব মনোজ্ঞ রূপ উদ্‌ভাবন করতে পারেন। দেবমূর্তির অনেক হাত অনেক মাথা, কান পর্যন্ত টানা চোখ, ঝোলা কান, লতানে আঙুল প্রভৃতি অসভ্যতার লক্ষণ নাও হতে পারে। অশোকস্তম্ভের সিংহ, দক্ষিণ ভারতের গজবিড়াল মূর্তি প্রভৃতি অস্বাভাবিক হলেও সার্থক সৃষ্টি, যেমন মিসর দেশের স্ফিংক্স আর বিলাতের ইউনিকর্ন কল্পিত প্রাণী হলেও চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উদার বুদ্ধি এখন আমাদের হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যভাগ্য অসাধারণ। নন্দলাল প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীবৃন্দের চেষ্টার ফলে ভারতীয় নবচিত্রকলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেমন পাশ্চাত্ত্য দেশের তেমনি এদেশের শিল্পীরাও নব নব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে মার্গের সূচনা করেছিলেন তা ক্রমশ বহু শাখাপ্রশাখায় বিস্তার লাভ করছে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। যেমন তাঁর চিত্রপদ্ধতি তেমনি তাঁর রূপকথা আর রূপনাট্য বা যাত্রা-পালার রচনা-পদ্ধতি একেবারে নূতন। সম্প্রতি বিখ্যাত লেখক Gerald Bulletএর একটি প্রবন্ধ পড়েছি—Facts and Fairy-Tales। তাতে তিনি বাইবেল-পাঠক সম্বন্ধে লিখেছেন—He need not believe that the stories really happened. He is free to regard them as allegories, fables or fairy-tales, items in a sublime mythology,...just as very young children accept and enjoy fairy-tales without either believing or disbelieving them to be fact। বাইবেল-পাঠক আর very young children সম্বন্ধে বুলেট যা বলেছেন, ছোট বড় নির্বিশেষে রূপকথার সকল পাঠক সম্বন্ধেই তা খাটে। ছেলেমানুষ না হলেও

রূপকথা উপভোগ করা যায়। সত্যাসত্য বিচারের দরকার হয় না, আমাদের স্বভাব-নিহিত কোনও গূঢ় কারণে সুরচিত রূপকথা তথা পুরাণকথা শুনে আমরা মুগ্ধ হই। এই মোহিনী শক্তির প্রধান সহায় বিশেষ প্রকার বর্ণনাভঙ্গী। আমাদের দেশের গল্প বলার গ্রাম্য পদ্ধতিতে সেই ভঙ্গী পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথার জন্য নূতনতর বর্ণনাভঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', মাসী-পিসীর গল্প, স্টীমার ভ্রমণ কথা, যাত্রার পালা প্রভৃতি অসামান্য মনোহারিতা পেয়েছে। তাঁর মৌখিক আলাপেও এই মনোহারিতার পরিচয় পাওয়া যেত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্তা রানী চন্দ সেই আলাপ লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলার জন্য যেমন অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর সাহিত্যরচনায় নিজের চারিত্রিক স্পর্শ এমন করে রেখে গেছেন যে পড়লেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করা যায়।



গল্পের বাজার

(১৮৭৯/১৯৫৭)

অন্য জন্তুর সঙ্গে মানুষের অনেক তফাত আছে। আমরা খাড়া হয়ে হাঁটি, আঙুল দিয়ে কলম ধরি, দাড়ি কামাই, নেশা করি। নেশা মানে শুধু মদ গাঁজা আফিম নয়, পান তামাক চা-ও নয়, জীবনধারণের জন্য যা অনাবশ্যক অথচ অভ্যাস করলে যাতে সহজেই প্রবল আসক্তি আসে, তারই নাম নেশা। ব্যসন শব্দেরও এই অর্থ। মৃগয়া দ্যূত দিবানিদ্রা পরনিন্দা নৃত্য গীত ক্রীড়া বৃথাভ্রমণ বেশ্যা মদ, এই দশটি শাস্ত্রোক্ত কামজ ব্যসন। সদর্থেও ব্যসন শব্দের প্রয়োগ আছে। মহাত্মাদের একটি লক্ষণ বলা হয়েছে—ব্যসনং শ্রুতৌ, অর্থাৎ বেদবিদ্যায় আসক্তি। শখ আসক্তি ব্যসন আর নেশা, নির্দোষ বা সদোষ যাই হক, মোটামুটি একই শ্রেণীতে পড়ে।

আগের তুলনায় এখন আমাদের নেশার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেকালের তরজা. কবিগান, মেড়ার লড়াই, বাচখেলা, বাইনাচ ইত্যাদির চাইতে এখনকার রেডিও সিনেমা থিয়েটার জলসা ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ ইত্যাদির বৈচিত্র্য আর আকর্ষণ বেশী। এ সবের চাইতেও ব্যাপক নেশার জিনিস গল্পের বই। আজকাল সাহিত্য বললে অধিকাংশ লোক কথাসাহিত্যই বোঝে। অনেক লোক আছে যারা কোনও রকম নেশা না করে অর্থাৎ পান তামাক সিগারেট চা পর্যন্ত না খেয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। তেমনি এমন লোকও আছে যাদের গল্প পড়বার আগ্রহ কিছুমাত্র নেই। তবু বলা যেতে পারে, শিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা অসংখ্য লোকে গল্পের বই পড়ে এবং অনেকের পক্ষে তা প্রবল আসক্তি বা নেশার বস্তু।

বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের উপদেশ দিয়েছেন—টাকার জন্য লিখিবে না। কিন্তু ছাপাখানার মালিককে তিনি বলেন নি—টাকার জন্য ছাপিবে না। তাঁর আমলে লেখক আর পাঠক দুইই কম ছিল, সুতরাং লেখককে নিঃস্বার্থ জনশিক্ষক মনে করা চলত। কিন্তু একালে চা আর সিগারেটের মতন গল্পের বই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, পাঠকরাও দাম দিতে প্রস্তুত, সুতরাং মুদ্রাকর দপ্তরী আর প্রকাশকের দাবি মেনে নিয়ে শুধু লেখককে বঞ্চিত করার কারণ

নেই। জনসাধারণের গল্পপ্রীতি বেড়ে যাওয়ার ফলে বাঙালী একটি সম্মানিত নূতন জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। গল্পকার শুধু লেখক নন, কবি আব চিত্রকরের তুল্য কলাবিৎ, ইন্দ্রজালিকের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য আছে। কাল্পনিক ঘটনার বিবৃতির দ্বারা তিনি পাঠককে সম্মোহিত ও রসাবিষ্ট করেন। গল্পগ্রন্থের আদর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের চাইতে ঢের বেশী, টেক্স্‌টবুকের নীচেই তার কাটতি।

ষাট-সত্তর বৎসর আগে যখন বাঙলা গল্পের খুব অভাব ছিল, তখন লোকে অবসরকালে কি পড়ত, তাদের রুচি কিরকম ছিল, এই সব খবর আধুনিক লেখক আর পাঠকদের অনেকেই জানেন না। বাঙলা বা ইংরেজী গল্পগ্রন্থের জ্ঞান আমার অতি অল্প, সেকালের সাহিত্যসেবীদের সঙ্গেও আমার যোগ ছিল না। তথাপি তখনকার পাঠকদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে তা বলছি।

তখন গল্পখোর বাঙালীর প্রধান সম্বল ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এগারোটি উপন্যাস, রমেশচন্দ্রের ছটি, তারকনাথের স্বর্ণলতা, স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি গল্প, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি আর বউঠাকুরাণীর হাট, এবং আরব্য উপন্যাস। আরও কতকগুলি ভাল মাঝারি মন্দ গল্পের বই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশই এখন লোপ পেয়েছে, নাম পর্যন্ত লোকে ভুলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন সবে ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু অল্প পাঠকই তার খবর রাখত। শরৎচন্দ্র আর প্রভাতকুমার তখনও কলম ধরেন নি। সেই গল্পাল্পতার যুগে পাঠকের স্পৃহা কি করে মিটত? তখন কৃত্তিবাস কাশীরাম আর ভারতচন্দ্রের রচনা লোকে সাগ্রহে পড়ত, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র আর রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক খুব জনপ্রিয় ছিল, মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং অনেক নিকৃষ্ট কবির রচনাও লোকে পড়ত, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য বহুপ্রচারিত হয় নি, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা একটু দুরূহ ছিল। এখনকার মতন তখনও অধিকাংশ পাঠক কবিতার চাইতে গল্পেরই বেশী ভক্ত ছিল, কিন্তু যথেষ্ট গল্পের বই না থাকায় কবিতার পাঠক এখনকার তুলনায় সেকালে বেশী ছিল।

তখন শুধু বাঙলা বই পড়ে পাঠকের বুভুক্ষা মিটত না, প্রচুর ইংরেজী গল্পও লোকে পড়ত। আশ্চর্য এই, সেকালে সদ্য এনট্রান্স পাস করা ছাত্র এবং অনেকে যারা পাস করে নি তারাও ইংরেজী নভেল পড়ত, অথচ শুনতে পাই এখনকার অধিকাংশ গ্রাজুয়েট ইংরেজি নভেল বুঝতে পারে না। নব্য

বাঙালীর শক্তি বা রুচির এই পরিবর্তন উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ তা শিক্ষাবিশারদগণ বলতে পারেন।

আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে কোনও শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হলে এদেশে অবিলম্বে তার খবর আসে। সেকালে এমন হত না। অল্প কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত লোক নূতন বইএর সন্ধান রাখতেন কিন্তু আর সকলের পাঠ্য ছিল প্রাচীন লেখকের রচনা। তখন কলেজ স্ট্রীটের বইএর দোকানে ক্লাসিক ভিন্ন অন্য ইংরেজী নভেল পাওয়া যেত না, পাঠকরা হগ মার্কেট, রেলওয়ে বুকস্টল প্রভৃতি থেকে তাঁদের প্রিয় গল্পের বই যোগাড় করতেন। শিক্ষকরা মনে করতেন ছাত্রদের পক্ষে অবাধ নভেল পাঠ ভাল নয়, তাঁরা বলতেন, রবিনসন ক্রুসো, গলিভার্স ট্রাভ্‌লস, রাসেলাস, ভিকার অভ ওয়েকফিল্ড পড়তে পার, স্কটের বইও দু-চারখানা পড়তে পার, কিন্তু তার বেশী নয়। তখন কোনান ডয়েল সবে লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তার খবর অল্প বাঙালীই জানত।

সেকালে নভেলখোর বাঙালীর প্রধান পাঠ্য ছিল স্কট, ডিকেন্স, লিটন, থ্যাকারে, ভিকটর হিউগো, রাইডার হ্যাগার্ড, মারি করেলি, ডুমা ইত্যাদি। হার্ডি, গল্‌সওয়ার্দি আর টলস্টয়ের নাম সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত ছিল। রাশি রাশি অতি সস্তা মার্কিন ডিটেকটিভ আর ওআইল্ড ওয়েস্টের গল্প আমদানি হত, কিন্তু অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তার স্ল্যাং-বহুল ভাষা একটু দুর্বোধ ছিল। লোকে সব চেয়ে বেশী পড়ত রেনল্ড্‌সের রোমাঞ্চকর গল্পাবলী, ডিক্‌স এডিশন, ছ আনায় একখানা বেশ বড় বই, বিস্তর ছবি। অতি ছোট হরফে ছাপা, কিন্তু যারা পড়ত তাদের চোখের তেজ ছিল, মিটমিটে প্রদীপ বা হারিকেনের আলোয় অনায়াসে পড়া চলত। আমার এক মাস্টারমশাই গোগ্রাসে রেনল্ড্‌স গিলতেন। আমাকে বলেছিলেন, খবরদার, ত্রিশ বছর বয়সের আগে রেনল্ড্‌স ছোঁবে না। কিন্তু আমার দাদা* বললেন, শুনিস না মাস্টারের কথা, রেনল্ড্‌সের রবার্ট ম্যাকেয়ার পড়ে দেখিস, চমৎকার ডাকাতের গল্প; তার পর রাইহাউস প্লট, নেক্রোমান্সার ব্রঞ্জ স্ট্যাচু এই সব পড়বি। আমি দাদার উপদেশই পালন করেছিলাম। অল্প বয়সেই একগাদা রেনল্ড্‌স পড়া হয়ে গেল, অরুচিও ধরল।

* শশিশেখর বসু। —সঃ।

ডিক্‌স এডিশনের মতন সস্তা বই এখন স্বপ্নের অগোচর। শেকস্পীয়র মিলটন শেলী বাইরন প্রভৃতির সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর দাম ছিল বারো আনা। ডিকেন্স স্কট লিটন ইত্যাদির উপন্যাস ছ আনা মাত্র। অতি গরিব পাঠকও অল্প খরচে অনেক বই সংগ্রহ করতে পারত।

এককালে যাঁর বইএ এ দেশের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল সেই রেনল্ড্‌সের কোনও চিহ্নই এখন পাওয়া যায় না। বিলাতেও তাঁর বই প্রথম প্রথম খুব চলত। দু-একটি বইএ তিনি ব্রিটিশ রাজবংশের কুৎসা করেছিলেন সেজন্য কালক্রমে তাঁর জনপ্রিয়তা লোপ পায়। তাঁর গ্রন্থাবলীর কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আমার মনে আছে। দেদার রহস্য আর রোমাঞ্চ, কিছু ব্যভিচার, কিছু চুরি ডাকাতি নরহত্যা, এবং লর্ড-লেডিদের বিলাসময় জীবনযাত্রা। নায়ক-নায়িকারা রূপে গুণে অতুলনীয়, বিস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বহু কষ্টভোগের পর তাদের মিলন হয়। অনেক বইএর শেষে থাকত—And they were happy, oh, supremely happy। অথবা—At last they were united in holy wedlock and lived happily ever after।

Yellow Back নামে খ্যাত জনপ্রিয় ইংরেজী নভেলসমূহ এবং যেসব বাঙলা বইএর কাটতি সব চেয়ে বেশী তাদের রচনা পদ্ধতি অনেকটা রেনল্ড্‌সের মতন। রূপকথা আর অধিকাংশ ডিটেকটিভ গল্পের পদ্ধতিও এই রকম। আমার মনে হয় সব রকম গল্পই মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর গল্প রূপকথা জাতীয়, প্লটে যতই জটিলতা আর রোমহর্ষণ থাকুক, পরিশেষে পূর্ণ শান্তি, নায়ক-নায়িকার শারীরিক মানসিক আর্থিক সর্বাঙ্গীণ কুশল। পড়া শেষ হলে পাঠক হয়তো মনে মনে কিছুক্ষণ রোমন্থন করেন, কিন্তু তার পরে নিশ্চিন্ত হন, কারণ নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ একেবারে নিষ্কণ্টক। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের নায়ক-নায়িকা অল্পাধিক আঘাত পায়, তার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সারে না। লেখক মিলনান্ত করে গল্প সমাপ্ত করলেও কিছু কণ্টক রেখে দেন, তার ফলে পাঠকের মনে গল্পের জের চলতে থাকে। এই শ্রেণীর সকণ্টক গল্পকেই বোধ হয় মনস্তত্ত্বমূলক বলা হয়।

মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রী-সত্যবান আর নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান প্রথম শ্রেণীর নিষ্কণ্টক গল্প। কিন্তু মহাভারতের মূল আখ্যান সকণ্টক দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও আমাদের ভাবনা হয়—যুধিষ্ঠিরের মন হয়তো শেষ

পর্যন্ত অশান্ত ছিল, তবে ভীম বোধ হয় বেশ ফুর্তিতেই ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর পিতা ভ্রাতা আর পঞ্চ পুত্রের শোক নিশ্চয় ভুলতে পারেন নি, গান্ধারী আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূদের সঙ্গে রাজপুরীতে বাসও বোধ হয় তাঁর পক্ষে সুখকর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী আর যুগলাঙ্গুরীয় নিষ্কন্টক গল্প, বিষবৃক্ষ সকণ্টক। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন হলেও তাঁদের সম্পর্ক আগের মতন হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবিকে নিষ্কণ্টক গল্প বলা যেতে পারে, কারণ পাত্রপাত্রীদের সমস্ত দুঃখ শেষকালে মিটে গেছে। কিন্তু তবু সন্দেহ থেকে যায়, জীবনের অত বড় বিপর্যয়ের পর কমলা তার অজ্ঞাত স্বামীকে আবিষ্কার করে কি পূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছিল? শেষের কবিতা নিশ্চয় সকণ্টক গল্প। কেটিকে বিবাহ করে অমিত রায় কর্তব্য পালন করেছে, সেই সঙ্গে আত্মবিসর্জনও দিয়েছে। লাবণ্যর কাছে সে যেরকম উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতা দিত, কেটির কাছে তার কোনও কদর হবে মনে হয় না। অগত্যা সে হয়তো পলিটিক্স নিয়ে মেতে উঠে একজন দেশনেতা হয়ে যাবে। শরৎচন্দ্রের দত্তা নিষ্কণ্টক গল্প, কিন্তু বামুনের মেয়েতে কণ্টক আছে। প্রিয়নাথ ডাক্তার হয়তো সামলে উঠে আবার রোগী দেখা শুরু করবেন, কিন্তু তাঁর গর্বিতা কন্যার মনস্তাপ সহজে দূর হবে না।

এ দেশের এবং বোধ হয় সকল দেশেরই বেশীর ভাগ পাঠক প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ নিষ্কণ্টক গল্প চায় যার শেষে নায়ক-নায়িকা সুখে ঘরকন্না করে and live happily ever after। মামুলী ডিটেকটিভ কাহিনী এবং রোমাঞ্চ সিরিজের রূপসী বোম্বেটে জাতীয় গল্পও এই শ্রেণীতে পড়ে। ছোট ছেলেমেয়ের জন্য যেমন রূপকথা তেমনি অসংখ্য সাধারণ পাঠকের জন্য এমন গল্প দরকার যাতে প্রচুর আতঙ্ক আর উত্তেজনা আছে, প্রেমের লড়াইও আছে, কিন্তু যার পরিণাম নিষ্কণ্টক। যে পাঠকরা অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ এবং মানবচিত্তের রহস্য সম্বন্ধে কুতূহলী, অর্থাৎ যাঁরা সমস্যাময় বাস্তব জীবনের চিত্র চান, তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সকণ্টক গল্পই বেশী উপভোগ করেন।



সাহিত্যের পরিধি

(১৮৭৯/১৯৫৭)

রাম আর শ্যাম ঘোড়া নিয়ে তর্ক করছে। রাম সজোরে বলছে, ঘোড়ার মাপ অন্তত তিন হাত। ততোধিক জোরে শ্যাম বলছে, ঘোড়া দেড় ইঞ্চির বেশী হতেই পারে না। এরা কেউ দু রকম অর্থ স্বীকার করে না। ঘোড়া বললে রাম বোঝে যে ঘোড়া ঘাস খায়, আর শ্যাম বোঝে যা টিপলে বন্দুকের আওয়াজ হয়।

এই তর্কের হেতু—পৃথক বস্তু বোঝাবার জন্য একই শব্দের প্রয়োগ। এ রকম তর্ক বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু আর এক রকম তর্ক আছে যাতে শব্দের বাচ্যার্থ একই কিন্তু অর্থের ব্যাপ্তি সমান নয়। যেমন, যদু বলছে, ছানা আর চিনি একত্র পাক করলে যা হয় তারই নাম সন্দেশ। মধু বলছে, নাগ-মশাই দে-মশাই সেন-মশাই আর গঙ্গু-মশাই যা তৈরি করেন তাই হল সন্দেশ, আর সব সন্দেশই নয়। যারা আসল আর ভুয়ো গণতন্ত্র, সচ্চা আর ঝুটা আজাদি, খাঁটী আর ভেজাল হিন্দুধর্ম, ইত্যাদি নিয়ে বিতণ্ডা করে তারাও এই দলে পড়ে।

সাহিত্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে তর্ক শোনা যায় তা অনেকটা যদু-মধুর তর্কের তুল্য। তর্ককারীরা নিজের নিজের পছন্দসই গণ্ডির মধ্যে সাহিত্য শব্দের অর্থ আবদ্ধ রাখতে চান। কেউ বলেন, সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। কেউ বলেন শুধু রসে চলবে না, উচ্চ আদর্শ চাই। সংস্কৃতে কাব্য আর সাহিত্য প্রায় সমার্থক। কিন্তু আধুনিক প্রয়োগে সাহিত্যের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। Concise Oxford Dictionaryতে literatureএর বিবৃতি আছে—writings whose value lies in beauty of form or emotional effect; the books treating of a subject; (colloq.) printed matter। বাঙলায় সাহিত্য শব্দ আজকাল যেসব অর্থে চলে তা এই ইংরেজী বিবৃতির অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে অনেক চিঠি লিখেছেন। মথুর কুণ্ডুও পাটের দর জানাবার জন্য শিবু শাকে চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা

লিখেছেন তাই প্রকৃত চিঠি, আর মথুর কুণ্ডু যা লিখেছেন তা কিছুই নয়—এ কথা বলা চলে না। তুচ্ছ মহৎ ভাল মন্দ যাই হক, কবি প্রেমিক উকিল বা পাওনাদার যিনিই লিখুন, সমস্ত চিঠির সামান্য লক্ষণ—একজন অপর জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্যেরও সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে—একজন (বা এক দল) বহু জনকে কিছু জানাবার জন্য যা লেখে। সাহিত্য অতি তুচ্ছ হতে পারে, পাগলের প্রলাপ, বিপক্ষকে গালাগালি, বিজ্ঞাপন, টেক্সটবুক, সংবাদপত্র, কবিতা, গল্প, জ্ঞানগর্ভ রচনা বা তত্ত্বকথা হতে পারে, তার পাঠকসংখ্যা নগণ্য বা অগণ্য হতে পারে। আপনার আমার যা ভাল লাগে কিংবা নামজাদা সমালোচক যাকে 'রসোত্তীর্ণ' বলেন তাই সাহিত্য এবং আর সবই অসাহিত্য, এমন মনে করলে অর্থবিভ্রাট হবে। সাহিত্যের আধুনিক অর্থ অতি ব্যাপক। কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, রবীন্দ্রসাহিত্য তো আছেই, তা ছাড়া দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস জীবনী সমালোচনা বিজ্ঞাপন স্কুলপাঠ্য-সাহিত্য প্রভৃতি, এমন কি অশ্লীল সাহিত্যও শোনা যায়। এই সব প্রয়োগে সাহিত্যের অর্থ, the books treating of a subject, কোনও বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ।

আজকাল গাড়ি বললে বড়লোকরা বোঝেন মোটরকার। সেইরকম অনেক শিক্ষিত জন সাহিত্য শব্দে বোঝেন ললিত সাহিত্য, অর্থাৎ সর্বাগ্রে গল্প-উপন্যাস, তার পর কবিতা নাটক লঘুপ্রবন্ধ ও ভ্রমণকথা। Writings whose value lies in beauty of form or emotional effect, যার রচনাপদ্ধতি বা ভাষা মনোহর অথবা যা ভাবের উদ্রেক করে—এই অর্থই এখন অনেকে সাহিত্যের একমাত্র অর্থ মনে করেন। সাহিত্যদর্পণকারও বলেছেন, রসাত্মক বাক্যই কাব্য (= সাহিত্য)।

আত্মব্যঞ্জনা বা self-expressionএর জন্য মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা করে, তারই একটির ফল সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ নীচ ভাল মন্দ সবই আছে। কিন্তু সকল পাঠকের রুচি সমান নয়, একই পাঠকেরও রুচির বৈচিত্র্য থাকতে পারে। রাম সন্দেশ ভালবাসে, কিন্তু জিলিপি ছোঁয় না। শ্যামও সন্দেশের ভক্ত, কিন্তু সময়ে সময়ে জিলিপিই বেশী পছন্দ করে। অধিকাংশ লোকের মতে সন্দেশই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কি রকম সন্দেশ? ভারত সরকার তেল ঘি ইত্যাদি অনেক জিনিসের standard বেঁধে দিয়েছেন, হয়তো ভবিষ্যতে এক-দুই-তিন নম্বর সন্দেশের উপাদানের অনুপাত নির্দেশ করে দেবেন।

কিন্তু এক-দুই-তিন নম্বর সাহিত্যের মান বেঁধে দেবার শক্তি সাহিত্য আকাডেমিরও নেই। বহু লোকের মতে বা পুলিশের দৃষ্টিতে যা অনিষ্টকর তা বর্জিত বা দমিত হবে, কিন্তু বিভিন্ন পাঠকের রুচি বা প্রয়োজন অনুসারেই অন্যান্য সাহিত্য প্রচলিত থাকবে।

অধিকাংশ জনপ্রিয় রচনার উপজীব্য মানুষের আচরণ ও চিত্তবৃত্তি, এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু এমন রচনাও উৎকৃষ্ট ও সমাদৃত হতে পারে যার পাত্র-পাত্রী আর ঘটনাবলী অপ্রাকৃত, যেমন Penguin Island, Animal Farm, রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ ইত্যাদি। ডিটেকটিভ এবং রহস্যমূলক রোমাঞ্চকর গল্পে emotional effect প্রচুর থাকে, তার পাঠকসংখ্যাও সকল দেশে সব চাইতে বেশী, তথাপি এই শ্রেণীর রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গণ্য হয় না। দৈবাৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন Conan Doyleএর Sherlock Holmesএর গল্প ক্লাসিক সাহিত্যের সম্মান পেয়েছে। Lewis Carrollএর Alice in Wonderland ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য লিখিত হলেও সকল পাঠকের সমাদর পেয়ে চিরায়ত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' আরও উচ্চ শ্রেণীর রচনা মনে করি। চিত্র আর তক্ষণ কলায় যেমন impressionistic style এবং অবাস্তব সংস্থান দ্বারা রসসৃষ্টি করা হয়, সুকুমার রায় তাঁর ছড়া রচনায় সেইরূপ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পাঠক আর সমালোচকদের মধ্যে রামগরুড়ের ছানার বাহুল্য আছে তাই সুকুমার রায়ের প্রতিভা যথোচিত মর্যাদা পায় নি।

ইংরেজী অভিধানে যে beauty of form or emotional effectএর উল্লেখ আছে, কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের একটি শ্লোকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়—

যানেব শব্দান্ বয়মালপামোঃ
যানেব চার্থান্ বয়মুল্লিখামঃ।
তৈরেব বিন্যাসবিশেষভব্যৈঃ
সম্মোহয়ন্তীহ কবয়ো জগন্তি॥

—আমরা যেসব শব্দ বলি, যেসব অর্থ প্রয়োগ করি, তাদেরই বিশেষ প্রকার ভব্য বিন্যাস দ্বারা কবিগণ জগৎকে সম্মোহিত করেন।

কিন্তু form বা শব্দবিন্যাসের উপর যদি অতিরিক্ত নির্ভর করা হয় তবে

emotion বা রসের চাইতে ভঙ্গীই বেশী প্রকট হয়। এরূপ রচনার বহু পাঠক হয় না। জেম্‌স জয়েসের অদ্ভুত রচনায় যাঁরা রস পান তাঁদের সংখ্যা অল্প। আমাদের দেশের কয়েকজন আধুনিক কবির রচনা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ, কিন্তু এক শ্রেণীর সমানধর্মা পাঠকের সমাদর পেয়েছে। বাঙলা কবিতার যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা এখন দ্বিধা বিভক্ত। একদল প্রাচীনপন্থী কবিদের কৃপার চক্ষে দেখেন, আর একদল অত্যাধুনিক কবিদের অপ্রকৃতিস্থ মনে করেন। কোনও নূতন পদ্ধতির প্রবর্তনকালে প্রায় মতভেদ দেখা যায়। কালক্রমে সেই পদ্ধতি বর্জিত বা বহুসমাদৃত হতে পারে অথবা চিরদিনই বিতর্কের বিষয় হয়ে টিকে থাকতে পারে। শত বৎসর পূর্বে বাঙলা কবিতায় যমক অনুপ্রাস ইত্যাদি শব্দালংকারের বাহুল্য ছিল, এখন আর নেই। এককালে গদ্য কবিতা অনেকের দৃষ্টিতে উপহাসের বিষয় ছিল, এখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আদিরসাত্মক রচনা নিয়ে বোধ হয় চিরদিনই বিতর্ক চলবে।

ব্যাপক প্রয়োগে সাহিত্যের আধুনিক অর্থ—কোনও বিষয়সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ এবং যা কিছু ছাপা হয় (printed matter)। বিশিষ্ট প্রয়োগে—এমন গ্রন্থ যার রচনাপদ্ধতি বা ভাষা মনোহর, অথবা যা ভাবের উদ্রেক করে, অর্থাৎ যাতে রস আছে।

আর্ট-এর যেমন বাঙলা প্রতিশব্দ নেই, তেমনি রস-এর ইংরেজী নেই। মোটামুটি বলা যেতে পারে, রচনায় যে গুণ থাকলে পড়তে ভাল লাগে তারই নাম রস। অলংকারশাস্ত্রে নবরসের উল্লেখ আছে—আদি (বা শৃঙ্গার), হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত। কৌতূহলও একটা রস, বোধ হয় অদ্ভুতের অন্তর্গত। ডিটেকটিভ গল্পে এই রসই প্রধান। আমাদের আলংকারিকরা রস সম্বন্ধে বিস্তর লিখেছেন, করুণ রস পড়ে লোকে কেন সুখ পায় তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

একশ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, শুধু রসে চলবে না, উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সমাজের যা আদর্শ সাহিত্যেরও কি তাই? হিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, Pilgrim's Progress, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্‌ভাবশতক ইত্যাদি গ্রন্থে উচ্চ আদর্শ আছে। রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে মুকুন্দ দাস যেসব যাত্রার পালা রচনা করেছিলেন তা নীতিবাক্যে পরিপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে এই সব রচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সাহিত্যে যদি নীতিকথা বা

সামাজিক আদর্শ প্রচারের বাহুল্য থাকে তবে তার রস শুখিয়ে যায়। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ঘরে বাইরে, দেনাপাওনা, পথের পাঁচালি ইত্যাদিতে উচ্চ আদর্শ কতটুকু আছে? আমরা নিজের জীবনে রোগ শোক নিষ্ঠুরতা কৃতঘ্নতা প্রতারণা ব্যভিচার ইত্যাদি চাই না, ভয়ানক আর বীভৎস রসও পরিহার করি, কিন্তু সাহিত্যে এ সমস্তই রসসৃষ্টির সহায়। পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়ও সাহিত্যে অত্যাবশ্যক নয়।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক আকাঙ্ক্ষা আর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা সমান নয়। মনোবিজ্ঞানীরা এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু কোনও বহুসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। সাহিত্যের যে রস সুধীজনের কাম্য তা বহু জটিল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের রসতত্ত্বের জ্ঞান নিতান্ত অস্পষ্ট, art for art's sake, মানব-কল্যাণের নিমিত্তই সাহিত্য, মানুষে মানুষে মিলনের জন্যই সাহিত্য, জীবনের আলেখ্যই সাহিত্য—এই ধরনের উক্তিতে রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। উত্তম সাহিত্য আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু কোন্ কোন্ রস কি ভাবে যোজিত হলে উত্তম সাহিত্য উৎপন্ন হয় তা আমরা জানি না। অনেক বৎসর পূর্বে এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তা থেকে কিছু পুনরুক্তি করছি।—*

সাহিত্যের অনেক উপাদান নীতিবিরোধী, অনেক উপাদান পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু কৃতী রচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। নিপুণ পাচক কটু তিক্ত মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত করে। নিপুণ সাহিত্যিকের পদ্ধতিও অনুরূপ। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লংকা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটা পেঁয়াজ রসুন দিলে উৎকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে শান্তরস আদিরস বা বীভৎসরস, সুনীতি বা দুর্নীতি, একনিষ্ঠ প্রেম বা ব্যভিচার, কত মাত্রায় থাকলে সুধীজনের উপভোগ্য হবে তার নিরূপণের সূত্র অজ্ঞাত। জনকতক ভোক্তার হয়তো কোনও বিশেষ রসে আসক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বিচারই চূড়ান্ত গণ্য হয় না। যিনি শুধু একশ্রেণীর ভোক্তার তৃপ্তিবিধান করেন অথবা জনসাধারণের অভ্যস্ত ভোজ্যই পরিবেশন করেন তিনি সামান্য পেশাদার বা hack writer মাত্র। যাঁর রুচি অভিনব এবং যিনি বহু ভোক্তার রুচিকে নিজের রুচির

'সাহিত্যবিচার' (লঘুগুরু) দ্রষ্টব্য। —সঃ।

অনুগত করতে পারেন তিনিই উত্তম সাহিত্যস্রষ্টা। যিনি কোনও লেখকের রচনায় এই গুণ উপলব্ধি করে পাঠকগণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই উত্তম সমালোচক।

সকল দেশেই অল্প কয়েকজন বিচক্ষণ বোদ্ধা সাহিত্যের বিচারকরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। এঁদের কেউ নির্বাচন করে না, নিজের প্রতিভাবলেই এঁরা বিচারকের পদ অধিকার করেন এবং পাঠকের রুচির উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এঁরা কেবল রচনার রস বা উপভোগ্যতা দেখেন না, সমাজের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিচার করেন। পাঠকের আনন্দ আর সামাজিক স্বাস্থ্য দুইএর প্রতিই তিনি দৃষ্টি রাখেন। তাঁর যাচাইএর পদ্ধতি কি রকম তা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না, তাঁর নিজেরও বোধ হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই। সামাজিক আদর্শ চিরকাল একরকম থাকে না। সে কারণে রচনায় অল্পস্বল্প বিচ্যুতি থাকলে তিনি উপেক্ষা করেন, কিন্তু অধিক বিচ্যুতি মার্জনা করেন না। তাঁর সিদ্ধান্তে মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত জন সাধারণত তাঁর অভিমতই প্রামাণিক মনে করেন।



বানানের সমতা ও সরলতা

(১৮৭৯/১৯৫৭)

কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উত্তরপ্রদেশীয় লেখক আমার কাছে এসেছিলেন। একজন বাঙালী অধ্যাপকও তখন উপস্থিত ছিলেন। দুজনের পরিচয়ের পর অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, পন্ডিতজী, আমাদের জাতীয় সংগীত জন-গণ-মন হিন্দীতে অমন উৎকট বানানে লেখা হয় কেন—'দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গা, উচ্ছল-জলধিতরঙ্গা'? শেষে অনর্থক আ-কার যোগ করেন কেন? পন্ডিতজী উত্তর দিলেন, বাবুজী, হিন্দী আর বাঙলা জবান এক নয়। আপনাদের অ-কার যেন awe, কিন্তু হিন্দীতে তেমন নয়, upএর আদ্যক্ষর তুল্য হ্রস্ব। জন-গণ-মন গাইবার সময় সেই হ্রস্ব অ-কার আমরা টেনে দীর্ঘ করি, তার ফলে অ-কারান্ত বঙ্গ আমাদের উচ্চারণে বঙ্গা হয়ে যায়। শেষে আ-কার না দিলে লোকে পড়বে—দ্রাবিড়্ উৎকল্ বঙ্গ্ উচ্ছল্ জল্ধিতরঙ্গ্। তুলসীদাসজীও তাঁর রামায়ণে ছন্দের প্রয়োজনে অনেক জায়গায় অ স্থানে আ করেছেন, যেমন, 'সুনি প্রভু বচন হরস হনুমানা, শরণাগত বচ্ছল ভগবানা।' আপনাদের বানানেও গলদ আছে। অ-কার হচ্ছে হ্রস্ব স্বর, তার আসল উচ্চারণ ভুলে গিয়ে তাকে awful করেছেন কেন? হ্রস্ব অ-কার বোঝাবার জন্য আপনারা দীর্ঘ আ-কার দেন কোন্ হিসাবে? bus club Punjab (পঞ্জাব) স্থানে বাস ক্লাব পাঞ্জাব লেখেন কেন?

বাঙলা বানান নিয়ে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে, এখন আর সেসব পুরনো কথার আলোচনা করব না। কতকগুলি শব্দের বানানে যে বৈষম্য, বাহুল্য বা জটিলতা দেখা দেয় তার সম্বন্ধে কিছু বলছি।

বাঙলা আসামী ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি আর্যভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে। এই মিল যত বজায় রাখা যায় ততই মঙ্গল। বাঙলা বইএর গুণগ্রাহী অবাঙালী পাঠক বিস্তর আছেন। আমরা যদি বাঙলা বানানে অনর্থক বৈষম্য আনি তবে অবাঙালী পাঠকের পক্ষে তা দুর্বোধ হবে, তার ফল বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে লাভজনক হবে না।

সংস্কৃতে অ কণ্ঠ্য বর্ণ, তার মূল উচ্চারণ upএর আদ্যক্ষর তুল্য। এই হ্রস্ব অ টেনে উচ্চারণ করলেই আ হয়। ই ঈ যেমন মূলত একই ধ্বনি, শুধু প্রথমটি হ্রস্ব আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘ তেমনি অ আ মূলত একই, শুধু প্রথমটি হ্রস্ব আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। ইংরেজী fur যদি টেনে দীর্ঘ করা হয় তবে far হয়ে যায়। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে কলেক্টর পায়োনিয়র সর (Sir) ক্লব ইত্যাদি বানান প্রচলিত ছিল। তখন অ-কারের মৌলিক অর্থাৎ upএর আদ্যক্ষর তুল্য উচ্চারণ আমাদের অভ্যস্ত ছিল, তার ফলে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বহু শব্দে একই বানান চলত। বাঙালী তখন স্থানভেদে অ-কারের চার রকম উচ্চারণ করত, যেমন কটা, কটু, একটু, টি-কপ। 'কটা' শব্দে অ-কারের উচ্চারণ সংবৃত, অর্থাৎ ইংরেজী awe শব্দের তুল্য। এই উচ্চারণ হিন্দীতে নেই। 'কটু' শব্দের অ-কার ও-কারের তুল্য। এও হিন্দীতে নেই। 'একটু শব্দে অ-কার গ্রস্ত, অর্থাৎ ক-অক্ষর হসন্ত তুল্য। 'টি-কপ' শব্দে ক-এর উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ ইংরেজী cupএর তুল্য, কিন্তু আধুনিক বাঙালী অ-কারের শেষোক্ত হ্রস্ব উচ্চারণ ভুলে গেছে, তার ফলে অ-কার স্থানে আ-কার চলছে, যেমন ক্লাব, বাস, সার্কাস, কাটলেট। মাঝে মাঝে নাম্বারও দেখতে পাই, কিন্তু জজ এখনও জাজ হন নি।

হিন্দী মরাঠী গুজরাটীতে অ-কারের শুধু বিবৃত বা হ্রস্ব, এবং গ্রস্ত বা হসন্তবৎ উচ্চারণ আছে। 'কল বন বট'-এর হিন্দী উচ্চারণ cull, bun, butএর তুল্য। গ্রস্ত অ-কার হিন্দীতে খুব বেশী, আমাদের 'জনতা বিমলা কামনা' হিন্দী উচ্চারণে 'জন্তা, বিম্লা, কাম্না।' কিন্তু হিন্দীতে সংবৃত অর্থাৎ awe-তুল্য অ-কার নেই, তা বোঝাবার জন্য আ-কার লেখা হয়, যেমন royal—রায়ল, talky—টাকি। সেকালে বাঙালীও এই রকম বানান করত, তার কয়েকটি নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে, যেমন কালেজ, আগস্ট, লাট (lord বা lot)। ষাট-সত্তর বৎসর আগে law স্থানে 'লা' লেখা হত।

এককালে আমাদের অ-কারের যে শক্তি ছিল তা ফিরিয়ে আনা উচিত মনে করি। হ্রস্ব অ-কার স্থানে আ-কারের প্রয়োগ খুব বেশীদিনের নয়। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যাপত্রে আছে—'অপর সরকিউলর রোড।' রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের পুরনো মুদ্রণে 'কটলেট, থর্ড' ইত্যাদি বানান দেখা যায়। আমাদের লেখকরা একটু চেষ্টা করলেই আ-কারের অপপ্রয়োগ বন্ধ করে অ-কারের মৌলিক বিবৃত হ্রস্ব উচ্চারণ ফিরিয়ে আনতে পারেন। Bus

স্থানে বাস না লিখে বস লিখলে কোনও ক্ষতি হবে না, সাধারণ লোকে এখন যতটা বিকৃত উচ্চারণ করে তার চাইতে বেশী বিকৃত করবে না। স্থানভেদে অ-কারের চার রকম উচ্চারণই বাঙলায় চলতে পারে, তাতে অবাঙালী পাঠকের উচ্চারণ ভুল হলেও অর্থবোধে বাধা হবে না। জন-গণ-মন গানে সংবৃত অ-কার বোঝাবার জন্য যদি বঙ্গা-তরঙ্গা লেখা হয় তাতে আমাদের আপত্তির কারণ নেই। আমরাও তো হিন্দী হৈ স্থানে হ্যায় লিখি।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বানান-সমিতির নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে ণ বাদ দিয়ে শুধু ন লেখার বিধান আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও অসংস্কৃত শব্দে ণ নেই, রানী, বরন (বর্ণ), মন (চল্লিশ সের) লেখা হয়। বাঙলায় 'গিণি সোণা' মূর্ধন্য ণ দিয়ে কেন লেখা হয় জানি না, হয়তো সোনার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য।

বানান-সমিতির আর একটি নিয়ম—কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে, যেমন, ইশারা তামাশা শয়তান শেমিজ-এ তালব্য শ, কিন্তু আসমান জিনিস সাদা নোটিস পুলিস-এ দন্ত্য স। হিন্দী প্রভৃতিতে এই রীতি মানা হয়, বাঙালী মুসলমান লেখকরাও তা মানেন। সকলেই এই নিয়মে বানান করলে সামঞ্জস্য আসবে।

আর একটি বিষয় বিচারের যোগ্য। অনেক শব্দে অনর্থক apostrophe বা ঊর্ধ্ব কমা দেখতে পাই। বার্নার্ড শ', পাঁচ শ' ইত্যাদিতে ঊর্ধ্ব কমার সার্থকতা কি? না দিলেও লোকে শএর ঠিক উচ্চারণ করবে, কেউ শ্ বলবে না। দু'দিন, ন'টাকা ইত্যাদি বানানে ঊর্ধ্ব কমার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। দুই থেকে দু, নয় থেকে ন হয়েছে তা জানাবার কি দরকার? দু ছ ন শ ইত্যাদি স্বপ্রতিষ্ঠ শব্দ, এদের ব্যুৎপত্তি না জানালে কোনও ক্ষতি হয় না। সাধু রূপ 'তাহা তাহাকে তাহাতে তাহার' থেকে চলিত রূপ 'তা তাকে তাতে তার' হয়েছে, কিন্তু ঊর্ধ্ব কমা দেওয়া হয় না।

লখনউএর যারা বাসিন্দা তারা সরল বানান লেখে ল খ ন উ, কিন্তু বাঙালী অনর্থক লক্ষ্ণৌ লেখে কেন? 'দরভঙ্গা'য় দ্বার নেই, বঙ্গের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, তবু দ্বারবঙ্গ লেখা হয় কেন? আর একটা উৎকট বানান sir স্থানে স্যার। যেমন ক্যাট হ্যাট ব্যাট, তেমনি স্যার। শুধু সার লিখলেই চলে, সেকেলে বানান সর আরও ভাল মনে করি।

অনেকে মনে করেন বিদেশী শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্য শেষে হস্‌চিহ্ন দিতেই হবে। এঁরা লেখেন—কাট্‌লেট্‌, টি-পট্‌, প্লেট্‌, ডিশ্‌। হসচিহ্ন

না দিয়ে যদি শুধু ডিশ লেখা হয় তবে লোকে ডিশঅ পড়বে এমন ভয় আছে কি? অনর্থক হস্‌চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করায় লাভ নেই।

অনেকে 'মেইন, চেইন, টেইল' লেখেন। এঁদের যুক্তি—ইংরেজী শব্দে i অক্ষর আছে, উচ্চারণেও তার প্রভাব পড়ে। এই যুক্তি মিথ্যা। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, কাছাকাছি বানানে হলেই যথেষ্ট। 'মেইন, চেইন' ইত্যাদি লিখলে লোকে ই-কারের উপর অতিরিক্ত জোর দেয়। আর একটি ভয়ংকর বানান মাঝে মাঝে দেখি—'কেইক' অর্থাৎ কেক। ই-কার না দিলে কি 'ক্যাক' পড়বার ভয় আছে?



আচার্য উপাচার্য

(১৮৭৯/১৯৫৭)

কালক্রমে অনেক শব্দের মানে বদলায়। সংস্কৃত অভিধানে যেসব অর্থ পাওয়া যায় আধুনিক বাঙলা প্রয়োগে বহু ক্ষেত্রে তার অল্পাধিক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠশালা আর বিদ্যালয় এই দুইএর মূল অর্থ একই, কিন্তু আজকাল মানে বদলে গেছে। সেই রকম—বৈদ্য ও চিকিৎসক, ঘটনা ও যোজনা, অভ্যর্থনা ও প্রার্থনা, প্রণাম ও নমস্কার। অনেক শব্দের অর্থব্যাপ্তি (connotation) পূর্ব্ববৎ নেই, যেমন, সাহিত্যএর অর্থ প্রসারিত হয়েছে, কাব্যএর অর্থ সংকুচিত হয়েছে। ধাতু বললে সাধারণ শিক্ষিত লোকে বোঝে metal, কিন্তু কবিরাজরা প্রাচীন অর্থ অনুসারে অধিকন্তু বোঝেন হরিতাল হিঙ্গুল প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এবং রক্ত মাংস প্রভৃতি দৈহিক উপাদান।

একালের রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সেকালের মতন নয়, সেজন্য অনেক শব্দের প্রাচীন অর্থ কিছু না বদলালে আমাদের আধুনিক প্রয়োজন মেটে না। কিন্তু মূল অর্থের সঙ্গে নূতন অর্থের ভাবগত বিরোধ যাতে না হয় তা দেখা দরকার। স্নাতকএর একটি প্রাচীন অর্থ— বিদ্যাশিক্ষান্তে যে ব্রহ্মচর্যসমাপ্তিসূচক স্নান করেছে। সমাবর্তন-এর অর্থ—ব্রহ্মচর্যের অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। আজকাল এই দুই শব্দ গ্র্যাজুএট ও কনভোকেশন অর্থে চলছে। এতে আপত্তির কারণ কিছু নেই। কিন্তু নাচ গানের স্কুলকে বিদ্যালয় বলা গেলেও পাঠশালা বলা চলবে না, সেখানকার শিক্ষককেও গুরুমহাশয় বা অধ্যাপক বলা চলবে না।

কুলপতি শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে বিপ্রর্ষি দশসহস্র মুনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। যেমন অক্ষৌহিণী শব্দের বিবৃতিতে ৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ গজ ইত্যাদির উল্লেখ আছে তেমনি কুলপতির বিবৃতিতে ১০,০০০ শিক্ষার্থী মুনির উল্লেখও পৌরাণিক সংখ্যান ধরা যেতে পারে। দশ সহস্র শিষ্যের মানে অনেক শিষ্য, দু-এক হাজার বা দু-পাঁচ শও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কুলপতি ছিলেন— একথা বললে প্রাচীন অর্থের অপলাপ হবে মনে করি না।

মনুর বচন অনুসারে আচার্য শব্দের অর্থ—যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করে বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ শিক্ষা দেন। আপ্তের অভিধানে আচার্যএর একটি অর্থ দেওয়া আছে—(when affixed to proper names) learned, venerable (somewhat like the Eng. Dr.)। এই সব অর্থের কালোচিত পরিবর্তন করলে রবীন্দ্রনাথের আচার্য উপাধিও সার্থক। গুরু আর আচার্য প্রায় সমার্থক, সেজন্য তাঁর গুরুদেব উপাধিও সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, বহুকাল স্বয়ং অধ্যাপনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষার বিধায়ক ছিলেন। এ কারণে আচার্য উপাধি সর্বতোভাবেই তাঁর উপযুক্ত। বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, তার চানসেলর নেহরুজী দিল্লিতে থাকেন, কালেভদ্রে বিশেষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে আসেন, প্রশাসন বা administration সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে তাঁর সম্মতি নিতে হয়। কোনও স্কুল বা কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টকে আচার্য বা অধ্যাপক বললে যে দোষ হয়, বিশ্বভারতীর চানসেলরকে আচার্য বললেও সেই দোষ হয়। বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলরের পদে যিনি অধিষ্ঠান করেন তিনি রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী বা রাজ্যপাল যাই হন, তাঁকে আচার্য বলা নিতান্ত অসংগত। চানসেলর আর আচার্য এই দুই শব্দের অর্থগত বা ভাবগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই।

কলেজের প্রিনসিপাল অধ্যাপনাও করতে পারেন কিন্তু অধ্যাপনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে শুধু প্রাধান্যসূচক পদবী দেওয়া হয়েছে, কারণ, তিনি অধ্যাপকবর্গের প্রধান এবং পরিচালক। প্রিনসিপালএর প্রতিশব্দ অধ্যক্ষও প্রাধান্য ও কর্তৃত্বসূচক। Concise Oxford Dictionaryতে University Chancellorএর অর্থ—titular head with Vice-c. acting, অর্থাৎ চানসেলর পদবীতে প্রধান হলেও ভাইস-চানসেলরই প্রকৃত কর্তা। চানসেলরের যা অধিকার তা প্রশাসন বা ব্যয়-অনুমোদন সংক্রান্ত, তাঁকে আচার্য বলার পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নেই।

ভাইস-চানসেলরকে উপাচার্য বলা আরও আপত্তিজনক। ইংরেজী ভাইস-এর অন্ধ অনুকরণে বাঙলায় উপ-উপসর্গের প্রয়োগ একেবারে নিরর্থক। ভাইস-চানসেলর ইচ্ছা করলে অধ্যাপনা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর

প্রকৃত কর্ম প্রশাসন বা পরিচালন। ইংরেজী নামে ভাইস উপসর্গ সত্ত্বেও তিনি কারও স্থলাভিষিক্ত বা সহকারী নন। উপাচার্য শুনলে মনে আসে assistant professor। এই উপাধি তাঁর শুধু অযোগ্য নয়, মর্যাদাহানিকরও বটে।

সরকারী কার্যের পরিভাষা সংকলনের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন।* এই সমিতির সংকলিত তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা আছে, যেমন—Senate অধিষদ্, Syndicate নিষদ্, Registrar নিবন্ধক, Vice-Chancellor অধিপাল, Chancellor মহাধিপাল। (এই সংজ্ঞাগুলির রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম এ, কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ)। কলেজের প্রধান যেমন অধ্যক্ষ, সরকারী বিভাগের ডিরেক্টর যেমন অধিকর্তা, কোনও সংঘের প্রধান নেতা বা নিয়ন্তা যেমন অধিনায়ক, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রধান নিয়ন্তা তিনি অধিপাল।

একালের ভাইস-চানসেলর (বিশেষত বিশ্বভারতীর তুল্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের) সেকালের কুলপতিরই সমপর্যায়ের। অধিপাল উপাধিতে তাঁর অধিনায়কত্ব ও পদোচিত গৌরব সূচিত হয়। চানসেলরকে আচার্য আখ্যা না দিয়ে মহাধিপাল বললে তাঁরও যথোচিত মর্যাদা বজায় থাকে।

❑

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত সমিতির মতন এটিরও সভাপতি ছিলেন—রাজশেখর বসু। —সঃ।

স্বাধীনতার স্বরূপ

(১৮৭৯/১৯৫৭)

স্বাধীন আর পরাধীন দেশের প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন, দেশের লোকেই যেখানে শাসন করে সে দেশ স্বাধীন, বিদেশী যেখানে শাসন করে তা পরাধীন। কিন্তু এত সহজে প্রশ্নটির মীমাংসা হয় না। দেশের কত জন স্বাধীন, কতটা স্বাধীন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বাধীন, ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করা দরকার।

স্বাধীনতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—নিজের ইচ্ছায় চলবার অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করবার ক্ষমতা। এ রকম নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোনও দেশের কোনও লোকের নেই, সর্বশক্তিমান ডিকটেটরেরও নেই। সকল রাষ্ট্রেই নাবালক, পাগল, জেলখানার কয়েদী ইত্যাদির স্বাধীনতা অল্প। প্রাচীন স্বাধীন ভারতে স্ত্রী আর শূদ্রের অনেক অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণ গুরু পাপে লঘু দণ্ড পেত, কিন্তু অব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পেত না। কমিউনিস্ট দেশের প্রজার স্বাধীনতা অতি সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগুরু অশ্বেতজাতির অনেক অধিকার নেই। বিলাতে ১৯২০ সালের আগে রোমান ক্যাথলিক প্রজার পূর্ণ অধিকার ছিল না, ১৯১৮ সালের আগে মেয়েদের ভোট ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভারতের প্রজা বিনা বাধায় প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারত, কিন্তু সমাজতন্ত্রী স্বাধীন ভারতে সেই অধিকার সংকুচিত হয়েছে। বর্তমান ব্রিটিশ এবং আরও অনেক ইওরোপীয় রাষ্ট্রের অবস্থাও এই রকম। মোট কথা, প্রজার পক্ষে স্বাধীন আর পরাধীন দুই দশাই আপেক্ষিক বা relative।

আমরা বলে থাকি. তুর্ক জাতি অর্থাৎ পাঠান-মোগল কর্তৃক ভারত বিজয়ের পর থেকে ১৯৪৭ সালের অগস্ট পর্যন্ত মোটামুটি ৭০০ বৎসর ভারত পরাধীন ছিল। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, মুসলমান বিজেতারা ভারতে স্থায়ী ভাবে বসতি করেছিল এবং এদেশের বিস্তর লোক মুসলমান হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, এই কারণে বাদশা-নবাবদের বিদেশী বলা ঠিক নয়, তাঁদের রাজত্বকালে ভারত পরাধীন ছিল এ কথাও বলা চলে না। এঁদের যুক্তি অনুসারে কেবল ব্রিটিশ অধিকারেই ভারত পরাধীন ছিল। এ

দেশের মুসলমানরাও মনে করে, বাদশাহী আর নবাবী আমলে তাদের স্বাধীনতার হানি হয় নি।

আলোচ্য বিষয়টি কি রকম জটিল তা আরও কয়েকটি দেশের ইতিহাস থেকে জানা যাবে। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরমান্ডির ডিউক উইলিয়ম যখন ইংলান্ড আক্রমণ করে জয়ী হন তখন ইংরেজ জাতি নিশ্চয় পরাধীন হয়েছিল। তার পর শতাধিক বৎসর নরমান অভিজাত বর্গের সর্বময় কর্তৃত্বের সময় দেশের অধিবাসী অ্যাংলোস্যাকসনরা অধীনতার দুঃখ ভাল করেই ভোগ করেছিল। কিন্তু সেই পরাধীন দশা ক্রমে ক্রমে আপনিই বিলীন হয়ে গেল। বিজেতা আর বিজিতদের মধ্যে ভাষাগত ভেদ ছিল, কিন্তু বর্ণগত ধর্মগত আর আচারগত ভেদ ছিল না, সেজন্য নরমান আর অ্যাংলোস্যাকসন শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে নরমান বিজয়ের পর ইংলান্ড দু-এক শ বৎসর মাত্র পরাধীন ছিল।

সপ্তম শতাব্দে ইসলামের উৎপত্তির সময় মিসর পারস্য তাতার প্রভৃতি স্বাধীন ছিল, কিন্তু কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই মুসলমান খলিফা এবং আরব যোদ্ধারা এই সব দেশ জয় করে করে নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের লোক বিজিত হল. কিন্তু ধর্মান্তরিত হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাযুজ্য লাভ করল, তাদের পরাধীনতার কলঙ্ক আর রইল না।

মুসলমান বিজয়ের এইপ্রকার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটলেও কয়েকটি দেশে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। স্পেন, সিসিলি, বলকান প্রদেশের কতক অংশ আর ভারতবর্ষ বিজিত হয়েও পুরোপুরি ধর্মান্তরিত হয় নি। স্পেন সিসিলি ইত্যাদি কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই বিজেতার কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ তা পারে নি। কুবলাই খাঁ আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনেক বৎসর চীন দেশে রাজত্ব করেছিলেন এবং নিজেরাই বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ কালে ভারতে যে দেশাত্মবোধ আর সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেকালে তা ছিল না। ভারতবাসী বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আপৎকালেও তাদের ঐক্য ঘটে নি, আক্রামক জাতিদের মতন তারা যুদ্ধনিপুণ ছিল না, তাদের নীতি যদ্‌ভবিষ্য তদ্‌ভবিষ্য। এই সব কারণে ভারত পরাধীন হয়েছিল। ভারতীয় প্রজা চিরকাল ঝঞ্ঝাট পরিহার করেছে, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থেকে চিরাগত ধর্ম আর সমাজবিধি পালন করতে পারলেই কৃতার্থ হয়েছে, রাজা যেই হক তাতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

নরমান বিজয়ের পর ইংলান্ডের এবং মুসলমান বিজয়ের পর মিসর পারস্য প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতা ঘটেছিল এবং মিশ্রণের ফলে কয়েক শ বৎসরের মধ্যে তা তিরোহিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা আংশিক, অর্থাৎ শুধু রাজনীতিক, অত্যাচারিত হয়েও দেশের অধিকাংশ লোক তাদের ধর্মগত আর সমাজগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। বহুবর্ষব্যাপী নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও ভারতবাসীর একটি বিষয়ে দৃঢ়তা ছিল, সে তার 'সহজং কর্ম (বা ধর্ম) সদোষমপি' ত্যাগ করে নি। সমগ্র ভারত যদি পরধর্ম গ্রহণ করত তবে আমাদের পরাধীন দশার স্থিতি সাত শ বৎসর না হয়ে দু শ বৎসর গণ্য হত, অর্থাৎ শুধু ব্রিটিশ অধিকার কাল। সে ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমানের সঙ্গে সাজাত্য অনুভব করে কবি ইকবালের মতন আমরাও হৃত রাজ্যের জন্য বিলাপ করতাম—চীন হমারা, স্পেন হমারা।

অন্য বিষয়ে উদ্যমহীন হয়েও ভারতবাসী তার দৃঢ় স্বধর্মনিষ্ঠা কোথা থেকে পেয়েছে? কেউ কেউ বলবেন, এর মূলে আছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিন্তু যথার্থ বর্ণাশ্রম আর চাতুর্বর্ণ্য বহুকাল আগেই লোপ পেয়েছে, তার স্থানে যা এসেছে তা জাতিভেদ বা casteism। এই শতমুখী ভেদবুদ্ধির এমন শক্তি থাকতে পারে না যার দ্বারা বিজেতার ধর্মকে বাধা দেওয়া যায়। ভারতবাসীর প্রকৃতিতে এক প্রকার প্রবল জাড্য বা inertia আছে, সে অজ্ঞাতসারে অনেক পরিবর্তন মেনে নেয় কিন্তু সজ্ঞানে তার নিষ্ঠা ত্যাগ করতে চায় না। হয়তো এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বহিরাগত আঘাত প্রতিহত হয়েছিল। পেগান গ্রীস আর রোমের সংস্কৃতি প্রচুর ছিল, তথাপি সেখানকার লোকে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। ভারতের অসংখ্য ধর্মমত আর লোকাচারের মধ্যে এমন কিছু বলিষ্ঠ অবলম্বন আছে যার কাছে বিদেশীর প্রভাব হার মেনেছিল। ইতিহাসজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো তার সন্ধান পেয়েছেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। পাঁচ শ বৎসরের মুসলমান শাসনের ফলে ভারতবাসীর সংস্কৃতি অবশ্যই কিছু বদলেছে। কিন্তু তার চাইতে বহুগুণ বদলেছে দু শ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে। মুসলমান সংস্কৃতি থেকে গ্রহণযোগ্য বেশী কিছু আমরা পাই নি, কিন্তু ব্রিটিশ বা ইওরোপীয় সংস্কৃতি থেকে প্রচুর পেয়েছি। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি, কিন্তু ইওরোপীয় আচার কিছু কিছু আত্মসাৎ করেছি এবং সাগ্রহে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা বুদ্ধি ও ভাবধারা অজস্র পরিমাণে বরণ করে নিয়েছি।

আমিষ নিরামিষ

(১৮৭৯/১৯৫৭)

মথুর মুখুজ্যে সকালবেলা পার্কে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর বাল্যবন্ধু অঘোর দত্তর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হয়ে গেল। দুজনে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর, আছ কেমন? বয়স কত হল?

অঘোর দত্ত বললেন, ভাল মন্দ মিশিয়ে আছি, নালিশ করবার কিছু নেই। বয়স প্রায় আটাত্তর হল।

মথুর। আমার পঁচাত্তর, কিন্তু ভাল নই দাদা। বাত হাঁপানি ডিসপেপসিয়া, নানানখানা। আচ্ছা তুমি তো নিরামিষ খাও। কত দিন খাচ্ছ?

অঘোর। তা ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর, ছেলেবেলা থেকেই।

মথুর। বল কি হে! সেই জন্যই এখন পর্যন্ত বেশ আছ। আমিও ভাবছি মাছ মাংস ছেড়ে দেব। আর কেন, ঢের খেয়েছি, শেষ বয়সে সাত্ত্বিক আহারই ভাল। নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবী হয়, আনি বেসান্ট, বার্নার্ড শ,

অঘোর। ভুল করলে ভাই। আমিষ খেয়েও বিস্তর লোক আশি পেরিয়ে বেঁচে আছেন, যেমন চার্চিল, ফজলুল হক, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। যোগেশ বিদ্যানিধি মশাই তো ছেয়ানব্বই পার হয়ে বার্নার্ড শকেও হারিয়ে দিয়েছেন।

এমন সময় ফণী মল্লিক এসে পড়লেন। এঁর বয়স প্রায় ষাট, বহু কাল আগে একবার বিলাত গিয়েছিলেন, তার লক্ষণ সাজে আর চালচলনে এখনও কিছু দেখা যায়। মথুরবাবু বললেন, আসতে আজ্ঞা হক মল্লিক সায়েব, বসুন এইখানে। এই অঘোর দত্তকে চেনেন তো? অদ্ভুত মানুষ, পঁয়ষট্টি বৎসর নিরামিষ খেয়ে বেঁচে আছেন। আচ্ছা মল্লিক মশাই, আপনি তো বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক, আমিষ নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ফণী মল্লিক বললেন, প্রচুর আমিষ খাওয়া উচিত, আমিষের অভাবেই হিন্দু জাতির অধঃপতন হয়েছে।

মথুর। আচ্ছা অঘোর, তোমার তো কোনও কালেই ধর্মে তেমন মতি দেখি নি। তবে মাছ মাংস খাও না কি কারণে?

অঘোর। যে কারণে তুমি সাপ ব্যাঙ খাও না।

মথুর। ও একটা বাজে কথা। যদি বলতে অহিংসার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য খাও না, কিংবা শাস্ত্রমতে প্রশস্ত নয় তাই খাও না তা হলে বুঝতাম।

অঘোর। আমরা যা করি সব কিছুরই কি কারণ বলা যায়? যা বলেছি তার সোজা অর্থ—তোমার যেমন সাপ ব্যাঙে রুচি হয় না আমার তেমনি মাছ মাংসে হয় না। যদি জেরা কর কেন রুচি হয় না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়তো পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে। যদি নিরামিষ সহ্য না হত তবে নিশ্চয় আমিষ ধরতাম, যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত শেষ বয়সে রোগে পড়ে ধরেছিলেন। আমি কিন্তু পুরোপুরি ভেজিটেরিয়ন নই। দুধ খাই, যা হচ্ছে খাঁটী গোরস, আর মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য জান্তব ঔষধও খেতে বা ইনজেকশন নিতে হয়েছে।*

ফণী মল্লিক সহাস্যে বললেন, হুঁ, এইবার পথে আসুন। এক মার্কিন ভদ্রলোক এচ জি ওয়েল্‌সকে বলেছিলেন, আপনাদের বার্নার্ড শ একজন ক্ষণজন্মা জ্ঞানী সাধুপুরুষ, নিরামিষ খেয়েই এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক চালনা করছেন। ওয়েল্‌স হেসে বললেন, নিরামিষ না ছাই। দুধ খাচ্ছেন, চীজ খাচ্ছেন, ডিম খাচ্ছেন, আবার প্রতিদিন লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন নিচ্ছেন, যা হল রক্তমাংসের সারাৎসার। শুনুন মথুরবাবু, মাছ মাংস ডিম খেলে যত সহজে পুষ্টি আর শক্তিলাভ হয়, তেমন আর কিছুতে হয় না। জনকতক ভাত ডাল শাগ তরকারি খেয়ে দীর্ঘজীবী হতে পারে, কিন্তু অ্যাভারেজ লোকের পক্ষে আমিষ বর্জন অনিষ্টকর। যার প্রচুর দুধ ক্ষীর ছানা খাবার সামর্থ্য আছে তার হয়তো চলে যেতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে আর সকল জায়গায় তা সুলভ নয়।

---

* প্রায় কোনও প্রচ্ছন্নতা না রেখে নিজেকে এতটা project বোধহয় আর কখনও করেন নি। বয়স আটাত্তর, ৬০/৬৫ বৎসর অর্থাৎ ১২/১৩ বৎসর বয়স থেকে নিরামিষাশী ও সব বিষয় চরম বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর rational মতবাদ। ফোটোগ্রাফ না হলেও অঘোর দত্ত নিখুঁত আত্মপ্রতিকৃতি। আর 'হয়তো ছেলেবেলায় এমন কিছু পড়েছিলাম...'—আমার শৈশবে একবার বলেছিলেন—'রাজর্ষি; ওটাও আমার নিরামিষ খাওয়ার একটা কারণ।' আবার—'মোটেই ভেজিটেরিয়ন নই, রোজ খাঁটী গোরস খাচ্ছি'—এও বলেছেন। —সঃ।

মথুর। কিন্তু শুনেছি মাংস খেলে হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়। এই দেখুন না, এদেশে যারা মাংসখোর তারাই দাঙ্গাবাজ আর একটুতে ছোরা মারে।

ফণী। মারবেই তো, অন্য পক্ষ যে নিস্তেজ ভীরু। মুখুজ্যে মশাই, আমাদের যে মাইল্ড হিন্দু বলে খ্যাতি আছে তা মোটেই গৌরবের নয়। আমাদের একটু উগ্র হওয়া দরকার। ভারতীয় আর্যজাতির ইতিহাস দেখুন। রাম লক্ষ্মণ সীতা বনে গিয়ে মাংস খেয়েই জীবনধারণ করতেন। চিত্রকূট আর দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলে চাল ডাল আটা পাবেন কোথা? পেলে অবশ্য ফলমূলও খেতেন, কিন্তু সেটা তাঁদের প্রধান খাদ্য ছিল না, শুধু ভাইটামিন-সিএর জন্য খেতেন। বনবাসী পাণ্ডবরাও তাই করতেন। তাঁরা এত হরিণ মারতেন যে সেখানকার ঋষিরা তাঁদের অন্যত্র চলে যেতে বলেছিলেন। আমাদের মাংসাশী পূর্বপুরুষরা তেজস্বী মহাবীর যুদ্ধবিশারদ ছিলেন, আবার বেদ-বেদান্তও রচনা করেছেন। তাঁদের বংশধররা বৌদ্ধ আর জৈনদের নকলে নিরামিষভোজী হয়েই অধঃপাতে গেছে।

মথুর। অঘোর, তুমি কি বল? মাংসাহার আসুরিক নয় কি? তাতে কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু আর হিংস্রতা প্রবল হয় না কি?

অঘোর। ঠিক বলতে পারি না। নিরামিষাশী গণ্ডার মোষ আর ষাঁড়ের ক্রোধ নেহাত কম নয়। বাঁদর আর ছাগলের প্রথম রিপু বাঘ সিংগির চাইতে প্রবল। শুনেছি হিটলার নিরামিষ খেতেন, কিন্তু অহিংস হতে পারেন নি। আমিষাশী লোকের তুলনায় নিরামিষাশীর সংযম হয়তো মোটের উপর কিছু বেশী, কিন্তু তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। চুরি জুয়াচুরি ভেজাল কালোবাজার লাম্পট্য ইত্যাদি নানারকম দুষ্কর্ম আমাদের দেশের নিরামিষ-খোরদের মধ্যে কিছুমাত্র কম নয়। এদেশের অনেক লোক গরুকে মাতৃজ্ঞান করে, বাঁদরকে ভ্রাতৃজ্ঞান করে, কিন্তু গোখাদক শিকারপ্রিয় পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আমাদের জন্তুপ্রীতি মোটের উপর কম। নিরামিষ ভোজন বেশী হিতকর কি না তার পরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত হয় নি। যদি শ-খানিক শিশুকে একই পরিবেশে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত রাখা হয় এবং তাদের পঞ্চাশ জনকে আমিষ আর পঞ্চাশ জনকে নিরামিষ খাওয়ানো হয় তবে তাদের স্বাস্থ্য আর চরিত্রের গড়পড়তা প্রভেদ দেখে খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা যেতে পারে। তবে এ কথা ঠিক যে আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বেশী মাংস খাওয়ার নিন্দা করেন, আমিষ-নিরামিষ মিশ্রিত খাদ্যই ভাল মনে করেন।

ফণী। আমিও মানি যে মিশ্রিত আহারই ভাল। কিন্তু খাদ্যবিজ্ঞানীরা

শুধু বেশী মাংস খাওয়ার নিন্দা করেন না, অতিরিক্ত স্টার্চ মিষ্টান্ন আর তেল ঘিও অনিষ্টকর বলেন। আমরা বাঙালীরা যা খাই তাতে মাছ মাংসের মাত্রা নিতান্তই কম। এদেশে নদীবহুল অঞ্চল আর সমুদ্রের উপকূলে বিস্তর মাছ পাওয়া যায়, সেই বিধিদত্ত খাদ্য না খাওয়া ঘোরতর বোকামি। মাছ পাঁঠা মটন ডিম আমাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নয়, মুরগিও জাতে উঠেছে, আজকাল পোর্ক আর বীফেও অনেকের আপত্তি নেই। এখন দরকার যেমন করে হক আহারে আমিষের মাত্রা বাড়ানো। আমরা যদি আহার বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের সমান না হই তবে জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে যাব। কূপমণ্ডূক হয়ে সনাতন বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকার দিন চলে গেছে। আমাদের এখন নানা উপলক্ষে দেশবিদেশে যেতে হয়, এ খাব না ও খাব না বলে আবদার করলে চলবে না। সভ্য মানুষের পোশাক যেমন প্রায় এক ধরনের হয়ে পড়ছে, সভ্য মানুষের খাদ্যও তেমনি ইউনিভর্সাল হওয়া দরকার। অঘোরবাবু যে সাপ ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত কুযুক্তি। সাপ ব্যাঙে রুচি না হবারই কথা, কিন্তু সভ্য লোকে সর্ব দেশে যা খায় তার উপর ঘৃণা থাকা সুরুচির পরিচয় নয়।

অঘোর। সাপ ব্যাঙ শুওর গরু ছাগল ভেড়া কোনওটার উপর আমার ঘৃণা নেই, সবাই কৃষ্ণের জীব। সায়েবদের যেমন কাঁঠাল কয়েতবেল আর টোপাকুলের গন্ধ সয় না, আমারও তেমনি আমিষের গন্ধ সয় না। নিজে খাই না, কিন্তু যারা খায় তাদের রুচির নিন্দা করি না। মল্লিক মশাই, আপনি রামায়ণ মহাভারত থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। দয়া করে আর একটু পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। আমাদের পূর্বপুরুষ অতিপ্রাচীন মানবজাতি কি খেয়ে জীবনধারণ করত? যখন পশুপালন আর কৃষিকর্ম জানা ছিল না তখন মানুষ শুধু শিকার করা জন্তু নয়, সাপ ব্যাঙ ইঁদুর টিকটিকি শামুক গুগলি ফড়িং পোকা, মায় নরমাংস, যা জুটত তাই খেত। পাওয়া গেলে ফলমূলও খেত, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সত্য মানতে হবে যে প্রায় সকল প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য হতে পারে, কিন্তু সকল উদ্ভিদ নয়। পশুপক্ষিপালন শেখার পর মানুষ পালিত জন্তুর মাংস দুধ ডিম খেতে শুরু করল। তার পর কৃষির প্রচলন হলে নানারকম শস্য উৎপন্ন হতে লাগল, খাদ্যের বৈচিত্র্য বেড়ে গেল। মানুষের রুচি কালে কালে বদলায়, এক শ বছর আগে আমরা যা খেতাম এখন ঠিক তা খাই না। মোট কথা, আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সাপ ব্যাঙ পোকামাকড়ে বিলক্ষণ রুচি ছিল, তার পর ক্রমশ রুচি বদলেছে, আধুনিক

সভ্য মানুষ নানা রকম আমিষ নিরামিষ খেতে শিখেছে, সেকালের অনেক খাদ্যের উপর বিতৃষ্ণাও জন্মেছে। কিন্তু এখনও অসভ্য আর অর্ধসভ্য জাতি আছে যাদের সাপ ব্যাঙ ইঁদুর পোকায় আপত্তি নেই।

ফণী। আদিম মানুষ কি খেত আর একালের অসভ্য মানুষ কি খায় তা আমাদের দেখবার দরকার নেই। আমার বক্তব্য আধুনিক সভ্য সমাজে যা খুব চলে তাই আমাদের খেতে হবে।

অঘোর। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রাণীর মাংস ডিম দুধ আর বাছা বাছা শস্য তরকারি ফল মূল। হিন্দুর লোকাচার অনুসারে মাছ ছাগল ভেড়া হরিণ হাঁস ইত্যাদি কয়েকটি প্রাণীর মাংস শুদ্ধ। শাস্ত্রে পাঁচটি পঞ্চনখ জন্তু খাবার বিধানও আছে—খরগোশ শজারু গোসাপ গণ্ডার আর কচ্ছপ। এখন নতুন ফর্দ করতে হবে, সায়েবরা যা খায় অর্থাৎ গরু শুওর ইত্যাদিও খেতে হবে। পোর্ক আর বীফ দুর্মূল্য হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল ঘোড়া আর তিমি অর্থাৎ হোয়েলের মাংসও চলছে। সায়েবরা ব্যাঙের ঠ্যাং আর ঝিনুকের কাঁচা শাঁসও অতি সুস্বাদু মনে করে। অতএব এসবেও আপত্তি করা চলবে না। মল্লিক মশাই, এই তো আপনার মত?

ফণী। হাঁ, তবে সায়েব বললে ঠিক হবে না, বলুন আধুনিক সুসভ্য জাতিরা।

অঘোর। সুসভ্য জাতিদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞতম আর দূরদর্শী তাঁরা বুঝেছেন যে অভ্যস্ত বাছাবাছা খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভর ভাল নয়। দরকার হলে অনভ্যস্ত খাদ্যও খেতে হবে, যাতে পুষ্টি হয় আর স্বাস্থ্যহানি হয় না। পুরাণে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র সপরিবারে কুকুরের মাংস খেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আধুনিক যুগে যুদ্ধ বা আবিষ্কার ইত্যাদির অভিযানে অবস্থা বিশেষে অনভ্যস্ত খাদ্যও খাবার দরকার হতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে আর ফ্রান্সে জনকতক ভলনটিয়ারকে কিছুদিনের জন্য এমন জায়গায় নির্বাসিত করা হয়েছিল যেখানে মামুলী খাদ্য মোটেই মেলে না। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, ফল মূল পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মাছ ব্যাঙ শামুক গুগলি যা জোটে তাই কাঁচা খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। তারা ফিরে এলে দেখা গেল যে তাদের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি হয় নি। আমাদের দেশেও ওই রকম আপৎকালীন আহারের অভ্যাস হওয়া দরকার।

মথুর। দেখ অঘোর, তুমি একটি ভণ্ড। নিজে নিরামিষ খাও অথচ

মল্লিক মশাইকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি কি বলতে চাও, সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড় খেতে না শিখলে আমাদের নিস্তার নেই?

ফণী। অঘোরবাবু আমার লেগ পুল করছেন।

অঘোর। আজ্ঞে না। আপনি অনেক সারগর্ভ কথা বলেছেন, আমি শুধু আপনার যুক্তি আর একটু ফালাও করবার চেষ্টা করছি।

মথুর। আচ্ছা মল্লিক মশাই, আমিষ খাদ্য খুব পুষ্টিকর তা তো বুঝলাম। কিন্তু অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম, অতএব কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি মেনে নিয়েও নিরামিষাশী হওয়া উচিত নয় কি? প্রাচীন যুগের অবস্থা যাই হক, ঈশ্বরকৃপায় এখন যখন চাল ডাল গম তরকারি আর কিছু কিছু দুধও জুটছে, আর মাছ মাংসের বাজারও আগুন, তখন নিরামিষ খাওয়াই আমাদের উচিত, এই কি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়?

ফণী। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তা জানবেন কি করে? সকলেই অহিংস হবে আর নিরামিষ খাবে এই যদি সৃষ্টিকর্তার মতলব হত, তবে তিনি বাঘ সিংগি বেরাল প্রভৃতি জানোয়ার সৃষ্টি করতেন না, সব জন্তুকেই গরু ছাগলের মতন নিরামিষাশী করতেন। পৃথিবীতে বিস্তর প্রাণী আছে যারা বিধাতার বিধানেই আমিষাশী হয়েছে, হিংসার পাপ তাদের স্পর্শ করে না। মানুষকেও সেই দলে ফেলবেন না কেন?

অঘোর। কিন্তু মানুষ শুধু আমিষ খায় না, লাউ কুমড়ো আম কাঁঠালও খায়। বিধাতা আমাদের বাঘ সিংগির দলে ফেলেন নি, বরং বলতে পারেন, ভালুক শেয়াল ইঁদুর কাগ প্রভৃতি সর্বভুক জানোয়ারের দলে ফেলেছেন।

ফণী। এ কথায় আমার আপত্তি নেই।

অঘোর। আরও একটা কথা। বিধাতা আমাদের এমন বুদ্ধি দিয়েছেন, যাতে চিরাভ্যস্ত খাদ্য বদলাতে পারি।

মথুর। তাইতো, বিষয়টা বড়ই গোলমেলে ঠেকছে। তোমরা দুই তার্কিকে মিলে আমার মাথা গুলিয়ে দিলে।

অঘোর। শোন মথুর, এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না, কূল কিনারা পাবে না। শাস্ত্রে আছে, যাতে জীবের অত্যন্ত হিত হয়, তাই ধর্ম। কিন্তু মুশকিল এই, বেরালের যা হিত ইঁদুরের তা নয়, মশা মাছি ছারপোকার যা হিত মানুষের তা নয়। অহিংসা পরম ধর্ম, কিন্তু তা পুরোপুরি মেনে চলা আমাদের অসাধ্য। আমিষাহার না হয় বর্জন করা গেল, কিন্তু আরও অনেক নিষ্ঠুর কর্ম

আমরা চোখ বুজে করে থাকি। ষাঁড়কে নপুংসক করে বলদ বানিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাই। কোটি কোটি পোকা মেরে পবিত্র আর শৌখিন এণ্ডি গরদ তসর তৈরি করি, তুচ্ছ শখের জন্য পাখিকে খাঁচায় পুরি, নানা জন্তুর স্বাধীনতা হরণ করে জুএ বন্দী করি, পোলিও-ভ্যাকসিন তৈরির জন্য হাজার হাজার বাঁদর চালান দিই, তাদের বধ করা হবে জেনেও। এসব কি জীবহিংসা নয়? আমাদের স্বভাব হঠাৎ বদলানো যাবে না। আমিষাহার অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, শাস্ত্রে তার নিন্দা থাকলেও বারণ নেই। মনুর সেই বচনটি জান তো? 'ন মাংস ভক্ষণে দোষো' ইত্যাদি। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'—লোকের প্রবৃত্তিই এই রকম, 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—তবে ছাড়তে পারলে মহা ফললাভ। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষ মাংসাহার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গৌরদাস বাবাজীকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'বাপু, ভগবান কোথায় বলেছেন যে পাঁঠা খাইও না?...পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে।' বিবেকানন্দ মাংসভোজন আবশ্যক বলেছেন। এ দেশের যেসব সম্প্রদায় বংশানুক্রমে নিরামিষাশী ছিল, তাদেরও অনেকে আজকাল আমিষ খাচ্ছে, আধুনিক ভারতে নিরামিষভোজী কমছে, আমিষভোজী বাড়ছে।

মথুর। তবে কি তোমরা বলতে চাও আমিষ না খাওয়াই দোষের?

ফণী। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অঘোর। আমি তা বলি না। এ যুগের ঋষি হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। খাদ্য-বিজ্ঞানী যে ব্যবস্থা দেবেন, তাই মেনে নেওয়া ভাল। অবশ্য সেকালের ঋষিদের মতন আধুনিক ঋষিদেরও মতভেদ আছে। যাঁর ব্যবস্থা আমাদের মনের মতন হয়, তাই মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ফণী। অঘোরবাবু, আপনাদের শাস্ত্রে আছে না—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'? মহাজন অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকে যা করে, তাই হচ্ছে ধর্মের পথ। অতএব আমিষাহারই ধর্ম। আপনি ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

অঘোর। মহাজনের পথ ছেড়ে অন্য পথে চললেই লোকে ধর্মভ্রষ্ট হয় না। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, আজীবন ব্রহ্মচারী, ছাতু-মাত্র-ভোজী নির্বাক মৌনী বাবা, বিবস্ত্র নেংটা বাবা—এরা খাপছাড়া, কিন্তু অধার্মিক নয়। নিরামিষ-ভোজীকেও যদি এইসব ক্র্যাংকের দলে ফেলেন, তবে আপত্তি করব না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। কালক্রমে নিরামিষ ভোজনই সভ্যজনের প্রিয় হওয়া অসম্ভব নয়। অহিংসা প্রবৃত্তির প্রসারের ফলে আমাদের রুচি

বদলাতে পারে। নিরামিষের তুলনায় আমিষ খাদ্যে টোমেইন আর নানা রকম ক্রিমি কীট (যেমন trichina, fluke ইত্যাদি) জন্মাবার সম্ভাবনা বেশী, এই কারণেও আমিষের আকর্ষণ কমতে পারে। হয়তো ভবিষ্যতে সভ্য মানবের বিচারে আমিষ খাদ্য অসুন্দর অহৃদ্য অনাবশ্যক গণ্য হবে। অনেক পাশ্চাত্ত্য শিকারী লিখেছেন, মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে বাঁদরের মাংস তাঁরা খেতে পারেন না। সর্বজীবে সমজ্ঞান বৃদ্ধি পেলে হয়তো কোনও মাংসেই রুচি হবে না।

মথুর। বাঁদর তো আমাদের পূর্বপুরুষ?

অঘোর। ঠিক পূর্বপুরুষ নয়. নিকট জ্ঞাতি বলা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রফেসর হলডেন দিল্লিতে বক্তৃতায় বলেছেন, মাছই আমাদের অতিপ্রাচীন আদিম পূর্বপুরুষ।

মথুর। কি ভয়ানক কথা! তাহলে মাছ খাওয়া মানে পিতৃমাংস ভক্ষণ? আচ্ছা দেড় টাকা সেরের চুনো পুঁটিও কি আমাদের পূর্বপুরুষ?

অঘোর। চুনো পুঁটি কই মাগুর ইলিশ রুই কাতলা সবাই। তবে চিংড়ির কথা আলাদা, ওরা হল মাকড়সা আর কাঁকড়াবিছার সগোত্র।

মথুর। মহাভারত! তা হলে খাব কি?

অঘোর। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলছে, হাতি ঘোড়া থেকে পোকা মাকড় পর্যন্ত সব প্রাণীই মানুষের ভক্ষ্য। প্রবৃত্তি বলছে, বাছা বাছা গুটিকতক প্রাণীই খেতে ইচ্ছা করে। অন্তরাত্মা বলছে, নিরামিষেই যখন কাজ চলে তখন জীব-হিংসার দরকার কি।

ফণী। সব গাঁজা। আমিষ ত্যাগ করলে মানুষের অধঃপতন হবে, নিরামিষ খাদ্যে এসেনশ্যাল আমিনো-অ্যাসিডের অভাব আছে।

অঘোর। খাদ্যবিজ্ঞানী আর রসায়নী হয়তো সে অভাব পূরণ করতে পারবেন। সয়াবীন, চীনাবাদাম, তিল, ঈস্ট, খুদে পানা ইত্যাদি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

মথুর। তা হলে এখন করা যায় কি?

অঘোর। দেখ মথুর, প্রবৃত্তিই বলবতী। যাতে তোমার রুচি হয়, যা তোমার পেটে সয়, তাই খাবে। ভবিষ্যতে হয়তো মাছ মাংসের অনুকল্প উপাদেয় সুষম নিরামিষ খাদ্য আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু তা তোমার আমার ভোগে লাগবে না। মল্লিক মশায়ের বয়স কম, উনি হয়তো চেখে দেখবার সুযোগ পাবেন। এখন ওঠা যাক, অনেক বেলা হয়েছে। □

গ্রহণীয় শব্দ

(১৮৮০/১৯৫৮)

ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার উপাদান শব্দ। শব্দের অর্থ যদি সর্বগ্রাহ্য হয় তবেই তা সার্থক, অর্থাৎ প্রয়োগের উপযুক্ত এবং সাহিত্যে গ্রহণীয়।

বাঙলা ভাষা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। তার এক কারণ, বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অর্থাৎ নূতন বস্তু নূতন ভাব নূতন রুচি নূতন আচারের প্রচলন। অন্য কারণ, অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাপূর্বক ইংরেজী ভাষার অনুকরণ। মৃত ভাষা ব্যাকরণের বন্ধনে মমির মতন অবিকৃত থাকতে পারে, কিন্তু সজীব চলন্ত ভাষায় বিকার বা পরিবর্তন ঘটবেই। আমাদের আহার পরিচ্ছদ আবাস সমাজব্যবস্থা আর শাসনপ্রণালী যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি শব্দ শব্দার্থ আর শব্দবিন্যাসও বদলাচ্ছে।

যাঁরা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী তাঁরা কোনও পরিবর্তন প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন না। আধুনিক ছেলেমেয়েদের চালচলন যেমন অনেক লোকের পক্ষে দৃষ্টিকটু, আধুনিক বাঙলা ভাষার রীতিও সেই রকম। অন্ধ গোঁড়ামি সকল ক্ষেত্রেই অন্যায়, কিন্তু শুধু হুজুক বা ফ্যাশনের বশে কোনও নূতন বস্তু বা রীতি মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। ভাষার রীতির তুলনায় সামাজিক রীতির গুরুত্ব অবশ্য অনেক বেশী, তথাপি কোনও শিক্ষিত লোকই চান না যে মাতৃভাষায় জঞ্জাল আসুক। সহসাগত কোনও শব্দ শব্দার্থ বা প্রয়োগরীতিকে সাহিত্যে স্থান দেবার আগে একটু যাচাই করে দেখা ভাল।

ভাষার সমৃদ্ধি হয় কৃতী লেখকের প্রভাবে, কিন্তু তার ক্রমিক মন্থর পরিবর্তনে জনসাধারণের হাতই বেশী। সাধারণ মানুষ ব্যাকরণ অভিধানের বশে চলে না। কয়েকজন শব্দের উচ্চারণে বা প্রয়োগে ভুল করে, তার পর অনেকে সেই ভুলের অনুসরণ করে, তার ফলে কালক্রমে নূতন শব্দ নূতন অর্থ আর নূতন ভাষার উৎপত্তি হয়। ভাষা মাত্রেই পূর্ববর্তী কোনও ভাষার বিকার বা অপভ্রংশ এবং একাধিক ভাষার মিশ্রণ। শব্দ অর্থ আর ভাষার এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা evolution বারণ করা যায় না। কিন্তু

অভিব্যক্তিতেও মানুষের কিছু হাত আছে। মানুষ অন্ধভাবে সবরকম প্রাকৃতিক পরিবর্তন মেনে নেয় না, স্বচ্ছন্দাগত সব কিছুকে সাদরে বরণ করে না। অভিব্যক্তির বহু ক্ষেত্রে মানুষ সজ্ঞানে হস্তক্ষেপ করেছে, যে পরিবর্তন তার পক্ষে অনুকূল তাই ঘটাবার চেষ্টা করেছে। বন্য প্রাণী আর উদ্‌ভিদ থেকে গৃহপালিত পশুপক্ষী আর ভক্ষ্য শস্য ফলাদির উৎপত্তি মানুষেরই যত্নের ফল। ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক হস্তক্ষেপ শুভজনক হতে পারে।

বিষয়টি সহজ নয়। ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষা আর প্রকাশ-শক্তি বর্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কোন্ শব্দ গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। সবিস্তার আলোচনা না করে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। তা থেকে হয়তো সতর্কতার প্রয়োজন বোঝা যাবে।

এমন অনেক বস্তু এদেশে আছে যার সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত জন এতকাল উদাসীন ছিলেন। সম্প্রতি এই প্রকার কয়েকটি বস্তুর গুরুত্ব বেড়েছে, সংবাদপত্র এবং সাধারণের পাঠ্যগ্রন্থে তাদের উল্লেখ না করলে চলে না। কিন্তু নামকরণে অসাবধানতা দেখা যাচ্ছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে লোহা তৈরি হচ্ছে, নূতন পরিকল্পনায় উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে। যে কাঁচা মাল বা খনিজ বস্তু থেকে লোহা তৈরি হয় তার বাঙলা নাম কি? রাশি রাশি এই বস্তু রেলগাড়িতে বোঝাই হয়ে লোহার কারখানায় যায়, কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজে জাপান রাশিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানি হয়। অতি প্রয়োজনীয় এই ভারতীয় সম্পদের একটা সর্বগ্রাহ্য নাম অবশ্যই চাই। ইংরেজী নাম iron ore, বৈজ্ঞানিক নাম hematite। যে অশিক্ষিত জন এই বস্তু পাহাড় কেটে বার করে বা খনি থেকে তোলে তারা বলে লোহা-পাথর। এই অতি সরল উত্তম নামটি কিন্তু বাঙলা কাগজে স্থান পায় না, লেখা হয়—লৌহপিণ্ড বা খনিজ লৌহ বা আকরিক লৌহ। তিনটে নামই ভুল। লৌহপিণ্ড মানে লোহার তাল, lump of iron। খনিজ বা আকরিক লৌহ বলতে বোঝায়, যে লৌহ খনি বা আকরে থাকে। কিন্তু খনি বা আকরে কুত্রাপি লৌহ থাকে না, থাকে একরকম পাথর যাতে লোহা যৌগিক অবস্থায় আছে। মাটিতে আখ হয়, আখে চিনি আছে, কিন্তু আখকে ভূমিজ শর্করা বলা চলে না। খনি আর আকর শব্দের মানে একই, কিন্তু পারিভাষিক প্রয়োগে mineralএর বাঙলা খনিজ, oreএর বাঙলা আকরিক। অতএব iron oreএর শুদ্ধ প্রতিশব্দ লৌহ-

আকরিক। কিন্তু লোহা-পাথর নাম আরও ভাল।

লোহার কথা আর একটু বলছি। লোহা-পাথর থেকে প্রথমে যে লোহা অশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশিত হয় তার মোটা মোটা বাটের নাম pig-iron। শূকর-দেহের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই বস্তু ভারতের বাইরে প্রচুর চালান যায়। Iron foundry বা লোহা ঢালাইখানায় এই লোহা গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে রেলিং, রাঁধবার কড়াই, বাটখারা ইত্যাদি নানা জিনিস তৈরি হয়। এই জাতীয় লোহার নাম cast-iron বা ঢালাই লোহা। সংস্কৃতে অনেক রকম লোহার নাম আছে, কিন্তু কোন্‌টিতে cast-iron বোঝায় তা স্থির করা যায় না। Pig-iron-এর বাঙলা নাম চাই। শূকর-লৌহ চলবে না, বাজার চলিত নাম পিগ-লোহা বাঙলা ভাষায় মেনে নেওয়া ভাল।

Atom bomb অর্থে অনেকে আণবিক বোমা লেখেন। এই অনুবাদ ভুল। Atomicএর বাঙলা পারমাণবিক। পরমাণু বোমা লিখলে ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী মহাশয় অনেকবার আলোচনা করেছেন।

যুদ্ধের সময় blackout অর্থে নিষ্প্রদীপ খুব শোনা যেত, এখনও বিজলীর অভাবে শহর অন্ধকার হলে বলা হয় নিষ্প্রদীপ। কিন্তু blackoutএর উদ্দিষ্ট অর্থ আলোকহীনতা। নিষ্প্রদীপ মানে আলোকহীন। ভারতচন্দ্র বহুকাল আগে শুদ্ধ নাম রচনা করে গেছেন—অপ্রদীপ, অর্থাৎ আলোকের অভাব। শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণ দুই রূপেই চলতে পারে। Blackoutএর প্রতিশব্দ রূপে অপ্রদীপই গ্রহণীয়।

সাত-আট বৎসর আগে civil supply অর্থে লেখা হত অসামরিক সরবরাহ। Civil শব্দের বাঙলা ছিল না, তাই নঞর্থক অসামরিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। যেন সামরিক প্রয়োজনই মুখ্য, জনসাধারণের প্রয়োজন নিতান্তই গৌণ। এই রকম মনোভাবের ফলে এককালে non-Mohamedan নামটির সৃষ্টি হয়েছিল। আজকাল সরকারী নাম জনসংভরণ চলছে, কিন্তু প্রথম প্রথম খুব আপত্তি শোনা গিয়েছিল।

Subcontinentএর বাঙলা উপমহাদেশ। ইংরেজী কাগজে অবিভক্ত সমগ্র ভারত সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকলে লেখা হয়—in this Subcontinent। এর উদ্দেশ্য বোধ হয় পাকিস্তানকে কোনও রকমে ক্ষুণ্ণ না করা। বাঙলায় 'এই উপমহাদেশে' যেমন শ্রুতিকটু তেমনি অনর্থক। বিষ্ণুপুরাণে

পরাশরের বচন আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যস্য সন্ততিঃ॥

এই বর্ণনা অনুসারে ভারতবর্ষ মানেই this Subcontinent, যেমন স্কান্ডিনেভিয়া মানে নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক আর আইসলান্ড। প্রাচীনকালে এই দেশে বহু স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল, ব্রিটিশ আমলেও ফ্রেঞ্চ পোর্তুগীজ অঞ্চল আর নেপাল ছিল, তথাপি সমগ্র দেশকে বলা হত India বা ভারতবর্ষ। পাকিস্তান হয়েছে বলেই ভারতবর্ষ নামের ভৌগোলিক অর্থ বদলাতে পারে না। আমাদের খণ্ডিত দেশকে শুধু ভারত বা ভারত রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

Chancellor ও Vice-chancellor অর্থে আচার্য ও উপাচার্য চলছে। এই দুই প্রতিশব্দ অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করি। উপাচার্যের মানে assistant professor। Vice-chancellorকে এই নাম দিলে তাঁর মর্যাদার হানি হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি।*

কথায় কথায় thanks, please, kindly ইত্যাদি বলা ইংরেজী শিষ্টাচার। আমরা তা মেনে নিয়েছি। একবার একটি মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় আমি নাম সহি করলে সে বলেছিল, ধন্যবাদ। আমি প্রশ্ন করলাম, কে ধন্য, তুমি না আমি? মেয়েটি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার পর উত্তর দিল— আমি, আমি। ধন্য শব্দের এক অর্থ কৃতার্থ, আর এক অর্থ খুব বাহাদুর, যেমন ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী। মেয়েটি প্রথম অর্থে নিজেকেই ধন্যবাদ দিয়েছিল, দ্বিতীয় অর্থে আমাকে দেয় নি। Thanksএর বাঙলা চাই, ঠিক সমার্থক না হলেও ধন্যবাদ মেনে নেওয়া যেতে পারে। Please, kindly স্থানে অনুগ্রহপূর্বক, দয়া করে ইত্যাদি বলা হয়। হিন্দীতে 'কৃপয়া' এই ছোট সংস্কৃত পদটি চলছে, বাঙলাতেও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ইংরেজীতে অনেক লোকের নাম একত্র লিখতে হলে আগে Messrs বসানো হয়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই Mister। হিন্দীতে তার নকল চলছে সর্বশ্রী, বাঙলাতেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সর্বশ্রী শুনলেই মানে আসে হাওড়াশ্রী ব্যাঁটরাশ্রী। লোকে যদি এতই শ্রীর কাঙাল হয় তবে উৎকট সর্বশ্রী না লিখে শ্রীর পর কোলন বা ড্যাশ দিয়ে সমস্ত নাম লেখা যেতে পারে।

'আচার্য উপাচার্য' দ্রষ্টব্য। —সঃ।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি আমাদের কিছু পক্ষপাত দেখা যায়। জীবনচরিত বা চরিত স্থানে জীবনী, জন্মবার্ষিক বা জন্মদিন স্থানে জন্মবার্ষিকী, পরিক্রম বা পরিক্রমণ স্থানে পরিক্রমা, শতাব্দ স্থানে শতাব্দী, প্রকাশ স্থানে প্রকাশনা ইত্যাদি চলছে। এতে আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু স্থানে অস্থানে কার্যকরী শব্দটির এত চলন হল কেন? শুধু খবরের কাগজে নয়, অনেক জনপ্রিয় লেখক আর অধ্যাপকের লেখাতেও দেখতে পাই—কার্যকরী উপায়, কার্যকরী সমাধান, প্রস্তাব কার্যকরী করা ইত্যাদি। কার্যকর বা কার্যকারী লিখতে বাধে কেন?

আর একটি অদ্ভুত ফ্যাশন সম্প্রতি দেখা দিয়েছে—ক্লীবলিঙ্গ প্রীতি। পত্রিকা বা পুস্তকের নাম রূপম্, সুন্দরম্, অবনীন্দ্রচরিতম্ ইত্যাদি রাখলে আপত্তি করা যায় না। বোধ হয় গৌরব বৃদ্ধির জন্যই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত নাম দেওয়া হয়। ভরতনাট্যম্ও এই রকম হতে পারে। অনেক দ্রাবিড়ী নামের শেষে ম্ আছে, যেমন—পায়সম্ রসম্ পপডম্ শ্রীরঙ্গম্ চিদম্বরম্। ভরতনাট্যম্ও হয়তো সেই রকম। সেদিন রাস্তায় একটি কবিরাজী দোকানে সাইন বোর্ড দেখেছি—শ্রীআয়ুর্বেদম্। সংস্কৃত ভাল করে না শিখলে কবিরাজ হওয়া যায় না। আয়ুর্বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ। দোকানের মালিক শেষে ম্ যোগ করে আয়ুর্বেদকে নপুংসক করলেন কেন? আর একটি শোচনীয় নাম মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। একজন লেখক তাঁর রচনার শেষে নাম লেখেন—ভারতপুত্রম্। এই ভারতসন্তান ক্লীবত্ব বরণ করলেন কোন্ দুঃখে?



শতাব্দ স্থানে সর্বদা অকারণ স্ত্রীলিঙ্গ শতাব্দী চলছে। কিন্তু একবিংশ 'শতাব্দী'র আরম্ভে পাশাপাশি লেখা হতে লাগল—'নতুন সহস্রাব্দ'। অব্দ—শত হলে স্ত্রী, আর 'সহস্র' হলে পুং (*লালিমা পাল*)—কোন্ যুক্তিতে লিঙ্গভেদ?—সঃ।

শিক্ষার আদর্শ

(১৮৮০/১৯৫৮)

আমার শোবার ঘরের পাশে একটা বকুল গাছ আছে, এক জোড়া বুলবুলি আর গোটাকতক শালিক চড়াই তাতে রাত্রিযাপন করে। চৈত্র মাসে নূতন পাতা গজাবার পর তারা প্রায় সকলেই বিতাড়িত হয়, দুটো কাগ এসে গাছে বাসা বাঁধে। নিশ্চয় একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী। কিছুদিন পরে দেখি, বাসার খড়কুটোর মধ্যে একটা কদাকার বাচ্চা প্রকাণ্ড হাঁ করছে, তার মা নিজের ঠোঁট দিয়ে সন্তানের লাল মুখের ভিতর খাবার পুরে দিচ্ছে। শিশু কাগ ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তার মুখের ব্যাদান আর রক্তিমা কমে আসে, সে নিজের ঠোঁট দিয়ে মায়ের মুখ থেকে খাবার তুলে নেয়। আরও কিছুদিন পরে দেখি, কিশোর কাগ বাসা ছেড়ে ডালের উপর বসেছে, তার মা তাকে ঠেলা দিচ্ছে, বাচ্চা ভয়ে কা কা করছে, পাখা নাড়ছে, আর দু পায়ের আঙুল দিয়ে ডাল আঁকড়ে আছে। তার পর তরুণ কাগ হঠাৎ শাখাচ্যুত হয়ে ঝটপট করছে, তার মা নিজের দেহ দিয়ে তাকে সামলাচ্ছে। একজন সাঁতারপটু লোক ছোট ছেলেকে যেমন করে সাঁতার শেখায়, কাগের মা তেমনি করে নিজের বাচ্চাকে উড়তে শেখাচ্ছে।

পাখির যা প্রাথমিক শিক্ষা, ওড়া আর আহার সংগ্রহ, তা সে নিজের মায়ের কাছ থেকেই পায়। বাকী যা কিছু সবই তার সহজ প্রবৃত্তি (instinct) আর অভিজ্ঞতার ফল। মাছ ব্যাঙ সাপ ইত্যাদি নিম্নতর প্রাণী পিতামাতার উপর আরও কম নির্ভর করে, তাদের জীবিকার্জনের সামর্থ্য জন্মগত।

আদিম মানুষ পিতা মাতা আর গোষ্ঠীবর্গের কাছ থেকে জীবনযাপনের উপযোগী সকলপ্রকার শিক্ষা পায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন বেড়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়েছে। আত্মীয়স্বজনের কাছে যা শেখা যায় তা এখন পর্যাপ্ত নয়, সমাজ আর রাষ্ট্রই নানাপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইতর প্রাণী আর আদিম মানুষ পিতামাতা ইত্যাদির কাছে যা শেখে তা যতই সামান্য হক, তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। আধুনিক সভ্য মানুষের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাও কি

পর্যাপ্ত? অন্য দেশ সম্বন্ধে আলোচনা না করে আমাদের দেশের কথাই বলছি।

প্রচলিত শিক্ষাকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) সামান্য শিক্ষা, যা সকলের পক্ষেই আবশ্যক এবং পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হয়। (২) বিশেষ শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়। (৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা, যার উদ্দেশ্য জীবিকার্জনের উপযোগী কোনও কর্মে জ্ঞান ও পটুতা লাভ।

(১) সামান্য শিক্ষা। — আমাদের দেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যেসব বিষয় নির্দিষ্ট আছে সেগুলিকেই সামান্য শিক্ষার অঙ্গ বলা যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী তালিমও সামান্য শিক্ষা, যদিও তার অঙ্গগুলি কিছু অন্যরকম। নিরক্ষর লোকেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কেউ কেউ কোটিপতি ধনী বা সাধু মহাত্মাও হতে পারে, তথাপি বিদ্যার প্রয়োজন চিরকালই স্বীকৃত হয়েছে। এককালে লেখাপড়া বললে বোঝাত ন্যূনতম বিদ্যা অর্থাৎ নামমাত্র লেখা আর পড়া, আর একটু অঙ্ক করা। ইংরেজীতে এরই নাম three R's—reading, 'riting and 'rithmetic। এই লেখাপড়া কখনই যথেষ্ট গণ্য হয় নি, শাস্ত্র (অর্থাৎ সুশৃঙ্খল কেতাবী বিদ্যা) না পড়লে মানুষ অন্ধবৎ হয়, একথা বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ গ্রন্থে বলেছেন—

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে অন্ধই।

এদেশে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত যেসব বিষয় পড়ানো হয় তার বার বার পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি এইগুলিকে প্রধান অঙ্গ বলা যেতে পারে। —মাতৃভাষা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ভারতের ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। এইসব বিদ্যার অল্পমাত্র জ্ঞানও যার নেই সে 'অন্ধ এব', অর্থাৎ তাকে অশিক্ষিত বলা যেতে পারে।

(২) বিশেষ শিক্ষা। — উল্লিখিত সামান্য শিক্ষায় সকলে তৃপ্ত হয় না, অনেকে কয়েকটি বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করতে চায়। এই বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নাও হতে পারে। অনেকে কেবল শখ বা জ্ঞানলাভের

জন্যই বিদ্যাবিশেষের চর্চা করেন। হাইকোর্টের জজ ব্যারিস্টার ইত্যাদির মধ্যে গণিত বিজ্ঞান আর সংস্কৃতে উচ্চ উপাধিধারী লোক বিরল নন। এঁরা যে বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তা বিচার সংক্রান্ত কাজের পক্ষে অনাবশ্যক।

এক শ্রেণীর বিদ্যাকে ইংরেজীতে বলা হয় humanities। এই সংজ্ঞাটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, লাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য এর একটি প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি আধুনিক বিদ্যাও এর অন্তর্গত, কিন্তু পরীক্ষা- ও প্রযুক্তি-মূলক বিজ্ঞান (experimental and applied science) নয়। কলেজের পাঠ্য বিষয়কে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, আর্টস্ ও সায়েন্স। সায়েন্সের প্রতিশব্দ আছে—বিজ্ঞান। খবরের কাগজে আর্টস্ স্থানে কলা দেখতে পাই, কিন্তু এই অনুবাদ অন্ধ নকল। আর্টস্ বললে যেসব কলেজী বিদ্যা বোঝায় তাদের কলা নাম দিলে উপহাস করা হয়। আর্টস্ আর হিউম্যানিটিজকে যুক্তভাবে সাহিত্যাদিবর্গ বলা যেতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং ইতিহাস জীবনচরিত দর্শন সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যাদির অন্তর্গত।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে বিজ্ঞানের চাইতে সাহিত্যাদিবর্গের ছাত্র বেশী দেখা যেত। তখন বিজ্ঞ লোকেরা বলতেন, সায়েন্স তো ছেলেখেলা, আসল বিদ্যা হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্য, তার পরে ফিলসফি। এখন রুচির পরিবর্তন হয়েছে, বিজ্ঞানের ছাত্রই আজকাল বেশী। এই পরিবর্তনের কারণ, সাহিত্যাদি শিখলে জীবিকার্জনের যত সম্ভাবনা, বিজ্ঞান শিখলে তার চাইতে বেশী। ভারত সরকার শিল্পবর্ধনের ব্যাপক পরিকল্পনা করেছেন, তার ফলে বিজ্ঞানীর চাকরি পাবার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। অর্থবিদ্যা (economics), বাণিজ্য (commerce) প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যাও আজকাল জনপ্রিয় হয়েছে, শিখলে জীবিকার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

(৩) বৃত্তিমুখী শিক্ষা। — এই শ্রেণীর শিক্ষা হাতেকলমে না শিখলে সম্পূর্ণ হয় না। আইন আর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বৃত্তিমুখী, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। ডাক্তারি শিক্ষার পদ্ধতিকেই প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিমুখী বলা চলে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রোগীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন, চিকিৎসা কার্যেও সাহায্য করেন, সেজন্য তাঁর বৃত্তির উপযোগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট পদের শিক্ষার্থীও ভবিষ্যৎ মক্কেল শ্রেণীর সম্পর্কে আসেন,

সেজন্য তাঁর শিক্ষাও যথার্থ বৃত্তিমুখী। আইন শিক্ষার্থীকে যদি বাদী-প্রতিবাদীর সম্পর্কে আনা হত এবং মকদ্দমা চালাবার কিছু ভার দেওয়া হত, এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীকে দিয়ে যদি নূতন ব্রিজ বাঁধ বা কারখানার প্ল্যান এস্টিমেট আর তদারকের কাজ কিছু কিছু করানো হত, তবেই তাঁদের শিক্ষা যথার্থ বৃত্তিমুখী হত।

মানুষের শৈশবে যার আরম্ভ হয় এবং জীবিকানির্বাহের উপযোগী কর্মে নিয়োগ পর্যন্ত যা চলে, যাতে যথাসম্ভব শরীর আর মনের উৎকর্ষ এবং অর্থোপার্জনের যোগ্যতা লাভ হয়, সেই সমগ্র শিক্ষাই পর্যাপ্ত শিক্ষা। এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য—সকল লোকেরই সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যা আর জীবিকার বিধান। শুনতে পাই সোভিএট রাষ্ট্রে সমস্ত প্রজার জন্য এই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে কর্ম নির্বাচনে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতটা গ্রাহ্য হয় জানি না। ভারতে এবং অন্যান্য সকল দেশে অল্পসংখ্যক প্রজাই সরকারী কাজ পায়, বাকী সকলকেই নিজের চেষ্টায় জীবিকার যোগাড় করতে হয়। আমাদের দেশে সকলে কাজ পায় না, সেজন্য বেকারের সংখ্যা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

বন্দে মাতরম্ স্তোত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে ধরণীং ভরণীং বলেছেন, অর্থাৎ বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানগণকে ধারণ করেন, ভরণও করেন। এখন নানা কারণে আমাদের মাতৃভূমির ধারণ ও ভরণের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। সকল প্রজার উপযুক্ত পর্যাপ্ত শিক্ষা আর জীবিকার সংস্থান শীঘ্র সম্ভাব্য না হলেও কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেটের লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত।

শিক্ষা যদি পর্যাপ্ত বা বৃত্তিমুখী নাও হয় তথাপি জীবিকার্জনের উপযোগী হতে পারে। যাঁরা কেবল সাহিত্যাদি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন তাঁরাও রাষ্ট্রের অতি উচ্চ পদ পেতে পারেন, সরকারী বিভাগের অধিকর্তা, রাজনীতিক, অধ্যাপক, লেখক, সম্পাদক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হতে পারেন। যাঁরা বিজ্ঞানাদি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করেন অথবা বৃত্তিমুখী শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের জীবিকার ক্ষেত্র অবশ্য আরও বিস্তৃত।

আমাদের শিক্ষালাভের তিনটি পর্যায় আছে— (১) পাঠশালা ও স্কুল, (২) কলেজ, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া, প্রায়োগিক (technical) ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার জন্য কতকগুলি পৃথক শিক্ষালয় আছে, যেমন মেডিক্যাল,

এঞ্জিনিয়ারিং ও ল কলেজ, চারু ও কারু শিল্প বা arts and craftsএর শিক্ষালয়, সংগীত শিক্ষালয় ইত্যাদি। এইপ্রকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত।

ইংরেজী ইউনিভার্সিটি শব্দের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ রচিত হয়েছে। এই বৃহৎ শব্দটির বদলে একটি ছোট নাম চালাতে পারলে সকলেরই সুবিধা হয়। বিদ্যামণ্ডল, বিদ্যাচক্র, বিদ্যাকুল, এইরকম কিছু চালানো যায় না কি?

নামের আদিতে বিশ্ব থাকলেও তার মানে এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণীয় বিষয় আর শিক্ষার্থীর বাহুল্য হলে সকল ক্ষেত্রে ফল ভাল হয় না। প্রাচীনকালের কুলপতি বিপ্রর্ষিরা তাঁদের আশ্রমে নাকি দশ সহস্র মুনিকে পালন করতেন আর শিক্ষা দিতেন। নালন্দা প্রভৃতি বিহারেও অসংখ্য বিদ্যার্থী থাকত। তিন-চার শ বৎসর আগেও বিদ্যার সংখ্যা কম ছিল, মেধাবী লোকে চেষ্টা করলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে পারত। কিন্তু এখন বিদ্যার (বিশেষত বিজ্ঞানের) শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, আজকাল সর্বজ্ঞ বা বহুজ্ঞের চাইতে বিশেষজ্ঞের আদর বেশী। ইংরেজীতে একটি পরিহাস আছে—বিশেষজ্ঞ তাঁকেই বলে যিনি অল্প বিষয় সম্বন্ধে বিস্তর জানেন। অতএব গণিতের পদ্ধতি অনুসারে বলা চলে—শূন্য বিষয় সম্বন্ধে যাঁর অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই চরম বিশেষজ্ঞ।

সেকালের অসংখ্য বিদ্যার্থী সমন্বিত ঋষিকুল বা বিহারের অনুরূপ ব্যবস্থা এখন অচল। যেখানে কয়েকটি বিদ্যার প্রকৃষ্ট চর্চার ব্যবস্থা আছে সেই বিদ্যামণ্ডলই প্রশস্ত। অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা প্রধান তাঁরা যদি প্রশাসন বা পরিচালন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে অধ্যাপনা উপেক্ষিত হবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য, উজ্জয়িনী জ্যোতিষের জন্য, মিথিলা জনক রাজার কালে অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য এবং পরবর্তীকালে ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান কালে আমাদের দেশেও বিভিন্ন বিদ্যামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয় একই ছাঁচে গড়ে উঠলে ফল ভাল হবে না।

বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। শুনতে পাই সেখানকার শিক্ষার ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে। এক দল নাকি বলেন, সেকেলে আশ্রমিক ব্যবস্থা চলবে না, এখন আধুনিক

পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি মেনে নিতে হবে। আর এক দল বলেন, গুরুদেবের যে আদর্শ ছিল, তিনি যে রীতি চালিয়ে গেছেন তা থেকে কিছুমাত্র স্খলন হলে বিশ্বভারতী পন্ড হবে।

প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ আর তাঁর প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করলে বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ব্যাহত হবে—এই ধারণার কারণ দেখি না। কলিকাতা প্রভৃতি অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, উচ্চ বিজ্ঞানাদি শেখাবার যে রকম ব্যবস্থা আছে. বিশ্বভারতীতে ঠিক সে রকম না হলে ক্ষতি কি? কবিগুরুর জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আর বিশ্বভারতীতে যা শিক্ষণীয় ছিল তা প্রধানত সাহিত্যাদি বিদ্যা—হিউম্যানিটিজ ও আর্টস্, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাসাদি, তা ছাড়া চিত্র সংগীত ইত্যাদি চারুকলা আর কয়েকটি কারুকলা। শিক্ষার সেই বৈশিষ্ট্য আর পরিধি বজায় রেখেই বিশ্বভারতীর অগ্রগতি ও বিবৃদ্ধি হতে পারে। পূর্বে যে সামান্য শিক্ষার কথা বলেছি (যা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য) তারই অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার সীমা যদি আই এস-সি শ্রেণী পর্যন্তই রাখা হয় এবং বহুবিধ বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন যদি নাও হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? যেসব ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান অথবা চিকিৎসা বাস্তুবিদ্যা যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রায়োগিক বা বৃত্তিমুখী বিদ্যা শিখতে চায় তারা কলকাতায় বা অন্যত্র শিক্ষালাভ করতে পারে। Liberal education বা উদার শিক্ষা বা polite learning বা ভব্য শিক্ষা বললে যা বোঝায় তাই বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কবিগুরুর যা একান্ত কাম্য ছিল—বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার আদান-প্রদান, বিশ্বভারতী যদি সেই মিলনের ক্ষেত্র হয় তা হলেও তার প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে।

গাছতলায় বা ফাঁকা জায়গায় বিনা চেয়ার টেবিলে পঠন-পাঠনের পদ্ধতি যথাসম্ভব বজায় রাখলে বিশ্বভারতীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ শিক্ষা চলতে পারে। বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে বিদ্বান কুশলী ও সন্তুষ্ট অধ্যাপকবর্গের প্রয়োজন অনেক বেশী। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সকল বিদ্যাস্থান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ❑

উত্তর-চলচ্চিন্তা

রাজশেখর বসুর নিজ সংকলিত তৃতীয় ও শেষ প্রবন্ধ সংগ্রহ চলচ্চিন্তা—'শিক্ষার আদর্শ' ইত্যন্ত দশটি রচনা নিয়ে—প্রথম প্রকাশ করেন মিত্র ও ঘোষএর পক্ষে শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে (১৮৮০ শক)। এর পর আরও আটটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও তা অগ্রন্থিত ছিল। ১৩৬৭তে রাজশেখরের মৃত্যুর পর এই আটটি ও আরও দুটি পূর্বতন অগ্রন্থিত প্রবন্ধ (সাহিত্য সংস্কার এবং তামাক ও বড় তামাক) যোগ করে চলচ্চিন্তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ভানুবাবু।

বর্তমান—এই *প্রায় সমগ্র* সংগ্রহে চলচ্চিন্তার আদি সংকলন রাখা হয়েছে। চলচ্চিন্তোত্তর আটটি প্রবন্ধ, ও পরে খুঁজে পাওয়া জীবনের শেষ রচনা 'রবীন্দ্রকাব্যবিচার' কালানুক্রমিক গ্রথিত হল এই উত্তরখণ্ডে।

পূর্বোক্ত অন্য দুটি, ও আরও যা রচনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার অন্তর্ভুক্তি পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়—বিবিধ রচনায়।

—স:।

বাংলা সাইক্লোপিডিয়া

(১৮৭৭/১৯৫৫)

অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি কয়েকজন ফরাসী পন্ডিত (Diderot, D'Alembert, Voltaire, Euler ইত্যাদি) Encyclopedie নাম দিয়ে একটি গ্রন্থমালা রচনা করেন। নামটি গ্রীক থেকে উদ্ভূত, মৌলিক অর্থ— বিদ্যাপরিবৃতি, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানের ভান্ডার। প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী মত প্রকাশের জন্য সম্পাদকগণ তখনকার রোমান ক্যাথলিক ধর্মনেতাদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন, রাজদন্ডও ভোগ করেছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরে ইংরেজী Encyclopedia Britannica সংকলিত হয় এবং এ পর্যন্ত তার অনেক সংস্করণ হয়েছে। এই প্রকান্ড বহুখন্ড বহুবার সংশোধিত গ্রন্থে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখা যে সকল বিবৃতি আছে তা প্রামাণিক বলে গণ্য হয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক আরব্ধ 'মহাকোষ' গ্রন্থের উদ্দেশ্য উক্ত দুই গ্রন্থের অনুরূপ। নানা বিদ্যার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতিসংবলিত কোষগ্রন্থের সম্পাদন একজনের সাধ্য নয়, বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন প্রামাণিক সংকলন অসম্ভব। নগেন্দ্রনাথ যা সমাপ্ত করেছেন এবং অমূল্যচরণ যার কয়েক খন্ড প্রকাশ করে গেছেন তা অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা যেমন মুখ্যত ব্রিটিশ জাতি, আর ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনে রচিত, নগেন্দ্রনাথ আর অমূল্যচরণের গ্রন্থ তেমনি বাঙালী আর বাংলা ভাষার প্রয়োজনে রচিত।

কয়েকটি বৃহৎ বাংলা শব্দকোষে ভূগোল, ইতিহাস, ও সাহিত্য-বিষয়ক তথ্য এবং জীবনচরিত আছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বহু বৎসর পূর্বে যে 'বাঙ্গলা শব্দকোষ' রচনা করেছিলেন তাতে এদেশের খনিজ, বনজ, কৃষিজ দ্রব্য, প্রাণী, নৌকাদি যান, শিল্পসাধিত্র যথা তাঁত ঢেঁকি ঘানি, মাছ-ধরা জাল, গৃহোপকরণ এবং তাস পাশা দাবা প্রভৃতি খেলার বিবরণও আছে। অন্য কোনও বাংলা শব্দকোষে এসব পাওয়া যায় না। যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থ

সংস্কৃতেতর বাংলা শব্দের অভিধান, সেজন্য তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রায় বর্জিত হয়েছে, তথাপি কয়েকটি সংস্কৃত নামযুক্ত বিষয়ের বিবৃতি আছে, যেমন সংগীতের তাল ও রাগ-রাগিণী। এই শব্দকোষ এখন পাওয়া যায় না। নব সংস্করণের জন্য তিনি গ্রন্থের আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, শুনেছি তৎসম শব্দ যোগ করে অভিধানও পূর্ণাঙ্গ করেছেন। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে এই বহু তথ্যপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের আয়োজন হচ্ছে।

বহুমূল্য কোষগ্রন্থ কেনা সকলের সাধ্য নয়, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন প্রকাণ্ড গ্রন্থ নাড়াচাড়া করাও অসুবিধাজনক। ইংরেজীতে বড় মাঝারি ছোট অনেক রকম সাইক্লোপিডিয়া আছে। ছোটগুলির দাম বেশী নয়। তাতে যে বিবৃতি থাকে তা খুব সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি কাজ চলে। বাংলায় এই রকম ছোট কোষ রচনার চেষ্টা কয়েকজন করেছেন, কিন্তু ইংরেজী গ্রন্থের সঙ্গে কোনওটির তুলনা হয় না।

একটি ছোট সুসংকলিত প্রামাণিক বাংলা সাইক্লোপিডিয়ার প্রয়োজন আছে। যদি হাজার-বার শ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ পনর-কুড়ি টাকার মধ্যে পাওয়া যায় তবে বোধ হয় ক্রেতার অভাব হবে না। ইংরেজীর নকলে এই ছোট গ্রন্থের নাম 'বিশ্বকোষ' বা ওই রকম কিছু দিলে অতিরঞ্জন হবে। 'বিষয়কোষ' নাম চলতে পারে। শব্দকোষ বা অভিধানের প্রধান উদ্দেশ্য—শব্দের রূপ অর্থ ও প্রয়োগবিধির নির্দেশ। বিষয়কোষের উদ্দেশ্য—বিষয় (subject) অর্থাৎ পদার্থ, জাতি (class), ব্যক্তি (individual), স্থান, ঘটনা প্রভৃতির বিবৃতি। শব্দকোষ যেমন ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সহায়, বিষয়কোষ সেইরূপ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন ও জ্ঞান লাভের সহায়।

যে কোষগ্রন্থের প্রস্তাব করছি তার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার গৌরব বর্ধন নয়, শুধুই উপস্থিত প্রয়োজন সাধন। সাধ্যের অতিরিক্ত সঙ্কল্প করলে কাজ অগ্রসর হবে না, হয়তো পণ্ড হবে। এমন একটি গ্রন্থ চাই যা থেকে ছাত্র শিক্ষক লেখক পাঠক সাংবাদিক রাজনীতিক ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই দেশীয় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর পান। যা ইংরেজী গ্রন্থে পাওয়া যায় তা দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না, তাতে সম্পাদনের শ্রম আর প্রকাশের খরচ অনর্থক বাড়ানো হবে। আমরা এখনও ইংরেজী ভাষার চর্চা করি। যখন ইংরেজী বর্জন করব, তখন বিষয়কোষের পরিধি বাড়ালেই চলবে, যাতে

বিদেশী গ্রন্থের দরকার না হয়। আপাতত পাশ্চাত্ত্য কোনও বিষয় জানতে হলে ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়াই দেখব। যা তাতে নেই, যা নিতান্ত এদেশের শুধু তার জন্যই বাংলা বিষয়কোষের প্রয়োজন।

শব্দকোষের মতন বিষয়কোষ বর্ণানুক্রমেই সংকলিত হওয়া আবশ্যক। বিষয়ের শ্রেণী ভাগ করলে (অর্থাৎ বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প জীবন-চরিত ইত্যাদি পৃথক পৃথক দিলে) সুবিধা হবে না। প্রস্তাবিত গ্রন্থে আল্পস্, লন্ডন, পিরামিড, তড়িৎতত্ত্ব, সাইক্লোট্রন, ব্যাকটিরিয়া, বাওবাব বৃক্ষ অনাবশ্যক, কিন্তু অবিভক্ত ভারতের নগর পর্বত নদী মন্দিরাদি, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, শাল সেগুন ধান যব গম আম কাঁঠাল কলা থাকবে। এদেশের চটকল, কাপড় কল, কাগজ, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, লোহা তামা এঞ্জিন টেলিফোন বন্দুক কামান বারুদ প্রভৃতির কারখানা, দামোদর পরিকল্পনা ইত্যাদির কথাও থাকবে। সীজার শেক্সপীয়র মার্কস স্তালিন চার্চিল, ফরাসী-বিপ্লব, ইউরোপীয় দর্শন সাহিত্য ও কলা বাদ যাবে; চন্দ্রগুপ্ত কালিদাস তুলসীদাস রবীন্দ্রনাথ বরাহমিহির গান্ধী, সিপাহী-বিদ্রোহ, ভারতীয় দর্শন সাহিত্যকলা দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাদ যাবেন, আলেকজান্ডার, হিউএন্ত্সাং, মহম্মদ ঘোরি, অলবেরুনি, ভিক্টোরিয়া থাকবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছিল। কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ থাকবেন, বিদেশী হলেও জরথুস্ত্র খ্রীষ্ট মহম্মদ সেন্ট টমাস থাকবেন, কারণ এঁদের সঙ্গে বহু ভারতবাসীর ধর্মীয় সম্বন্ধ আছে; কিন্তু আখেনাটেন, সেন্ট পল, মার্টিন লুথার বাদ যাবেন। কংগ্রেস, মোসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি ভারতীয় রাজনীতিক দল থাকবে, কিন্তু নাৎসী বলশেভিক কুমেনটাং প্রভৃতি বাদ যাবে।

কিউবা কোথায়? প্লেটোর প্রধান রচনাবলী কি কি? ক্যাসানোভা কে? আইফেল টাওয়ার কি? ইভোলিউশন থিওরি কি? জেসুইট কোয়েকার মরমন কারা? এই সব প্রশ্নের জন্য আমরা ইংরেজী সাইক্লোপিডিয়া দেখব। বাংলা বিষয়কোষে দেখব—মান্ডি রাজ্য কোথায়? ভাস কবির প্রধান রচনা কি কি? পরাগল খাঁ কে? যন্ত্রমন্ত্র কি? নব্য ন্যায় কি রকম? মিতাক্ষরা আর দায়ভাগের প্রভেদ কি? নাথপন্থী কর্তাভজা ওআহাবী কারা?

এই রকম একটি বিষয়কোষ রচনা করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ

লোকের সমবেত চেষ্টা চাই। তাঁরা এক বা একাধিক সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে লিখবেন অথবা তথ্য যোগান দেবেন। বাংলা দেশে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের তুল্য অশেষজ্ঞ পন্ডিত দ্বিতীয় নেই। বয়স ছিয়ানব্বই হলেও তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে, এখনও তিনি লেখেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সম্পাদনের ভার তাঁকে দিতে বলছি না, লেখার জন্য কিছুমাত্র পীড়ন করতেও বলছি না। বিষয়কোষ যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের কর্তব্য হবে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ রাখা, তাঁর উপদেশ নেওয়া, এবং তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। নানা বিদ্যায় তাঁর অধিকার আছে, ভারতীয় জ্যোতিষ উদ্‌ভিদ প্রাণী এবং চিরাগত শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান, এবং অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে যা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত বিজ্ঞানীরা জানেন না। এদেশের লোকাচার এবং ব্রত-পূজাদি সম্বন্ধেও তিনি অনেক জানেন। তিনি বর্তমান থাকতে তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে যদি তথ্য আহরণ না করি, তবে আমরা বঞ্চিত হব।*

এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের উদ্যোগ কে করবেন? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ জড়ত্ব লাভ করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিত্য কর্ম আর শিক্ষার সংস্কার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, নূতন কিছুতে হাত দেবেন মনে হয় না। উত্তর ও মধ্য প্রদেশের সরকার নিজ ভাষার উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করছেন, শুনেছি একটি ছোট হিন্দী সাইক্লোপিডিয়া রচনারও আয়োজন হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রপুরস্কার ছাড়া বাংলা ভাষার জন্য কিছু খরচ করেন কি না জানি না। নানা পরিকল্পনা আর বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য তাঁরা অজস্র টাকা যোগাতে পারেন। যাতে এদেশের শিক্ষার সাহায্য হয়, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলাভ হয়, এমন একটি উদ্দেশ্যের জন্য তাঁরা কি কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে পারেন না? রাধাকান্ত দেব, মহাতাব চাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের তুল্য কোনও বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তি বা ধনী বাঙালী ব্যবসায়ী যদি সাহস করে গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেন, তবে তাঁদের ক্ষতি না হয়ে লাভেরই সম্ভাবনা।

গ্রন্থ রচনার জন্য এমন একদল লোকের প্রয়োজন হবে যাঁরা ভূগোল

* এই প্রবন্ধ লেখার সময় যোগেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

ধর্মের আদর্শ, সেই ধর্মের যারা অনুগামী, যারা যুদ্ধ, সাম্রাজ্যদখল, জোচ্চুরি, জালিয়াতি সবই করে—তাদের হাতে কতটা রক্ষিত হয় তাই নিয়ে তাঁর প্রশ্ন। এখানেও প্রচারণ ও আচরণের সেই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর অবলম্বন। "প্রার্থনা"-র মূল কথাও তাই—ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কীভাবে ধর্মকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, তারই বিবরণ। এর উপসংহার বাক্যটি যেন ঋষিবাক্যের মতো শোনায়—"হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে, জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টি তা তোমাতে সঞ্চারিত হোক।" এ প্রার্থনা সম্বুদ্ধ মানুষের, রাজশেখর সেই বিরল প্রজাতির সদস্য। "তিমি" প্রবন্ধটিতেও ওই একই উদ্‌বেগ—তিমি বৃহৎ শক্তির প্রতীক, তিমিংগিল আরও বৃহৎ শক্তির প্রতীক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিবেশে লেখা এ প্রবন্ধে রাজশেখর বৃহৎ ও অতিবৃহৎ শক্তিগুলির সমস্ত আশ্বাস ও আদর্শের ঘোষণায় একটি সংগত অবিশ্বাস পোষণ করছেন, বলেছেন "সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল একসঙ্গে জড়িত —এই উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধির প্রসাব না ঘটলে সমস্ত ব্যবস্থাই পন্ড হবে।"

এই "উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধি"র পিছনে আছে যেমন প্রখর যুক্তি, তেমনই বিশ্বাস, ঘটনা ও আবেগের স্রোত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও মতাদর্শের সংকীর্ণতায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একটি কল্যাণকর বিশ্বানুভব নির্মাণের চেষ্টা। রাজশেখর জানেন সমস্যা কত জটিল, গড্ডলিকার বিরুদ্ধে যাওয়া কত কঠিন। ফলে তাঁর আশা তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচারবোধের দ্বারা শাসিত ও দমিত। তবু অনাসক্তির মধ্যেও, প্রায় সোক্রাতেসীয় গোত্রের প্রশ্নসংকুলতার (সোক্রাতেসের ছদ্মযুক্তির ফাঁদে ফেলার চেষ্টা রাজশেখরে নেই) মধ্যেও মানবজীবন ও সমাজের ভবিষ্যতের জন্য তাঁর প্রচ্ছন্ন উদ্‌বেগটি আভাসিত হয়। "ভেজাল ও নকল"-এও সামাজিক মানুষের নীতিবোধের সেই ক্ষীয়মাণ তাৎপর্যের বিষয়ে তাঁর উদ্‌বেগ, যার নাম চারিত্রশক্তি। সমাজে প্রতারণা, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রিক প্রতারণাতে আমরা কত সহজে অভ্যস্ত হয়ে যাই, "সত্যমেব জয়তে" কথাটা কত বিচিত্রভাবে আমাদের হাতে লাঞ্ছিত তা তিনি লক্ষ করেন, আমাদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ চেষ্টায় ক্রোধ নেই, হতাশা নেই, অভিশাপ নেই, প্রভুত্বধর্মী হুকুম নেই। এমনকি "সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়"—এই ভাববাচ্যীয় নিষেধে যে প্রত্যক্ষতাও অনুপস্থিত—তা থেকে রাজশেখরের মনোভঙ্গিটি বুঝতে পারি আমরা। "বিলাতী খ্রিষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু"-র মধ্যেও তুলনার সূত্রে দু সমাজের বিশ্বাস ও আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেন, এবং সমাজের শক্তির মূলে যে চারিত্রশক্তি তার কথা বার বার বলেন। "অশ্রেণিক সমাজ" তাঁরও কাম্য, কিন্তু তার নির্মাণ যে কত কঠিন সে সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা আছে, তাই আলোচনা ও প্রশ্নের গন্ডি তিনি পেরোন না, সমাধান দেন না। "সমদৃষ্টি"-র মধ্যেও সেই স্বার্থহীন নৈতিকতার কথা আসে, যে-নৈতিকতা সামাজিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি। তিনি গুরুর আসন নিতে আদৌ আগ্রহী নন, বন্ধুর মতো সৎপরামর্শ নিয়ে হাজির থাকেন মাত্র। সমাজের কাছ থেকে খুব একটা প্রত্যাশা তাঁর নেই, কিন্তু তাঁর নিজের দায়, ওই সুপরামর্শ নিয়ে প্রস্তুত থাকার দায়

অশ্লীল ও অনিষ্টকর

(১৮৮০/১৯৫৮)

আমরা সিনেমার কবলে পড়েছি। শহরের দেওয়াল অভিনেত্রীদের ছবিতে ছেয়ে গেছে, সমস্ত খবরের কাগজে সিনেমার বড় বড় বিজ্ঞাপন আর বিবরণ ছাপা হচ্ছে। মোটা মোটা মাসিক পত্রিকায় বিখ্যাত লেখকদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা-সুন্দরীদের ছবি গিজগিজ করছে। পূজার মণ্ডপে হিন্দী ফিল্‌ম-সংগীত নিনাদিত হচ্ছে। তারকাদের লীলাভূমি বোম্বাই এখন সিনেমাক্রান্ত ছেলেমেয়ের মক্কা-বারাণসী।

সম্প্রতি আমাদের হুঁশ হয়েছে—সিনেমা শুধু চিত্ত-বিনোদন করে না, অনেক ক্ষেত্রে চিত্তবিক্ষোভও করে। আপত্তিজনক ছবি আর বিজ্ঞাপন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পুলিসের কর্তারা নাকি বলেছেন তাঁদের হাত-পা বাঁধা, সেনসর বোর্ড যা পাস করেন তার উপর কথা চলে না। শুধু এদেশে নয়, বিলাতেও অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। গত নভেম্বরের World Digest পত্রিকায় Sidney Moseleyর একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—

By film, by television, by picture in the Press, we stir sexual emotions which are already astir in the normal human being. Do you wonder then, that some men, unable to resist the effect of the glamorous presentations of sex which are continually thrust before them, go berserk and that all sorts of tragedies result? When you tempt men with drink or doxies the result is inevitable.

এর চাইতে কড়া সমালোচনা বোধ হয় এদেশে কেউ করেন নি। পাশ্চাত্ত্য দেশে কি রকম ছবি দেখানো হয় বা বিজ্ঞাপিত হয় তা ঠিক জানি না, তবে তার যেসব পোস্টার এখানে দেখা যায়, তা থেকে অনুমান করতে পারি যে ভারতীয় ছবির তুলনায় তা ঢের বেশী ‘প্রগতিশীল’। এদেশের লোকমত এখনও পাশ্চাত্ত্যের মতন উদার আর নির্লজ্জ হয় নি। আমাদের আদর্শ কি

হওয়া উচিত তাও স্থির করা সহজ নয়, কারণ অশ্লীলতার কোনও বহুসম্মত মানদণ্ড নেই। লোকমত কালে কালে বদলায়, দেশে দেশেও বিভিন্ন। স্ত্রী পুরুষ অল্পবয়স্ক আর পূর্ণবয়স্কের পক্ষে কি অবদ্য বা অনবদ্য তারও বিচার এক পদ্ধতিতে করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু অশ্লীলতা আছে। তার দোষ ক্ষালনের জন্য Horace Heyman Wilson বহুকাল পূর্বে লিখেছেন—

These men wrote for men only; they never think of a woman as a reader. What is natural, cannot be vicious; what everyöne knows, surely everyone may express; and that mind which is only safe in ignorance or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble and impotent security.

অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা নারীর পক্ষে অশোভন, তা পুরুষের পক্ষে বিহিত হতে পারে। যা স্বাভাবিক, তা মন্দ হতে পারে না। যা সকলেই জানে, তা সকলেই প্রকাশ করতে পারে। যে মনকে অজ্ঞতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, সে মন অত্যন্ত দুর্বল, তার আত্মরক্ষার শক্তি নেই।

ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দ উপাদেয় গ্রন্থ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেক মনীষী তার বিলাস বর্ণনায় কুরুচি পেয়েছেন। ভারতচন্দ্রের রচনায় এবং প্রাচীন বাঙলা কাব্যে যে আদিরস আছে, তা আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টিতে অশ্লীল, কিন্তু সেকালে কেউ তার দোষ ধরত না। পাঁচালি তরজা কবির লড়াই প্রভৃতির অশ্লীলতা ইতর ভদ্র সকলে উপভোগ করত। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য লেখকদের অনেকে নিরঙ্কুশ ছিলেন। শেক্সপীয়রের Venus and Adonisএর তুলনায় কালিদাস জয়দেব ভারতচন্দ্র প্রভৃতির আদিরসাত্মক রচনা যেন শিশুপাঠ্য। Don Quixote গ্রন্থে একটি সরাইএর বর্ণনায় যে কুৎসিত বীভৎসতা আছে তা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বিলাতে ভিক্টোরীয় যুগের ভদ্রশ্রেণী কিছু prude বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন, সাহিত্যে আর প্রকাশ্য সামাজিক আচরণে তার প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজের শিষ্য বাঙালী লেখকেরা সেই ভিক্টোরীয় শুচিতা আদর্শরূপে মেনে নিয়েছিলেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য থেকে লজ্জা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, বাঙলা সাহিত্যও কিছু অসংবৃত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে। খ্যাতনামা জনপ্রিয় ইংরেজ লেখকদের রচিত লোকসাহিত্যে এমন বর্ণনা দেখা

যায়, যা আধুনিক বাঙলা গ্রন্থে থাকলে লেখক আর প্রকাশককে আদালতে দণ্ড পেতে হবে।

উপরে উইলসনের যে অভিমত দিয়েছি তা যুক্তিসম্মত হলেও সকল সমাজে গ্রহণীয় হবার সম্ভাবনা নেই। অশ্লীলতার মোটামুটি লক্ষণ—যা কামের উদ্দীপক অথবা উদ্দীপক না হলেও যা প্রচলিত রুচিতে কুৎসিত বা অশালীন গণ্য হয়। সামাজিক প্রথার সঙ্গে শালীনতার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। ভিক্টোরীয় যুগে ভদ্র নারীর decollete সজ্জা (অর্ধমুক্ত বক্ষ) ফ্যাশনসম্মত ছিল (এখনও আছে) কিন্তু অনাবৃত ankle বা পায়ের গোছ, অশ্লীল গণ্য হত এবং পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এখন ankle প্রদর্শন রুচিসম্মত হয়েছে, পুরুষের লোভও প্রায় লোপ পেয়েছে। আমাদের দেশে নারীচরণের নিম্নভাগ কোনও কালেই কামোদ্দীপক গণ্য হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় কবিরা পুরুষের দেহসৌষ্ঠব বর্ণনায় যেমন ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ লিখেছেন তেমনি সুন্দরীর রূপ বর্ণনায় পীনপয়োধরা ক্ষীণমধ্যা নিবিড়নিতম্বা করভোরু প্রভৃতি বিশেষণ দিয়েছেন। দেবীস্তোত্রেও এই সব লক্ষণ বর্জিত হয় নি। What is natural cannot be vicious—Wilsonএর সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন কবিরা বিলক্ষণ মানতেন। কিন্তু কালক্রমে এদেশে রুচির পরিবর্তন হয়েছে, নারীর রূপবর্ণনা এখন প্রাচীন রীতিতে করলে চলে না, একটু রেখে ঢেকে সংবৃতভাবে করতে হয়।

অনাত্মীয় পুরুষকে ভদ্র নারীর মুখ দেখানো নিরাপদ নয়, অর্থাৎ তা অশ্লীল—এই ধারণা থেকে ঘোমটা বোরখা অবরোধ অসূর্যম্পশ্যতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল লাভ হয় নি। লোকে বহুকাল থেকে যা অনাবৃত দেখে তার সম্বন্ধে দুষ্ট বা morbid কৌতূহল হয় না, যা আবৃত তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। ৬০।৭০ বৎসর আগে অতি অল্প বাঙালী মেয়ে স্কুল-কলেজে যেত। তাদের সম্বন্ধে অল্পবয়স্ক পুরুষদের দুষ্ট কৌতূহল ছিল। কিশোরী আর যুবতী নূতন ধরনে শাড়ি পরে জুতো পায়ে দিয়ে হাতে বই নিয়ে খুটখুট করে চলেছে—এই অভিনব দৃশ্যে অনেকের চিত্তবিকার হত, সেজন্য মেয়েদের পায়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ গণ্য হত না। এখনকার পুরুষেরা পথচারিণীদের সহজভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সর্বকালে সর্বদেশেই আছে, তাই মাঝে মাঝে মেয়েদের অপমান সইতে হয়। শিস, অশ্লীল গান বা ঠাট্টা, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি ধর্ষণেরই অনুকল্প।

অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় শিষ্ট রুচির বিরোধী বা কুৎসিত গণ্য হতে পারে। ভাতার শব্দ ভর্তার অপভ্রংশ মাত্র, অর্থে গৌরব আছে, কামগন্ধ নেই। তথাপি শিষ্টজনের রুচিতে অশ্লীল। এই রকম অনেক শব্দ আছে, যার সংস্কৃত রূপ বা ডাক্তারী নাম শিষ্ট কিন্তু বাঙলা গ্রাম্য রূপ অশ্লীল গণ্য হয়। অনেক সময় অল্পবয়স্করা (এবং অনেক বৃদ্ধও) নিজেদের মধ্যে অশ্লীল আলাপ করে। বোধ হয় তাতে তারা নিষেধ লঙ্ঘনের আনন্দ পায়। যারা এরকম করে, তাদের দুশ্চরিত্র মনে করার কারণ নেই। মাতা ভগিনী কন্যা সম্পর্কিত কুৎসিত গালি যাদের মধ্যে চলিত আছে তারা অসভ্য হলেও দুর্বৃত্ত না হতে পারে। অশ্লীল বিষয়ের প্রভাবও সকলের উপর সমান নয়। এমন লোক আছে যারা সুন্দরী নারীর চিত্র বা প্রতিমূর্তি দেখলেই বিকারগ্রস্ত হয়। আবার এমন লোকও আছে যারা অত্যন্ত অশ্লীল দৃশ্য দেখে বা বর্ণনা শুনেও নির্বিকার থাকে।

সামাজিক সংস্কার অনুসারে অতি সামান্য ইতরবিশেষে শ্লীল বিষয়ও অশ্লীল হয়ে পড়ে। কোথায় পড়েছি মনে নেই—এক পাশ্চাত্ত্য চিত্রকর একটি নগ্ন স্ত্রীমূর্তির sketch এঁকে তাঁর বন্ধুকে দেখান। বন্ধু বললেন, অতি অশ্লীল। চিত্রকর বললেন, তুমি কিছুই বোঝ না, অশ্লীল কাকে বলে এই দেখ। এই বলে চিত্রকর মূর্তির পায়ে জুতো এঁকে দিলেন। বন্ধু তখন স্বীকার করলেন, চিত্রটি আগে নির্দোষ ছিল, এখন বাস্তবিকই অশ্লীল হয়েছে।

অনিষ্টকর না হলেও অনেক বিষয় কেন কুৎসিত গণ্য হয় তার ব্যাখ্যান নৃবিজ্ঞানী (anthropologist) আর মনোবিজ্ঞানীরা করবেন। আমাদের শুধু মেনে নিতে হবে যে নানারকম taboo সব সমাজেই আছে এবং তা লঙ্ঘন করা কঠিন, যদিও কালক্রমে তার রূপান্তর হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের অভিনয় আর নাচের প্রবর্তন করেন তখন তাঁকে বিস্তর গঞ্জনা সইতে হয়েছিল। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচি আর শালীনতার ধারণাও বদলায়। ২৫।৩০ বৎসর আগে কেউ ভাবতেও পারত না যে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী কুলললনা বক্ষ আর পৃষ্ঠ অর্ধমুক্ত আর কক্ষ প্রকটিত করে পরপুরুষের বাহুলগ্না হয়ে বল নাচে মেতেছে। ভদ্র পুরুষের নটবৃত্তিতে আমরা বহুকাল থেকে অভ্যস্ত। কিন্তু ভদ্র নারী সিনেমায় নেমে বহুজনপ্রিয়া রূপবিলাসিনী হবে এবং প্রচুর প্রতিপত্তি পাবে—এও ২৫/৩০ বৎসর আগে কল্পনাতীত ছিল। অচির ভবিষ্যতে বাঙালীর হোটেলে বা

রেস্তোরাঁতে হয়তো Cabaretএর ব্যবস্থা হবে এবং তাতে মেয়েরা নাচবে।

প্রায় দু শ বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পর যেন পরিবর্তনের প্লাবন এসেছে, দেশের লোক অত্যন্ত আগ্রহে বিলাতী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করছে। ভবিষ্যৎ বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্ত্য সমাজের নকলেই গড়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের প্রগতিতে অর্থাৎ সাহেবীভবনে যে বিলম্ব হচ্ছে, তার প্রধান কারণ দারিদ্র, প্রাচীন সংস্কার নয়। যাঁরা ধনী তাঁদের অনেকে বহুদিন পূর্বেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজ স্থাপন করেছেন। জাপানে যা হয়েছে ভারতেও তা না হবে কেন? পাশ্চাত্ত্য বীর্য উদ্যম কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ না পেলেও ক্ষতি নেই, পাশ্চাত্ত্য রীতি নীতি ফ্যাশন ব্যসন যথাসাধ্য আত্মসাৎ করতেই হবে, তাই আমাদের পরম পুরুষার্থ।

মহা বাধা আমাদের দারিদ্র। টাকার জোরে এবং শখের প্রাবল্যে অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান শীঘ্রই পূর্ণমাত্রায় সাহেব হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু মধ্যবিত্ত আর অল্পবিত্ত সকলকেই লোভের মাত্রা কমিয়ে নিজের সামর্থ্যের উপযোগী আধা বা সিকি-সাহেবী সমাজে তুষ্ট হতে হবে। আমাদের রুচি আর শালীনতাও এই মধ্যাল্পবিত্ত সমাজের বশে নিরূপিত হবে।

এদেশের যাঁরা নিয়ন্তা, অর্থাৎ বিধানসভা ইত্যাদির সদস্য, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্ত। অশ্লীলতা দমন এঁদেরই হাতে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণমাত্রায় পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নয়, ইওরোপ আমেরিকার রুচি এঁরা অন্ধভাবে মেনে নিতে পারবেন না। অতএব আশা করা যেতে পারে, অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর রুচি অনুসারেই এঁরা শ্লীলতা বা অশ্লীলতা, নিরাপত্তা বা অনিষ্টকারিতা বিচার করবেন এবং তদনুসারে সিনেমার ছবি আর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত করবেন।

কোনও সাহিত্যিকের রচনা ভাল কি মন্দ তার বিচার সমালোচকরা ধীরে-সুস্থে করেন। তাঁদের মানদণ্ড অনির্দেশ্য, সকলে তা প্রয়োগ করতে পারে না। যদি বিদগ্ধতার খ্যাতি থাকে তবে পাঠক-সাধারণ তাঁদের অভিমতই মেনে নেয়। মত প্রকাশে দেরি হলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু সিনেমা-ছবির নির্বাচন অবিলম্বে করতে হয়, সেনসর-বোর্ড বেশী সময় নিতে পারেন না। তাঁরা কিরকম মানদণ্ড অনুসারে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার করবেন?

সেনসর-বোর্ডের সদস্যদের রুচি যদি মোটামুটি একরকম হয় তবে বিচার

কঠিন হবে মনে করি না। তাঁদের অতিমাত্রায় উদার না হওয়াই উচিত। যদি তাঁরা মনে করেন, কোনও ছবি দেখে এক শ দর্শকের মধ্যে দশজনের চিত্তবিকার হতে পারে তবে সে ছবি মঞ্জুর করবেন না। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে psychosomatic effect বলেন, অর্থাৎ মানসিক উত্তেজনার ফলে দৈহিক বিকার (পূর্বে উদ্ধৃত Sydney Moseleyর উক্তিতে তারই ইঙ্গিত আছে)—তার সম্ভাবনা থাকলে সে ছবি অবশ্যই বর্জন করবেন। বিদেশে সে ছবি দেখানো হয় কিনা, ভারতের অন্য প্রদেশের সেনসর-বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা—তা ভাববার দরকার নেই। যা তাঁদের নিজের বিচারে অবাঞ্ছিত, এখানকার সেনসর-বোর্ড তা অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, পরিবারের সকলে যে ছবি একসঙ্গে দেখতে পারে শুধু সেই ছবিই মঞ্জুর করা উচিত, প্রাপ্তবয়স্ক আর অল্পবয়স্কর জন্য ভেদ রাখা অন্যায়। এই প্রস্তাব অতি সমীচীন। কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য—এই কথা বিজ্ঞাপনে লিখলেই অল্পবয়স্কদের লোভ বাড়ানো হয়।

আর্টের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে কিঞ্চিৎ কামকলার প্রয়োজন থাকতে পারে। সিনেমা আর সাহিত্যে তার প্রয়োগ যদি সংযত করা হয় তবে আর্ট আর সংস্কৃতি চর্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।



এই প্রবন্ধের সাত বৎসর আগে (১৯৫১) একই কথা লিখেছেন পরশুরাম—'রামধনের বৈরাগ্য' গল্পে। তাতে বোধহয় আধুনিক অশ্লীল বাঙলা সাহিত্যের ইন্ধন ছিল! —স:।

পরিপূর্ণ সাহিত্য

(১৮৮১/১৯৫৯)

রোজগার বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে চাকরি। ওকালতি ডাক্তারি ঠিকাদারি দালালি ব্যবসা ইত্যাদি রোজগার হলেও অগ্রগণ্য নয়, সাধারণ ভদ্রসন্তানের দৃষ্টিতে চাকরিই সর্বোত্তম জীবিকা। সেই রকম, সাহিত্য বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে প্রধানত গল্প-উপন্যাস, তার পর কবিতা, তার পর লঘু প্রবন্ধ বা রম্যরচনা। ইংরেজীতে literature অর্থে অনেক রকম রচনা বোঝায়, কিন্তু বাঙলায় সাহিত্য শব্দ অতি সংকীর্ণ অর্থে চলে। অমুক একজন সাহিত্যিক এ কথার মানে, লোকটি গল্প উপন্যাস বা কবিতা লেখেন, অথবা তার সমালোচনা করেন।

অনেকে বলেন, বাঙলা কথাসাহিত্য এখন ইংরেজীর সমকক্ষ এবং বাঙলা ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু সেজন্য আমাদের বেশী আত্মপ্রসাদের কারণ নেই। শুধু গল্প উপন্যাস নয়, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অবস্থা কি রকম তা ভাবা দরকার।

স্কুল-কলেজের টেক্সটবুক, শিশুপাঠ্য গল্প-কবিতা, ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি কর্ম সংক্রান্ত পুস্তক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানারকম বিধিগ্রন্থ—এই সব ছাড়া যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাই বয়স্থ জনসাধারণ অবসরকালে পড়ে। তা থেকেই আধুনিক বাঙালী লেখক আর পাঠকের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত রচনা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে—উদ্ভাবী (বা কাল্পনিক) আর ভাবাত্মক অর্থাৎ creative আর emotional রচনা। গল্প উপন্যাস কবিতা ভক্তিগ্রন্থ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই সবেরই পাঠক বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব-বিষয়ক অর্থাৎ informative আর factual রচনা। এই শ্রেণীর উদাহরণ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর, বিশ্বপরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা, বিচিত্র জগৎ', চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিশ্বের উপাদান', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি',

সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস।' প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অনেক কম, পাঠকও কম। এসব বইএর বারো মাসে তেরো সংস্করণ হবার কোন আশা নেই।

ইংরেজী প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা আছে, যেমন, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, দেশ-ভ্রমণ, সার-সংকলন বা digest, খেলা, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি, বাঙলা পত্রিকার বৈচিত্র্য বেশী নেই, সাধারণ মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকায় সব রকম জনপ্রিয় রচনা ছাপা হয়। এইসব পত্রিকায় নানারকম বইএর যে বিজ্ঞাপন থাকে তা থেকেই বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। আমার অনুরোধে Statisticsএর একটি ছাত্র * অনেকগুলি বিজ্ঞাপন থেকে একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান খাড়া করেছেন। তাঁর হিসাব অনুসারে বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন শ্রেণীর বইএর শতকরা হার এই রকম ঃ—

গল্প উপন্যাস এবং তার আলোচনা	৭৫
কবিতা নাটক এবং তার আলোচনা	৫
ভক্তিগ্রন্থ	৬
চরিতকথা, স্মৃতিকথা	৪
ভ্রমণকথা, স্থান-বিবরণ	২
ইতিহাস	২
রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব	২
অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য শিল্প	১এর কম
দার্শনিক বিষয়	১
বৈজ্ঞানিক বিষয়	১এর কম
ফলিত জ্যোতিষ, অলৌকিক বিষয়	১
অন্যান্য বিবিধ বিষয়	১

এই ফর্দ থেকে বোঝা যায় যে বাঙলা সাহিত্যের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক এবং ভাবাত্মক রচনা। ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসাদির সংখ্যা বেশী, কিন্তু জ্ঞানাত্মক গ্রন্থের অনুপাত এদেশের মতন অত্যল্প নয়।

* আমি। —সঃ।

সংস্কৃত শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে, তার কতকগুলি ইংরেজী art সংজ্ঞার অন্তর্গত। যেমন গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য আলেখ্য তক্ষণ। ইংরেজীতে গল্প আর কাব্য-রচয়িতাও আর্টিস্টরূপে গণ্য হন, বাঙলাতেও তাঁদের কলাবিৎ বলা চলে। যাঁরা ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, গীত-বাদ্য-নৃত্য বা অভিনয় করেন তাঁরা যেমন আর্টিস্ট, গল্প-উপন্যাস আর কবিতার লেখকও তেমনি আর্টিস্ট বা কলাবিৎ। এঁদের সকলেরই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন। যাতে বিনোদনের সঙ্গে মনের উৎকর্ষ আর অনুভূতির প্রসার হয় সেই রচনা অবশ্যই প্রকৃষ্ট। সকল দেশেই সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ আর্ট বা কলাচর্চা।

সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে কথাসাহিত্য কাব্য সংগীত নাট্য চিত্রকলা প্রভৃতি অপরিহার্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কলাচর্চাই সংস্কৃতির সবটা নয়। উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক, এবং ভাবাত্মক, creative আর emotional সাহিত্যে সব প্রয়োজন মেটে না, জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব বিষয়ক সাহিত্যও অপরিহার্য। এই জাতীয় সাহিত্য বাঙলায় যথেষ্ট নেই।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, জ্ঞানাত্মক বাস্তব বিষয়ের চর্চা তো স্কুল-কলেজেই চুকে গেছে, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ বয়সেও যদি তার জের টানতে হয় তবে জীবন দুর্বহ হবে। এ রকম মনোভাব ঠিক নয়। শিক্ষার শেষ নেই, আজীবন তা চলে। ঠেকে শেখা শুনে শেখা আর দেখে শেখার সুযোগ সকল ক্ষেত্রে মেলে না, তাই যত কাল সামর্থ্য তত কালই পড়ে শিখতে হয়। মানুষের যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা পুরাকাল থেকে সংগৃহীত হয়ে আসছে তা শুধু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সংরক্ষিত গুহ্য বিদ্যা নয়, জনসাধারণের সাহিত্যেও যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ভাষায় তাকে স্থান দিতে হবে।

টেক্সটবুক প্রায় নীরস রচনা, পরীক্ষা পাসের জন্যেই ছেলেমেয়েরা তা পড়ে। সে রকম লেখা বয়স্থ লোকের উপযুক্ত নয়। শুধু তথ্য থাকলেই চলবে না, রচনা চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, তবেই সাধারণ পাঠকের পড়বার আগ্রহ হবে। ইংরেজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ বিস্তর আছে, পাঠকও অসংখ্য। উদাহরণ আর আদর্শস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম করছি।—

H G Walesএর Short History of the World, সদ্য প্রকাশিত Julian Huxleyর Story of Evolution, M Davidsonএর Easy Outline of Astronomy, Gilbert Murryর Myths and Ethics,

A N Whiteheadএর Science and the Modern World, নির্মলকুমার বসুর Cultural Anthropology।

বাঙলায় এই জাতীয় গ্রন্থ নেই এমন নয়, কিন্তু যথেষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ নামে বিশ্বভারতী অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ ছোট বই প্রকাশ করেছেন। শুনেছি এই গ্রন্থমালার ক্রেতা অনেক কিন্তু পাঠকও অনেক কিনা জানি না।

বাঙলা গল্প কাব্য আর ভক্তিগ্রন্থ সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য রচনায় হিন্দী এগিয়ে যাচ্ছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের অনেক বৎসর আগেই হিন্দী অনুবাদ ছাপা হয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক আর শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণেও হিন্দী অগ্রণী। বাঙলার তুলনায় হিন্দীভাষীর সংখ্যা অনেক বেশী, হিন্দী বইএর পাঠকও বেশী। বিহার উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ—এই সকল রাজ্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রচুর সরকারী সাহায্য আর উৎসাহ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পোষকতা তো আছেই। এ সবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী সাহায্য অতি অল্প। আমাদের অপূর্ণ সাহিত্যকে পূর্ণতা দেবার জন্য লেখক প্রকাশক পাঠক আর সরকার সকলকেই অবহিত হতে হবে। বাঙলা সাহিত্য চিরকালই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে থাকুক এমন স্পর্ধা করতে বলি না, কিন্তু বাঙলা সাহিত্য সকল বিভাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা বাঙালী মাত্রেরই করা উচিত।



রবীন্দ্র-জন্মদিন

(১৮৮১/১৯৫৯)

কোনও মহাপুরুষের উদ্দেশে লোকে যখন সমবেতভাবে শ্রদ্ধার অর্ঘ দেয় তখন এক বা একাধিক প্রতীক উপলক্ষ্য করেই তা দিয়ে থাকে। এই প্রতীক প্রতিমূর্তি হতে পারে, কৃতির নিদর্শন হতে পারে, জন্মস্থান সাধনাস্থান বা জন্মদিনও হতে পারে। যদি অসংখ্য অনুরাগী জন একই কালে বা একই স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তবে সেই শ্রদ্ধা বিপুলতা পায়।

পঁচিশে বৈশাখে অনেক লোক জন্মেছে, কিন্তু একাধিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় নি। অতএব এই তারিখের কোনও নিজস্ব নিরপেক্ষ মহত্ত্ব নেই। ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা হয়তো বলবেন, শুধু দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র নয়, আরও অনেক রকম জটিল যোগাযোগ চাই, তবেই রবীন্দ্রনাথের তুল্য পুরুষের উদ্ভব হতে পারে। যাঁরা কার্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খলা মানেন তাঁরা বলবেন, শুধু জ্যোতিষিক সমাবেশ নয়, অসংখ্য কারণপরম্পরার ফল স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু তার নির্ণয় আমাদের অসাধ্য।

তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য দেবতার অধিষ্ঠানের জন্য নয়, বহু কাল যাবৎ অগণিত ভক্তের সমাগমের ফলে সামান্য স্থানও পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে। চৈত্র-শুক্ল-নবমী, ভাদ্র-কৃষ্ণ-অষ্টমী, ক্রিসমাস ডে প্রভৃতির পুণ্যতা রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বা যিশুখ্রীষ্টের জন্মের জন্য নয়, অসংখ্য ভক্ত একই দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সেই কারণেই তা পুণ্যদিন। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি যদি সামান্য লোক হতেন তবে এই দিন কেউ গ্রাহ্য করত না। তিনি অসামান্য, তাই এই দিনকে উপলক্ষ্য করে গুণগ্রাহী ভক্তজন সমবেতভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এবং তার ফলেই এই দিনটি পুণ্যময় পর্বদিনে পরিণত হয়েছে।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্যদেব প্রভৃতির যে বিবরণ সমকালীন লোকরা রেখে

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীর উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসবে পঠিত। ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬।

গেছেন তার কতটা ইতিবৃত্ত আর কতটা পৌরাণিক বা mythical তার নির্ণয় সহজ নয়। ধর্মনেতা বা অবতারদের চরিতকথায় কালক্রমে অতিরঞ্জন এসে পড়ে। ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ধর্মনেতা ছিলেন না এবং তিনি স্বয়ং স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের অনেকে কবির কথা লিখেছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এখনও লিখছেন। পঞ্চাশ ষাট সত্তর বৎসর পরে এই সাক্ষাৎদর্শীদের কেউ জীবিত থাকবেন না, তখন তাঁদের লিখিত বিবরণ আর কবির স্বরচিত আত্মকথাই আমাদের ঐতিহাসিক সম্বল হবে।

স্মরণ কীর্তন আর আলোচনাই শ্রদ্ধাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। তার ভিত্তি বিশ্বস্ত সত্যাশ্রিত বিবরণ। যাঁরা কবির কথা লিখছেন, ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের কাছে তাঁদের গুরুতর দায়িত্ব আছে। লেখক আর সমালোচকদের সতর্ক থাকতে হবে যেন রবীন্দ্রচরিতকথায় কল্পনা আর জল্পনা না আসে, যেন তা কিংবদন্তী বা অবদানকল্পলতায় পরিণত না হয়।



স্নেহদ্রব্য

(১৮৮১/১৯৫৯)

বাঙালীর রান্নায় সরষের তেল আর ঘি বহুকাল থেকে চলে আসছে। কুড়ি-পঁচিশ বৎসর আগে পঞ্জাবী আর উত্তরপ্রদেশীকে বলতে শুনেছি, সরষের তেল খেলে পেট জ্বলে যায়, কিন্তু এখন তারাও খেতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীজী বলতেন, লংকা আর সরষের তেল বিষবৎ ত্যাজ্য। কিন্তু লংকাখোর দক্ষিণভারতবাসীর জঠর এপর্যন্ত দগ্ধ হয় নি, বাঙালীর জঠরও সরষের তেলে স্নিগ্ধ আছে, যদিও কেউ কেউ বিষাক্ত ভেজাল তেল খেয়ে রোগে পড়েছেন।

'বনস্পতি' নাম কোন্ মহাপণ্ডিত চালিয়েছেন জানি না। সরকার এই উৎকট নাম মেনে নিয়েছেন। এর আভিধানিক অর্থ—পুষ্পব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ, অশ্বত্থাদি; বৃক্ষ মাত্র (শব্দসার)। হিন্দীতে বনস্পতি মানে উদ্ভিদ। যদি সেই অর্থই ধরা হয় তা হলেও উদ্ভিজ্জ তৈলজাত দ্রব্যবিশেষের নাম বনস্পতি হবে কেন? গরু থেকে দুধ হয়, দুধ থেকে ঘি। সে কারণে ঘিকে গরু বলা চলে কি? এই প্রবন্ধে হাইড্রোজেনেটেড অয়েলকে সংক্ষেপে হাইড্রোতেল বলব। বিভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত এই দ্রব্য 'ডালডা, রসোই, কুসুম, পকাও' ইত্যাদি নানা নামে বিক্রি হয়।

গত যুদ্ধের আগে ঘি আর সরষের তেলের যে দাম ছিল এখন তার পাঁচ-ছ গুণ হয়েছে। হাইড্রোতেল প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিদেশ থেকে আসতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম হোটেলের রান্নায়, ময়রার ভিয়ানে, আর ঘিএর ভেজালে চলত, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ তা পছন্দ করত না, যদিও দাম ছিল দশ আনা সেরের কাছাকাছি, অর্থাৎ ঘিএর অর্ধেক। অনেকে মনে করত, বস্তুটি অপকারী, অন্তত তার 'ফুড-ভ্যালু' কিছু নেই। হাইড্রোতেল সম্বন্ধে সাধারণের ভয় ক্রমশ দূর হল, গৃহস্বামীর আপত্তি থাকলেও গৃহিণীরা লুকিয়ে আনাতে লাগলেন। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কর্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, কি করা যায় বলুন, ছেলেগুলো রাক্ষসের মতন লুচি খাচ্ছে, কাহাঁতক ঘি যোগাব?' (ঘি তখন পাঁচ সিকে সের)।

এখন এদেশে প্রচুর হাইড্রোতেল তৈরি হচ্ছে, জনকতকের আপত্তি থাকলেও জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় খাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এই বস্তুটির বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ উঠেছে, এবং সবিশেষ জানবার জন্য অনেকে আগ্রহী হয়েছেন। এই প্রবন্ধে তেল ঘি হাইড্রোতেল প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

স্নেহ (fat)

ইংরেজী ফ্যাট শব্দের অর্থ প্রাণিদেহের চর্বি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় মাখন ঘি আর উদ্‌ভিজ্জ তেলও ফ্যাটএর অন্তর্গত। এই ব্যাপক অর্থে ফ্যাট-সংজ্ঞার প্রতিশব্দ রূপে অনেকে লেখেন, চর্বি বা চর্বি-জাতীয় দ্রব্য। ইংরেজী প্রয়োগের অন্ধ অনুকরণে সরষে তিল ইত্যাদির তেলকে চর্বি বললে আমাদের সংস্কারের উপর পীড়ন হয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ফ্যাটএর প্রতিশব্দ স্নেহ বা স্নেহদ্রব্য লেখাই ভাল, তাতে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকবে না।

স্নেহাম্ল (fatty acid)

স্নেহ শব্দের এক অর্থ স্নিগ্ধতা, চিক্কণতা, বা তেলা ভাব। ভ্যাসেলিন, লুব্রিকেটিং অয়েল প্রভৃতিও চিক্কণ, কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন স্নেহ বা ফ্যাটের তুল্য নয়। স্নেহ মাত্রেরই প্রধান উপাদান গ্লিসারিন এবং কয়েক প্রকার স্নেহাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড। রসায়ন শাস্ত্রে যাকে অম্ল বা অ্যাসিড বলা হয় তার স্বাদ টক নাও হতে পারে। অধিকাংশ স্নেহাম্ল টক নয়।

অপূরিত (unsaturated) ও প্রপূরিত (saturated)

প্রত্যেক স্নেহাম্লের অণুতে কতকগুলি কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। এই সব পরমাণুর বিন্যাস ও সংখ্যা এক-এক স্নেহাম্লে এক-এক প্রকার। এক শ্রেণীর স্নেহাম্লে আরও হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে দিতে পারা যায়, অপর শ্রেণীতে তা পারা যায় না। প্রথম শ্রেণীকে বলা হয় অপূরিত (অনসাটুরেটেড), অর্থাৎ যতটা হাইড্রোজেন থাকতে পারে ততটা নেই, হাইড্রোজেনের কিছু আসন খালি আছে। অপর শ্রেণীর স্নেহাম্লকে বলা হয় প্রপূরিত (সাটুরেটেড), অর্থাৎ এগুলিতে পূর্ণমাত্রায় হাইড্রোজেন আছে, আসন খালি নেই।

বিভিন্ন তেলে আর ঘিএ যে স্নেহাম্ল থাকে তার মধ্যে অপূরিত আর

প্রপূরিতর শতকরা হার মোটামুটি এই রকম—

	অপূরিত	প্রপূরিত
সরষের তেল	৫০	৫০
তিল তেল	৮৫	১৫
চীনাবাদাম তেল	৭৫-৮৭	২৫-১৩
নারকেল তেল	২	৯৮
ঘি (গাওয়া ভঁয়সার কিছু তারতম্য আছে)	২৯	৭১

সরষে তিল আর চীনাবাদাম তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল প্রচুর আছে, এই সব তেল শীতকালেও তরল থাকে। নারকেল তেল আর ঘিএ প্রপূরিত বেশী, ঠাণ্ডায় জমে যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সংযোগ করলে অপূরিত স্নেহাম্ল প্রপূরিত হয়ে যায়, তার ফলে তরল তেল গাঢ় হয়। যোজিত হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে তেলের রূপ ঘিএর মতন নরম, ছাগল-ভেড়ার চর্বির মতন জমাট বা মোমের মতন শক্ত করা যায়। এদেশে ৯ ভাগ চীনাবাদাম তেলে ১ ভাগ তিল তেল মিশিয়ে তাই থেকে হাইড্রোতেল তৈরি হয়, কিন্তু সবগুলির গাঢ়তা সমান নয়। হাইড্রোতেলের কথা পরে হবে, এখন সাধারণ তেলের কথা বলছি।

কোন্ তেল ভাল?

ভারতের অনেক প্রদেশে তিল আর চীনাবাদাম তেলে রান্না হয়, দক্ষিণ ভারতে নারকেল তেলও চলে। বাঙালী সহজে অভ্যাস বদলাতে পারে না। বার-তের বৎসর আগে যখন সরষের তেল খুব দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল তখন অনেকে জেনে শুনে ভেজাল তেল কিনত, কিন্তু তিল বা চীনাবাদাম তেল ছুঁত না। প্রচলিত তেলের মধ্যে কোন্‌টি বেশী হজম হয় বা বেশী পুষ্টিকর তার পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত হয় নি, অতএব নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। আয়ুর্বেদে তিল তৈলের বহু প্রশংসা আছে, তৈল শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থই তিলজাত (যেমন oilএর মৌলিক অর্থ olive-জাত)। সরষে তিল আর চীনাবাদাম তিন রকম তেলই অনেক কাল থেকে ভারতবাসীর রান্নায় চলছে, তাতে স্বাস্থ্যহানি হয়েছে এমন শোনা যায় নি। অতএব ধরা যেতে পারে যে তিনটি তেলই সুপাচ্য। অবশ্য এমন লোক আছে যার পেটে এক

রকম তেল সয় কিন্তু অন্য রকম তেল সয় না, কিংবা ঘি সয় কিন্তু কোনও তেল সয় না। সব রকম তেলের চাইতে ঘি বেশী পাচ্য আর পুষ্টিকর, এ বিষয়ে মতভেদ নেই।

খাদ্যের রাসায়নিক গঠনের সঙ্গে তার পাচ্যতা আর পুষ্টিকরতার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্রে সুনির্ণীত হয় নি। মোটামুটি দেখা যায়, স্নেহদ্রব্যের মধ্যে যেগুলি তরল এবং যাতে অপূরিত স্নেহাম্ল বেশী, সেইগুলিই সহজে জীর্ণ হয়। ঘিএ প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী থাকলেও তার লঘু গঠনের জন্য সুপাচ্য। তা ছাড়া ঘিএ ভাইটামিন এ আর ডি আছে, তেলে নেই। নারকেল তেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল খুব বেশী, কিন্তু তার কতকটা ঘিএর তুল্য।

পূর্বোক্ত তালিকায় বিভিন্ন তেলের যে স্নেহাম্ল দেখানো হয়েছে তাতে তিল তেলে অপূরিত স্নেহাম্ল সব চাইতে বেশী আর প্রপূরিত কম। এই কারণে অন্য তেলের তুলনায় সম্ভবত তিল তেল পাচ্যতায় শ্রেষ্ঠ, তার পরেই চীনাবাদাম তেল।

খাদ্যদ্রব্য ভাজবার সময় তেল বা ঘি তপ্ত করতে হয়। বেশী তাপে সব স্নেহদ্রব্যই বিকৃত হয় বা পুড়ে যায়, কিন্তু তেল যত আঁচ সইতে পারে, ঘি তত পারে না। সেজন্য প্রবাদ—তেল পুড়লে ঘি, ঘি পুড়লে ছাই। ঘি বেশী পুষ্টিকর হলেও ভাজবার পক্ষে তেলই ভাল, যদিও 'ঘিএ ভাজা তপ্ত লুচি'র খ্যাতি বেশী। চর্বি আর হাইড্রোতেলও বেশী আঁচ সইতে পারে।

ভাজবার সময় তেল-ঘিএর কিছু অংশ বাষ্পাকারে উবে যায়। ঘিএ সব চাইতে বেশী যায়, তিল তেলে আর নারকেল তেলে একটু কম, সরষে আর চীনাবাদাম তেলে আরও কম। এই কারণে ভাজবার পক্ষে সরষে আর চীনাবাদাম তেল শ্রেষ্ঠ। সরষের তেলের দুর্লভতার সময় আমি তিন-চার মাস তিল তেল চালিয়েছিলাম, তার ফলে রান্নাঘরের দেওয়াল তৈলাক্ত হয়ে যায়।

খাদ্য সম্বন্ধে অকারণ পক্ষপাত বা বিদ্বেষ ভাল নয়। পশ্চিম বাঙলার খাদ্যসংকটের একটি কারণ—রুটিতে আপত্তি আর ভাতে অত্যাসক্তি। যে সব খাদ্য অন্য প্রদেশে খুব চলে তা বাঙালীরও অভ্যাস করা উচিত। প্রত্যেক তেলেরই বিশিষ্ট গন্ধ আছে। সরষের তেল না হলে চলবে না, অন্য তেলের গন্ধ খারাপ, এমন মনোভাব ক্ষতিকর। অভ্যাস করলে তিল আর চীনাবাদাম তেলেও রুচি হবে।

হাইড্রোতেল

ঘিএর উপর ভারতবাসীর যে আসক্তি আছে তা অন্যায় নয়, কারণ অন্য স্নেহদ্রব্যের চাইতে ঘিএর পুষ্টিকরতা বেশী। জল আর বাতাসের সংস্পর্শে, পুরনো হলে, এবং বার বার তপ্ত করলে ঘি আর তেল বিকৃত হয়। ঘিএর উপর সাধারণের পক্ষপাত আছে, তাই খারাপ ঘি দিয়ে তৈরি খাবারে একটু দুর্গন্ধ থাকলে লোকে গ্রাহ্য করে না, বরং সেই গন্ধকেই ঘৃতপক্কতার প্রমাণ মনে করে। ঘি আভিজাত্যের লক্ষণ, মান্য কুটুম্ব বা অতিথিকে তেলে ভাজা খাবার দেওয়া যায় না। খাঁটী ঘি দুর্মূল্য হলে লোকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে সস্তা ভেজাল দেওয়া ঘি কেনে। ঘিএর কৃত্রিম এসেন্স বাজারে পাওয়া যায়, হাইড্রোতেলে অল্প একটু দিলে পচা ঘিএর মতন গন্ধ হয়। অনেক দোকানের 'বিশুদ্ধ ঘৃতের খাবার' এই নকল ঘিএ তৈরি হয়। গৃহস্থের যে চক্ষুলজ্জা আগে ছিল এখন তা দূর হয়েছে, নকল ঘি কিনে আত্মবঞ্চনা বা অতিথিবঞ্চনার দরকার হয় না, খোলাখুলি হাইড্রোতেলে রান্না হয়। তেলে ভাজা খাবারে যে গন্ধ হয় তা হাইড্রোতেলের খাবারে থাকে না, সেজন্য ঘৃতপক্কের বিকল্পরূপে হাইড্রোতেলপক্ক খাবার অবাধে চলে।

হাইড্রোতেলে ঘি-ব্যবসায়ীর ক্ষতি

অনেকে বলেন, হাইড্রোতেলে ঘিএর সর্বনাশ হচ্ছে, এর উৎপাদন একেবারে বন্ধ না করলে ঘি লোপ পাবে। এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। চল্লিশ বৎসর আগে হাইড্রোতেল ছিল না, তখন ঘিএ চর্বি চীনাবাদাম তেলের ভেজাল দেওয়া হত। ভাল চর্বির গন্ধ অনেকটা ভঁয়সা ঘিএর মতন, তাই ভেজাল ধরা সাধারণের অসাধ্য ছিল। হাইড্রোতেল তুলে দিলে আবার চর্বি চলবে। ঘি-ব্যবসায়ীর যে অসুবিধা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ হিন্দু জনসাধারণ চোখ বুজে চর্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘি খেলেও শুধু চর্বি খেতে রাজী নয়, কিন্তু শুধু হাইড্রোতেল খেতে তার আপত্তি নেই। সেকালে খাঁটী আর ভেজাল ঘিএর একাধিপত্য ছিল, তাই ঘিএর ব্যবসা ভাল চলত। কিন্তু এখন হাইড্রোতেল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। হাইড্রোতেল তুলে দিলে চর্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘিএর বিক্রি খুব বেড়ে যাবে, খাঁটী ঘিএর দাম চড়বে।

ভারতবর্ষ ভেজালের জন্য কুখ্যাত। আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসংখ্য অসাধু আছে, জনসাধারণও নিশ্চেষ্ট। বাজারের ঘি আর তেলে প্রচুর ভেজাল

চলে, বিদেশ থেকে ঘি আর সরষের তেলের কৃত্রিম এসেন্স অবাধে আমদানি হয়। আমাদের সরকার ছোটখাট ভেজালদারদের সাজা দেন কিন্তু বড়দের পরিহার করেন। যেমন, বেরাল নেংটি ইঁদুর ধরে কিন্তু ড্রেনবাসী বড় ইঁদুর দেখলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়।

সরকারী নিয়ম অনুসারে হাইড্রোতেলে কিছু তিল তেল দেওয়া হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় তিল তেল সহজেই ধরা যায়, সেজন্য ঘিএ হাইড্রোতেল থাকলে তিল তেলের জন্যই ভেজাল ধরা পড়ে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা সাধারণের সাধ্য নয়, সেজন্য প্রস্তাব হয়েছে, হাইড্রোতেলে এমন রঙ দেওয়া হক যাতে ঘিএ মেশালে রঙ দেখেই লোকে ভেজাল বুঝতে পারে। এই প্রস্তাব একেবারে নিরর্থক। হাইড্রোতেলে যদি প্রচুর রঙ থাকে তবেই ঘিএ তার ভেজাল ধরা পড়বে। কিন্তু লাল নীল সবুজ ব্রাউন ইত্যাদি রঙের হাইড্রোতেল তৈরি করা বৃথা, কেউ তা কিনবে না।

হাইড্রোতেলের দোষ

হাইড্রোতেলে প্রপূরিত গাঢ় স্নেহাম্ল বেশী, সেজন্য তার কতকটা হজম হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই কারণে খাদ্য হিসাবে তেলের চাইতে হাইড্রোতেল নিকৃষ্ট।

শারীরবিজ্ঞানী আর স্বাস্থ্যবিশারদগণ মাঝে মাঝে এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যাতে লোকে উদ্‌বিগ্ন হয়। কয়েক বৎসর থেকে তাঁরা প্রচার করছেন সিগারেটখোরদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যানসার বেশী দেখা যায়। সিগারেট-ব্যবসায়ীরা এই মত খণ্ডনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, নামজাদা ডাক্তারদের দিয়ে প্রতিবাদও প্রচার করাচ্ছেন, তথাপি সিগারেটের অনিষ্ট-করতা এখন প্রায় সর্বস্বীকৃত হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে সাধারণ লোকেও খুব জল্পনা করছে, কিন্তু সিগারেটের কাটতি এখন পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নি। লোকের মনোভাব বোধ হয় এই—হুজুকে পড়ে নেশা ছাড়তে পারব না, ক্যানসার যখন হবে তখন দেখা যাবে। সম্প্রতি শারীরবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, স্নেহদ্রব্যে যদি প্রপূরিত স্নেহাম্ল থাকে তবে তা বেশী খেলে রক্তে কোলেস্টেরল নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে। হাইড্রোতেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল বেশী, সেজন্য এসব জিনিস খেলে থ্রম্বোসিসের সম্ভাবনা বাড়ে। মাখন আর ঘিও নিরাপদ নয়, কারণ তাতেও প্রপূরিত স্নেহাম্ল আছে। অতএব তরল তেল খাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

ঘিএর অনুকল্প

এদেশে যেমন ঘিএর, পাশ্চাত্ত্য দেশে তেমনি মাখনের আদর। মাখন দুর্মূল্য, সেজন্য দরিদ্রের জন্য মাখনের অনুকল্প মার্গারিনএর প্রচলন হয়েছে। ঘিএরও একটা অনুকল্প দরকার। মার্গারিন দেখতে মাখনের মতন হলেও উপাদান মাখনের সমান নয়, কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশে ঘিএর যে অনুকল্প হবে তারও উপাদান আর লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। হাইড্রোতেলে প্রপূরিত স্নেহাম্ল যদি খুব কমানো হয়, অর্থাৎ চীনাবাদাম তেলে যদি বেশী হাইড্রোজেন সংযোগ নিষিদ্ধ হয় তবে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা কমবে। এ রকম হাইড্রোতেল হয়তো খুব নরম হবে, গ্রীষ্মকালে তেলের মতন তরল থাকবে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তাই চালাতে হবে। সরকার স্বয়ং উদ্‌যোগী হয়ে কিছু করবেন মনে হয় না, কিন্তু জনমত যদি প্রবল হয়, তবে আইন করতে বাধ্য হবেন।

এক বিষয়ে চর্বি আর গাঢ় হাইড্রোতেল ঘি আর তরল তেলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিস্কুটে ঘি বা তেলের ময়ান দিলে চলে না। পূর্বে দেশী বিলাতী সব বিস্কুটেই চর্বির ময়ান চলত, এখন হাইড্রোতেল দেওয়া হয়। রান্নার হাইড্রোতেল যদি পাতলা করা হয় বিস্কুটওয়ালাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজারে প্রায় গন্ধহীন ও বর্ণহীন চীনাবাদাম তেল পাওয়া যায়, তার দাম সাধারণ তেলের চাইতে বেশী, কিন্তু হাইড্রোতেলের চাইতে কম। অনেক গুজরাটী আর মারোয়াড়ী খাবারওয়ালা তা ঘিএর বদলে ব্যবহার করে। এই deodorized decolorized তেলে হাইড্রোজেন যোগ করা হয় না, তেলের স্বাভাবিক স্নেহাম্লই বজায় থাকে। বাঙালী গৃহস্থ এই তেল ঘিএর অনুকল্পরূপে ব্যবহার করে দেখতে পারেন।



রচনা ও রচয়িতা

(১৮৮১/১৯৫৯)

আমরা যেসব বস্তু নিত্য ব্যবহার করি তার অধিকাংশের উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার স্থূল প্রয়োজন মেটানো। এইসব বস্তুর কতকগুলি অতি প্রাচীন, তাদের উদ্‌ভাবক বা প্রবর্তকের নাম আমাদের জানা নেই। যেমন তীর-ধনুক, পোড়ামাটির বাসন, গাড়ির চাকা, কাপড় বোনার তাঁত ইত্যাদি। কতকগুলি বস্তুর প্রবর্তকের নাম আমরা জানি এবং সসম্মানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত বস্তুর পরিবর্তন করতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাতে তাঁদের মর্যাদাহানি হবে তাও মনে করি না। আমরা চাই, যা কাজের জিনিস তা আরও কাজের উপযুক্ত হক, আরও ভাল হক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত প্রথম ব্যাকরণের জন্য পাণিনির নাম জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু পরবর্তী ব্যাকরণকারগণ পাণিনির অন্ধ অনুকরণ করেন নি। প্রথম বিজলী বাতির উদ্‌ভাবক এডিসন এবং প্রথম সার্থক এয়ারোপ্লেনের নির্মাতা রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের নির্মিত বস্তুর সঙ্গে আধুনিক বস্তুর সাদৃশ্য খুব কম।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উপযোগিতা বা utilityই অগ্রগণ্য, তার উদ্‌ভাবকের কীর্তি অতি গৌণ। কে প্রথমে তৈরি করেছিলেন তা অনেকেই জানে না, যারা জানে তারাও ব্যবহারকালে স্মরণ করে না। কিন্তু যেসব বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদান অথবা ভাব বা রসের উৎপাদন, তার সঙ্গে রচয়িতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। রচয়িতা যদি অজ্ঞাত হন তথাপি তাঁর কৃতির উপর অন্যের হস্তক্ষেপ স্যাক্রিলেজ তুল্য অপরাধ গণ্য হয়। কেউ যদি অ্যাপোলো, বেলভিডিয়র বিগ্রহ বা অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি আরও ভাল করে গড়তে চায়, কিংবা কালিদাস শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের রচনার সংস্কার করতে চায়, তবে সে উন্মাদ গণ্য হবে।

বেদের এক নাম শ্রুতি, কারণ গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে আর শুনে শুনে বেদাধ্যয়ন হত। প্রাচীন ভারতের লিপির প্রচলনের পরেও বেদাভ্যাসের এই পদ্ধতি বজায় ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা সহজে প্রশংসা করেন না, কিন্তু তাঁরাও মেনেছেন যে অন্তত তিন হাজার বৎসর যাবৎ বেদবিদ্যা মুখে মুখেই চলে আসছে এবং অপরিবর্তিত আছে। শুধু তার

বাক্য নয়, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে তার উচ্চারণ বা পঠনরীতিও প্রায় যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এই আশ্চর্য ঘটনার কারণ, বেদের প্রতি ভারতবাসীর অসীম শ্রদ্ধা। বাঙলা দেশে বেদচর্চা প্রায় লোপ পেয়েছিল, সেজন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে শুদ্ধ পাঠ শেখবার জন্য কাশী পাঠিয়েছিলেন। এখনও ব্রাহ্ম উপাসনায় প্রাচীন রীতিতে উপনিষদাদির শ্লোক উচ্চারিত হয়।

শুধু বেদ নয়, সংস্কৃত কাব্য পাঠের রীতিও অতি প্রাচীন এবং সর্বত্র প্রায় একরকম। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণে বিকার এসেছে। শুনেছি কোনও এক পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সংস্কৃত বাক্য রচনার যেমন গৌড়ী আর বৈদর্ভী রীতি আছে তেমনি বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণকে গৌড়ী রীতি রূপে মেনে নিতে দোষ কি? এই উক্তির জন্য তিনি ধমক খেয়েছিলেন। আমরা সংস্কৃত কবিতা সুর করে পড়তে জানি না, নীরস গদ্যের মতন পড়ি; কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে সুর করে পড়াই রীতি। বিহারী উত্তরপ্রদেশী মরাঠী গুজরাটী এবং দ্রাবিড় পণ্ডিতরা প্রায় একই সুরে সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করেন। এই চিরাগত রীতির কারণও সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদ মনে করেন, গান-বাজনা গুণিজনের স্বচ্ছন্দ বিহার বা কসরতের ক্ষেত্র, যদি নির্দিষ্ট সুর আর তাল মোটামুটি বজায় রাখা হয় তবে কর্তব বা সুর ভাঁজায় গায়কের চিরন্তন অধিকার আছে। গান যদি বেওয়ারিশ হয় কিংবা গানের বাক্য যদি তুচ্ছ আর সুরের বাহন মাত্র হয় তবে কর্তবে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু রচয়িতা যদি কবিতার সঙ্গে তাল মান লয় যোগ করে গান রচনা করেন তবে তার অলংকরণের অধিকার গায়কের থাকে না। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরকে বাগর্থ তুল্য সম্পৃক্ত বলেছেন। কবি যখন গান রচনা করেন তখন বাক্ আর অর্থের সঙ্গে সুরও সম্পৃক্ত করেন, অর্থাৎ কবিরচিত গানে কবিতার সঙ্গে সুরের অচ্ছেদ্য ও অপরিবর্তনীয় বন্ধন ঘটে।

রবীন্দ্রকাব্যের বাক্যের পরিবর্তন যেমন গর্হিত, রবীন্দ্রসংগীতের সুরের পরিবর্তন বা অলংকরণও তেমনি গর্হিত। মনালিসার বাঁকা হাসি যদি ভাল না লাগে তবে অতি বড় চিত্রবিশারদেরও তা সোজা করবার অধিকার নেই। যিনি মনে করেন, নির্দিষ্ট রীতিতে না গেয়ে রবীন্দ্রসংগীত আরও শ্রুতিমধুর করে গাওয়া যেতে পারে, তাঁর উচিত অন্য গান রচনা করে তাতে নিজের সুর দেওয়া। 

ধর্মশিক্ষা

(১৮৮১/১৯৫৯)

আমাদের দেশে সব রকম দুষ্কর্ম আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। চুরি ডাকাতি প্রতারণা ঘুষ ভেজাল ইত্যাদি দেশব্যাপী হয়েছে, অনেক রাজপুরুষ আর ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর কর্মে অসাধুতা প্রকট হয়েছে, জননেতাদের আচরণেও অসংযম আর গুণ্ডামি দেখা দিয়েছে, ছেলেরা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত হয়েছে। অনেক সরকারী অফিসে কাজ আদায়ের জন্য চিরকালই আমলাদের ঘুষ দিতে হত। এখন তাদের জুলুম বেড়ে গেছে, উপরওয়ালাদের বললেও কিছু হয় না, তাঁরা নিম্নতনদের শাসন করতে ভয় পান।

প্রাচীন ভারতে চোরের হাত কেটে ফেলা হত। বিলাতে দেড় শ বৎসর আগে সামান্য চুরির জন্যও ফাঁসি হত। রাজা রতন রাও কুলনারীহরণের জন্যে নিজের পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই রকম কঠোর শাস্তির ভয়ে দুর্বৃত্তরা কতকটা সংযত থাকত, কিন্তু একেবারে নিরস্ত হত না।

সমাজরক্ষার জন্য যথোচিত দণ্ডবিধি অবশ্যই চাই, কিন্তু তার চাইতেও চাই এমন শিক্ষা আর পরিবেশ যাতে দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। অনেকে বলেন, বাল্যকাল থেকে ধর্মশিক্ষাই দুষ্প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রিলিজস এডুকেশনের জন্য বিলাতে আইন আছে, সকল খ্রীষ্টান ছাত্রকেই বাইবেল পড়তে হয় এবং তৎসম্মত ধর্মোপদেশ শুনতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান মাত্রেই এই শিক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্টরা (যাঁদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা মনীষী আছেন) বলেন খ্রীষ্টীয় বা অন্য কোনও ধর্মের ভিত্তিতে মরালিটি বা সামাজিক কর্তব্য শেখানো শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকরও বটে, তাতে বুদ্ধি সংকীর্ণ হয়।

বাল্যকাল থেকে সুনীতি আর সদাচার শিক্ষা কর্তব্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ নেই। কিন্তু সেকিউলার বা লোকায়ত ভারত-রাষ্ট্রের প্রজার জন্যে এই শিক্ষার ভিত্তি কি হবে? শিক্ষার্থীর সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু জৈন শিখ মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, অথবা শাস্ত্রনিরপেক্ষ শুধুই নীতিবাক্য?

রিলিজন শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। ক্রীড বা নির্দিষ্ট বিষয়ে আস্থা না থাকলে রিলিজন হয় না। হিন্দুধর্ম ঠিক রিলিজন নয়, কারণ তার বাঁধাধরা

ক্রীড নেই। কিন্তু যেমন মুসলমান আর খ্রীষ্টীয় ধর্ম, তেমনি জৈন শিখ বৈষ্ণব আর ব্রাহ্ম ধর্মও রিলিজন। ভারতীয় ছাত্র যদি মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন শিখ বৈষ্ণব ব্রাহ্ম ইত্যাদি হয় তবে তার সাম্প্রদায়িক ক্রীড অনুসারে তাকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু ছাত্রকে কিংবা মিশ্র সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে কি শেখানো হবে? শুধু অল্পবয়স্কদের জন্যে ব্যবস্থা করলে চলবে না, প্রাপ্তবয়স্করাও যাতে কুকর্মপ্রবণ না হয় তার উপায় ভাবতে হবে।

ধর্ম শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ অতি ব্যাপক—যা প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধিসমূহই ধর্ম, যাতে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তাই ধর্ম। ইংরেজীতে gentlemanএর একটি বিশিষ্ট অর্থ—chivalrous wellbred man। জেন্টলম্যান বা সজ্জনের যে লক্ষণাবলী, তা যদি বহুগুণ প্রসারিত করা হয় তবে তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে। শুধু ভদ্র আচরণ, মার্জিত আলাপ, সত্যপালন, দুর্বলকে রক্ষা করা ইত্যাদি ধর্ম নয়, শুধু ভক্তি বা পরমার্থতত্ত্বের চর্চাও ধর্ম নয়। স্বাস্থ্য বল বিদ্যা উপার্জন সদাচার সুনীতি বিনয় (discipline) ইন্দ্রিয়সংযম আত্মরক্ষা দেশরক্ষা পরোপকার প্রভৃতিও ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে গুণাবলীর অনুশীলন ও সামঞ্জস্য বিবৃত করেছেন তাই ধর্ম। মানুষের সাধনীয় ধর্মের এমন সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আর কেউ বোধ হয় করেন নি।

ভারতীয় বিদ্যার্থী সেকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা পেত তাকে তখনকার হিসাবে সর্বাঙ্গীণ বলা যেতে পারে। বিবিধ বিদ্যা আর শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান বা ritualএর সঙ্গে সদাচার আর সামাজিক কর্তব্যও শিক্ষণীয় ছিল। এখন গুরুগৃহের স্থানে স্কুল-কলেজ হয়েছে, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তায় আস্থা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এখনকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যল্প, ধর্ম বা সামাজিক কর্তব্য শেখাবার তাঁদের সময় নেই, যোগ্যতাও নেই।

ধর্মশিক্ষার জন্য কেউ কেউ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে থাকেন। ছেলেরা নিয়মিত গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, স্তোত্রপাঠ, গীতা-অধ্যয়ন ইত্যাদি করুক। মেয়েরা মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে নানা রকম ব্রতপালন আর শিবপূজা করুক। ছাত্রছাত্রীদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শোনাবার ব্যবস্থা হক। সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ভক্তি যাতে হয় তার চেষ্টা করা হক।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। অনেকে বলেন, স্বর্গ-নরকে সাধারণের আস্থা কমে যাওয়াই নৈতিক অবনতির কারণ। Pie in the sky আর hell fire, অর্থাৎ পরলোকে গিয়ে পুণ্যবান স্বর্গীয় পিষ্টক খাবে আর পাপী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে, এই বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়—Jesus Christ can save to the uttermost! ফ্রেমে বাঁধানো অনুরূপ আশ্বাসবাক্য দেশী ছবির দোকানে পাওয়া যায়—'একমাত্র হরিনামে যত পাপ তরে, পাপিষ্ঠের সাধ্য নাই তত পাপ করে।' কিন্তু এই সব বাণীতে কোনও ফল হয় না, কারণ জনসাধারণ ইহসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

দুষ্ক্রিয়া বৃদ্ধির নানা কারণ থাকতে পারে। বোধ হয় একটি প্রধান কারণ, জুয়াড়ী প্রবৃত্তি বা gambling spiritএর প্রসার। লোকে দেখছে, দুষ্কর্মাদের অনেকেই ধরা পড়ে না, যারা ধরা পড়ে তাদেরও অনেকে শাস্তি পায় না। অতএব দুষ্কর্ম করে নিরাপদে লাভবান হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এক শ জন দুষ্কর্মার মধ্যে যদি পঁচাত্তর জন সাজা না পায় তবে সেই পঁচাত্তরের মধ্যে আমারও স্থান হতে পারে, অতএব আইনের ভয়ে পিছিয়ে থাকব কেন? ঝুঁকি না নিলে কোনও ব্যবসাতে লাভ হয় না, দুষ্ক্রিয়াও একটা বড় ব্যবসা। লোকনিন্দা গ্রাহ্য করবার দরকার নেই, আমি যদি ধনবান হই তবে আমার দুষ্কর্ম জানলেও লোকে আমাকে খাতির করবে।

বহুকালের সংস্কার সহজে মুছে যায় না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস কমে গেলেও পাপের জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন অস্বস্তিবোধ অনেকের আছে এবং তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় তারা সুসাধ্য উপায় খোঁজে। বিস্তর লোক মনে করে, গঙ্গাস্নান, একাদশী পালন, দেববিগ্রহ দর্শন, গো-ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ সেবা, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি কর্মেই পাপস্খালন হয়। হরিনাম-কীর্তনে বা খ্রীষ্ট-শরণে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই উক্তির সঙ্গে উহ্য আছে—আগে অনুতপ্ত হয়ে পাপকর্ম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু লোকে কুকর্মের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, মনে করে ভগবানের নাম নিলেই নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে। লোভী ডায়াবিটিক যেমন মিষ্টান্ন খায় আর ইনসুলিন নেয়।

আইনের ফেসাদে পড়লে লোকে যেমন উকিল মোক্তার বাহাল করে, তেমনি অনেকে পাপস্খালনের জন্য গুরুর শরণ নেয়। সেকেলে মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে, আধুনিক জনপ্রিয় সাধু-মহাত্মারা গুরুর

স্থান নিয়েছেন। তাঁরা একসঙ্গে বিপুল ভক্তজনতাকে উপদেশ দেন, যেমন গৌতম বুদ্ধ দিতেন এবং একালের রাজনীতিক নেতারা দেন। অনেকে মনে করে, আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি, গুরুকে যদি ভক্তি করি আর ঘন ঘন তাঁর কাছে যাই তা হলে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। আমাদের দেশে সাধুসন্তের আবির্ভাব চিরদিনই হয়েছে, জনসাধারণের কাছে তাঁরা ভক্তি শ্রদ্ধাও প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু এখনকার জনপ্রিয় গুরু-গুর্বীর সন্নিধানে যে বিপুল ভক্তসমাগম হয় তা বোধ হয় বুদ্ধ আর চৈতন্যদেবের কালেও দেখা যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীঅরবিন্দেরও এমন ভক্তভাগ্য হয় নি।

একদিকে গুরুভক্তির তুমুল অভিব্যক্তি, অন্যদিকে দুষ্কর্মের দেশব্যাপী প্লাবন, এই দুইএর মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ আছে কি? একথা বলা যায় না যে গুরুভক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলেই দুষ্কর্মের প্রবৃত্তি বেড়ে গেছে, কিংবা গুরুরা জাল ফেলে চুনোপুঁটি রুই কাতলা সংগ্রহ করছেন। সাধুসঙ্গকামী ধার্মিক সজ্জন এখনও অনেক আছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে দুষ্কর্ম বৃদ্ধির ফলেই সাধু মহাত্মা গুরুর চাহিদা বেড়ে গেছে, বিনা আয়াসে পাপমুক্ত হবার মতলবে এখন অসংখ্য লোক গুরুর দ্বারস্থ হচ্ছে।

ভক্ত অথচ লম্পট মাতাল চোর ঘুষখোর ইত্যাদি দুশ্চরিত্র লোক অনেক আছে। তথাপি দেখা যায়, যারা স্বভাবত ভক্তিমান তারা প্রায় শান্ত সচ্চরিত্র হয়। কিন্তু স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকলে কোনও লোককে যেমন গণিতজ্ঞ বা সংগীতজ্ঞ করা যায় না, তেমনি কৃত্রিম উপায়ে অপাত্রকে ভক্তিমান করা যায় না। মামুলী নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম করলে বা স্তোত্র আবৃত্তি করলে চিত্রের পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান—অপবিত্র বা পবিত্র যেকোনও অবস্থায় যদি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করা হয় তবে বাহ্য আর অভ্যন্তর শুচি হয়ে যায়। কেবল নাম স্মরণেই যদি দেহশুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি হত তবে লোকে অতি সহজে দিব্যজীবন লাভ করত। গোঁড়া আচারনিষ্ঠ স্ত্রীপুরুষও কত মন্দ হতে পারে তার অনেক চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

যে স্বভাবত সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান আর জিজ্ঞাসু, সে নিজের রুচি অনুসারে ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের চর্চা করে। শুনেছি বিদ্যাসাগর প্রায় নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতন কর্মবীর পরোপকারী সমাজহিতৈষী অল্পই জন্মেছেন। গান্ধীজী ভক্ত বিশ্বাসী, নেহেরুজী অভক্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু দুজনেই অক্লান্তকর্মা লোকহিতৈষী সাধুপুরুষ।

মনুর বচন বলে খ্যাত একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

পরস্পরভয়াৎ কেচিৎ পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
রাজদণ্ডভয়াৎ কেচিৎ যমদণ্ডভয়াৎ পরে॥
সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মা যময়তাং যমঃ।
আত্মা সংযমিতো যেন যমস্তস্য করোতি কিম্॥

—কোনও কোনও পাপমতি পরস্পরের ভয়ে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, কেউ রাজদণ্ডের ভয়ে, কেউ বা যমদণ্ডের ভয়ে। কিন্তু সকল শাসকের উপরে শাসন করে আত্মা বা অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ যে সংযমিত করেছে যম তার কি করবে?

মোট কথা, ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তঃকরণের সংযমন বা বিনয়ন, disciplining the mind। এই বিনয়নের উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

শোনা যায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা অবিনীত লোককে বিনীত করা হয়। প্রথমে হয় brain washing বা মস্তিষ্ক ধোলাই, অর্থাৎ লোকটির মনে যেসব কমিউনিস্ট-নীতিবিরুদ্ধ পূর্ব সংস্কার আছে তার উচ্ছেদ করা হয়, তার পর অবিরাম মন্ত্রণা দিয়ে এবং দরকার মতন পীড়ন করে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল করা হয়। এই indoctrinationএর ফলে বহু নবাগত বিদেশী পূর্বের ধারণা ত্যাগ করে কমিউনিস্ট শাসনের আজ্ঞাবহ ভক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রজাদের শিশুকাল থেকেই শেখানো হয়—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের স্বার্থের চাইতে রাষ্ট্রের স্বার্থ বড়, রাষ্ট্রশাসকের বিধান শিরোধার্য করাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অন্য দেশে যে ডিমোক্রেসি আছে তা দুর্নীতিপূর্ণ ধাপ্পাবাজি মাত্র, প্রকৃত গণতন্ত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই আছে, সেখানকার প্রজাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। অবশ্য এমন লোক অনেক আছে যারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রজা না হয়েও স্বেচ্ছাক্রমে সেখানকার শাসনতন্ত্রের বশংবদ ভক্ত এবং তার কোনও দোষই মানতে চায় না।

এই রাষ্ট্রবিহিত একদেশদর্শী শিক্ষার ফলে কমিউনিস্ট প্রজার মানসিক পরিণতি কি হয়েছে তার আলোচনা অনাবশ্যক, অনেকে সে সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু যেসব পর্যটক অপক্ষপাতে দেখেছেন তাঁরা কমিউনিস্ট শাসনের শুধু দোষ আবিষ্কার করেন নি, অনেক সুফলও লক্ষ্য করেছেন। সম্প্রতি (২৪-১০-১৯৫৯) স্টেটসম্যান পত্রে প্রকাশিত একজন নিরপেক্ষ

দর্শকের বিবরণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি।—

China today is free of all signs of robbery and corruption, and this is no mean achievement. ...One does feel that we, in our country, could do with a little more honesty. There is an air of efficiency everywhere in the new China. ...One does not have to worry about things like the purity of food, ...or short measure or incorrect prices. These things are the result of strict controls. I miss these on my return to India. ...The people have been made conscious of the need to keep their homes and the streets clean. ...Is it fear that drives him or is it patriotism? The truth probably is, a bit of both. ...The Communist party has used two methods: coercion and 'education'.

ডিকটেটর-শাসিত রাষ্ট্রে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদিত হয়, সেখানকার প্রজা ভয়ে বা ভক্তিতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে চলে। গণতন্ত্রে ততটা আশা করা যায় না, কারণ, দুষ্ট দমনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সেখানকার শাসকদের নেই। যারা দুষ্ট আর দুষ্টের পোষক, তাদেরও ভোট আছে, সুতরাং তারা অসহায় নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ—প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বেশী হস্তক্ষেপ না করে এমন শিক্ষা পরিবেশ আর দণ্ডবিধির প্রবর্তন যাতে লোকে সুবিনীত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনুকরণ না করেও সেখান থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি।

Indoctrinationএর একটি ভাল প্রতিশব্দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছি—কর্ণেজপন, চলিত কথায় যার নাম জপানো বা ভজানো। শব্দটি মন্দ অর্থেই চলে, কিন্তু ভাল মন্দ মাঝারি সকল উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হতে পারে। শিশুকে যখন শেখানো হয়—সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, ঝগড়া মারামারি করবে না, গুরুজনের কথা শুনবে ইত্যাদি, তখন শিশুর মঙ্গলের জন্যই তার কর্ণেজপন হয়। ভোটের দালালরা যখন নিরন্তর গর্জন করে—অমুককে ভোট দিন ভোট দিন, তখন পাড়ার লোকের কর্ণেজপন হয়। ধর্মঘটী আর রাজনীতিক শোভাযাত্রীর দল অবিরাম যে স্লোগান আওড়ায় তা সর্বসাধারণের কর্ণেজপনই, কিন্তু এই ধরনের স্থূল ঘোষণায় বিশেষ কিছু ফল হয় না, কর্ণেজপন হলেও তা প্রায় অরণ্যে রোদনের তুল্য।

ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাও কর্ণেজপন। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে সত্য মিথ্যা আর অত্যুক্তির এমন নিপুণ মিশ্রণ থাকে যে বহু লোক মোহগ্রস্ত হয়। 'তেল ঘি খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না, অমুক বনস্পতি খান, পুষ্টির জন্য তা অপরিহার্য, আধুনিক সভ্য আর শিক্ষিত জনের রান্নাঘরে তা ছাড়া অন্য কিছু ঢুকতে পায় না।' সম্প্রতি লোকসভায় একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে এরকম বিজ্ঞাপন আপত্তিজনক, কিন্তু এমন আইন নেই যাতে এই অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ, অকারণে শিকল টেনে গাড়ি থামানো, রেলকর্মচারীকে নির্যাতন, গাড়ির আসবাব চুরি ইত্যাদি নিবারণের জন্য সরকার বিস্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশবাসীকে আবেদন জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না, কারণ, কুকর্ম নিবারণে শুধু কর্ণেজপন যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে শাস্তির অবশ্যম্ভাবিতা আর লোকমতের প্রবল সমর্থন আবশ্যক। ভেজাল ধরা পড়লে যে শাস্তি হয় তা অতি তুচ্ছ। অপরাধী ধনী হলে তার নাম প্রায় প্রকাশিত হয় না। একই লোক তেল-ঘিএ ভেজালের জন্য বহুবার জরিমানা দিয়েছে এবং স্বচ্ছন্দে সসম্মানে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।

বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, নব মৃৎপাত্রে যে সংস্কার লগ্ন হয় তার অন্যথা হয় না। বাল্যশিক্ষার অর্থ, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ হিতকর সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করা। এর প্রকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্য বিচক্ষণ মনোবিজ্ঞানীদের মত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষার সবটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, চরিত্র-গঠনে অভিভাবন বা suggestionএরও স্থান আছে। যে শিক্ষক ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেবেন তাঁকে শিক্ষণের পদ্ধতি শিখতে হবে। কিন্তু বাল্যশিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বয়স্থ জনসাধারণ যাতে সংযমিত থাকে তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। শুধু উপদেশ বা সরকারী বিজ্ঞাপনে কাজ হবে না, বর্তমান দন্ডনীতি কঠোরতর করতে হবে এবং সেইসঙ্গে প্রবল জনমত গঠন করতে হবে।

সৎকর্ম আর সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক জনসাধারণের প্রশংসা, দুষ্কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক জনসাধারণের ধিক্কার। ট্রামকর্মী, মোটরবস ও ট্যাক্সির চালক, মুটে ইত্যাদির সাধুতা, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের সাহসিকতা ইত্যাদি বিবরণ মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যায়। এইসব কর্মের প্রশংসা আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। সাধারণের কাছে সিনেমাতারকা,

ফুটবল-ক্রিকেট-খেলোয়াড়, সাঁতারু ইত্যাদির যে মর্যাদা, সৎকর্মা আর সাহসী স্ত্রীপুরুষেরও যাতে অন্তত সেই রকম মর্যাদা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। দুষ্কর্মের নিন্দা তীক্ষ্ণ ভাষায় নিরন্তর প্রচার করতে হবে, যাতে জনসাধারণের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। শুধু মামুলী দুষ্কর্ম নয়, রাস্তায় ময়লা ফেলা, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা, পানের পিক ফেলা, রাস্তার কল খুলে জল নষ্ট করা, নিষিদ্ধ আতসবাজি পোড়ানো ইত্যাদি নানা রকম কদাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দরকার। সংবাদপত্রের কর্তারা যদি বিবিধ রাজনীতিক সভার বিবরণ, সিনেমা চিত্রের বিস্তারিত পরিচয়, রাশিফলের আলোচনা ইত্যাদি কমিয়ে দিয়ে সৎকর্মের প্রশংসা আর কুকর্মের নিন্দা বহুপ্রচারিত করেন তবে তা সার্থক কর্ণেজপন হবে, লোকমতও প্রভাবিত হবে। যেমন দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, তেমনি দেশব্যাপী দুর্নীতি, কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের রাজনীতিক আর সাংস্কৃতিক নেতাদেরও এই জনমত গঠনে উদ্‌যোগী হওয়া কর্তব্য।

সাধারণের পক্ষে ফ্যাশনের বিধান প্রায় অলঙ্ঘনীয়। যে নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ ফ্যাশনের বিধি-নিষেধ মেনে চলে সেই রকম নিষ্ঠা বিহিত-অবিহিত কর্ম সম্বন্ধেও যাতে লোকের মন দৃঢ়বদ্ধ হয় তার জন্যে সুকল্পিত ব্যাপক আর অবিরাম প্রচার আবশ্যক।

পঞ্চশীল ভঙ্গ করে চীন দুঃশীল হয়েছে, ক্রূর কর্ম করে ভারতবাসীকে ক্ষুব্ধ বিদ্বিষ্ট করেছে। চীনের শাসনতন্ত্রের যতই স্বেচ্ছাচার নির্দয়তা আর কুটিলতা থাকুক, প্রজার স্বাধীন চিন্তা যতই দমিত হক, সে দেশের জনসাধারণের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা যায় না। কিছুকাল আগেও দুর্নীতির জন্যে চীন কুখ্যাত ছিল, কিন্তু দশ বৎসরে ভাল-মন্দ যে উপায়েই হক, চীনের প্রজা সংযমিত কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর আমাদের দেশে তার বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কোনও অবতার বা মহাপুরুষ অলৌকিক শক্তির দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না। কমিউনিস্ট পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ না করেও আমরা সমবেত চেষ্টায় দেশের কলঙ্ক মোচন করতে পারি। যদি হাল ছেড়ে দিয়ে যদ্‌ভবিষ্য নীতি আশ্রয় করি তবে আমাদের রক্ষা নেই।

❑

রাশি রাশি

(১৮৮১/১৯৫৯)

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর কোনও বইএ পড়েছি, অক্ষয়কুমার দত্ত অহরহ ভাবতেন, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! শেষ বয়সে তাঁর মাথার অসুখ হয়েছিল, নিরামিষ ছেড়ে আমিষ খেতে শুরু করেছিলেন। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাই বোধ হয় তাঁর অসুখের কারণ।

বিপুল, বিশাল, বিরাট, ভূমা, অসীম ইত্যাদি শব্দের একটা মোহিনী শক্তি আছে। অত্যন্ত বৃহতের চিন্তা আমাদের একটু অভিভূত করে, তার উপলব্ধিতে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই, আনন্দিত হই, কিঞ্চিৎ ভয়ও পাই। অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন 'হর্ষিত' অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁর মন 'ভয়ে প্রব্যথিত' হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বিপুলতা থেকে আশ্বাসও পান। ভবভূতি তাঁর জীবদ্দশায় অবজ্ঞাত ছিলেন। মালতীমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় এই বলে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; কোনও কালে কোনও দেশে এমন লোক থাকতে পারেন যিনি আমার সমানধর্মা এবং এই রচনার গুণগ্রহণে সমর্থ।

আকাশ সমুদ্র হিমালয় ইত্যাদির বিশালতা কবিকে ভাবাবিষ্ট করে। দেশ আর কাল নিয়ে দার্শনিকরা চিরকাল মাথা ঘামিয়েছেন, এই দুই বিরাট পদার্থের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, না শুধুই আমাদের অধ্যাস বা illusion? এখনও তাঁরা এ রহস্যের সমাধান খুঁজে পান নি। বিজ্ঞানীরা সমস্তই মাপতে চান, তাঁদের মানদণ্ড একদিকে বেড়ে চলেছে, আর একদিকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হচ্ছে, আগে যে সংখ্যা পর্যাপ্ত মনে হত এখন তাতে কুলয় না। সেকালেও লোকের ধারণা ছিল যে আকাশে অসংখ্য তারা আছে, কিন্তু শুধু চোখে যা দেখা যায় তার সংখ্যা তিন হাজারের বেশী নয়, লোকে তাই অসংখ্য মনে করত। এখন যন্ত্রের যত উৎকর্ষ হচ্ছে ততই বেশী তারা দেখা যাচ্ছে, লক্ষ থেকে কোটি, তার পর বহু কোটি।

এক শ বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাইবেলের উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার

বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল বললেন, পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার নয়, কয়েক কোটি বৎসর। তার পর ডারউইন আর ওআলেস প্রচার করলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পুরাতন জীব থেকে নব নব জীবের উদ্ভব হয়েছে। তখনকার গোঁড়া খ্রীষ্টানরা (মায় বিলাতের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন) এই মতের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন, কিন্তু তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। আধুনিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি নয়, বহু কোটি বৎসর।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কালপরিমাণ আরও বিপুল। চতুর্যুগ = ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এক মন্বন্তর = ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। ব্রহ্মার এক অহোরাত্র = ২৮,৮০০ কোটি বৎসর। ব্রহ্মার আয়ু = ১০,৩৬৮র পর ১২ শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর।

প্রচলিত ধারাপাতে সংখ্যার এই তালিকা দেখা যায়—এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত (million), কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ (billion), পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্ধ। বৃন্দএর অন্য নাম অব্জ। Prof N W Pirie, FRS ১৯৫৪ সালে লিখিত Origin of Life প্রবন্ধে অব্জ শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

পরার্ধ মানে ১এর পিঠে ১৭ শূন্য। ছেলেবেলায় আমরা যে ধারাপাত পড়তুম তাতে পরার্ধের পরেও অনেক সংখ্যা ছিল। তাদের নাম ভুলে গেছি, শুধু শেষের দুটি মনে আছে—পার, অপার। আমাদের যিনি অঙ্ক শেখাতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, অপারের পরে কোন্ সংখ্যা? তাঁর বিদ্যা বেশী ছিল না, উত্তর দিলেন, অপার সব চাইতে বড়, তার পরে আর সংখ্যা নেই। আমি বললুম, কেন, অপারের পিঠে তো আবও শূন্য জুড়ে দেওয়া যায়। তিনি বললেন, তাতে তোর লাভটা কি? অপারের বেশী টাকাও তোর হবে না, কাঁইবিচিও হবে না। মাস্টারমশাই রিয়ালিস্ট ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত পিঁপড়ের মতন। চিনির এক কণায় যদি পেট ভরে তবে বস্তার সন্ধান করা বোকামি।

বিজ্ঞানীরা টাকা গোনবার জন্য সংখ্যা চান না, যেসব বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বা রাশি রাশি বস্তু নিয়ে তাঁদের কারবার, তার পরিমাপের জন্যই সংখ্যা দরকার। লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন ইত্যাদিতে এখন কাজ চলে না। তারায় তারায় দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষ (প্রায় ৬এর পর ১২ শূন্য মাইল),

অথবা parsec (প্রায় ১৯ এর পর ১২ শূন্য মাইল) দিয়ে, অতি সূক্ষ্ম বস্তু মাপা হয় Angstrom unit দিয়ে (১ সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ)।

খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ দার্শনিক A N Whitehead লিখেছেন—Let us grant that the pursuit of mathematics is a divine madness of the human spirit, a refuge from the goading emergency of contingent happenings। অর্থাৎ ধরা যেতে পারে, গণিতের চর্চা এক রকম দিব্যোন্মাদ, ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়। হোআইটহেডের যদি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র পড়া থাকত তা হলে হয়তো লিখতেন—গণিতচর্চায় যে আনন্দ লাভ হয় তা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

যাঁরা খাঁটী গাণিতিক তাঁরা সংখ্যা নির্ধারণ করেই খুশী, তা দিয়ে কি মাপা হবে সে চিন্তা তাঁদের নেই। Edward Kasner একজন বিখ্যাত মার্কিন গণিতজ্ঞ। খেয়ালের বশে একদিন তিনি একটা সংখ্যা স্থির করলেন—১এর পিঠে ১০০ শূন্য। তাঁর ন বছরের ভাইপোকে বললেন, ওরে, একটা নাম বলতে পারিস? ভাইপো বলল, googol। নামটি গ্রীক লাটিন বা ইংরেজী নয়, ছোট ছেলের স্বচ্ছন্দ বালভাষিত, যেমন হাট্টিমাটিমটিম। কিন্তু এই গুগল নাম এখন সর্বস্বীকৃত হয়েছে। কাসনার তাঁর ভাইপোকে আবার বললেন, গুগলের চাইতে ঢের বড় একটা সংখ্যা বলতে পারিস? ভাইপো বলল, পারি, একের পিঠে দেদার শূন্য বসিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাতে ব্যথা হয়। কাসনার বললেন, তা হলে তো একটা মূর্খ পালোয়ানের কাছে আইনস্টাইনকে হেরে যেতে হবে, সংখ্যার নির্ধারণ গায়ের জোরে হতে পারে না। তখন ভাইপো চিন্তা করে বলল, একের পিঠে এক গুগল শূন্য, এর নাম হক googolplex। কাসনার বললেন, তথাস্তু, গাণিতিক সমাজও তাই মেনে নিলেন।

আপনি অঙ্কপাত করে অনায়াসে এক গুগল অর্থাৎ ১এর পর ১০০ শূন্য লিখতে পারেন, লাইনটি লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চির বেশী হবে না। কিন্তু গুগলপ্লেক্স লেখবার চেষ্টা করবেন না, পাগল হয়ে যাবেন। কাগজে কুলোবে না, ঘরেতেও নয়, পৃথিবীতেও নয়, আকাশের অতিদূরস্থ নক্ষত্র পর্যন্ত শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে যেতে হবে।

গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত যে মহিম্নস্তব রচনা করেছেন তার একটি শ্লোকে আছে—

সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়, তাতে যদি অসিতগিরিসম স্তূপীকৃত কজ্জল গোলা হয়, সুরতরুর শাখা যদি লেখনী হয়, ধরণী যদি পত্র হয় এবং শারদা যদি সর্বকাল লিখতে থাকেন, তথাপি হে মহেশ, তোমার গুণাবলীর পারে পৌঁছতে পারবেন না। পুষ্পদন্ত যদি আধুনিক গণিতের সংখ্যা জানতেন তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারতেন, হে মহেশ, তোমার গুণরাশি গুগলপ্লেক্সের চাইতেও বেশী।

সংখ্যাবিশারদরা অনেক রকম অদ্ভুত হিসাব করেছেন। মানবজাতি যখন প্রথম বলতে শিখল তখন থেকে এখন পর্যন্ত মোট কত কথা বলেছে? শিশুর আধ-আধ কথা প্রেমালাপ গালাগালি রাজনীতিক বক্তৃতা ইত্যাদি সব নিয়ে ১এর পিঠে মোটে ১৬টা শূন্য, গুগলের চাইতে ঢের কম।

নোবেল-পুরস্কৃত এডিংটন হিসাব করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রোটন আছে তার সংখ্যা ১৩৬.২ × ১এর পর ২৫৬ শূন্য। ইলেকট্রনের সংখ্যাও তাই। অর্থাৎ গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে কত তারা আছে? জ্যোতিষীরা অনুমান করেন, ৩,০০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটির মধ্যে, অর্থাৎ ৩এর পর ১০ শূন্য এবং ১এর পর ১১ শূন্যর মধ্যে। গুগলের চাইতে ঢের কম।

দাবা খেলার যত চাল হতে পারে তার সংখ্যা কত? আগে ১এর পর ৫৯ শূন্য বসান। যে সংখ্যা পাবেন তত শূন্য ১এর পর বসান। গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

এইবার অতি ক্ষুদ্র রাশি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অণু-পরমাণু কি বস্তু তা বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে ত্রসরেণুর অর্থ—ছয় পরমাণুর সমষ্টি, অথবা গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত রৌদ্রে দৃশ্যমান চঞ্চল সূক্ষ্ম পদার্থ। জীববিজ্ঞানে কীটের চাইতে কীটাণু ছোট, তার চাইতে জীবাণু বা মাইক্রোব ছোট. তার চাইতে ভাইরস ছোট (অণুবীক্ষণে অদৃশ্য)। রসায়নের অণু আরও ছোট, পরমাণু তার চাইতে ছোট, প্রোটন আরও ছোট, ইলেকট্রন সব চাইতে ছোট।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের উত্তম উদাহরণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। মাদার টিংচারে যে মূল বস্তু থাকে তার ১০ ভাগের ১ ভাগ থাকে প্রথম ডাইলিউশনে। তৃতীয় ডাইলিউশনে ১,০০০ ভাগের ১ ভাগ। দ্বাদশ ডাইলিউশনে লক্ষ কোটি ভাগের ১ ভাগ। শততম ডাইলিউশনে থাকে ১ গুগলের ১ ভাগ।

হোমিওপ্যাথরা বলেন, ডাইলিউশন বৃদ্ধিতে ঔষধের পোটেন্সি বৃদ্ধি হয়। অবিশ্বাসীরা বলেন, ১০০ ডাইলিউশনে পৌঁছবার আগেই এমন অবস্থা হয় যে এক শিশিতে অণু-প্রমাণ ঔষধও থাকে না। বিশ্বাসী বলেন, তোমার অঙ্কশাস্ত্র যাই বলুক, অণু-প্রমাণ ঔষধও থাকুক বা না থাকুক, স্পষ্ট দেখছি উপকার হয়, অতএব তর্ক না করে খেয়ে যাও, বিশ্বাসেই কৃষ্ণলাভ হয়।

অতি সূক্ষ্মের আর একটি উদাহরণ—ব্যাঙের আধুলির গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতীতে তার ভাল বর্ণনা আছে। ব্যাঙ তার বন্ধুকে একটি আধুলি ধার দিয়েছিল। শর্ত এই ছিল যে প্রতি কিস্তিতে অর্ধেক শোধ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে চার আনা, দ্বিতীয়তে দু আনা, তার পর যথাক্রমে এক আনা, দু পয়সা, এক পয়সা আধ পয়সা ইত্যাদি। ব্যাঙ হিসাব করে দেখল, তার পাওনা কোনও দিন শোধ হবে না, একটু বাকী থাকবেই। সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। ব্যাঙ যদি বুদ্ধিমান হত তবে বুঝত যে কয়েক কিস্তি পরেই বাকীর পরিমাণ নগণ্য হয়ে যাবে, অনন্তকাল তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

অন্তরকলন বা differential calculusএর আবিষ্কর্তা লাইবনিৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন তিনি প্রুশিয়ার রানীকে বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আজ আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র infinitesimal রাশির রহস্য বুঝিয়ে দেব। রানী বললেন, আপনাকে বোঝাতে হবে না, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাকে বলে তা এখানকার এই সভাসদ্‌দের আচরণ থেকেই আমি টের পাই।



পরশুরামএর শেষ রচনা—দাঁড়কাগ, ১-৬-১৯৫৯এ লেখা। ১৫-৬এ আর একটি গল্প—জামাইষষ্ঠী—আরম্ভ করেও কোনদিন তা শেষ করেন নি। এর পর প্রায় দশ মাস জীবিত ছিলেন পরশুরাম; কিন্তু তাঁর কুঠার অবনমিত ছিল।

রাজশেখর বসু কিন্তু এই সময়ে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর কলম থামে মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে—'রবীন্দ্রকাব্যবিচার' লিখে।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে, কলকাতা বেতারএর পক্ষে শ্রীঅমল হোমের অনুরোধে এই প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন ১৭-৪-১৯৬০এ, তাঁর চিরাচরিত নিয়মে পেনসিলে লিখে; শেষ হয় ২৬ এপ্রিল। (এও তাঁর চিরকালীন অভ্যাস—সব কিছুরই তারিখ লিখে রাখা।) ২৭ এপ্রিল সকালে এর একপাতা ফেআর কপিও করেন। বেলা একটা নাগাদ অকস্মাৎ নিঃশব্দ নিষ্ক্রমণ।

লেখাটা আর হল না—অমল হোমকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েকমাস পরে কাগজপত্রের মধ্যে এটির আবিষ্কর্তা—রাজশেখরের সব রচনার দিশারী—আমি। রবীন্দ্রশতবর্ষে যথাসময়ে এটি কলকাতা বেতারে পঠিত হয়।

এটি পড়ে দশ বৎসর আগে আমার ধারণা হয়েছিল আসন্ন মৃত্যুর আভাস এতে আছে, একটি শৃংখলাবদ্ধ সূচনা মাঝপথে দিশা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলুম—এও কি সেই রাজশেখরীয় সংক্ষিপ্ততা?

আসলে তখনও, পরশুরাম গল্পসমগ্র প্রায় কণ্ঠস্থ করলেও রাজশেখর প্রবন্ধাবলী ক্বচিৎ পড়েছি। আজ সমস্ত পড়ে উপলব্ধি করছি দুজনের রচনার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। পরশুরামের প্রতিটি গল্পে শেষরক্ষা দৃঢ় শৃংখলিত; রাজশেখর বসুর সব প্রবন্ধে সমগ্র বক্তব্য উপস্থাপনের পরেই আকস্মিক abrupt সমাপ্তি। রবীন্দ্রকাব্যবিচারেও তা স্খলিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহধন্য রাজশেখরের—যার অধিকাংশই আজও সাধারণের অজানা—রবীন্দ্রনাথের প্রতি শেষ ঐহলৌকিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে রবীন্দ্রলোকে প্রত্যাবর্তন মোটেই সমাপতন নয়। বোধহয় বহুপূর্বনির্ধারিত ছিল।

—দীপংকর বসু

রবীন্দ্রকাব্যবিচার

(২৬.০৪.১৯৬০)

যাঁরা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—লেখক, পাঠক, আর সমালোচক। লেখক সাহিত্য রচনা করেন, পাঠক তা উপভোগ করেন, সমালোচক তার উপভোগ্যতা বিচার করেন। এই তিন শ্রেণীর চেষ্টা বিভিন্ন, পটুতাও বিভিন্ন, কিন্তু এঁদের সংস্কার বা মানসিক পরিবেশ যদি মোটামুটি একরকম না হয় তবে লেখক পাঠক আর সমালোচকের সংযোগ হতে পারে না। বন্দে মাতরম্ গান সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের উপভোগ্য হতে পারে নি, কারণ তার রূপক অনেকের সংস্কারের অনুকূল নয়। রুল ব্রিটানিয়া, ইয়াংকি ডুড্‌ল প্রভৃতি গান সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলতেন, যদিও তিনি সনাতনী ছিলেন না। ভারতীয় পুরাণ তত্ত্বে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল, বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির তিনি অনুরক্ত পাঠক ছিলেন, উপনিষৎ থেকে আরম্ভ করে রূপকথা আর গ্রাম্য ছড়া পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস আর ঐতিহ্যের কোনও অঙ্গই তিনি উপেক্ষা করেন নি। পূর্ববর্তী লেখক ভারতচন্দ্র মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ কর্ণ-কুন্তী, কচ-দেবযানী, ব্রাহ্মণ, অভিসার, মেঘদূত প্রভৃতি অনবদ্য রচনা তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। এই বিশিষ্ট ভারতীয় সংস্কারের চিহ্ন তাঁর সকল রচনাতেই অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য যেমন গ্রীস-রোমের পুরাণ, বাইবেল আর ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে সংস্কার পেয়েছে, আমাদের সাহিত্যও তেমনি ভারতীয় দর্শন পুরাণ ইতিহাসাদি থেকে পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কার মোটামুটি আয়ত্ত না করলে যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসগ্রহণ করা যায় না, তেমনি ভারতীয় সংস্কারে ভাবিত না হলে এদেশের সাহিত্য উপভোগ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের মধ্যে যাঁদের প্রাচীনপন্থী বা রবীন্দ্রানুসারী

বলা হয় তাঁদের রচনাও ভারতীয় সংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু যাঁরা আধুনিক বলে খ্যাত তাঁরা এই সংস্কার প্রায় বর্জন করে চলেন, তাঁদের রচনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাবই প্রকট, গ্রীস-রোমের পুরাণকথার উল্লেখও কিছু কিছু দেখা যায়। এই নব্য রীতি প্রবর্তনের কারণ—গতানুগতিকতায় বিতৃষ্ণা এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যরীতির প্রতি অনুরাগ। আর একটি কারণ—এদেশের ঐতিহ্যকে এঁরা প্রগতির পথে বাধা স্বরূপ মনে করেন, সেজন্য তার যথোচিত চর্চা করেননি।

পূর্ববর্তী কবিরা যে সংস্কার অর্জন করেছিলেন, তা থেকে এঁরা প্রায় বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ, মেঘদূত' প্রভৃতির তুল্য রচনা এঁদের আদর্শের অনুরূপ নয়, সাধ্যও নয়। 'এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত, ফেনহিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে'—এইরকম অনুপ্রাসময় ছন্দ তাঁরা অতি সেকেলে মনে করেন। 'তাঁর লটপট করে বাঘছাল তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে, তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল, যত ভুজঙ্গদল তরজে'—এই ধরণের পৌরাণিক কল্পনাতেও তাঁদের অরুচি ধরে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু আদর্শও মনে করেন না।

বাঙালী সমাজের একটি শাখা ইঙ্গবঙ্গ নামে খ্যাত। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে নূতন শাখা উদ্‌গত হয়েছে, তাকে ইওরোবঙ্গ নাম দিলে ভুল হবে না। এই নূতন শাখার প্রসারের ফলে আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন শাখার ক্ষতি হবে মনে করি না। সাহিত্যের মার্গ বহু ও বিচিত্র, কালধর্মে নূতন নূতন মার্গ আবিষ্কৃত হবেই। একদল কবি যদি পূর্ব ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বনির্বাচিত পথেই চলেন এবং তাঁদের গুণগ্রাহী পাঠক আর সমালোচকের সমর্থন পান তাতে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়বে ছাড়া কমবে না।

প্রাচীন আর নবীন দুই শাখায়ই নিষ্ঠাবান লেখক পাঠক আর সমালোচক আছেন। এক শাখার সমালোচক যদি অন্য শাখার রচনা বিচার করেন, তবে পক্ষপাতিত্ব অসম্ভব নয়। তথাপি বাঙ্গালী সমালোচকের পক্ষে সমগ্র বাঙলা কাব্য বিচারের চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় বা বিদেশী যে কোনও পণ্ডিতের পক্ষে ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য রচনার তুলনাত্মক সমালোচনা সহজ নয়।

এককালে রবীন্দ্রকাব্যের যেসব দোষদর্শী সমালোচক ছিলেন তাঁরা সকলেই প্রাচীনপন্থী। নব্যতন্ত্রের পক্ষ থেকে প্রতিকূল সমালোচনা বিশেষ

কিছু হয়নি। রবীন্দ্রকাব্য আর পাশ্চাত্ত্যকাব্যের তুলনাত্মক নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন এমন বিদগ্ধ প্রতিভাবান সাহিত্যিক কেউ আছেন কিনা জানি না। মধুসূদন দত্ত যদি একালের লোক হতেন, তবে হয়তো পারতেন, প্রমথ চৌধুরীও হয়তো পারতেন। কোনও বিদেশী পণ্ডিতের এইরূপ সমালোচনার যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ সাহিত্যে যাঁর গভীর জ্ঞান নেই, উভয়বিধ সংস্কারে যিনি ভাবিত নন, তাঁর পক্ষে তুলনাত্মক বিচারের চেষ্টা না করাই উচিত।

বিবিধ রচনা

লঘুগুরু-বিচিন্তা-চলচ্চিত্তায় পূর্বগ্রন্থিত সব প্রবন্ধ প্রথম তিন অধ্যায়ে, ও তার পর রচিত শেষ নটি প্রবন্ধ চতুর্থ অধ্যায় উত্তর-চলচ্চিন্তায় সংকলনের পর যথাসম্ভব খুঁজে পাওয়া অগ্রন্থিত রচনা ও কয়েকটি উল্লেখ্য চিঠি মুদ্রিত হল এই শেষ অধ্যায়ে। —সঃ।

প্রথম পরিচয়

প্রায় একুশ বছর আগেকার কথা। অমল হোম মহাশয় বলে পাঠালেন, তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ আসবেন, আমাকে দেখতে চান। ভয় হল, কারণ আমি একটা দেখবার মতন মানুষ নই, বয়স হলেও অত্যন্ত গম্ভীর বাইরে লাজুক, কুনো আর অসামাজিক বলেও আমার বদনাম আছে। কাব্যজ্ঞান কিছুমাত্র নেই, অন্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ও নগণ্য। কি সম্বল নিয়ে কবির সঙ্গে আলাপ করব? আমার পরিচিত একটি ছেলের কাছে শুনেছিলাম, সে একবার কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, কিন্তু দরজায় পৌঁছেই প্রচণ্ড বুক ধড়ফড় করায় বেচারা ফিরে আসে। আমার অবস্থা ততটা খারাপ হয় নি, কিন্তু ভয় ছিল আমার সঙ্গে আলাপ করে কবি নিরাশ হবেন।

কবি কি মনে করেছিলেন জানি না, কিন্তু আমি নিরাশ হই নি। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ এক মুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। কার কোন্ বিষয়ে কতটুকু দৌড় তা বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। পরে দেখেছি, শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে, এমন কি ধৃষ্টতাও করেছে। তাঁর কাছে ঘোমটাবতী পল্লীবধূরও জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নিজেকে আবশ্যকমত প্রসারিত বা সংকুচিত করবার এই শক্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। 'হায় গগন নাহিলে তোমারে ধরিবে কেবা' — এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজের স্বভাবের একদিকের পরিচয় দিয়েছেন।

রাজশেখর বসু

৮-৮-৪৭.

লোকহিতৈষী প্রফুল্লচন্দ্র

(১৩৫১/১৯৪৪)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আপনারা যত জানতেন, অন্য অল্প লোকেই তাঁকে ততটা জানত, এজন্য তাঁর সম্বন্ধে নূতন বেশী কিছু বলার নেই। কোনও লোক যখন নানা কারণে বিখ্যাত হন তখন অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণটি অন্যান্য গুণের আড়ালে পড়ে যায়। আমার মনে হয়, প্রফুল্লচন্দ্রের বেলা তাই হয়েছে। তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠাতা—এই কথাই লোকে বেশী বলে। এদেশে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী আর শিল্পকর্তা আছেন, সুতরাং এই দুই দলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ফেললে তাঁর গৌরব বাড়ে না। তাঁর মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনি নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী। এই গুণে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক বিদ্যা, শিল্পপ্রসারের জন্য তাঁর আগ্রহ—এসব তিনি শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা পেয়েছিলেন। কিন্তু লোকহিতের প্রবৃত্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি বেশী রোজগার করেননি, সেজন্য তাঁর দানের পরিমাণ ধনকুবেরদের তুল্য নয়। তথাপি তিনি দাতাদের অগ্রগণ্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে দধীচির সঙ্গে সার্থক তুলনা করেছেন। সংসারচিন্তা এবং সব রকম বিলাসিতা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের সমস্ত ক্ষমতা ভাবনা আর অর্থ জনহিতে লাগিয়েছিলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হয়েছে, আচার্য তৎক্ষণাৎ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কোনও হাসপাতাল বা অনাথ আশ্রম বা স্কুল বা কলেজে টাকার অভাব, আচার্য তাঁর নিজের পুঁজি নিঃশেষ করে দান করলেন। কোনও ছোকরা এসে বললে, আমার মাথায় একটা ভাল মতলব এসেছে, ময়রার দোকান খুলব কিংবা ট্যানারি করব কিংবা কাপড়ের ব্যবসা করব, কিন্তু হাতে টাকা নেই। আচার্য তখনই মুক্তহস্ত হলেন। নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য তিনি অনেক লিমিটেড কম্পানিতে টাকা দিয়েছিলেন ডিরেক্টারও হয়েছিলেন। অনেক কোম্পানী ফেল হওয়ায় বিস্তর টাকা খুইয়েছেন, সময়ে সময়ে বদনামও পেয়েছেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি। কোনও কম্পানি টাকা ধার করবে, উনি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে জামিন হয়ে দাঁড়ালেন।

তারপর কম্পানি ফেল হলে অম্লানবদনে দণ্ড দিলেন। অনেকক্ষেত্রে আইন অনুসারে তিনি টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন না, তাঁর হিতার্থীরাও তাঁকে বারণ করেছিলেন, তবু তিনি টাকা দিয়েছিলেন—পাছে তাঁর সাধুতায় কলঙ্ক হয়। মহাভারতে আছে—সকল শৌচের মধ্যে অর্থশৌচ শ্রেষ্ঠ। একথা তাঁর চেয়ে কেউ বেশী বুঝত না, টাকাকড়ির দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়ে গাপ করবার লোকের অভাব হয়নি।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় আমাদের কম্পানির অনেক টাকা মারা যায়। শেয়ারহোল্ডার মিটিংএ একজন বলেছিলেন—দেশী ব্যাঙ্কে বিশ্বাস নেই, সেখানে আর যেন টাকা না রাখা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র উত্তর দিলেন—অবশ্যই রাখা হবে, দশবার টাকা মারা গেলেও রাখা হবে; আমাদের এই দেশী কারবারকে লোকে বিশ্বাস করে, আমাদেরও অন্য দেশী কারবারকে বার বার বিশ্বাস করতে হবে।

তাঁর স্মৃতিরক্ষা বা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমরা কি করতে পারি? এই কারখানায় তাঁর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা বা চিতাভস্ম রক্ষার জন্য চৈত্যস্থাপন বেশী কিছু নয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর প্রিয়কার্যসাধন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনেক ইচ্ছার মধ্যে একটি ছিল—এই কম্পানি বড় থেকে আরও বড় হবে, এতে নানা রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হবে, এতে বহু লোক শিক্ষিত উৎসাহিত পুরস্কৃত প্রতিপালিত হবে। এই ইচ্ছার পূরণ কেবল ডিরেক্টারদের চেষ্টায় হবে না, শেয়ারহোল্ডাররা লাখ লাখ টাকা মঞ্জুর করলেও হবে না, আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টাতেই তা হতে পারবে।

❑

আচার্য রায়ের মৃত্যুর (১৬.০৬.১৯৪৪) পর বেঙ্গল কেমিক্যালে শোকসভায় পঠিত।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩৫৭/১৯৫০)

প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্বে 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় 'দেবীমাহাত্ম্য' নামে একটি গল্প পড়েছিলাম। লেখকের নাম ছিল না। রচনাটি অসাধারণ, পরিহাস ও করুণার আশ্চর্য সমন্বয়, ভাষার ভঙ্গীও নূতন, তখনকার কোনও লেখকের সঙ্গে মিল নেই। সাহিত্যগগনে নবোদিত জ্যোতিষ্কের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। অকস্মাৎ আবির্ভূত এই অজ্ঞাতপূর্ব শক্তিমান লেখকের পরিচয় জানতে অনেকেরই আগ্রহ হল। পত্রিকা-সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন—লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চীন দেশের ফেরত, কাশীতে বা পূর্ণিয়ায় বাস করেন, রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্যচর্চা করছেন। তিনি পূর্বেও ছদ্মনামে অল্পস্বল্প লিখতেন, এখন পরিণত বয়সে গল্প লেখা আরম্ভ করেছেন। তাঁর নবপ্রকাশিত গল্পটি পড়ে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন এবং আরও চাই আরও চাই বলে আবদার করছেন।

কিছু দিন পরে 'কোষ্ঠির ফলাফল' ক্রমশ প্রকাশিত হতে লাগল। এই ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত নরনারী সকলেই অসাধারণ, কিন্তু কেউ অস্বাভাবিক নয়, পিকউইক-চরিত্রাবলীর সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হল। বাংলায় হাস্যরসের বহু রচয়িতা পূর্বেও ছিলেন পরেও হয়েছেন। কেদারনাথের আবির্ভাবে সকলেই বুঝলেন যে হাস্যের সহিত শান্ত ও করুণ রসের মিলনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। ইংরেজীতে যাকে বলে milk of human kindness, সেই করুণার ক্ষীরধারাই তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

১৩৩৪ কিংবা ১৩৩৫ সালে দিল্লিতে যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়, কেদারনাথ তার এক শাখার সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত অমল হোম সেই অধিবেশন থেকে ফিরে এলে তাঁর কাছে শুনলাম, কেদারনাথের প্রবন্ধ 'পেনশনের পরে' শুনে শ্রোতারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁকে কিরকম দেখলেন? অমলবাবু উত্তর দিলেন, ভদ্রলোক যেন পাকা আমটি। কিছুকাল পরে কেদারনাথের সঙ্গে কয়েকবার আলাপের এবং

তাঁর প্রীতিলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে পুরুষের বর্ণনায় 'সৌম্য' শব্দটির বহু প্রয়োগ দেখা যায়, এখন বাংলাতেও খুব চলে। আমাদের দেশে সুদর্শন সাহিত্যিকের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু কেদারনাথকে দেখেই মনে হয়েছিল—হ্যাঁ, এইরকম পুরুষকেই সৌম্য বলা সার্থক।

যাঁরা শুধুই লেখক, অর্থাৎ রাজনীতিক বা ব্যবসাদার নন, সাধারণে তাঁদের নির্বিবাদ শান্ত ভালমানুষ মনে করে। মৎস্যজাতিও নিরীহ, কিন্তু সুবিধা পেলে পরস্পরকে কামড়াতে ছাড়ে না। অখ্যাত না হলে সাহিত্যিককেও মাঝে মাঝে স্বজাতির দংশন সইতে হয়। জলধর সেন 'জলধর দাদা' নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁর অন্য উপাধি ছিল অজাতশত্রু। কিন্তু তিনিও আক্রমণ থেকে নিস্তার পান নি। কেদারনাথের সৌভাগ্য এই যে তিনি আমরণ যথার্থ অজাতশত্রু ছিলেন। অনেক লেখকের রচনায় বিশেষ ভঙ্গী বা মুদ্রাদোষ থাকে, সকলের তা ভাল লাগে না। কেদারনাথের পদ্ধতিরও সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে বিদ্রূপ করবার সাহস কারও হয় নি।

আমরা এক যশস্বী লেখক ও জনপ্রিয় সৎপুরুষকে হারিয়েছি, কিন্তু চিরস্থায়ী সম্পদ রূপে তাঁর রচনা তিনি আমাদের দান করে গেছেন। কেদারনাথ লিখে গেছেন, তাঁর দুই আন্তরিক কামনা পূর্ণ হয়েছে—'শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ, বন্ধুত্বলাভ রবীন্দ্রের।' অধিকন্তু, 'ছিল যাহা আশাতীত, স্বাধীনতা,...তারও দেখা পেলাম আজ।' তিনি পূর্ণকাম হয়ে মহাযাত্রা করেছেন, এই আমাদের সান্ত্বনা।



ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনা

(১৩৫৯/১৯৫২)

যিনি কৃতকর্মা এবং যাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কৃতি লোকে আশা করে, তিনি যদি কর্মে রত থেকেই সহসা মারা যান তবে লোকে বলে, ইন্দ্রপাত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ খ্যাতনামা দেশনেতা শিল্পপতি বা আচার্য ছিলেন না, বিদ্যাবত্তাসূচক উপাধিও তাঁর ছিল না, দেশের অল্প লোকই তাঁর কাজের খবর রাখত। তথাপি বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর মৃত্যুতে ইন্দ্রপাত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ জীবদ্দশাতেই প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্মের মান সর্বসম্মতভাবে নির্ধারিত হয়েছে এমন বলা যায় না। সাহিত্য শব্দের প্রাচীন অর্থ আজকাল প্রসারিত হয়েছে, শুধু কাব্য আর কথাগ্রন্থ নয়; দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক রচনাও সাহিত্য। কিন্তু অনেকে মনে করেন, creative art ভিন্ন প্রকৃত সাহিত্য হয় না। কাব্য গল্প বা সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু প্রাচীন রচনার উদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যা লেখা হয় তা সাহিত্য নয়, সংকলন-জাতীয় কর্ম। এঁদের মতে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যস্রষ্টা নন, সাহিত্যের উদ্ধারক ও সংরক্ষক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যা করেছেন তা সৃষ্টিকর্ম কি স্থিতিকর্ম, সাহিত্যিকগণের কোন্ শ্রেণীতে তাঁর স্থান, তাঁর মর্যাদা কবি বা কথাকারের চাইতে বেশী কি কম, ইত্যাদি আলোচনায় লাভ নেই। তিনি যদি শুধু সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার ও উন্নতিসাধক হতেন, অথবা শুধু পত্রিকাসম্পাদক বা পুস্তকপ্রকাশক হতেন, তবে বলা চলত যে তিনি ঠিক সাহিত্যিক নন, সাহিত্যসহায়ক মাত্র। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ আজীবন গ্রন্থ প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এই কর্ম কি সাহিত্যরচনা নয়, শুধুই মোহিতলাল-কথিত খনিত্র-কর্ম?

মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা আছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, সর্বপ্রকার সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগের অর্থাৎ প্রেয় ও শ্রেয় লাভের আগ্রহ আছে। এই স্পৃহা কৌতূহল ও আগ্রহই মনুষ্যত্বের

বিশিষ্ট লক্ষণ, এবং ভাষা দ্বারা তা প্রকাশ বা চরিতার্থ করবার চেষ্টার নামই সাহিত্য। তথ্যমূলক রচনা অপেক্ষা রস- বা কল্পনা-মূলক রচনা শ্রেষ্ঠ—এই ধারণা সংকীর্ণ বুদ্ধির লক্ষণ।

ব্রজেন্দ্রনাথ যে সাহিত্য রচনা করেছেন তার অবলম্বন ইতিহাস। প্রথম জীবনে তিনি মোগল যুগ সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর মাতৃভূমি বাংলা দেশেই ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন। গত দেড় শ বৎসরে এদেশে যে সাহিত্যিক অভ্যুদয় হয়েছে এবং বাঙালী সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে, ব্রজেন্দ্রনাথ তারই ঐতিহাসিক ভিত্তি রচনা করেছেন। সাহিত্য-সেবকগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখে তিনি তাঁদের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'বাংলা সাময়িক পত্র' এবং আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।

এই গ্রন্থ রচনায় তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাকে তপস্যা বলা চলে। ইংরেজ প্রভৃতি জাতি নরম্যান টিউডর ইত্যাদি আমলের জীর্ণ ঘর-বাড়ি সযত্নে রক্ষা করে। শুধু মন্দির মূর্তি ও চিত্র নয়, প্রাচীন গ্রন্থ, চিঠিপত্র, অস্ত্র, গৃহসজ্জার আসবাব, তৈজস দ্রব্য, পরিধেয়, অলঙ্কার ইত্যাদি অতীত যুগের বিবিধ নিদর্শন মহামূল্য জ্ঞানে সঞ্চয় করে। প্রাচীনের প্রতি আমাদের এই মমতা নেই। দেবমন্দির ও তৎসংক্রান্ত বস্তু রক্ষায় কতকটা আগ্রহ আছে বটে, রাজাদের তোশাখানাতেও অনেক সেকেলে জিনিস রাখা হয়, কিন্তু সাধারণ লোকের বাড়িতে দু-এক শ বছর আগেকার আসবাব অলংকার বাসন ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া শক্ত।

ইংরেজী বিদ্যা শিখে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে ইতিহাস মানে শুধু রাজা-রাজড়ার কীর্তি বা অকীর্তি, যুদ্ধ, আর অসংখ্য সন-তারিখ। ব্রজেন্দ্রনাথ এই মোহ কাটিয়ে উঠে স্বজাতির সাহিত্যচেষ্টা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মন দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—'পূর্বপুরুষের কার্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই।...সরকারী দলিলপত্রে ও গ্রন্থাগারগুলিতে ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশে বাঙালী কি ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড় একটা প্রমাণ নাই।' এই উদাসীনতার প্রতিকার ব্রজেন্দ্রনাথ করেছেন। বলা যেতে পারে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে ভূমিকা ছাড়া তাঁর নিজের লেখা তো কিছুই নেই, শুধু

খবরের কাগজ থেকে সংকলন। এর জন্যই তাঁকে ইতিহাসকার আর সাহিত্যকার বলতে হবে?

অবশ্যই বলতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ যে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে একটা মৌলিক গ্রন্থ তিনি অল্পায়াসেই লিখতে পারতেন। তা হয়তো ধারাবাহিক ইতিহাস হত কিন্তু নিশ্ছিদ্র হত না। সেরকম গ্রন্থ রচনার লোভ সংবরণ করে তিনি সকল ক্রটি আর বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠেছেন! তাঁর গ্রন্থ স্বতঃপ্রমাণ ঐতিহাসিক প্রদর্শভাণ্ডার। সেকালের বাঙালী কিভাবে জীবন যাপন করত, কি চিন্তা করত তা ব্রজেন্দ্রনাথ নিজে বলেন নি, তাঁর সংগ্রহই বলেছে। অতীতকে তিনি কথা কইয়েছেন। তাঁর উদ্যম ও পদ্ধতি অভিনব, কিন্তু তাঁর সাধিত কর্ম ইতিহাসও বটে সাহিত্যও বটে।

ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, 'সংবাদপত্রের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুইই আছে। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার দায়িত্ব ইতিহাসলেখকের।' তিনি আরও বলেছেন, 'এ যুগের সংবাদপত্র বিগত শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মিথ্যাচারী।' তাঁর মুখে শুনেছিলাম, আরও এই উপাদান সংগ্রহ হলে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা তাঁর আছে।

আশা করি ব্রজেন্দ্রনাথের অনুবর্তীগণ আরও উপাদান সংগ্রহ করবেন এবং অচির ভবিষ্যতে কোনও যোগ্য লেখক সমস্ত উপকরণ যাচাই আর অবলম্বন করে সেকালের বাঙালী সমাজের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখবেন।



বাংলা ছন্দের মাত্রা

আমি ছন্দোবিশারদ নই, কিন্তু আমার একটা চলনসই কর্ণেন্দ্রিয় আছে যার দ্বারা বোধ হয় যে অমুক পদ্যের ছন্দটা ঠিক, অমুকটার বেঠিক। হয়তো কানের বা পাঠের বা অভিজ্ঞতার দোষে মাঝে মাঝে ঠিক ছন্দেও ত্রুটি ধরি, বেঠিক ছন্দেরও পতন বুঝতে পারি না। তথাপি নিজের কানের উপর নির্ভর করে যথাবুদ্ধি বাংলা ছন্দ বিশ্লেষের চেষ্টা করছি। অনেকে ছন্দের রহস্য না জেনেও ভাল পদ্য লিখতে পারেন, অনেক সাধারণ পাঠকও ছন্দ বজায় রেখে পড়তে পারেন। আমি সেই সহজ সংস্কারবশেই ছন্দোজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

চিত্রশাস্ত্রকার বিধান দিতে পারেন যে মানুষের মাথার যে মাপ হবে তার সঙ্গে চোখ নাক ধড় হাত পা প্রভৃতির এই এই অনুপাত থাকবে। আরও অনেক নিয়ম তিনি বিজ্ঞানীর মতন সূত্রাকারে বেঁধে দিতে পারেন। ঐসমস্ত নিয়ম অনুসারে কেউ যদি ছবি আঁকে তবে তা শাস্ত্রসম্মত হবে, কিন্তু ভাল নাও হতে পারে। যে যে লক্ষণ থাকলে চিত্র উত্তম হয় তার সম্পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া শাস্ত্রের সাধ্য নয়। শাস্ত্রকার কেবল স্থূল নিয়ম দিতে পারেন। ছন্দঃশাস্ত্রেও এই কথা খাটে। ছন্দের স্থূল নিয়মের আলোচনাই সুসাধ্য।

'ছন্দ' শব্দের ব্যাপক অর্থ করা যেতে পারে—পর্বে পর্বে বিভক্ত সুপাঠ্য সুশ্রাব্য শব্দধারা। ধারার বিভাগ অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিরাম বা একান্বয়ভঙ্গ (break of monotony) চাই, আবার বিভাগগুলির সংগতি বা সামঞ্জস্য (harmony)ও চাই। কেন সুশ্রাব্য হয়, কিসে সংগতি হয়, তা বলা আমার সাধ্য নয়। যে সকল ছন্দ সুপ্রচলিত তাদের স্পষ্ট ও সাধারণ লক্ষণগুলিই বিচার করে দেখতে পারি। ছন্দের চরণসংখ্যা, পর্ববিভাগ, যতি এবং স্থানবিশেষে স্বরাঘাত বা জোর(stress)ও আমার আলোচ্য নয়। বিভিন্ন ছন্দঃশ্রেণীর যা কঙ্কালস্বরূপ, অর্থাৎ মাত্রাসংস্থান বা মাত্রাগণনার রীতি, কেবল তার সম্বন্ধেই লিখছি। মাঝে মাঝে সংস্কৃত রীতির উল্লেখ করতে হয়েছে, কারণ বাংলা ছন্দের প্রকৃতি আলাদা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

প্রথমেই কয়েকটি শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা দরকার, নয়তো বোঝবার ভুল হতে পারে।

হরফ ও অক্ষর

'অক্ষর' শব্দ সাধারণত দুই অর্থে চলে। প্রথম অর্থ হরফ, যেমন অ ক্ক কু কে ক্র ৎ ং ঃ। দ্বিতীয় অর্থ—syllable। এই প্রবন্ধে প্রথম অর্থে 'অক্ষর' লিখব না, 'হরফ' লিখব। দ্বিতীয় অর্থেই 'অক্ষর' লিখব। এক শ্রেণীর বাংলা ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলা হয়, সেখানে 'অক্ষর' মানে হরফ। 'অক্ষরবৃত্ত' নামটি ভ্রান্তিজনক, কিন্তু বহুপ্রচলিত, সেজন্য বজায় রেখেছি।

'অক্ষর' বা syllable শব্দে বোঝায়—শব্দের নূন্যতম অংশ যার পৃথক্ উচ্চারণ হতে পারে। আগে বা পরে স্বরবর্ণ না থাকলে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করা যায় না, সেজন্য কেবল ব্যঞ্জনবর্ণে অক্ষর হতে পারে না। র ল শ ষ স স্বরযুক্ত না করেও উচ্চারণ করা যায় বটে, কিন্তু সাধারণ ভাষায় সেরকম প্রয়োগ নেই। প্রতি অক্ষরে থাকে—শুধুই একটি স্বর, অথবা একটিমাত্র স্বরের সঙ্গে এক বা একাধিক ব্যঞ্জন। অনুস্বার বিসর্গও ব্যঞ্জনস্থানীয়। অক্ষরের উদাহরণ—অ তু উৎ কপ্ দ্বী প্রাং স্তঃ। 'জল' সংস্কৃতে ২ অক্ষর—জ-ল, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে 'জল' হসন্ত সেজন্য ১ অক্ষর। 'জলছবি' ৩ অক্ষর—জল-ছ-বি, 'জলযোগ' ৩ অক্ষর—জ-ল-যোগ, 'জলকেলি' ৪ অক্ষর—'জ-ল-কে-লি'। 'অন্তঃপাতী'—অন্-তঃ-পা-তী কিংবা অ-ন্তঃ-পাতী। 'অধিষ্ঠাত্রী'—অ-ধিষ্-ঠাৎ-রী কিংবা অ-ধি-ষ্ঠা-ত্রী।

একটিমাত্র স্বর থাকাই অক্ষরের সাধারণ লক্ষণ। শব্দে যতগুলি স্বর ততগুলি অক্ষর। কিন্তু বাংলায় কতকগুলি দ্বিস্বর অক্ষর চলে, যেমন 'এই, বউ, খাও'। এইরকম জোড়াস্বর বা dipthong ঐ ঔ বর্ণের তুল্য এবং অক্ষরে এক স্বর রূপে গণনীয়। অথবা ধরা যেতে পারে যে দ্বিতীয় স্বরটি ব্যঞ্জনধর্মী, কারণ তার টান নেই।

মাত্রা, স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ, অক্ষরের লঘুগুরু ভেদ

'মাত্রা'র অর্থ—স্বরবর্ণের উচ্চারণকাল। ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রা নেই, ব্যঞ্জন যে স্বরকে আশ্রয় করে তারই মাত্রা আছে। ব্যঞ্জনের মাত্রা আছে মনে করলে অনর্থক বিভ্রাট হয়। সংস্কৃতে স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘভেদ আছে, হ্রস্বস্বরের এক মাত্রা দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা। ছন্দে অক্ষরেরও লঘুগুরুভেদ ধরা হয়। যে অক্ষরের অন্তর্গত স্বর হ্রস্ব তা লঘু, যার স্বর দীর্ঘ তা গুরু। সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে হ্রস্ব স্বরও দীর্ঘতা পায়—যদি তার পরে অনুস্বর বা বিসর্গ থাকে অথবা হস্‌চিহ্নিত ব্যঞ্জন বা যুক্তব্যঞ্জন থাকে। তা ছাড়া দরকার হলে চরণের

শেষের স্বরও দীর্ঘতা পায়—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥

প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে পূর্ববর্তী স্বরের উপর তার প্রভাব হয় না। বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের স্বাভাবিক ভেদ নেই, কেবল স্থান বিশেষে ঐ ঔ দীর্ঘ হয়।

উক্ত সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে এইসকল অক্ষরের অন্তর্গত স্বর হ্রস্ব, সেজন্য অক্ষরগুলি লঘু—অ চ কি তু নৃ প্র দ্বি ক্ষু। এইগুলি গুরু, কারণ অন্তর্গত স্বর দীর্ঘ—আ কা কী ভূ সে নৌ কিং নিঃ কিম্ পূর্ ন্যস্ ক্ষিপ্। 'শিল্প' শব্দের ই-কার দীর্ঘ, কারণ পরে যুক্তব্যঞ্জন আছে।

সংস্কৃত নিয়মে 'সূত' আর 'সুপ্ত' দুই এরই আদ্য স্বর দীর্ঘ—এবং অন্ত্য স্বর হ্রস্ব, সেজন্য আদ্য অক্ষর সূ-, সুপ্- গুরু এবং অন্ত্য অক্ষর -ত লঘু। 'কারু, দীন, শৌরি' এবং 'সত্ত্ব, দুষ্ট, দীপ্তি, সৈন্য' সবগুলিই ঐপ্রকার, একটির বদলে অন্য একটি বসালে দোষ হয় না। সূ- আর সুপ্- অক্ষরের যে ঊ উ আছে তাদের উচ্চারণকাল বা মাত্রা সমান। কিন্তু সূ- আর সুপ্- অক্ষরের ধ্বনির ওজনও কি সমান? সূ-এর উচ্চারণে টান আছে, সুপ্-এ ঘাত বা ধাক্কা বা সহসা ধ্বনিরোধ আছে, দুটিই সমান হতে পারে না। উক্ত দুরকম অক্ষরের অনুষঙ্গী দুরকম দীর্ঘস্বরের পার্থক্যসূচক পরিভাষা আছে কিনা জানি না। কাজ চালাবার জন্য নাম দিচ্ছি—'স্বতোদীর্ঘ', অর্থাৎ যে স্বর সংস্কৃতে স্বভাবত দীর্ঘ, যেমন 'সূত'এর ঊ; 'পরতোদীর্ঘ', অর্থাৎ যে স্বর হ্রস্ব হলেও পরবর্তী যুক্তব্যঞ্জনাদির প্রভাবে দীর্ঘ হয়, যেমন 'সুপ্ত'এর উ। অক্ষরের ঐরকম ভেদসূচক নাম—'স্বতোগুরু, পরতোগুরু'। সংস্কৃত ছন্দে এই ভেদ গ্রাহ্য হয় না—

রাগেণ বালারুণকোমলেন
চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার।

প্রথম পঙ্ক্তিতে যুক্তব্যঞ্জন নেই, দ্বিতীয়তে আছে, অথচ ছন্দ একই। বাংলা ছন্দের শ্রেণীভেদে পরতোগুরু অক্ষর মানা হয় কিন্তু ঐ ঔ ছাড়া স্বতোগুরু মানা হয় না, আবার কৃত্রিমগুরুও মানা হয়—সে কথা পরে বলব।

সংস্কৃত ছন্দে উক্ত ভেদের নিয়ম না থাকলেও নিপুণ কবি ধ্বনিবৈচিত্র্যের জন্য স্বতোগুরু বা পরতোগুরু অক্ষর নির্বাচন করে প্রয়োগ করেন। এই

নির্বাচনের সূত্র কবির মাথাতেই থাকে, ছন্দঃশাস্ত্রে তা নেই।

অক্ষর ও মাত্রা সম্বন্ধে আর একটু বলবার আছে। কোনও শব্দের অক্ষরগুলি দুই রীতিতে পৃথক্ করে দেখানো যেতে পারে।। প্রথম রীতি—শব্দের যুক্তব্যঞ্জন না ভাঙা, যেমন সু-প্ত, শ্র-দ্ধা-বান্। কিন্তু এতে পরতোদীর্ঘতা প্রকাশ পায় না। সু- আর শ্র- এর স্বর পরতোদীর্ঘ, কিন্তু অক্ষরে তার লক্ষণ নেই। দ্বিতীয় রীতি—যথাসম্ভব যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষ করা, যাতে স্বরের পরতোদীর্ঘতা (বা অক্ষরের পরতোগুরুতা) অক্ষর দেখলেই বোঝা যায়, যেমন সুপ্-ত, শ্রদ্-ধা-বান্। এই প্রবন্ধের উদাহরণে দ্বিতীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু যে বাংলা ছন্দে যুক্তব্যঞ্জনের জন্য পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় না সেখানে প্রথম রীতিতে অক্ষর ভাগ হয়েছে, যেমন জ-ন্মে-ছিস।

সংস্কৃত ছন্দ

বাংলা ছন্দের আলোচনার আগে সংস্কৃত ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক মনে করি, তাতে বাংলা ছন্দের সূত্রগঠন সহজ হবে। সংস্কৃত নিয়ম খুব বাঁধাধরা; পদ্যকারের স্বাধীনতা অল্প, সেজন্য নিয়মের সূত্র সরল। সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে—অক্ষরছন্দ বা বৃত্ত, এবং মাত্রাছন্দ বা জাতি।

অক্ষরছন্দের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা নিয়ত; মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাসও নিয়ত, অর্থাৎ লঘুগুরুভেদে অক্ষর সাজাবার বাঁধা নিয়ম আছে। মিশ্র ছন্দও চলে, যেমন ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে উপজাতি ছন্দ। মন্দাক্রান্তা অমিশ্র ছন্দ, সব চরণ সমান। অক্ষর ভাগ করে তার উদাহরণ দিচ্ছি—

কশ্-চিৎ কান্-তা-বি-র-হ-গু-রু-না স্বা-ধি-কা-রপ্-র-মৎ-তঃ
শা-পে-নাস্-তং-গ-মি-ত-ম-হি-মা বর্-ষ-ভোগ্-য়ে-ণ ভর্-তুঃ।

প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা ১৭, মাত্রাসংখ্যা ২৭। উদাহরণের শব্দগুলির যথাক্রম অক্ষরবিন্যাস নীচে দেওয়া হল, লঘু অক্ষরের চিহ্ন ১, গুরু অক্ষরের ২—

২২ ২২১১১১১২ ২১২২১২২
২২২২১১১১১২ ২১২২১ ২২

মাত্রাচ্ছন্দের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা প্রায় অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত। যথা পজ্ঝটিকা ছন্দে—

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥

যথাক্রমে চার চরণের অক্ষরসংখ্যা ১১, ১২, ১০, ১০। মাত্রাসংখ্যা প্রতি চরণে ১৬। অক্ষরবিন্যাস এইরকম—

২১ ১২১ ১২১১২২
১১ ১১২২ ১১১ ১২২
২১১২ ১১২২২২
২২ ২১ ১২১১ ২২

সংস্কৃত পদ্যে চরণের শেষে মিল কম দেখা যায়। যা আছে তা প্রায় মাত্রাচ্ছন্দে, যেমন পজ্ঝটিকায়, গীতগোবিন্দে, 'কজ্জলপূরিতলোচনভারে' প্রভৃতি স্তোত্রে। কারণ বোধ হয় এই—অক্ষরচ্ছন্দে অক্ষরবিন্যাস লঘুগুরুভেদে নিয়মিত, পর্যায়ক্রমে তার আবর্তন হয়। এমন ছন্দের মাধুর্য মিলের উপর নির্ভর করে না। মাত্রাচ্ছন্দে এই আবর্তনের অভাবে কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায়, তার পূরণের জন্যই মিলের চেষ্টা। অথবা এও হতে পারে যে চরণের মিল করতে গেলে অক্ষরচ্ছন্দের কড়া নিয়ম মানা শক্ত হয়, তাই পদ্যকার অপেক্ষাকৃত স্বাধীন মাত্রাচ্ছন্দের শরণ নেন।

বাংলা ছন্দ

বাংলা ছন্দের প্রচলিত শ্রেণী তিনটি। সাধারণত তাদের নাম দেওয়া হয়—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। তা ছাড়া সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণও কিছু চলে। বাংলায় স্বতোদীর্ঘ স্বর নেই, কিন্তু ছন্দের শ্রেণীবিশেষে ঐ ঔ দীর্ঘ হয় এবং পরতোদীর্ঘ ও কৃত্রিমদীর্ঘ স্বরও চলে।

বাংলা ছন্দের সাধারণ লক্ষণ—চরণের নিয়ত মাত্রাসংখ্যা, যেমন অধিকাংশ সংস্কৃত ছন্দে। অনেক আধুনিক ছন্দের চরণ অত্যন্ত অসমান, তথাপি তার জন্য সুশ্রাব্যতার হানি হয় না, বরং বৈচিত্র্য হয়। কিন্তু এইসব ছন্দের সূত্র-নিরূপণ অসম্ভব। শুধু বলা যেতে পারে যে অমুক পদ্যের শব্দগুলির মাত্রা অমুক শ্রেণীর রীতিতে ধরা হয়েছে। কিন্তু তাও আবার সর্বত্র স্থির করা যায় না॥

অক্ষরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্তের উদাহরণ—সাধারণ পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি। এই শ্রেণীর ছন্দের প্রধান লক্ষণ—চরণের নিয়ত হরফ-সংখ্যা, যেমন পয়ারের প্রতি চরণে ১৪ হরফ। স্বরান্ত ব্যঞ্জন, হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন, যুক্তব্যঞ্জন, অনেক স্থলে অনুস্বার পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়, কেবল বিসর্গ ধরা হয় না। 'ঐ' এক হরফ, কিন্তু 'ওই' দু হরফ। 'সর্দার' ৩ হরফ, কিন্তু দরকার হলে 'সরদার' লিখে ৪ হরফ করা যায়। 'বাগ্দেবী' আর 'বাগ্‌দেবী' একই শব্দ, অথচ প্রথমটির ৩ হরফ দ্বিতীয়টির ৪ হরফ ধরা হয়। আসল কথা—হরফের হিসাব একটা কৃত্রিম চাক্ষুষ উপায়। ছন্দের ব্যঞ্জন মুখে, ধারণা কানে। মুখ আর কানের সাক্ষ্য নিয়েই সূত্রনির্ণয় করতে হবে।

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

যদি প্রত্যেক হরফ স্বরান্ত করে পড়া হয় তবে বলা যেতে পারে—প্রতি চরণে ১৪ হরফ, ১৪ অক্ষর, ১৪ মাত্রা। কিন্তু যদি সহজ রীতিতে পড়া হয় তবে হসন্ত উচ্চারণের উপর নজর রেখে এইরকমে অক্ষর ভাগ করা যেতে পারে—

পা-খি সব ক-রে রব রা-তি পো-হা-ই-ল,
কা-ন-নে কু-সুম-ক-লি স-ক-লি ফু-টি-ল।

প্রথম চরণে ১২ অক্ষর, দ্বিতীয়তে ১৩। হসন্ত উচ্চারণের জন্য 'সব, রব, -সুম' এই ৩ অক্ষর পরতোগুরু হয়েছে, অন্য অক্ষরগুলি লঘু। দুই চরণেই ১৪ মাত্রা। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সূত্র এত সহজে পাওয়া যাবে না। সকল পদ্যই যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশুপাঠ্য নয়।

ব-হু প-রি-চ-র্যা ক-রি' পে-য়ে-ছি-নু তো-রে,
জ-ন্মে-ছিস ভ-র্তৃ-হী-না জ-বা-লার ক্রো-ড়ে।

এখানে 'জন্মেছিস' আর 'জবালা'র এই দুই শব্দের উচ্চারণ হসন্ত, সেজন্য '-ছিস' ও '-লার' এই দুই অক্ষর পরতোগুরু। কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে 'পরিচর্যা, জন্মেছিস, ভর্তৃহীনা' শব্দে পরতোগুরু অক্ষর উৎপন্ন হয় নি। প-রি-চ-র্যা ৪টিই লঘু অক্ষর। চ-এর অ-কারকে চেপে হ্রস্ব করে রাখা হয়েছে, তার ফলে 'পরিচর্যা'র উচ্চারণকাল 'পেয়েছিনু'র সমান। 'জন্মেছিস, ভর্তৃহীনা'ও এইরকম। উপরের উদাহরণে যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা

১৪, ১৪, অক্ষরসংখ্যা ১৪, ১২, মাত্রাসংখ্যা ১৪, ১৪।

অক্ষরবৃত্তের রীতি—হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন বা পূর্বোক্ত দ্বিস্বর থাকলে অক্ষর পরতোগুরু হয়, কিন্তু যুক্তব্যঞ্জন বা ঐ ঔ থাকলে হয় না। বিসর্গের জন্যও হয় না, 'দুঃখ'এর দুই অক্ষরই লঘু। শব্দের মধ্যে অনুস্বার থাকলে প্রায় হয় না, কিন্তু শেষে থাকলে হয়। 'সংখ্যা'র দুই অক্ষরই লঘু, কিন্তু 'সুতরাং'এর প্রথম দুই অক্ষর লঘু, শেষ অক্ষর গুরু।

উক্ত রীতির বশে অক্ষরবৃত্তের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা নিয়ত, অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত এবং সাধারণত হরফসংখ্যার সমান। অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত।

যুক্তব্যঞ্জনের জন্য অক্ষরের গুরুতা হয় না বটে, কিন্তু তার ঘাত বা ধাক্‌কা নিপুণ কবিরা উপেক্ষা করেন না, উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করে বৈচিত্র্যসাধন করেন। পাঠকও বিশেষ বিশেষ স্বরে জোর দিয়ে ঘাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন।

মাত্রাবৃত্ত

এই শ্রেণীর ছন্দে যুক্তব্যঞ্জন অবজ্ঞাত নয়, সেজন্য পরতোগুরু অক্ষর প্রচুর দেখা যায়। অনুস্বার, বিসর্গ, হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন এবং যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে অক্ষর পরতোগুরু হয়। যে অক্ষরে ঐ ঔ বা দ্বিস্বর আছে তাও গুরু। কিন্তু শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তার প্রভাব পূর্ববর্তী শব্দের অন্ত্য স্বরে প্রায় হয় না।

মাত্রাবৃত্তের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত। যথা—

পল্‌-ল-ব-ঘ-ন আম্‌-র-কা-ন-ন রা-খা-লের খে-লা-গে-হ্‌,
স্তব্‌-ধ অ-তল দি-ঘি-কা-লো-জল নি-শী-থ-শী-তল স্নে-হ।

যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৮, ১৯, অক্ষরসংখ্যা ১৭, ১৬, মাত্রাসংখ্যা ২০, ২০।

অনেকে বলেন—মাত্রাবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জন ২ মাত্রা। তাতে হিসাব মিলতে পারে, কিন্তু উক্তিটি ভ্রমাত্মক। 'পল্লব' শব্দের ল্ল ২ মাত্রা বললে বোঝায় ল্ল-এর অ-কার ২ মাত্রা। কিন্তু তা সত্য নয়, প-এর অ-কারই ২ মাত্রা, কারণ পরে যুক্তব্যঞ্জন আছে। পল্‌-ল-ব এইরকমে অক্ষরভাগ করলে মাত্রাবিপর্যয়

ঘটে না। অনুরূপ—উৎ-সা-হ, সং-হ-ত, দুঃ-স-হ।

বাংলা মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই—বাংলায় ঐ ঔ ছাড়া স্বতোদীর্ঘ স্বর নেই। মাত্রাবৃত্তে যদি অক্ষরবিন্যাস লঘুগুরুভেদে নিয়মিত করা হয় তবে তার সঙ্গে সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের সাদৃশ্য হয়। উদাহরণ শেষে আছে।

স্বরবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বাংলা ছন্দের নাম দিয়েছেন—'প্রাকৃত ছন্দ'। গ্রাম্য ছড়ায় ও গানে প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। 'স্বরবৃত্ত' নামের উদ্দিষ্ট অর্থ কি ঠিক জানি না। কেউ কেউ বলেন—এতে প্রতি চরণে স্বরবর্ণের (অতএব অক্ষরের) সংখ্যা সমান রাখা হয়। অনেক স্থলে তা হয় বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির লেখাতেও ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং তার জন্য ছন্দঃপাত হয় না। অতএব বলা চলে না যে নিয়ত স্বরসংখ্যাই এই শ্রেণীর লক্ষণ। স্বরবৃত্তের বিশিষ্টতা—মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য স্থানবিশেষে কৃত্রিম দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ।

বৃষ্-টি প-ড়ে́ টা-পুর টু-পুর ন-দেয় এ-র্ল বান,
শিব-ঠা-কু-রের বি-য়ে́ হ-বে́ তিন কন্-নে́ দান।

যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৭, ১৬, অক্ষরসংখ্যা ১৩, ১২, মাত্রাবৃত্তের রীতিতে গণিত মাত্রাসংখ্যা ১৮, ১৭। এই হিসাবে দ্বিতীয় চরণে এক মাত্রা কম পড়ে, কিন্তু ´ চিহ্নস্থানে প্রথম চরণে ২টি স্বর এবং দ্বিতীয় চরণে ৩টি স্বর প্রসারিত করায় কৃত্রিমগুরু অক্ষর উৎপন্ন হয়েছে, তার ফলে প্রতি চরণে ২০ মাত্রা হয়েছে। এই ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন—'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে।' অর্থাৎ—'বৃষ্টি' ৩ মাত্রা; শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে'ও ৩ মাত্রা।

দি-নের আ-লো́ নি-বে এ-র্ল সুয্-যি ডো-বে́ ডো-বে,
আ-কাশ ঘি-রে́ মেঘ জু-টে-ছে́ চাঁ-দের লো-ভে́ লো-ভে।
মে-ঘের উ-পর মেঘ ক-রে-ছে́, র-ঙের উ-পর রঙ।
মন্-দি-রে-তে́ কাঁ-সর ঘন্-টা বাজ্-ল ঠং ঠং।

উপরের ৪ পঙ্‌ক্তিতে যথাক্রমে হরফ-সংখ্যা ১৫, ১৭, ১৯, ১৬, অক্ষরসংখ্যা

১৪, ১৪, ১৩, ১২, মাত্রাবৃত্তানুসারে মাত্রাসংখ্যা ১৬, ১৭, ১৯, ১৮। ´চিহ্নস্থানে চার পঙ্‌ক্তিতে যথাক্রমে ৪, ৩, ১, ২, স্বর প্রসারিত করায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২০ মাত্রা হয়েছে। প্রথম 'ঠং' লক্ষণীয়—এখানে প্রসারণ ও অনুস্বার এই দুই কারণে অ-কার ৩ মাত্রা পেয়েছে।

স্বরবৃত্তের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত। মাত্রাগণনায় মাত্রাবৃত্তের রীতি অনুসৃত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত কৃত্রিমদীর্ঘ স্বরও ধরা হয়। কৃত্রিমদীর্ঘ স্বর (বা কৃত্রিমগুরু অক্ষর) থাকাতেই মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের প্রভেদ হয়েছে।

উল্লিখিত সংস্কৃত ও বাংলা বিভিন্ন ছন্দঃশ্রেণীর লক্ষণ এই সারণীতে সংক্ষেপে দেওয়া হল—

লক্ষণ	সংস্কৃত		বাংলা		
	অক্ষরচ্ছন্দ	মাত্রাচ্ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত
স্বতোগুরু অক্ষর	আছে	আছে	নেই	অল্প*	অল্প*
পরতোগুরু অক্ষর	আছে	আছে	অল্প ‡	আছে	আছে
কৃত্রিমগুরু অক্ষর	নেই	নেই	নেই	নেই	আছে
হরফ-সংখ্যা	অনিয়ত	অনিয়ত	নিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
অক্ষরসংখ্যা	নিয়ত	প্রায় অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
মাত্রাসংখ্যা	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত
অক্ষরবিন্যাস	নিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত

অসম ছন্দ ও গদ্য ছন্দ

পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর বাংলা ছন্দে দেখা যায় যে একচরণের মাত্রাসংখ্যা পরবর্তী কোনও এক চরণের সমান। এইরকম দু-একজোড়া চরণ মিলিয়ে দেখলেই ছন্দের শ্রেণী ধরা পড়ে। কিন্তু যেখানে চরণগুলি অসমান সেখানে উপায় কি? শব্দাবলীর মাত্রাভঙ্গী থেকে অনেক স্থলে বলা যেতে পারে যে

*কেবল ঐ ঔ থাকলে। ‡ কেবল বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন, দ্বিস্বর, বা শব্দের শেষে অনুস্বার থাকলে।

ছন্দটি অমুক শ্রেণীর। কিন্তু কতকগুলি ছন্দ, বিশেষত গদ্য ছন্দ, তিন শ্রেণীর কোনওটির সঙ্গে খাপ খায় না।

১। আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির পরে মুষ্টি হানি'
করিবে তাহারে উচ্চকিত
আতঙ্কিত

২। অধরা মাধুরী পড়িয়াছে ধরা
এ মোর ছন্দ বন্ধনে।
বলাকা পাঁতির পিছিয়ে পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।

৩। আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠিন কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়,
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলির ভঙ্গী থেকে বলা যেতে পারে প্রথমটি অক্ষরবৃত্ত, দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত, তৃতীয়টি স্বরবৃত্ত। প্রত্যেকটিতে যেন সমান মাত্রার এক একরকম ছন্দ থেকে এক একটি পঙ্‌ক্তি তুলে এনে অসমান মাত্রার গোছা বাঁধা হয়েছে। এরকম ছন্দকে মিশ্রছন্দ বলা যেতে পারে। কিন্তু—

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান করে।
মনে হল স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।

এই উদাহরণ একবারে স্বচ্ছন্দ, সাধারণ ছন্দের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ এরকম গদ্য ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন—'এতে পদ্যের ছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।'

সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ

সংস্কৃত ছন্দের সমস্ত নিয়ম বজায় রেখে কেউ কেউ বাংলা পদ্য লেখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সুবিধা হয় নি, কারণ স্বতোদীর্ঘ স্বর বাংলা ভাষার

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাতে রচনা কৃত্রিম হয়ে পড়ে। বলদেব পালিতের লেখা থেকে উপজাতি ছন্দের নমুনা—

দৈবানুকূলে বলহীন শক্ত,
বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈবে।
দৈবে হবে নির্জিত সূতপুত্র
তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়শ্রী।

প্রতি চরণে ১১ অক্ষর। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ ইন্দ্রবজ্রা, ১৮ মাত্রা; দ্বিতীয় চরণ উপেন্দ্রবজ্রা, ১৭ মাত্রা। অনুরূপ সংস্কৃত—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা
সরিদ্ বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত একটি মন্দাক্রান্তার নমুনা আছে—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্‌লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি।

সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের রীতিতে বাংলায় অনেক গান রচিত হয়েছে, যেমন 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'জনগণমন অধিনায়ক'। এইসব গানে স্বতোদীর্ঘ স্বর থাকলেও তার ফল ভালই হয়েছে, কারণ গানের তালের সঙ্গে দীর্ঘস্বরের টান সহজেই খাপ খায়।

বাংলা মাত্রাবৃত্তের নিয়মে, অর্থাৎ শুধু পরতোদীর্ঘ স্বর অবলম্বন করে কেউ কেউ সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু স্বতোদীর্ঘ স্বরের জন্য সংস্কৃতে যে লালিত্য হয় অনুকরণে তা পাওয়া যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত বাংলা মাত্রাবৃত্তে মালিনী ছন্দের নমুনা—

উড়ে চলে গেছে বুলবুল, শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্‌গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

প্রতি চরণে ১৫ অক্ষর, ২২ মাত্রা, অক্ষরবিন্যাস সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের রীতিতে, শুধু স্বতোগুরু অক্ষর নেই। অনুরূপ সংস্কৃত—

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নু কন্যাবতীর্ণা।

সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দে অক্ষরবিন্যাসের বাঁধাবাঁধি নেই, সেজন্য বাংলায় অনুরূপ রচনা আড়ষ্ট না করেও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে অল্পাধিক সাদৃশ্য রাখা যেতে পারে। যথা রবীন্দ্রনাথের—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

দুই চরণে যথাক্রমে ২০, ১৪ মাত্রা (চরণের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ)। অনুরূপ গীতগোবিন্দে—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

'ছন্দ' পুস্তকে সংস্কৃত শিখরিণী অক্ষরচ্ছন্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা রূপান্তরের একটি নমুনা আছে। এতে শুধু মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখা হয়েছে—

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে যা খুশি কহি কত;

সংস্কৃত নমুনা—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং/স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীম্

প্রতি ভাগে যথাক্রমে ১১, ১৪ মাত্রা।

পরিশেষে বাংলা মাত্রাবৃত্ত-মন্দাক্রান্তার একটি উদ্‌ভট নমুনা দিচ্ছি—

মন্দ্রাক্রান্তায় রচিল কালিদাস কাব্য মেঘদূত চমৎকার,
বাংলায় তদ্রূপ লঘুগুরুবিভেদ নেই বলেই শক্ত একটু
যুক্তাক্ষর তাই যত পার চালাও আর দেদার দাও হসন্ত,
ঠিক ঠিক জায়গায় বসালে পাবে এই তক্রে কিঞ্চিৎ দুধের স্বাদ॥



বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা বানানের রীতি নির্দিষ্ট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নভেম্বর ১৯৩৫এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হয়। এতে ছিলেন—রাজশেখর বসু (সভাপতি), প্রমথনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক)।

সমিতি নির্ধারিত বানানের নিয়মাবলী সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেন।—

বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -
১লা আশ্বিন ১৩৪৩

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ যত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা অধিক হইবে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু সাধারণ লেখায় তাহা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই, যথা—'গণ, বন, ঘন, জলখাবার, জলযোগ, আষাঢ়, গাঢ়; সহিত, গলিত, অশ্বতর, হ্রস্বতর, একদা, একটা; অচেনা, দেখা'। এইপ্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের বানান-সংস্কার যদি করিতে হয় তবে, বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এইপ্রকার শব্দের বাংলা বানান এখনও সর্বজনগৃহীতরূপে নির্ধারিত হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেচ্ছতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। এবং প্রয়োজনমত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে. সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

সমস্ত বাংলা শব্দের বানান এককালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে বানানের কয়েকটি মাত্র নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। নিয়মগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম হইবে। কেবল নিয়ম রচনা দ্বারা সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। নির্ধারিত বানান অনুসারে একটি শব্দতালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

বলা বাহুল্য, পদ্যরচনায় সকল ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে বানান করা সম্ভবপর নয়।

বানানের নিয়ম যাহাতে বর্তমান বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল হয় সেই

চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট লেখকগণ অধিকাংশ শব্দ যে রীতিতে বানান করেন তদনুসারে ই ঈ উ ঊ জ ও-কার ং ঙ শ ষ স প্রভৃতি প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি শব্দের প্রচলিত বানানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সামঞ্জস্যের জন্য এইগুলিকেও যথাসম্ভব সাধারণ নিয়মের অনুযায়ী করা হইয়াছে। পূর্বে কেবল 'খুসী, সয়তান, সহর, পালিস, ক্লাশ' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু আজকাল অনেকে মূল শব্দ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়া খুশী, শয়তান, শহর, পালিশ, ক্লাস' লিখিতেছেন। এই রীতিতে সহজেই 'নক্‌শা, শরবৎ, শরম, শেমিজ, জিনিস, শার্সি প্রভৃতি নিয়মানুযায়ী বানান প্রচলিত হইতে পারিবে। অবশ্য কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম না করিলে চলিবে না, কিন্তু ব্যতিক্রম যত কম হয় ততই ভাল। বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, তথাপি যেখানে দুই প্রকার বানানের পক্ষেই প্রবল অভিমত পাওয়া গিয়াছে সেখানে বিকল্পের বিধান করিতে হইয়াছে। পূর্বে 'সঙ্ক্রান্তি, সঙ্খ্যা' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু এখন কেবল 'সংক্রান্তি, সংখ্যা চলিতেছে। এই রীতিতে 'ভয়ঙ্কর, সঙ্গম' প্রভৃতি স্থানে 'ভয়ংকর', 'সংগম লিখিলে বানান সহজ হইবে। কালক্রমে সরলতর বানানই চলিবে এই আশায় এই প্রকার শব্দে বিকল্পের বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার শব্দের সংখ্যা অধিক নয়, সেজন্য যদি কিছুকাল দুই প্রকার বানানই চলে (যেমন এখন 'অহংকার' চলিতেছে) তবে ক্ষতি হইবে না।

বাংলার কয়েকটি বর্ণে রেফের পর দ্বিত্ব প্রচলিত আছে, সকল বর্ণে নাই, যথা—'কর্ম্ম, সর্ব্ব', কিন্তু 'কর্ণ, সর্গ'। হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ব হয় না। এই অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করিলে বাংলায় প্রচলিত অসংখ্য শব্দের বানান অপেক্ষাকৃত সরল হইবে। যে দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক বানান-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের দুই জন ব্যতীত সকলেই দ্বিত্ববর্জনের পক্ষে। কয়েকজন প্রবীণ লেখক বহুকাল হইতে তাঁহাদের লেখায় দ্বিত্ব পরিহার করিয়াছেন। আজকাল বঙ্গদেশে প্রকাশিত অনেক সংস্কৃত পুস্তকে দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে।

তদ্‌ভব শব্দে অনেকে মূল অনুসারে ণ প্রয়োগ করেন, যথা—'কাণ, সোণা'। কিন্তু সকল শব্দে এই রীতি অনুসৃত হয় না, যথা—'বামুন, গিন্নী'। বাংলা ক্রিয়াপদেও ণত্ব হয় না, যথা—'শোনা, করেন, করুন'। বহু বিশিষ্ট লেখক 'কান, সোনা' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন এবং এই রীতি ক্রমে ক্রমে বিশেষ

প্রচলিত হইতেছে। 'কোরাণ, গভর্ণর' প্রভৃতিতে ণত্ব করিবার কোনও হেতু নাই। যাঁহারা বানান-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ণ বর্জনের পক্ষে। অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন করিলে বানান সরল হইবে। 'রাণী' বানান অনেকেই রাখিতে চান, এজন্য এই শব্দে বিকল্প বিহিত হইয়াছে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভু' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভু'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মনি'।

৪। হস্-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণত হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ,

কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ্ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, তখ্ত্, জেম্স্, বন্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্কি, সট্কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয়, তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুল (চূল), তাড়ু (তর্দূ), জুয়া (দ্যূত)'।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্তি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বৌঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। জ য

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।

৭। ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে, যথা—'ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়—'এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। ং ঙ

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন।'

ং ও ঙ-এর প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্প ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই।'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিন্‌সে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে,

যথা—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্স্পিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'সরবৎ, শরবৎ; শরম, সরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা' (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

১১। ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব কমা বর্জন করা যাইতে পারে এবং -লাম বিভক্তি স্থানে-লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো,

খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই, শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোব), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে, লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্ ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুর রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধিরক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে, সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড'।

১৩। বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে, তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস (bus), বাল্‌ব্‌ (bulb), সার (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মন (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (Phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে '্যা'কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে hat = হৈট। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া

ও ঔ হয়, সেরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ ঊ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে, তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—সীল (seal), ঈস্ট (east), ঊর্স্টার (worcester), স্পূল (spool)'।

১৬। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৭। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

১৮। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ারবন্ড' না লিখিয়া এড্‌ওয়ার্ড, ওঅর-বন্ড লেখা উচিত। হার্ডওয়ার (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। s, sh

১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।

২১। z

z স্থানে জ বা জ্‌ বিধেয়।

২২। হস্‌-চিহ্ন

৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।



রবীন্দ্ররচনার বানান

(১৯৪৩)

বাংলা ভাষার এক বিশেষ সমস্যা অগণিত শব্দের ব্যাকরণ সম্মত একাধিক বিকল্প বানান—যা এই ভাষা শিক্ষা, রচনার শুদ্ধি রক্ষা ও মুদ্রণ পদ্ধতিকে জটিল ও বিশৃঙ্খল করে তুলছিল। এর সমাধান ও নিয়মাবলী সুনির্দিষ্ট করার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে বানান-সংস্কার সমিতি গঠন করেন, যার যোগ্যতম সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন রাজশেখর বসু। সাধারণের প্রবল বিরোধ বিতর্ক ও মতানৈক্য পার হয়ে সমিতি-নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়—এর বিশদ বিবরণ 'বানানের নিয়ম' প্রবন্ধে আছে।।

রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সময় বিশ্বভারতী এই বানানের সমতা ও সরলতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন অনুভব করেন, কারণ বহু বৎসরব্যাপী রচিত এই বিপুল সম্ভারে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিস্তর বানান-পার্থক্য দেখা দিয়েছে কবি স্বয়ং তা স্বীকার করে কারণস্বরূপ 'ভাবনা ও অভ্যাস'এর মধ্যে বৈষম্য নিয়ে খেদ প্রকাশ করেছেন। এই সমস্যা অতিক্রম করে সমতা ও সরলতা আনার প্রায় শেষকথা রাজশেখরকে তাই চিঠি দিয়ে মতামত চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে শ্রীকানাই সামন্ত। চিঠিটা পাই নি, তাই 'প্রশ্ন' অনুপস্থিত। কিন্তু প্রায় সব উত্তরই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং প্রায় এই নির্দেশ মেনেই আজও মুদ্রিত হয়ে চলেছে রবীন্দ্র রচনাবলী।

এই উত্তরমালাও এক সুরচিত প্রবন্ধ। —স:।

শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তর প্রশ্নের উত্তর

১। কবির সকল বই-এর বানান ইত্যাদি সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি নিজে একই পদ্ধতিতে চলেন নি, সর্বমান্য কোনও পদ্ধতি নেই। ভাষায় খুঁটিনাটি এত বেশী যে কবির গ্রন্থাবলীর জন্য একটা সম্পূর্ণ পদ্ধতি খাড়া করাও বৃহৎ ব্যাপার। সুতরাং যথাসম্ভব সংগতিরক্ষার চেষ্টা করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না।

কবি ইলেক পছন্দ করতেন না। ৫/৬ বৎসর আগে আমি একবার তাঁকে বলি—ও-কার লেখার চেয়ে ইলেক দেওয়া ঢের সোজা, আর তাতে শুধু দরকার মতন উচ্চারণ বোঝানো যায়, শব্দের পূর্বরূপ বিকৃত হয় না। কবি

এই যুক্তি মেনেছিলেন। কিন্তু তখন হ'ক হ'ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমার ধারণা—ক্রিয়াপদের একটি বড় ফর্দ কবির সামনে ধরলে তিনি সংগতিরক্ষার উপায়স্বরূপ এই বানান মেনে নিতেন।

করি না, করি নে। গরু গোরু দুইই ঠিক মনে করি।

২। কি, কী।—কবির অভিপ্রায় মোটামুটি এই বুঝেছি।—অব্যয় কি (তাই কি? তাই নাকি, হাঁ কি না)। সর্বনাম কী (কী চাই, বল কী!)। বিশেষ ক্রিয়াবিশেষণ কী (কী জিনিস, কী করিয়া, কী বুদ্ধি!)। বোধ হয় সর্বত্র এই নিয়ম মানেন নি।

৩। দুই শব্দের মাঝে হাইফেন থাকবে, কি ফাঁক হবে, কিংবা জুড়ে দেওয়া হবে তার নিয়ম বাঁধা বোধ হয় অসম্ভব। ইংরেজীতেও সংগতি নেই। কবির কোনও নির্দিষ্ট মত ছিল বোধ হয় না। সংগতির আশা ত্যাগ করে আপনাদের পছন্দমত ছাপবেন। আমার পছন্দ—পরে বহুবচনবাচক শব্দ থাকলে জোড়া হবে (লোকগুলো, যেসকল)। দ্বিরুক্ত শব্দে ফাঁক (বার বার, ধীরে ধীরে)। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন বা ইত্যাদিসূচক হলে জোড়া (কাপড়চোপড়, গাছপালা)। অনুকার শব্দে জোড়া (চকচক, ঝনঝন)। ক্রিয়াবিশেষণ বা বিশেষণ বাচক হলে অনেক স্থলে জুড়লে ভাল হয়। (এজন্য, যেহেতু, যেরকম, সবচেয়ে, সবসুদ্ধ, হয়তো)। জোড়া বা না জোড়া অনেকটা উচ্চারণের উপর নির্ভর করে—যেকেউ, যে মানুষ (বা যে-মানুষ)। হাইফেন যথাসম্ভব কম হলে ভাল।

৪। কবি অসংস্কৃত শব্দে ঈ-কারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আগেকার লেখায় ব্যতিক্রম আছে (চয়নিকা ৩০ সং।)—কাঙালিনী, বিজুলী, বিজুলি, পাখী, পশ্চিমী, বাঙালী, চখা চখীরে, চাহনী, ময়ূরকণ্ঠী, মাসী, বাঁশরী, হিন্দুস্থানী, গয়লানী)।

৫। কবির পুরনো বইএ ইংরাজি ইংরেজি দুইই। 'কিম্বা' প্রভৃতি শব্দে করির যেখানে ং স্থানে ম লিখেছেন সেখানে বদলাবার দরকার নেই।

৬। কবি আমাকে বলেছিলেন—বাংলা প্রয়োগে শব্দের শেষের বিসর্গ অনাবশ্যক (সংস্কৃতে মনঃ, দুর্বাসাঃ, স্বতঃ, বাংলায় মন, দুর্বাসা, স্বত)।

৭। হস্-চিহ্ন সম্বন্ধে কবির মত জানি না। বোধ হয় সংস্কৃত শব্দে অধিকাংশ স্থলে হস্-চিহ্ন বজায় রাখা ভাল (ব্যতিক্রম—ভগবান, বলবান,

(বুদ্ধিমান, বিপদ, দিক ইত্যাদি বহু শব্দ)। অসংস্কৃত শব্দে নিতান্ত দরকার না হলে হস্-চিহ্ন বর্জনীয় (পটকা, বালতি, আচমকা, চটকানো)। খণ্ড-ত আমার পছন্দ নয়, বাংলা ছাড়া কোনও ভাষায় নেই। কিন্তু জগৎ স্থানে জগত লিখলে লোকে খেপে উঠবে। চলন্তিকা ৪র্থ সংস্করণে অনেক অসংস্কৃত শব্দে ৎ স্থানে ত দিয়েছি (ওত, তফাত, মেরামত, শরবত)। বুদবুদ, প্রগল্‌ভ—হস্-চিহ্ন আবশ্যক। সংস্কৃতে ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌যন্ত্র; বাংলায় সাধারণে হস্-চিহ্ন দেয় না।

৮। কার্তিক, বর্তিকা শুদ্ধ, পাণিনিসম্মত। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ঢাকার গোবর্ধন শাস্ত্রী প্রমাণ দিয়েছেন। 'পাশ্চাত্য' অনেকে লেখেন। সামান্য একটু পরিবর্তনে যদি শব্দটিকে শুদ্ধ করা যায় তবে ত্ত্য লিখতে দোষ কি? (বাংলায় ত্ত হরফ আছে বলেই র্ত্ত লিখতে হবে কেন?)

৯। যদি দৃষ্টিকটু না হয় তবে যুক্তাক্ষর কিছু কমানো ভাল (উদ্‌গত, উদ্‌ঘাটন, ধিক্‌কার)। তন্‌ময় দৃষ্টিকটু। বাংলায় দ-এর পর ব-ফলা বা য-ফলার দুরকম উচ্চারণ। যেখানে স্পষ্ট উচ্চারণ (চ বা তুল্য) সেখানে হস্-চিহ্ন দিতে চাই, অন্যত্র যুক্তাক্ষর রাখতে চাই (উদ্‌বন্ধন, উদ্‌বাহু, তদ্‌বিধ, উদ্‌যোগ, উদ্‌যাপন, বিদ্বান, অদ্বৈত, উদ্যত, উদ্যান)। রচনাবলীতে অবশ্য এরকম করা হয় নি।

কবি আমাকে বলেছিলেন—বাংলায় ঐ ঔ তুলে দেওয়া উচিত (পইতা, বউ, মউমাছি)। আমি বলেছিলাম—সর্বত্র তা হবে কি? উত্তর—কেন হবে না। পৌষ সংস্কৃত শব্দ, বাংলাতে উচ্চারণ বদলায় নি, সুতরাং পউষ বর্জনীয়। ঔষধ ঔউষধ হয় নি।

আমার মতে ঐ (that) স্থানে সর্বত্র ওই লিখলে দৃষ্টিকটু হবে।

১০। বানানসমিতি কেবল কয়েকটি শব্দে য-এর বদলে জ-এর ব্যবস্থা করেছেন (কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল)। অন্য শব্দে জ কিংবা য আপনারা স্থির করবেন। খৃষ্ট স্থানে খ্রীষ্ট বা খ্রীস্ট লেখা ভাল। নবাগত অসংস্কৃত শব্দে রি বা রী স্থানে ঋ লেখা অনুচিত, কারণ ঋ-কারের মূল উচ্চারণ তা নয়। আমরা যা ভুল করে আসছি তা আর বাড়াবার দরকার কি। বাংলা উচ্চারণে শ ষ স সমান, কিন্তু নবাগত notice লিখতে নোটিশ বানান করা ঠিক নয়। নোটিস, বার্নিশ ঠিক।

১১। মর্ত্য, মর্ত; অর্ঘ, অর্ঘ্য—সবই শুদ্ধ। বাংলায় মর্ত্য বেশী চলে। অর্ঘ, অর্ঘ্য—কিছু অর্থভেদ আছে।

১২। ১নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

১৩। ইলেক দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন।

১৪। অর্থবোধে বাধা হলে হাইফেন দেওয়া ভাল। উদাহরণগুলিতে হাইফেন না দিলেও চলে।

১৫। বাংলায় যেসকল শব্দে অ্যা উচ্চারণ আছে অথচ বানানে এ-কার বহুপ্রচলিত, সেখানে কবির রীতি অনুসারে ে দেওয়া উচিত।

১৬। কবির লেখায় আগে ? এবং ! চিহ্ন খুব থাকত, শেষে প্রায় বাদ দিয়েছিলেন। বোধ হয় সর্বত্র বাদ দিলে মানে বোঝা শক্ত হবে। কমা-চিহ্ন সম্বন্ধেও ঐ কথা। বাক্যের প্রথমে এমন কি, অর্থাৎ, আর, কিন্তু থাকলে স্থলবিশেষে কমা দিলে ভাল হয়।

রাজশেখর বসু
৩০/৪/৪৩



বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ

২৪।১২।১৯৪০

শ্রীযুক্ত সুস্থিরকুমার বসু
সাধারণ সম্পাদক, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন
জামসেদপুর

সবিনয় নিবেদন,

আপনি জানতে চেয়েছেন 'বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক রূপ ও তাহা সর্বজনমান্য করিবার উপায় সম্বন্ধে আমার অভিমত কি। অনুমান করি আমার উত্তর আগামী সম্মেলনে পড়া হবে। সময় অল্প, সেজন্য সংক্ষেপে লিখছি। বহুদিন পূর্বে 'সাধু ও চলিত ভাষা' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তা থেকে কিছু কিছু নিয়েছি।

সভায় আলোচ্য বিষয়—বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ। তার মানে এই বুঝেছি—লিখিত বা সাহিত্যিক বাংলা ভাষার চেহারা কিরকম হলে আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী হবে। অর্থাৎ সাহিত্যের বাহনই আলোচ্য, বাহিত বিষয় অপ্রাসঙ্গিক।

ভাষার রূপের তিন অঙ্গ—(১) লিপি বা বর্ণমালার আকৃতি, (২) শব্দাবলীর প্রকার বা form, এবং (৩) বানান। প্রথম অঙ্গটির আলোচনা করব না, কারণ তার এখনও তেমন তাগিদ নেই।

শব্দাবলীর প্রকার নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে, এখনও তা থামে নি। সাধুভাষা ভাল না চলিতভাষা ভাল? তার ভঙ্গী কিরকম হওয়া উচিত—বঙ্কিমীয়, প্রাচীন রবীন্দ্রীয়, আধুনিক রবীন্দ্রীয়, না অত্যাধুনিক তরুণ বিক্রীড়িত?

যদি সংজ্ঞার্থ (definitions) ঠিক না থাকে তবে বিতর্কে বৃথা বাক্য ব্যয় হয়, সেজন্য প্রথমেই 'মৌখিক', 'লৈখিক', 'সাধু' আর 'চলিত' এই কটি সংজ্ঞার অর্থ বিশদ হওয়া দরকার। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিক ভাষা

আছে, তা রাঢ়ের বা পূর্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। যদি কথাবার্তায় প্রাদেশিকতা বর্জন করতে চাই তবে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হক, আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে—যা সর্বসম্মত, যার দ্বারা বাঙালীর সঙ্গে আমার 'সাহিত্য' বা সহযোগ হয়, অর্থাৎ যা সাহিত্যের উপযুক্ত।

মুখের ভাষা যে অঞ্চলেরই হক, মুখের ধ্বনিমাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিক ভাষা দেখে অর্থাৎ পড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব। লৈখিক ভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকম না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিক ভাষা সর্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হক।

আজকাল বাংলা সাহিত্যে যে ভাষা চলছে তার দুই ধারা—সাধু ও চলিত। প্রথম ধারা অবশ্য প্রবলতর, কিন্তু তার কিছু পরিবর্তন যে দরকার তা অনেকেরই মনে হয়েছে। পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয়ও এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

'সাধুভাষা'র মানে সৎলোকের বা সভ্যলোকের ভাষা নয়; 'চলিত ভাষা'র মানে প্রচলিত ভাষা নয়। বাংলা ভাষার বিশেষণ হিসাবে 'সাধু' ও 'চলিত' দুটিই রূঢ় শব্দ, দুইভাষাই লৈখিক বা সাহিত্যিক। সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান প্রভেদ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের জন্য, যথা—'তাঁহারা বলিলেন', কিংবা 'তাঁরা বললেন'; এবং কতকগুলি অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের জন্য, যথা—'উঠান, একচেটিয়া, মিছা, সুতা', কিংবা 'উঠন, একচেটে, মিছে, সুতো'। আর যা প্রভেদ দেখা যায় তা লেখকের ভঙ্গীগত। কেউ বা বেশী সংস্কৃত শব্দ ও সমাস, কেউ বা বেশী আরবী ফারসী শব্দ চালান; কেউ বা পদবিন্যাসে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের চেষ্টা করেন। কিন্তু এসকল ভঙ্গী সাধু বা চলিত ভাষার বিশেষক লক্ষণ নয়।

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিত ভাষা আর পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষা একই। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। সাদৃশ্য এই পর্যন্ত আছে, যে চলিত ভাষার সর্বনাম ক্রিয়াপদাদি উল্লিখিত কতকগুলি শব্দের বানান ভাগীরথীতীরস্থ কয়েকটি জেলার মৌখিক ভাষার শিষ্ট

উচ্চারণের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। কিন্তু ঐসব জেলাবাসী লেখক যখন চলিত ভাষায় লেখেন তখন তিনি তাঁর মুখের ভাষার যথাযথ অনুসরণ করেন না। তিনি তাঁর বন্ধুকে হয়তো বলেন—'গ্যালো রোববারে কোথা গেশলে হ্যা?' কিন্তু লেখেন—'গেল রবিবারে কোথা গিয়েছিলে হে'। লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয়, কথাবার্তায় ততটা হতে পারে না।

সাধু বা চলিত যাই হক, সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার সমান হতে পারে না। তথাপি কোনও এক অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ভিত্তিতেই লৈখিক ভাষা গড়ে ওঠে, এবং কালক্রমে একের পরিবর্তনের ফলে অপরের পরিবর্তন আবশ্যক হয়। এই পরিবর্তন বিনা বিতর্কে বিনা পরামর্শে সাধু ভাষায় কিছু কিছু ঘটেছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহারদিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। 'লিখা, শিখা, শুনা, ঘুরা, লতানিয়া, জলুয়া, হয়েন, যায়েন' স্থানে এখন সাধুভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা, লতানে, জলো, হন, যান' চলছে। এই পরিবর্তন জীবন্তভাষার লক্ষণ এবং তা সাধারণের অজ্ঞাতসারে হয়েছে। ভাষার গতি বুঝে সজ্ঞানে সবিচারে আরও অগ্রসর হলে ক্ষতি হবে না।

লৈখিক ভাষার অবলম্বন হিসাবে পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে। কিন্তু যদি পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে প্রগতি না হয়ে বিপ্লব হবে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চারণ আর বানানের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। ও-কার আর হস্-চিহ্নের বাহুল্যে লেখা কণ্টকিত করায় কিছুমাত্র লাভ নেই, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসে। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও পদ্ধতি নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বমান্য হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিক ভাষা হতে অল্পাধিক প্রভেদ—অপরিহার্য।

সাধু আর চলিত দুরকম ভাষার পৃথক অস্তিত্বের আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না। দুইএর সমন্বয় অসাধ্য নয়। এমন লৈখিক ভাষা চাই যাতে বর্তমান সাধুভাষার আর মার্জিতজনের মৌখিকভাষা দুইএরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা

চাই, আবার মৌখিক ভাষার সহজ প্রকাশশক্তিও ছাড়তে চাই না। আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করছি।—

(১) ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিত রূপ গৃহীত হক।

(২) অন্যান্য অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের কতকগুলির সাধুরূপ আর কতকগুলির চলিত রূপ গৃহীত হক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধু রূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছল, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিক রূপই নেওয়া হক, যথা—'কুয়া, মিছা, উঠান, একচেটিয়া' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, উঠন, একচেটে'।

(৩) যে সংস্কৃত শব্দ বর্তমান চলিতভাষায় অচল নয়, অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকগণ যা চলিতভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' স্থানে যেন 'সত্যি, মিথ্যে, নোতুন, অবিশ্যি' লেখা না হয়।

(৪) বর্তমান সাধুভাষার কাঠামো বা অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অন্ধ অনুকরণ অথবা অকারণে বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়াপদের বিপর্যয় বর্জনীয়।

এ ভাষায় অনুবাদ করলে সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এতে দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না এমন আশঙ্কা অমূলক। দুরূহ সংস্কৃত শব্দ এবং সমাসের সঙ্গে মৌখিক ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম চালালেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না।

ভাষার তৃতীয় অঙ্গ বানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানের কতকগুলি নিয়ম সংকলন করে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তা সকল সাহিত্যসেবীকেই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও তাঁর লিখিত দৃষ্টান্তের প্রভাবে নূতন বানানগুলি ধীরে ধীরে প্রচলিত হচ্ছে। সবিস্তার আলোচনা না করে নূতন বানানের কয়েকটি প্রধান বিধি জানাচ্ছি।—

(১) হিন্দী মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি সংস্কৃতজাত ভাষায় রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব হয় না। ব্যাকরণ অনুসারেও দ্বিত্ব আবশ্যক নয়। বাংলাতেও দ্বিত্ব বর্জনীয়। 'কার্য' লিখতে একটা য যথেষ্ট।

(২) কতকগুলি বাংলা শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যেমন—'ছিল, বড়, কত'; কিন্তু অধিকাংশ শব্দে হয় না, যেমন—'ছিলেন,

তোমার, কেমন'। শেষোক্ত শব্দগুলিতে হস্ চিহ্ন দেওয়া হয় না, যদিও উচ্চারণ হসন্ত। যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকে তবে অসংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্ চিহ্ন বর্জনীয়। 'ওস্তাদ, পকেট, হুক, ডিশ' প্রভৃতি শব্দে হস্ চিহ্নের কোনও দরকার নেই।

(৩) অসংস্কৃত শব্দে ণ থাকবে না, কেবল ন। 'কান, বামুন, কোরান, করোনার' প্রভৃতিতে ন। এই প্রথা নূতন নয়, অনেক খ্যাতনামা লেখক বহুকাল থেকে এইরকম লিখছেন।

(৪) ফারসী আরবী ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে বাংলা বানানে s স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে। যথা—'জিনিস, সরকার, ক্লাস, নোটিস' দন্ত্য স; 'শরম, শুরু, শাগরেদ, পালিশ' তালব্য শ। হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতেও এই রীতি চলে। অনেক বাঙালী মুসলমানও এইরকম বানান করেন।

(৫) নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় বর্জনীয়। war 'ওয়ার' নয়, 'ওআর'। কিন্তু wire 'ওয়ার'।

(৬) বক্র আ বা বিকৃত এ বোঝাবার জন্য আদিতে অ্যা এবং মধ্যে বা অন্তে ্যা বিধেয়. যথা—'অ্যাসিড, হ্যাট, নিউম্যান'।

(৭) পৌষমাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয় চলিত ক্রিয়াপদের খামখেয়ালী বানানের নিরূপণ চেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কৃত নিয়মে তা আছে; 'বল্লেন, কর্ছিল' নয়, 'বললেন, করছিল'।

কেউ কেউ বলেন—এই নিয়মের কতকগুলি পালন করতে গেলে নানা ভাষায় জ্ঞান দরকার। 'জিনিস'-এর মূল 'জিন্স্', 'সাগরেদ'-এর মূল 'শার্গির্দ্' তা কত লোক জানে? আমি বলি, জানবার বিশেষ দরকার নেই। ব্যুৎপত্তি না জেনেও আমরা শিখি যে 'উজ্জ্বল'এ ব-ফলা আছে কিন্তু 'কজ্জল'এ নেই। যাঁরা জানেন এবং যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁরা নির্দেশ দেবেন এবং সাধারণে ক্রমে ক্রমে শিখবে।

বিনীত

রাজশেখর বসু



বাংলা অক্ষরের সংস্কার

(১৩৫০/১৯৪৪)

বাংলা অক্ষর সংস্কারের প্রস্তাব অনেক কাল থেকে হয়ে আসছে। এ বিষয়ে সম্ভবত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অগ্রণী। তাঁর পদ্ধতি মোটামুটি এই।—স্বরান্ত ব্যঞ্জন একই রকমে লেখা হবে, যেমন কু শু প্রু হু, কৃ শ্রৃ, কৃ হৃ; এবং যুক্তব্যঞ্জনের অঙ্গীভূত অক্ষরগুলি যথাসম্ভব অবিকৃত থাকবে, যেমন ক্ত ঙ্ক স্থ। কিন্তু যে যুক্তব্যঞ্জনের বিকৃত উচ্চারণ হয় তার আকৃতি তিনি বদলান নি, যেমন ক্ষ। এছাড়া তিনি অনাবশ্যক বোধে এবং ব্যাকরণের সমর্থনে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করেছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্দেশ্য বর্ণের মূল রূপ যথাসম্ভব বজায় রাখা, ছাপার সুবিধা অসুবিধার উপর তিনি দৃষ্টি দেন নি। বহু বৎসর পূর্বে যে একলিপি বিস্তার-সমিতি স্থাপিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা উড়িয়া গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় নাগরী অক্ষর চালানো। নাগরী-প্রচারিণী সভারও উদ্দেশ্য অনুরূপ। এই দুই সমিতি এখন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীর অনেকে অক্ষর-সংস্কারে উৎসাহী হয়েছেন, তার ফলে নানারকম পরিকল্পনা প্রচারিত হয়েছে। প্রস্তাবকগণের লক্ষ্য সমান নয়, কেউ এক বিষয়ে কেউ অন্য বিষয়ে বেশী ঝোঁক দিয়েছেন।

আমাদের আলোচ্য—কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বাংলা অক্ষরের সংস্কার আবশ্যক এবং কি উপায়ে তা সুসাধ্য হবে। কামাল আতাতুর্ক অল্পায়াসে তাঁর রাষ্ট্রে আরবী লিপির বদলে রোমান লিপি চালাতে পেরেছিলেন তার কারণ শুধু জবরদস্তি নয়। দেশের সুশিক্ষিত জনমতের তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন, অশিক্ষিত প্রজাবর্গও তাঁকে শ্রদ্ধা করত। আমির আমানুল্লা নিজের ক্ষমতা আর লোকপ্রিয়তা না বুঝেই হঠাৎ সমাজসংস্কার করতে গিয়ে বিতাড়িত হলেন। আমাদের দেশে এমন কোনও সর্বমান্য শক্তিমান্ নেতা নেই যাঁর হুকুমে অক্ষরের আমূল সংস্কার হতে পারে। সংস্কারের পরিকল্পনা যতই সরল ও যুক্তিসম্মত হক, লোকমত অগ্রাহ্য করে হঠাৎ তা চালানো যাবে না, সুতরাং শুধু কাগজে কলমে একটা সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শলিপির খসড়া খাড়া

করে লাভ নেই। এ কথাও মানতে হবে যে সকলকে বা অধিকাংশ লোককে খুশী করা অসম্ভব। অতএব ক্রমে ক্রমে সইয়ে সইয়ে পরিবর্তন করা ভিন্ন উপায় নেই। যদি জনকতক প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক একমত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নূতন পদ্ধতি মেনে নেন এবং ছাপাখানার কর্তারা তাঁদের সাহায্য করেন তবে সংস্কার ক্রমশ অগ্রসর হবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্যপরিষৎ এবং বিশ্বভারতীর সমর্থন পাওয়া যায় তবে সংস্কার দ্রুততর হবে।

আদর্শ অক্ষরমালা কিরকম হবে সে সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী মতভেদ নেই। এমন অক্ষর চাই যা চেনা পড়া ও লেখা সহজ, যাতে জটিলতা নেই, যার গঠনে রেখার বাহুল্য নেই, যার মোট সংখ্যা অল্প, যার যোজনপদ্ধতি সরল; যাতে শুধু বাংলা ভাষার সাধারণ শব্দাবলী নয়, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দও মোটামুটি উচ্চারণ অনুসারে লেখা যায়; যা ছাপবার জন্য বিস্তর টাইপ দরকার হয় না, যার গড়ন এমন যে ছাপবার সময় সহজে টাইপ ভাঙে না; এবং যা টাইপরাইটারের উপযুক্ত।

আমাদের বাংলা লিপি সুশ্রী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত গুণাবলীর বড়ই অভাব। অক্ষরের জটিল গঠন ও যোজন পদ্ধতির জন্য শিক্ষার্থীকে বিশেষত শিশুকে অনেক কষ্টভোগ করতে হয়। একখানা বর্ণপরিচয় যথেষ্ট নয়, প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ চাই। ব্যঞ্জনের সঙ্গে যোগ করতে গেলেই স্বরবর্ণের রূপ বদলে যায়। অ-কার অন্তর্হিত হয়, আ-কার এবং ঈ-কার ব্যঞ্জনের পরে বসে, অথচ ই-কার এ-কার ঐ-কার আগে বসে। ও-কার এবং ঔ-কারের আধখানা আগে আধখানা পরে বসে। উ-কার ঊ-কার ঋ-কার সাধারণত নীচে বসে, কিন্তু স্থলবিশেষে ব্যঞ্জনের ডাইনে জোড়া হয়। কতকগুলি যুক্তব্যঞ্জনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবারে বদলে গেছে। শিক্ষার্থীকে ৪৮টি মূল বর্ণ, ১৩/১৪ রকম স্বরচিহ্ন, য-ফলা রেফ র-ফলা প্রভৃতি ৭/৮টি ব্যঞ্জনচিহ্ন, এবং প্রায় ১৬০টি যুক্তব্যঞ্জন শিখতে হয়। তা ছাড়া অঙ্ক যতিচিহ্ন প্রভৃতি আছে। ছেলেবেলায় এই সমস্ত আয়ত্ত করতে কিরকম কষ্ট পেতে হয়েছিল তা হয়তো এখন আমাদের মনে নেই।

ছাপাখানার অক্ষরসমষ্টি আরও বেশী। ইংরেজী ছাপতে ক্যাপিটাল, স্মল, অঙ্ক এবং যতিচিহ্নাদি সমেত প্রায় ৭০টি টাইপে কাজ চলে, কিন্তু বাংলায় প্রায় ৫০০ টাইপ চাই। এত টাইপ কেন লাগে তা সংক্ষেপে বোঝানো অসম্ভব, সেজন্য তার আলোচনা করব না। আমাদের দেশে যারা টাইপের ছাঁদ

উদ্‌ভাবন করেছে তারা সূক্ষ্মবুদ্ধি শিল্পী নয়, সাধারণ মিস্ত্রী মাত্র, কোনও দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোক তাদের উপদেশ দেয় নি। তারা যথাসম্ভব হাতের লেখার নকল করেছে, নিজের রুচি অনুসারে একটু আধটু পরিবর্তন ও অলংকরণ করেছে, কিসে টাইপ সরল হয় তা মোটেই ভাবে নি, অনর্থক সংখ্যা বাড়িয়েছে। কতকগুলি অক্ষর এত জটিল যে ছাপায় প্রায় জুবড়ে যায়। সীসা-অ্যান্টিমনি-ঘটিত যে ভঙ্গুর ধাতুতে টাইপ গড়া হয় তার শক্তির উপর জুলুম করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে একটি টাইপ থেকে শাখা বেরিয়ে পাশের টাইপের মাথায় বা নীচে প্রসারিত হয়। এই শাখাগুলি ছাপাবার সময় প্রায় ভাঙে। ইংরেজীতে এইরকম kern টাইপের প্রয়োগ খুব কম।

বাংলা লিপির বদলে নাগরী লিপি চালালে একলিপিবিস্তারের সাহায্য হবে বটে, কিন্তু অন্য কোনও লাভ হবে না, কারণ নাগরী অক্ষর বাংলার তুল্যই দোষগ্রস্ত। আমরা যদি নিজের প্রয়োজনে নাগরী অক্ষর অল্পাধিক পরিবর্তিত করি তা হলে সে পরিবর্তন হিন্দী প্রভৃতি ভাষীর রুচিসম্মত না হতে পারে। সুতরাং নাগরীর মোহ ত্যাগ করাই কর্তব্য।

পণ্ডিতরা বলেন, প্রাচীন ফিনিশীয় লিপি থেকেই হিব্রু আরবী গ্রীক রোমান এবং ভারতীয় লিপিগুলি উদ্‌ভূত হয়েছে। ভারতীয় লিপির মূল যাই হক, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে পশ্চিম দেশীয় বর্বর বর্ণমালা (alphabet) এদেশে আমল পায় নি। প্রাচীন ভারতের ব্যাকরণকার আলফা বিটা গামা, এ বি সি, আলিফ বে পে প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল বর্ণক্রম পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত অ আ ক খ প্রভৃতি ক্রমে বর্ণমালা সাজিয়েছেন। আমাদের বর্ণসংখ্যা পশ্চিমদেশের চেয়ে বেশী, সেজন্য আমাদের অক্ষর অর্থাৎ বর্ণের লিখিত রূপও বেশী হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য বা ভারতীয় কোনও অক্ষরমালা মুদ্রাযন্ত্র বা টাইপরাইটারের অপেক্ষায় সৃষ্ট হয় নি, লেখার জন্যই হয়েছে। দৈবক্রমে পাশ্চাত্ত্য অক্ষরের অল্পতা মুদ্রণের অনুকূল হয়েছে এবং ভারতীয় অক্ষরের বাহুল্য বাধাস্বরূপ হয়েছে। এতে পাশ্চাত্ত্য দেশের বাহাদুরি নেই, আমাদেরও লজ্জার কারণ নেই। বর্ণমালা এবং তার লিখিত রূপ বা লিপি এক জিনিস নয়, প্রথমটি অবিকৃত রেখেও দ্বিতীয়টি বদলানো যেতে পারে। এদেশে তা ঘটেছে। পাণিনির সময় বা তার পূর্ব থেকেই বর্ণমালা প্রায় অবিকৃত আছে, কিন্তু লিপি বা অক্ষরমালার আকৃতি কালে কালে বদলেছে। প্রাচীন সরল ব্রাহ্মী অক্ষরগুলি ক্রমে ক্রমে জটিল হয়ে বাংলা নাগরী প্রভৃতির বর্তমান রূপ পেয়েছে।

রোমান অক্ষর জটিলতাহীন, বহুপ্রচলিত, তাদের বিন্যাসরীতিও সরল, পর পর সাজালেই শব্দরচনা হয়, বাংলা বা নাগরীর মতন একটা অক্ষরের সঙ্গে আর একটা জড়াতে হয় না। রোমান লিপির সুবিধা এবং কি উপায়ে তা বাংলা বর্ণমালার উপযোগী করা যায় তার বিশদ আলোচনা অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একাধিক প্রবন্ধে করেছেন। কিন্তু আমাদের অভ্যাস মজ্জাগত, আত্মাভিমানও প্রবল, সেজন্য অত্যন্ত উপযোগিতা সত্ত্বেও রোমান লিপি এখনই প্রচলিত হবার সম্ভাবনা নেই। এখন আমাদের যা আছে তারই যথাসম্ভব সংস্কারচেষ্টা কর্তব্য। এই সংস্কার ক্রমে ক্রমে করতে হবে যাতে অভ্যাস পীড়িত না হয় এবং বর্তমান রীতির সঙ্গে যোগসূত্র সহসা ছিন্ন না হয়।

অনেকে প্রস্তাব করেছেন যুক্তাক্ষরের পরিবর্তে হাইফেন-যোগে অক্ষর সংযুক্ত করা হক। এই পদ্ধতিতে লিখলে বা ছাপলে যোজিত অক্ষরগুলির মধ্যে যে ফাঁক থাকবে তা দৃষ্টিকটু হবে এবং লোকে হাইফেনটিকে সংযোগচিহ্ন না ভেবে বিচ্ছেদচিহ্নই মনে করবে। বরং হস্‌চিহ্ন ভাল। অনেক শব্দে যুক্তাক্ষরের বদলে হস্‌চিহ্ন চলে, তার প্রয়োগ বাড়ালে অভ্যাসে তত বাধবে না। এই চিহ্ন যদি নীচে না দিয়ে অক্ষরগুলির প্রায় মাঝামাঝি বসানো হয় এবং কম হেলানো হয় তবে ফাঁক বেশী হবে না। কিন্তু সংস্কারের আরম্ভেই সমস্ত যুক্তাক্ষর তুলে দিয়ে হস্‌চিহ্ন চালানো কঠিন হবে।

কেউ কেউ বলেন, বাংলায় ঈ ঊ ঋ এবং তিন রকম শ ষ স রাখবার দরকার নেই। এই প্রস্তাব গ্রহণীয় মনে করি না। বাংলায় অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আছে, তাদের উচ্চারণ যতই বিকৃত হক ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বানানের সাম্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা লোপ পাবে না, সে কারণেও পূর্ণ অক্ষরমালা আবশ্যক। বিদেশী শব্দের sh এবং s-এর পৃথক উচ্চারণ বোঝাবার জন্য। শ এবং স-এর প্রয়োজন আছে।

আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করছি। অক্ষরসংস্কারের প্রথম ক্রম হিসাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতি এখনই নেওয়া যেতে পারে।—

(১) অনেক শব্দে যুক্তব্যঞ্জন স্থানে হস্‌চিহ্ন সহজেই চালানো যেতে পারে, তাতে চক্ষুপীড়া বা উচ্চারণের বাধা হবে না; যেমন 'ধিক্‌কার, বাগ্‌দেবী, খড়্‌গ, তদ্‌গত, সদ্‌ভাব, উদ্‌যোগ, প্রগল্‌ভ, বল্‌গা, সদ্‌ব্যয়'। কিন্তু 'উদ্যান, বিদ্বান্' প্রভৃতি যথাবৎ লিখতে হবে। খণ্ড ত অনাবশ্যক। রেফের পর

দ্বিত্ববর্জন করলে যুক্তব্যঞ্জন কমবে। বহু অসংস্কৃত শব্দে যুক্তব্যঞ্জন বাদ দেওয়া যেতে পারে, অনেক স্থলে হস্‌চিহ্নও না দিলে চলে যেমন 'নকশা, আডডা, সরদার, পরদা, উলটা'। এর ফলে যুক্তব্যঞ্জন খুব না কমলেও হস্‌চিহ্ন প্রয়োগের অভ্যাস বাড়বে এবং ক্রমশ আরও বাড়ানো সম্ভবপর হবে।

(২) যুক্তব্যঞ্জনের অঙ্গীভূত অক্ষরগুলির মূল রূপ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখতে হবে। এ বিষয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্রের রীতি গ্রহণীয়। লাইনোটাইপে অনেকটা তা করা হয়েছে। জ্ঞ এবং ক্ষ এই দুই অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ অত্যন্ত বিকৃত, সেজন্য এখন বর্তমান আকৃতিই রাখা ভাল।

(৩) হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় বর্গীয় বর্ণের পূর্বে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ যোগ হলে সাধাবণত পঞ্চম বর্ণের প্রতীকস্বরূপ অনুস্বার দেওয়া হয়, যেমন 'রংগমংচ, পংডিত, নংদ, কংপ'। অবশ্য উচ্চারণ পঞ্চম বর্ণ অনুসারেই হয়। আজকাল কয়েকজন সাহসী বাঙালী লেখক ক-বর্গের পূর্বে প্রায় সর্বত্র ঙ স্থানে অনুস্বার দিচ্ছেন, যেমন 'অংক, সংগে'। এই রীতি সকল বর্গেই প্রচলনযোগ্য, কিন্তু উচ্চারণে বাধতে পারে। যদি অনুস্বারের পুচ্ছ বাদ দেওয়া যায় তবে গোল চিহ্নটি সকল পঞ্চম বর্ণের প্রতীকরূপে গণ্য হতে পারে, অনুস্বার বলে ভ্রম হবে না। এর ফলে ২০টি যুক্তব্যঞ্জন কমবে এবং নূতন পদ্ধতি অভ্যাস করতেও অসুবিধা হবে না।

(৪) তুচ্ছ কারণে ছাপাখানায় টাইপের বাহুল্য করা হয়েছে। শব্দের আদিতে মধ্যে ও শেষে দেবার জন্য দুরকম এ-কার আ-কার এবং

হাতের লেখা আর ছাপার টাইপ সমান হতে পারে না। লেখার টানে অক্ষর অল্পাধিক জড়িয়ে যায়। কিন্তু ছাপায় অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য অত্যাবশ্যক। শতাধিক বৎসর পূর্বে হাতে লেখা পুঁথির গোটা গোটা অক্ষরের নকলে টাইপের যে ছাঁদ হয়েছিল এখনও তাই চলছে। আধুনিক হাতের লেখার সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যদি টাইপের ছাঁদ কিছু বদলানো হয় তবে এই প্রভেদ বাড়বে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, আজকাল বইএর মলাটে এবং পণ্য বস্তুর বিজ্ঞাপনে অনেক রকম বিকৃত অক্ষর দেখা যাচ্ছে। অক্ষরকার বোধ হয় মনে করেন যে দুষ্পাঠ্যতাই আধুনিকতার লক্ষণ। কিছুকাল পূর্বে আমার কয়েকজন বন্ধু একটি পত্রিকার মলাটে ছাপা নামটি অনেক চেষ্টা করে পড়েছিলেন—'তাড়ী'। কিন্তু নামটি 'প্রাচী'। এইরকম বিকৃত অক্ষরে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। ইংরেজী বিজ্ঞাপনে উৎকট অক্ষর দেখা যায় না।

❑

ণ অনাবশ্যক। লাইনোটাইপে একই রকম অক্ষরে কাজ চলছে, সাধারণ টাইপেও চলবে। অনেক টাইপে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ই-কার ঈ-কার উ-কার ঊ-কার ঋ-কার য-ফলা রেফ এবং চন্দ্রবিন্দু জোড়া আছে। এই বাহুল্য অনাবশ্যক। সর্বত্র ই-কার উ-কার য-ফলা প্রভৃতি পাশে বসিয়ে দিলেই কাজ চলে, যেমন লাইনোটাইপে।

(৫) লাইনোটাইপে এক নূতন উপায়ে অনেকগুলি যুক্তব্যঞ্জনের টাইপ কমানো হয়েছে। গ ণ দ ন প ম ল শ ষ স অক্ষরের ডান দিকের রেখাটি বাদ দিয়ে কতকগুলি অর্ধ-টাইপ করা হয়েছে। এইগুলির পাশে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্ণ-টাইপ বসিয়ে দিলেই যুক্তাক্ষর তৈরি হয়, যেমন গ্ল ণ্ট দ্গ ন্দ ল্ক শ্চ স্ন ষ্ট। এই উপায়ে প্রায় ৭৬ টাইপ কমেছে। সাধারণ টাইপেও এই পদ্ধতি গ্রহণীয়।

অক্ষর সংস্কারের দ্বিতীয় ক্রমে অধিকাংশ যুক্তব্যঞ্জনের জায়গায় হস্‌চিহ্ন চালাতে হবে। য-ফলা, র-ফলা, রেফ, এবং যেসব যুক্তব্যঞ্জন শব্দের গোড়ায় বসে, যেমন ক্ল ক্ষ গ্ল জ্ঞ প্ল ব্ল ম্ল প্রভৃতি, তখনও হয়তো ছাড়া চলবে না। প্রায় এগার বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার এই রকম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত যুক্তব্যঞ্জন বাদ দিয়েও আমরা আদর্শ লিপিতে পৌঁছতে পারব না। যদি মূল বর্ণগুলির আকৃতি সরল করা হয় এবং আ-কার ই-কার প্রভৃতির যোজ্য চিহ্ন তুলে দেওয়া হয়, অর্থাৎ অক্ষরমালার আমূল পরিবর্তন হয় এবং স্বরব্যঞ্জননির্বিশেষে সকল অক্ষর পাশাপাশি বসিয়ে শব্দরচনা হয়, তবেই সকল বাধা দূর হবে।

অক্ষর সংস্কারের শেষ পর্যায় কি? আশা করি তত দিনে আমাদের স্বরাজ্যলাভ এবং আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা হবে, উদ্যম বাড়বে, বুদ্ধি মোহমুক্ত হবে। তখন নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরেরও চূড়ান্ত সংস্কার করতে দ্বিধাবোধ করব না। নূতন অক্ষর উদ্‌ভাবনের প্রয়োজন কি? রোমান লিপি আমাদের সুপরিচিত, বাংলা বর্ণমালার লিখিত রূপ হিসাবে এই রোমান অক্ষর চালানোই সুসাধ্য। বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে ক-অক্ষর বা k-অক্ষর কোনওটি গোমাংস নয়। যদি আমরা ক নাম দিয়েই k অক্ষর চালাই তাতে ক্ষতি কি? ইওরোপ যেমন সুবিধাজ্ঞানে ভারতীয় মঞ্চ এবং দশমিক গণনাপদ্ধতি নিয়েছে আমরাও সেইরকম রোমান লিপি আত্মসাৎ করতে পারি, তার জন্য দীনতার গ্লানি আমাদের স্পর্শ করবে না।

□

সরকারী পরিভাষা

(১৩৫৫/১৯৪৮)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা'—পড়িয়া সুখী হইলাম, তিনি সংস্কারমুক্ত হইয়া বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন। নূতন পরিভাষা সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল আছে। তাঁহাদের প্রতি এই অনুরোধ—বিচারকালে তাঁহারা যেন এই কয়টি বিষয় মনে রাখেন।—

(১) বর্তমান ইংরেজী পরিভাষা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে, কোনও বিশেষ প্রদেশের জন্য রচিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কতকগুলি প্রতিশব্দ চলে বটে (যেমন—আদালত, দারোগা, হিসাব অধিকারি, মাসুল, কোতোয়াল, কানুন, মুখ্‌তসর, মুসন্না ইত্যাদি), কিন্তু কেবল ইংরেজী পরিভাষাই সর্বভারতে সাধারণভাবে রাজকার্যে চলে।

(২) যদি ইংরেজী শব্দ বর্জন করা হয় তবে তৎস্থানে এমন শব্দ নির্বাচন করিতে হইবে যাহা সর্বভারতে গ্রাহ্য হইতে পারে, কেবল প্রদেশবিশেষের উপযোগী করিলে চলিবে না। এই সর্বভারতীয় পরিভাষা রচনার উদ্‌যোগ কেন্দ্রীয় সরকারেরই করা উচিত ছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহারা এদিকে মন দেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে পরিভাষা সংকলিত হইতেছে। শুনিতেছি বোম্বাই বিহার ও উড়িষ্যাতেও শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

(৩) সর্বভারতীয় পরিভাষা যেমনই হউক, এখন যেমন সংবাদপত্রাদিতে এবং লৌকিক প্রয়োজনে কতকগুলি প্রাদেশিক প্রতিশব্দ চলে (আইন আদালত, দারোগা ইত্যাদি) ভবিষ্যতেও সেরূপ চলিবে। 'বাজেট, পুলিস' প্রভৃতি অনেক ইংরেজী শব্দও চলিবে, অবশ্য কালক্রমে এইরূপ শব্দের অনেকগুলি লুপ্ত হইবে। যেমন পূর্বপ্রচলিত বহু ফারসী শব্দের এখন এই গতি হইয়াছে, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। আরও মনে রাখা উচিত—যে শব্দ বাঙালীর বোধ্য তাহা সর্বভারতের উপযোগী না হইতে পারে। বাংলায় সরবরাহ supply, কিন্তু হিন্দীতে এ অর্থ চলে না।

(৪) নূতন পরিভাষা সুবোধ্য হইবে, অর্থাৎ তাহা শুনিলেই উদ্দিষ্ট অর্থের

জ্ঞান হইবে এমন আশা করা বৃথা। বর্তমান ইংরেজী পরিভাষা কি শুনিলেই বোধগম্য হয়? Administrator-general & Official Trusteeর অর্থ কয়জন জানে? সকল ক্ষেত্রে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা বাচ্যার্থ হইতে উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা যায় না, প্রয়োজনের বশেই আমরা নূতন শব্দের প্রয়োগ শিখি। 'সিনেমা' কাহাকে বলে তাহা সাধারণে স্বচক্ষে দেখিয়া বা পরের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছে, শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গতি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় নাই। 'ব্ল্যাকআউট, সেলট্যাক্স, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ, কালোবাজার, মুদ্রাস্ফীতি', প্রভৃতির অর্থ দশ বৎসর পূর্বে কয়জন বুঝিতে পারিত? আমরা দায়ে পড়িয়া এগুলির অর্থ শিখিয়াছি। সর্বভারতীয় পরিভাষার সমস্ত (বা অধিকাংশ) শব্দ সর্ব প্রদেশে সুবোধ্য করা অসম্ভব, যাহাতে সর্ব প্রদেশে গ্রহণযোগ্য হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত। নূতন শব্দ লোকে কালক্রমে ধীরে ধীরে শিখিবে, যেমন এক কালে ফারসী শব্দ এবং তাহার পর ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছে।

(৫) বর্তমান ইংরেজী শব্দগুলির প্রতিশব্দে খাপছাড়া ভাবে নির্বাচন করিলে চলিবে না, এক-একটি নাম হইতে উদ্‌ভূত অন্যান্য নামেরও প্রতিশব্দ করিতে হইবে। শুধু Inspector নয়, Sub-Inspector, Inspector-general, Deputy Inspector-general প্রভৃতির সুসংগত প্রতিশব্দ চাই।

(৬) প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে এবং সন্ধি-সমাসের সাহায্যে সংক্ষেপে পরিভাষা রচনার অসামান্য শক্তি সংস্কৃত ভাষার আছে। ফারসীরও অনেকটা আছে। সংস্কৃত-ফারসী মিশ্রিত খিচুড়ি পরিভাষাও হইতে পারে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। সংস্কৃত বা ফারসী বর্জন করিয়া পরিভাষা রচনার শক্তি কোনও প্রাদেশিক ভাষার নাই। সংস্কৃত ভাষা ভারতের সকল প্রদেশে মান্য এবং সংস্কৃত শব্দ সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই সহজে স্থান পাইতে পারে। তামিল তেলেগু প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতজাত না হইলেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের যে প্রভাব ফারসীর তাহা নাই, বিশেষত দক্ষিণ ভারতে নগণ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'পারিভাষিক শব্দের গঠন' প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা ফাল্গুন ১৩৫৪) সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বিদেশীর শাসনকালে ভারতীয় প্রজা বিদেশী পরিভাষায় ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়াছে। নব ভারতে যাঁহাদের সংস্কৃতের সহিত সম্পর্ক

নাই তাঁহারাও কালক্রমে সংস্কৃতজাত পরিভাষা শিখিবেন। ইহার জন্য ভাষাজ্ঞান বা ব্যুৎপত্তিজ্ঞান অনাবশ্যক। ফারসী আরবী না জানিয়াও আমরা বহু ফারসী আরবী শব্দ শিখিয়াছি।

(৭) পশ্চিমবঙ্গে, মধ্যপ্রদেশে ও যুক্তপ্রদেশে সংস্কৃতের ভিত্তিতেই পরিভাষা সংকলিত হইতেছে। নির্বাচিত শব্দগুলি সকল ক্ষেত্রে সমান না হইলেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে। ইহা সুখের বিষয়, কারণ, উদ্দেশ্য ও আদর্শ যখন সমান, তখন ভবিষ্যৎ মিলিত আলোচনার ফলে একই শব্দাবলী গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৮) উক্ত প্রদেশগুলিতে যে শব্দাবলী সংকলিত হইতেছে তাহা চূড়ান্ত নহে, মিলিত যুক্ত-আলোচনার ফলে অনেক পরিবর্তন হইবে, অতএব এক-একটি শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়া এখন বিশেষ লাভ নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ভিন্ন সর্বভারতীয় পরিভাষার প্রতিষ্ঠা হইবে না। কেন্দ্রীয় কর্তাদের অভিরুচি কি প্রকার তাহা এখনও অজ্ঞাত। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হইবে কি হিন্দুস্থানী হইবে তাহা লইয়া এখনও বিবাদ চলিতেছে। গণপরিষদে হিন্দীর জয় হইলে সরকারী পরিভাষা সংস্কৃতপ্রধান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানীর জয় হইলে ফারসী শব্দের বাহুল্য হইবে এবং সেরূপ পরিভাষা বাঙালী ওড়িয়া মারাঠী গুজরাটী দ্রাবিড়ী প্রভৃতির পক্ষে সংস্কৃত অপেক্ষা সুখবোধ্য সুখোচ্চার্য বা সুশ্রাব্য হইবে না। ইহাও সম্ভবপর যে প্রবল মতভেদের ফলে বর্তমান ইংরেজী পরিভাষাই বজায় থাকিবে। 'কেরানী, কনস্টেবল, নির্মাণবিৎ' ভাল, কিংবা 'করণিক, আরক্ষিক, বাস্তুকার' ভাল—এ বিতর্ক এখন তুচ্ছ। ভাবিবার বিষয় এই—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজভাষার উপর কোন্ ভারতী ভর করিবেন, সংস্কৃত না ফারসী, না ইংরেজী?

❑

বিদ্যালয়ের বাংলাভাষা

(১৩৫৯/১৯৫২)

এই নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছেন। 'কথাসাহিত্য' আষাঢ় সংখ্যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তারই জের টেনে আমি কিছু বলছি। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমার মোটেই নেই। কিন্তু বহু কাল আগে যখন স্কুলে পড়তাম তখন বাংলা ভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তার দোষ-গুণ আমার মনে আছে। সেজন্য লেখকের যুক্তি বুঝতে আমার বাধা হয় নি।

কৃষ্ণদয়ালবাবুর এই কালোচিত প্রবন্ধটি শিক্ষাধিকারের কর্তাদের অবশ্যপাঠ্য। যাঁরা বাংলা শিক্ষায় গোড়া থেকে সুব্যবস্থা চান তাঁদের সকলেরই লেখকের মত ও প্রস্তাবগুলি সযত্নে বিচার করে দেখা উচিত। আলোচনার সুবিধার জন্য মূল প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি—

'আমি নিজে বাংলা চলিতভাষার অনুরাগী। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা চলিতভাষার মোহ ত্যাগ করে তাদের প্রত্যেকটি রচনা সাধুভাষায় লেখা অভ্যাস করুক এই আমি চাই।...ছেলেবেলা থেকেই যেসব ছাত্র চলিতভাষা লিখতে শুরু করে তারা স্বভাবতই তদ্‌ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ আর বড়জোর গোটাকতক অতিপরিচিত সহজ সরল তৎসম শব্দ দিয়ে কাজ চালিয়ে যায় বলে অধিকাংশ তৎসম শব্দ অপ্রয়োজনে ও অব্যবহারে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এর অনিবার্য পরিণাম...বাংলা সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বহু ক্লাসিক শ্রেণীর রচনা ছাত্রদের অনধিগম্য ও অপঠিত থেকে যায়।...আমার মতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনটাই মুখ্য, সাহিত্যদীক্ষার প্রয়োজন গৌণ।...বিদ্যালয়ে চলিত ভাষা যদি আদৌ না চালানো হয় তা হলে ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষার চাপটা অনেকখানি কমে যায়।...চলিতভাষা এখন কেবল গড়ে উঠছে, তার ব্যাকরণ এখনও সবটা লেখাই হয় নি।...নিম্নতম শ্রেণী থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের গদ্যাংশ সাধুভাষায় লেখা হওয়া চাই—একটি নিবন্ধও চলিত ভাষায় লেখা হলে

চলবে না।...নবম ও দশম মানের জন্য একখানি সংকলন-পুস্তক এতকাল যেমন চলে আসছিল তেমনি চলুক।'

আমার বিশ্বাস, সাধুভাষা ক্রমশ অচল হয়ে আসছে, ভবিষ্যতে কেবল চলিতভাষাতেই বাংলা সাহিত্যের সকল প্রয়োজন মিটবে। এই বিশ্বাস সত্ত্বেও কৃষ্ণদয়ালবাবুর সমস্ত প্রস্তাব আমি গ্রহণীয় মনে করি। সাধুভাষায় সাহিত্য রচনা একদিন বন্ধ হবে। খবরের কাগজও চলিত ভাষায় লেখা হবে, কিন্তু গত দেড় শ বৎসরে সাধুভাষায় যে বিশাল বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার একটা বড় অংশ চিরায়ত বা ক্লাসিক হয়ে থাকবে। এই কারণে সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে গেলেও তার চর্চা লোপ পাবে না।

এখন সাধু আর চলিত দুই রীতিতেই বাংলা ভাষা লেখা হচ্ছে। যদি ভবিষ্যতে চলিতভাষাই একমাত্র সাহিত্যিক ভাষা হয় তবে অষ্টম মান পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তা বর্জিত হবে কেন? কৃষ্ণদয়ালবাবু তার কারণ দেখিয়েছেন। তাঁর যুক্তির পরিপূরকরূপে কিছু বলছি।

বাংলা সাধুভাষা বহুজনের চেষ্টায় বহু কালে তার সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র সেন, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কলকাতার রমেশচন্দ্র দত্ত, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যে রীতির প্রবর্তন করেছেন পরবর্তী লেখকরা তারই অনুসরণ করেছেন। ভঙ্গীর বা স্টাইলের ভেদ থাকলেও তাঁদের রীতি একই। চলিতভাষার প্রভাবে, নূতনত্বের প্রয়াসে এবং গ্রাম্যতার সংক্রমণে আজকাল সাধুভাষাতেও কিছু বিকার এসেছে, তথাপি চলিতভাষার তুলনায় তা অধিকতর শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খলা থাকায় সকল জেলার বাঙালীর পক্ষেই সাধুভাষা আয়ত্ত করা সহজ। এ ভাষার ব্যবহার ক্রমশ কমে গেলেও বহুকাল চলবে, সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই ভাষাই প্রশস্ত। আর সঙ্গে যদি চলিত ভাষাও শেখানো হয় তা হলে অল্পবয়স্ক ছাত্ররা দোটানায় পড়বে।

সাধুভাষার তুল্য সুশৃঙ্খল আর সর্বসম্মত হলে চলিতভাষাই বাংলা শিক্ষার একমাত্র বাহন হবে। তখন উচ্চতর শ্রেণীতে সাধুভাষা শেখালেই চলবে। কিন্তু বাংলাভাষার এই পরিবর্তন শীঘ্র হবে এমন সম্ভাবনা দেখি না। চলিতভাষার যতই প্রসার হক, এখনও তা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই ভাষার যাঁরা

প্রধান সংস্থাপক—রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, তাঁদেরও শব্দাবলীতে সর্বত্র ঐক্য দেখা যায় না (করলাম, করলেম, করলুম, তাঁদের, তাঁদেরকে, কাকেও, কাউকে ইত্যাদি)।

চলিত ভাষার লক্ষণ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়। সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, এবং কয়েকটি অসংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ আর অব্যয় ছাড়া সাধুভাষার সঙ্গে তার কোনও প্রভেদ নেই। তৎসম শব্দ বেশী থাকলেই সাধুভাষা, আর তদ্‌ভব দেশজ বা বিদেশজ শব্দ বেশী থাকলেই চলিতভাষা হয় না। অনেকে মনে করেন, কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাই চলিতভাষা। এই ধারণা একবারেই ভুল। যেমন সাধুভাষা, তেমনি চলিতভাষাও সাহিত্যিক প্রয়োজনে উদ্‌ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional লৈখিক ভাষা, ভাগীরথীতটবর্তী স্থানের মৌখিক ভাষার সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও ঐক্য নেই। খাস কলকাতাবাসীর মুখের বুলি—গ্যালো রোব্‌বারে কোথায় ছেলে হ্যা? ভের বেতে বরযাত্তর গেশলে বুঝি? এই কথাই সাহিত্যোচিত চলিতভাষায় লেখা হবে—গেল (বা গত) রবিবারে কোথায় ছিলে হে? ভাইএর বিয়েতে বরযাত্র গিয়েছিলে বুঝি?

অনেক লেখক মনে করেন, তৎসম শব্দ যত বাদ দেওয়া যায় ততই ভাল। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির একমাত্র যোগসূত্র সংস্কৃত বা তৎসম শব্দাবলী। বহু অবাঙালী বাংলা সাহিত্য পড়ে থাকেন। তাঁদের অনেকের কাছে শুনেছি—বাংলা লেখায় সংস্কৃত শব্দ বেশী থাকলে তাঁদের বোঝবার সুবিধা হয়, বাংলায় বিকৃতরূপে আর বিকৃত অর্থে যে উর্দু বা আরবী-ফারসী শব্দ চলে তাতে তাঁদের সাহায্য হয় না। তৎসম শব্দ কমালে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যে যোগসূত্র আছে তা ছিন্ন হবে, বাংলা ভাষার প্রসার কমে যাবে।

চলিতভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা নয়, সাধুভাষারই কালক্রমিক সংস্করণ। সাধুভাষার পদ্ধতির সঙ্গে অনেক রফা করতে হবে, গ্রাম্যতা একবারে বাদ দিতে হবে, তবেই চলিতভাষা সর্বসম্মত প্রামাণিক সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হবে। অবশ্য সাহিত্যে সকল ভঙ্গীরই স্থান আছে। হুতোম পেঁচার সেকেলে বৈঠকী ভাষা, 'সম্বুদ্ধ' লিখিত কয়েকটি গল্পের বরিশালী ভাষা, সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের সিলেটী-আরবী-ফারসী-জার্মন-ফ্রেঞ্চের বুকনি দেওয়া বিচিত্র আলাপের ভাষা, 'রূপদর্শী'র স্ল্যাং-বহুল আড্ডার ভাষা—সবই উপভোগ্য এবং সাহিত্যে স্থায়িত্ব পাবার যোগ্য। কিন্তু এ ধরণের লঘু ভাষা

রসাত্মক হলেও সর্বার্থসাধক নয়, পাঠ্যপুস্তকের যোগ্যও নয়। যাঁরা খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং গম্ভীর চলিত ভাষাতে লিখে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও এমন লেখক বেশী নেই যাঁদের রচনায় সংস্কৃতেতর শব্দাবলীর ঐক্য আছে—যেমন ঐক্য সাধুভাষার অধিকাংশ লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে সাধুভাষা আর চলিত ভাষা দুইই দিলে তারা দিশেহারা হয়ে একটা খিচুড়ি ভাষায় অভ্যস্ত হবে। রাজনীতি আর চলিত ভাষা দুটোই অপরিহার্য, কিন্তু একটু বেশী বয়সে চর্চা করাই নিরাপদ।

কৃষ্ণদয়ালবাবু নিম্ন শ্রেণীতে ব্যাকরণের চাপ কমাতে বলেছেন। এই প্রস্তাব সমীচীন মনে করি। শিশু যেমন শুনে শুনে মৌখিক ভাষা শেখে, অল্পবয়স্ক ছাত্র তেমনি বই পড়ে সাহিত্যিক বা লৈখিক ভাষা শিখবে। ব্যাকরণ একটি analytical শাস্ত্র, 'ব্যাকরণ'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বিশ্লেষণ। আগে সংঘটন অর্থাৎ বাক্যরচনা, তার পর বিশ্লেষণ বা ব্যাকরণ শেখাই যুক্তিসংগত। ছাত্র যা পড়বে তা থেকেই বানান, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধিসমাসবদ্ধ পদ, বাক্যরীতি ইত্যাদি শিখবে। প্রাথমিক ব্যাকরণে কৃৎ তদ্ধিত আর সমাস প্রকরণের দরকার দেখি না। ইংরেজী ভাষাতেও নানারকম সমাস আছে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ—sunlight, কর্মধারয়—hot bag, বহুব্রীহি—blockhead, অলুক্—son-in-law ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজী প্রাথমিক ব্যাকরণে সমাস-প্রকরণ থাকে না অথবা সংক্ষেপে থাকে। ছাত্র যদি ভবিষ্যতে সাহিত্যিক হয় এবং নূতন নূতন শব্দ আর সমাসবদ্ধ পদ রচনা করতে চায়, তবে তাকে ভাল করে ব্যাকরণ শিখতেই হবে। কিন্তু এই শিক্ষা উচ্চতর শ্রেণীতে হওয়াই ভাল।

❑

বনফুলকে লিখিত চিঠি। এই সময়ে প্রকাশিত 'বনফুলের গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকারূপে মুদ্রিত। —সঃ

ছোটগল্প বলতে কি বোঝায়

(১৩৬২/১৯৫৬)

ছোট গল্প বললে কি বোঝায়—আপনার এই প্রশ্ন শুনেই মুখে উত্তর আসে—মানে তো স্পষ্ট, যেমন ছোট এলাচ ছোট সাহেব ছোট লোক, তেমনি ছোট গল্প। কিন্তু এ উত্তর অচল। কত ছোট? কিসের চাইতে ছোট? ছোট হলে শুধু আকার কমে যায়, না গুণও বদলায়? গল্প মানে কি?

আধুনিক বাংলা ভাষা ইংরেজীর অনুগামিনী ল্যাংবোট। ইংরেজী শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই। আজকাল 'প্রতিভার লক্ষণ' লিখলে চলে না, Promise-এর মাছি-মারা নকলে লিখতে হবে প্রতিভার প্রতিশ্রুতি।' ভবিষ্যতে হয়তো আমরা হিন্দীর বশে চলব, কিন্তু আপাতত ইংরেজীই বাংলার প্রভু। অতএব নভেল আর স্টোরি শব্দের মানে আগে বুঝতে হবে।

বাংলায় গল্প কথা কাহিনী সমার্থক। মহাভারতের প্রকান্ড আখ্যান গল্প, কথামালার ক্ষুদ্র আখ্যানও তাই। ইংরেজীর তরজমা করে আমরা নভেলকে উপন্যাস আর স্টোরিকে গল্প বলি। এককালে রোমান্স অর্থে রমন্যাস চলত, কিন্তু আজকাল শোনা যায় না। সমালোচকরা লিখে থাকেন—'অমুক রচনাটি প্রকৃত পক্ষে বড় গল্প, উপন্যাস বলা চলে না।' অতএব গল্প বড় হলেই উপন্যাস হয় না। কিন্তু উপন্যাস ছোট হলে কি গল্প হয়?

Concise Oxford Dictioneryতে novelএর অর্থ—fictitious prose narrative of sufficient length to fill one or more volumes, portraying characters & actions representative of real life in continuous plot. ওই অভিধানে storyর অর্থ—tale of any length told or printed in prose or verse of actual or fictitious events, legends, myth, anecdote, novel, romance.

উক্ত সংজ্ঞার্থ অনুসারে রূপকথা পুরাণকথা কিংবদন্তী নকশা বা স্কেচ, নভেল প্রভৃতি ছোট বড় সব রকম আখ্যান স্টোরির অন্তর্গত, কিন্তু নভেলে বাস্তবতুল্য মানব-জীবনের একটানা বর্ণনা থাকা চাই। বাংলার উপন্যাস

বললে মোটামুটি বোঝায়—কয়েকজন পাত্রপাত্রীর জীবন ও চরিত্রের আনুপূর্বিক বিবরণ। উপন্যাসে মধ্য ঘটনাবলীই প্রধান, কিন্তু আদি ও অন্ত্য ঘটনারও অল্পাধিক বিবরণ আবশ্যক। পক্ষান্তরে গল্পে আদি মধ্য অন্ত্য যেখান থেকে হক এক খণ্ড ঘটনা দেখালেও চলে।

ইংরেজী স্টোরি শব্দ আজকাল অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে চলছে। অনেক ম্যাগাজিনে স্টোরি নামে এমনি রচনা ছাপা হয় যা সাধারণ বাঙালী পাঠকের বিচারে গল্প নয়। কৌতূহলজনক চিত্তাকর্ষক বা চিন্তার উদ্দীপক ক্ষুদ্র ঘটনার বিবরণও স্টোরি। বিষয়টি অসম্ভব হলেও ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ভূত' আর আপনার (*বনফুলের*) 'জ্যামিতিক গল্প ক খ গ' নিঃসন্দেহে স্টোরি।

অতএব গল্প বা স্টোরির অর্থ উপন্যাস বা নভেলের চাইতে ব্যাপক। উপন্যাস গল্পের অন্তর্গত, কিন্তু গল্প মাত্রই উপন্যাস নয়। গল্পের আকার যাই হক, তার বিষয় অসংখ্য। অধিকাংশ উপন্যাসের উপজীব্য বিরহ-মিলন-কথা। যাতে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পূর্ণ ও সবিস্তার বিবরণ থাকে তাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। বহুকাল পূর্বে একটি ইংরেজী ছড়া শুনেছিলাম, কার তৈরি জানি না। এই ছড়াটিকে যাবতীয় মিলনান্ত প্রেমোপন্যাসের ঘনীভূত নির্যাস বলা যেতে পারে—

Mister Miss
Meet, kiss.
More kisses
Mr. & Mrs.

প্রেম (মামুলী ও বিকৃত) বহুকাল কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ছিল, কিন্তু এখন তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছে খুন চুরি প্রভৃতি অপরাধ এবং রোমাঞ্চকর রহস্য। ডিটেকটিভ কাহিনীর পাঠক সব দেশেই বেশী, কিন্তু বাঙালী রচয়িতা এখনও কোনান ডয়েল এডগার ওআলেস প্রভৃতির তুল্য মর্যাদা পান নি। ইংরেজী গল্পের বিষয়ের সীমা নেই, Erewhon, Perguin Island, Animal Farm প্রভৃতি রূপক গল্প খুব জনপ্রিয়। বাঙালী পাঠকের রুচির বৈচিত্র্যও পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে।

সংস্কৃতে কবি বললে কথাকারও বোঝায়। যিনি রসের উপলব্ধি করেন এবং নিজ রচনার দ্বারা সেই রস অন্যের মনে সঞ্চারিত করেন তিনিই কবি।

(ভাগ্যক্রমে রসের ইংরেজী নেই)। কাব্যকার আর কথাকার দুজনেই রসের ভাবক ও সঞ্চারক, যদিও তাঁদের কলাবিধি পৃথক। যে লেখক শুধু পাঠকের রুচির বশে চলেন তিনি পেশাদার মাত্র। যিনি নিজের নব নব রসানুভূতি ব্যক্ত করে পাঠকের রুচি প্রভাবিত করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।

বিষয়ের বৈচিত্র্যে আপনি আমাদের কথাকারদের মধ্যে অদ্বিতীয়। বাস্তব, কাল্পনিক, অসম্ভব, রূপক, প্রতীকময়, সব রকম রচনাই আপনার আয়ত্ত। আপনি যা লেখেন তা ছোট গল্প কি বড় গল্প কি উপন্যাস তার বিচার নিরর্থক। গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য 'মৃগয়া', অলৌকিক রূপক 'বৈতরণী তীরে', বিচিত্র চরিত্রচিত্র যেমন 'নাথুনীর মা, ছোট লোক, বিজ্ঞান, দেশী ও বিলাতী', সবই আপনার সার্থক সৃষ্টি। অতিকায় প্রাণীর মতন কালবশে মহাকাব্য লোপ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, মহোপন্যাসও ক্রমশ লোপ পাবে, ছোট রচনাতেই সুধীজনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হবে। ভূরিভোজী পাঠক-পাঠিকার জন্য আপনি 'জঙ্গম' লিখে প্রচুর ক্যালরি সরবরাহ করুন। কিন্তু মিতাহারীও অনেক আছে, তাদের জন্য নানাবিধ জীবনীর রসও লঘুমাত্রায় পরিবেশন করতে থাকুন।



ভুল নাম ও নকল জিনিস

(১৩৬৩/১৯৫৬)

সম্প্রতি দিল্লিতে লোকসভায় একজন সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন, বনস্পতিকে ভেজিটেবল ঘি বলা চলবে কিনা। ডক্টর রঘুবীর তার উত্তরে বলেন, ভেজিটেবল ঘি নামে কোনও বস্তু নেই, জিনিসের ভেজালের চাইতে নামের ভেজাল বেশী অনর্থকর।

নামের ভেজাল অর্থাৎ শব্দের অপপ্রয়োগ চিরকালই চলে আসছে। অনেক ভুল নাম কালক্রমে ভাষায় স্থায়িত্ব পায় এবং সাধারণত তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ভুল নামের সুযোগে নিকৃষ্ট নকল জিনিস বাজারে প্রচলিত হয়।

তৈল শব্দের মূল অর্থ তিল থেকে উৎপন্ন, অর্থাৎ তিল তৈল। ইংরেজী অয়েল শব্দের উৎপত্তি, লাটিন অলিয়ম থেকে, যার মৌলিক অর্থ অলিভজাত, অর্থাৎ অলিভ অয়েল। কিন্তু কালক্রমে অর্থ প্রসারিত হয়েছে, এখন স্নেহদ্রব্য বা তত্তুল্য বস্তুমাত্রই তৈল বা অয়েল, সরষের তেল তার্পিন কেরোসিন সবই এই নামে চলে। তালবৃন্তের মূল অর্থ তালগাছের ডাল, তা থেকে হল তালপাতার পাখা; তার পর সংস্কৃত ভাষায় পাখামাত্রই তালবৃন্ত নাম পেল।

অজ্ঞতার জন্য অনেক ভুল নাম চালানো হয়। কয়েকটি ইংরেজী অভিধানে ট্যাবলয়েড শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছিল—ঔষধাদির চাকতি, অর্থাৎ ট্যাবলেট। ট্যাবলয়েড শব্দের যাঁরা প্রবর্তক তাঁরা উকিলের চিঠি দিয়ে জানালেন যে ওই নামে শুধু তাঁদের তৈরি জিনিস বোঝায়, অভিধানে ব্যাপক অর্থ দিয়ে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তখন অভিধান সংশোধিত হল।

একটি বিশেষ কম্পানির প্রস্তুত বীজঘন বস্তুর পেটেন্ট নাম ফিনাইল। কিন্তু সাধারণ লোকে ওই রকম সকল বস্তুকেই ফিনাইল বলে। থার্মস একটি বিশেষ কম্পানির প্রস্তুত জিনিসের নাম, কিন্তু সাধারণ লোকে সব ভ্যাকুয়ম ফ্লাস্ককেই থার্মস বলে। ভ্যাসেলিন নাম একটি আমেরিকান কম্পানির পেটেন্ট, কিন্তু লোকে অনুরূপ সকল বস্তুকেই ওই নাম দিয়েছে। প্রায় পঁচিশ

বৎসর পূর্বে কেড্‌স নামক এক আমেরিকান কম্পানির ক্যাম্বিসের জুতো এদেশে আসত। এখন আর আসে না, কিন্তু অনেক শিক্ষিত লোকেরও ধারণা, কেড্‌স মানেই ক্যাম্বিসের জুতো।

কাগজে দশ-বারো টাকা দামের নাইলন (বা নিলন) শাড়ির বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। ও দামে একজোড়া নাইলনের মোজাও হয় না। রেয়ন বা নকল রেশমের শাড়িকে নাইলন নাম দিয়ে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

ময়রাকে যদি প্রশ্ন করি, মিষ্টান্নে যে হলদে রং দাও তা কি জিনিস? সে বলে, জাফরান। অনেক ময়রাই মনে করে হলদে রং মাত্রই জাফরান। কুঙ্কুম শব্দের অর্থ জাফরান। যেমন চন্দন ঘষে তিলকচর্চা হয় তেমনি এককালে মেয়েরা কুঙ্কুম অর্থাৎ জাফরান বেটে তার টিপ পরত। বাইশ বৎসর আগে মাদ্রাজের মেয়েদের তা পরতে দেখেছি। আধুনিক বাঙালী মেয়ে যাকে কুঙ্কুম বলে তাতে জাফরানের লেশ নেই, যে-কোনও খয়ের রঙের পিষ্ট বস্তু এই নামে চলে। অজ্ঞতার ফলে কুঙ্কুম শব্দের মানে বদলে গেছে।

খাঁটি সোনা খুব নরম, অল্পাধিক খাদ না মেশালে অলংকার গড়া যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজকাল যে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেন তা নাইন ক্যারাট গোল্ডের, অর্থাৎ তার ভরিতে দশ আনা খাদ। এই ভেজাল সোনার মেডালকে গোল্ড মেডালই বলা হয়। কিন্তু দোকানদার যদি সের পিছু দশ ছটাক ভেজাল দেওয়া জিনিসকে ঘি নামে চালায় তবে সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে। মেডাল খাবার জিনিস নয়, সেজন্য তাতে ভেজাল থাকলে আইন ভঙ্গ হয় না।

অনেক ভুল নাম প্রয়োগসিদ্ধ বা আইনসম্মত। অনেক নামে অজ্ঞতা প্রকাশ পেলেও ক্ষতি বিশেষ কিছু হয় না। কিন্তু সাগুদানা বা এরারুট নামের অপপ্রয়োগ অনর্থকর। স্টার্চ (শ্বেতসার বা পালো) অনেক রকম উদ্‌ভিজ্জ বস্তু থেকে প্রস্তুত হয়, যেমন আলু চাল গম ভুট্টা টাপিওকা (কাসাভা বা শিমুল-আলু), শটি ইত্যাদি। যদি সুশোধিত হয় তবে গুণের বেশী তারতম্য দেখা যায় না। তাল-বর্গীয় সাগু গাছের মজ্জা থেকে যে স্টার্চের দানা প্রস্তুত হয় তাই সাগুদানা। ক্যানা বা সর্বজয়া শ্রেণীর এক রকম গাছের মূল থেকে তৈরি স্টার্চের নাম এরারুট (অ্যারোরুট)। আসল সাগু আর এরারুট অন্যান্য শোধিত স্টার্চের তুলনায় বেশী লঘুপাক কিনা তার বোধ হয় কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয় নি। সাধারণে গতানুগতিক ভাবে বিশ্বাস করে যে

চিনির চাইতে মিছরি বেশী উপকারী, তাল-মিছরি আরও উপকারী; তেমনি মনে করে, সুপাচ্যতায় সাগু আর এরারুট শ্রেষ্ঠ। সম্ভবত এই শ্রেষ্ঠতা কাল্পনিক, সকল বিশুদ্ধ স্টার্চই প্রায় সমান পাচ্য।

কিন্তু গুণের তারতম্য থাকুক বা না থাকুক, সাগু আর এরারুট নামে অন্য স্টার্চ বিক্রয় করা প্রতারণা। অনেক বৎসর পূর্বে কোনও অসাধু ব্যবসায়ীর মাথায় এল—আসল সাগুর দরকার কি, টাপিওকার পালো থেকে দানা তৈরি করলেই চলবে, দেখতে আর খেতে একই রকম হবে। এককালে এই নকল জিনিস কোনও কোনও দোকানে কেচুয়া দানা নামে বিক্রি হত, কিন্তু পরে তা সাগুদানা নামেই চলে গেল। এখনকার অনেক দোকানদারও জানে না যে সে নকল জিনিস বেচছে। সাগুদানা নামে লোকে যা কেনে তা টাপিওকার দানা আর এরারুট নামে যা কেনে, তা ভুট্টার স্টার্চ (কর্ন ফ্লাওআর) অথবা টাপিওকার স্টার্চ।

দোকানদার আর জনসাধারণ যাতে সাগুদানা আর এরারুট নামের অপপ্রয়োগ না করে তার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। টাপিওকার দানা আর ভুট্টা প্রভৃতি থেকে তৈরি স্টার্চ নিষিদ্ধ করার দরকার নেই, কারণ কোনওটি *অখাদ্য নয়। কিন্তু এমন আইন হওয়া* উচিত যাতে খাদ্যবস্তু মাত্রই যথার্থ নামে বাজারে চলে। টাপিওকা-দানা, কাসাভা-দানা, শিমুল-দানা বা পালো-দানা নাম চলতে পারে। সবরকম স্টার্চের সাধারণ নাম শ্বেতসার বা পালো দিলে দোষ হবে না।

ভারত সরকার সিন্থেটিক রাইস নাম দিয়ে চালের অনুকল্প তৈরির চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি বিলাতী 'নেচার' পত্রে তার গবেষণার বৃত্তান্ত ছাপা হয়েছে। এর প্রধান উপাদান টাপিওকার পালো আর চীনাবাদামের খোল। এই নকল চালের রূপ আর পুষ্টিগুণ নাকি চালের মতই হবে। তথাপি এ জিনিসকে সিন্থেটিক রাইস নাম দেওয়া অন্যায়। আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে নীল (ইন্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে তার আণবিক গঠন আর গুণ স্বভাবজাত বস্তুর সমান বা প্রায় সমান, সেজন্য সিন্থেটিক (সংশ্লেষিত) বিশেষণ সার্থক। কিন্তু সিন্থেটিক চাল ডাল মাছ মাংস ডিম প্রস্তুত করা মানুষের অসাধ্য। নকল চাল যতই সুখাদ্য হক, তা সিন্থেটিক হতে পারে না, তাকে ইমিটেশন রাইস বা নকল চালই বলা উচিত।

❑

বঙ্গ-বিহার

(১৩৬২/১৯৫৬)

মানুষ সব চেয়ে ভালবাসে আত্মীয়-স্বজনকে, তার পর যথাক্রমে নিজের সমাজ জাতি আর দেশের লোককে। বসুধার সকলকেই যাঁরা কুটুম্ব জ্ঞান করেন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। সাধারণ মানুষের প্রীতির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কিন্তু তা অপরাধ নয়। বিহারের যেসব জেলা প্রধানত বাংলাভাষী তা পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত হক—এই কামনা বাঙালীর পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

কিন্তু আজ যদি বিহার সরকার হঠাৎ উদার হয়ে বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন তা হলেই কি আমাদের অভাব মিটবে, দেশে সমৃদ্ধি আসবে? নানা উপলক্ষ্যে পশ্চিম বাংলায় হিন্দীভাষীর প্রবেশ বহুকাল থেকে অব্যাহত আছে। শ্রমসাধ্য জীবিকায় এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙালী পরাভূত হয়েছে, বিহারী ওড়িয়া পঞ্জাবী মারোয়াড়ী মাদ্রাজী গুজরাটী প্রভৃতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, এবং এই সব বিদেশীর অনেকে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলার প্রধান প্রধান নগরে যেসব অবাঙালী স্থায়ী ভাবে বাস করেন তাঁদের মধ্যে প্রবল প্রতিপত্তিশালী লোক অনেক আছেন। সম্প্রতি উদ্‌বাস্তুর আগমনে বাংলাভাষীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে কিন্তু বাঙালীর প্রভাব বাড়ে নি। এমন সম্ভাবনা অমূলক নয় যে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে অবাঙালীর সংখ্যা ও প্রভাব আরও বাড়বে। উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি রাষ্ট্র আইন করে বিজাতির অনুপ্রবেশ দমন করেছে, কিন্তু ভারতের কোনও প্রদেশের এমন অধিকার নেই যে অন্য প্রদেশবাসীর আগমন রোধ করে। অতএব পশ্চিম বাংলা উত্তরোত্তর বহুভাষী বহুজাতির দেশে পরিণত হবে। বিহার প্রভৃতি প্রদেশেও অনেক বাঙালী আছেন, কিন্তু এককালে তাঁদের যে প্রভাব ছিল এখন তা নেই।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে শ্রমসাধ্য কর্মে বিমুখতা, ব্যবসায়ে অপটুতা, এবং অন্য বহু ক্ষেত্রে উদ্যমের অভাবে প্রবাসে আর স্বদেশে বাঙালী ক্রমশ ক্ষীণবল হচ্ছে। অধিকাংশ বাঙালীর মনে এই ভয় আছে যে বঙ্গ-বিহার একরাজ্য হলে আমাদের আত্মরক্ষার যেটুকু রাজনীতিক শক্তি আছে তাও খর্ব

হবে, এবং স্বাধীনতালাভের পূর্বে লীগ-সরকারের আমলে হিন্দু বাঙালীর যে দুর্দশা হয়েছিল তাই ফিরে আসবে। লক্ষ্য করবার বিষয়—সংযোগের প্রস্তাবে অধিকাংশ বাঙালী ভয় পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ বিহারী খুশী হয়েছেন।

যাঁদের উদ্‌যোগে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তাঁরা কোনও প্রদেশের সংকীর্ণ নীতি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। প্রদেশ ভাগের প্রধান লক্ষ্য—প্রশাসনের সৌকর্য, শিল্পের প্রতিষ্ঠা, কৃষির বিস্তার ইত্যাদি সর্বহিতকর কর্ম, ভাষার ঐক্য অপেক্ষাকৃত গৌণ। ভারতীয় প্রজা অবাধে সকল রাজ্যে প্রবেশ করবে, বসতি করবে, সর্বত্র সমান অধিকার পাবে, সেই সঙ্গে তার নিজের ভাষা আর সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে—এই হচ্ছে সংযুক্ত ভারত রাষ্ট্রের নীতি। ভাষার ঐক্য অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশ ভাগ করা অসাধ্য, একভাষী প্রদেশও কালক্রমে বহুভাষী হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। অতএব, বিভিন্ন ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি ও আচারের একত্র অবস্থান উদারভাবে মেনে নেওয়াই সকল প্রদেশবাসীর কর্তব্য।

সংযুক্ত বঙ্গ-বিহার সম্বন্ধে শঙ্কার মূলে আছে—(১) জীবিকার নানা ক্ষেত্রে বাঙালীর উদ্যম আর পটুতার অভাব, (২) বিহারবাসীর সংখ্যাধিক্য জনিত প্রাধান্য। প্রথম কারণটি দূর হলে দ্বিতীয়টিরও গুরুত্ব থাকবে না। বাঙালী যদি অধিকাংশ ব্যবসায় আর শ্রমসাধ্য কাজ বিদেশীকে ছেড়ে দিয়ে চাকরি ওকালতি ডাক্তারি শিক্ষকতা গ্রন্থরচনা প্রভৃতি কয়েকটি বাছা বাছা বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং অতিমাত্র ভাবালু হয়ে নাচ গান সিনেমা আর গুরু-গুর্বী নিয়ে মেতে থাকে, তবে কেবল ভাষার গণ্ডি টেনে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, নিজের দেশেও তাকে দুর্বল পরাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। অতএব আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বাঙালীকে উদ্যমী আর পরিশ্রমী হতে হবে। একভাষী বা বহুভাষী কোনও প্রদেশেই শক্তিশালী স্বাবলম্বী বাঙালীর ভয় থাকবে না।

আমার মনে হয়, বঙ্গ-বিহার একীকরণের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, আবার হঠাৎ একীকরণও বাঞ্ছনীয় নয়। একীকরণ আমাদের

প্রবন্ধটি বঙ্গ-বিহার সংযুক্তীকরণের প্রস্তাব প্রসঙ্গে লিখিত। ১৯৫৬ সালে ভাষাসমস্যা ও রাজ্য পুনর্গঠন নিয়ে সারা ভারতে অশান্তি দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অশান্তি দূরীকরণের জন্য বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব দেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই নিয়ে বহু মতানৈক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত খেজুরী উপনির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হলে এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। —সঃ।

আদর্শ ও সাধনার বিষয় হয়ে থাকুক। দুই প্রদেশের সংযোগের ফলে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং উভয়েরই কল্যাণ হবে। যদি ভবিষ্যতে আসাম উড়িষ্যা আর ত্রিপুরাও বঙ্গ-বিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে আরও ভাল। কিন্তু সংযোগ এখনই সাধ্য নয়, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। আদর্শ মনে রেখে বাঙালী আর বিহারী ভবিষ্যৎ মিলনের জন্য সচেষ্ট হক। বিহারনিবাসী বাঙালীর ক্ষোভের যেসব কারণ আছে, বিহার সরকার তা দূর করুন। পশ্চিমবঙ্গানিবাসী বিহারীর যদি কিছু অভিযোগ থাকে, তারও প্রতিকার এদেশের সরকার করুন। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার সঙ্কল্প অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হক, তাতে বাঙালীর হিন্দীপ্রভুত্বের ভয় কমবে। অন্তত পাঁচ বৎসর বিহার আর পশ্চিম বাংলার কোর্টশিপ ও আত্মশুদ্ধি চলুক। এই পরীক্ষা-কালের মধ্যে যদি মনোমালিন্য দূর হয়, তবেই দুই প্রদেশের সংযোগ সাধ্য হবে। কতকগুলি সংলগ্ন রাজ্য নিয়ে যে মণ্ডল বা Zone গঠনের প্রস্তাব নেহরুজী করেছেন, তার দ্বারা ভবিষ্যৎ মিলনের পথ সুগম হবে।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে যেসব ইওরোপীয় জাতি বসতি করেছে তারা দুই পুরুষের মধ্যেই মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজী ভাষা আত্মসাৎ করেছে এবং অন্যান্য প্রজার সঙ্গে মিশে গেছে। ওলন্দাজ রুজভেল্ট এবং জার্মান আইজেনহাওয়ার অসম্পূর্ণভাবে মার্কিন হয়ে গেছেন। ভারতবাসী অত সহজে ভাষা আর সামাজিক প্রথা বদলাতে পারে না, সেকারণে সম্পূর্ণ একীভবন এখন অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা থাকলে কালক্রমে তাও ঘটতে পারে। ততদিন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন'ই ভারতীয় প্রজার সাধনীয় হক, কিন্তু বৈচিত্র্যে যেন ভেদবুদ্ধি আর বিদ্বেষ না আসে। মার্কিন রাষ্ট্রের মতন সর্বাঙ্গীণ মিলন অসম্ভব হলেও দ্বিভাষী কানাডা আর ত্রিভাষী সুইৎসারল্যান্ডের মতন মিলন অসাধ্য হবে কেন?



সাহিত্য-সংস্কার

(১৩৫৬/১৯৪৯)

সব দিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়াছে, মিস মেয়ো অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, স্টেটসম্যান বর্জন ও ইংলিশম্যানের অর্জন জোর চলিতেছে, রিফর্ম কমিশনও নিশ্চয় বয়কট হইবে। কিন্তু আসল কাজই বাকী রহিয়াছে—খুড়ার গঙ্গাযাত্রা।

সজ্ঞানে তীরস্থ করার উপযোগী খুড়া পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু বিস্তর লেখক আছেন, ছোট বড় মাঝারি,—তাঁদের দুরস্ত করাই এখন মস্ত কাজ। লেখকগণের নিজের চরিত্র সংশোধনের কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার চরিত্র, তারা কি বলে কি করে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়।

গীতায় ভগবান একটি খাঁটী কথা বলিয়া গেছেন—কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োইপাত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ কি কর্ম আর কি অকর্ম সে বিষয়ে কবিদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে যে সব অনর্থ ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে তার প্রতিকার আবশ্যক। আমাদের প্রথম কর্তব্য—বড় বড় লেখকগণ যা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তার একটা গতি করা। দ্বিতীয় কর্তব্য—ভবিষ্যতে যাঁরা লিখিবেন তাঁদের জন্য একটি আদর্শ-নির্দেশ।

ছোট-খাটো লেখকগণ ধর্তব্য নন, কারণ তাঁদের লেখা কালক্রমে আপনিই মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁরা সম্রাট, তাঁদের লেখা আবশ্যক মত সংস্কার করা অবশ্যকর্তব্য। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা দূরে থাক তাঁর গানের সুরেও কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চান না। যদি সত্য হয় তবে দুঃখের বিষয়। স্টিভেনশন প্রথমে যে রেলগাড়ির এঞ্জিন সৃষ্টি করেন তার চিম্‌নি ছিল চার হাত, হেলিয়া দুলিয়া কোনও গতিকে গজেন্দ্রগমনে ঘণ্টায় পাঁচ-দশ মাইল চলিত। আর এখনকার পঞ্জাব বম্বে মেলের এঞ্জিন দেখ, কি পরিবর্তন। কিন্তু স্টিভেনশনের মর্যাদা কিছুই কমে নাই। যদি রবীন্দ্রনাথের বাউলের সুর ওস্তাদ-পরম্পরায় সংস্কৃত হইয়া বাগেশ্রী-চৌতালে পরিণত হয়, তবে তাঁর ক্ষুণ্ণ হওয়া অনুচিত, কারণ ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। যদি কোন দক্ষ ব্যক্তি গোরার উন্নত সংস্করণে পরেশবাবুর বড় মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে পানুবাবুর

বিবাহ দেয়, তবে দেখিতে শুনিতে ভালই হয়। অধিকন্তু, যদি রেললাইনের উপরেই সানাই বাজাইয়া মোটর চালানো যায়, অর্থাৎ নরেশচন্দ্রের কমলের সঙ্গে যদি শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর শুভবিবাহ সংঘটিত হয় এবং তদুপলক্ষে যতীন্দ্র সিংহ মহাশয়ের চাকারভর্তি সাহেব সঙ্গত রচনা করেন, তবে মস্ত একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। এই উপায়ে প্রবীণ নবীন সমস্ত বড় বড় লেখকদের রচনা অদল বদল করিয়া ছাঁটিয়া তালি দিয়া নির্দোষ চিরস্থায়ী সাহিত্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য—ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ-নির্দেশ। এই আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে আর্ট ও সমাজ দু-ই বজায় থাকে।

আর্ট কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে—যা ভাল লাগে তাই আর্টের অঙ্গ বা রসবস্তু, এবং তা ভদ্রজনের মুখরোচক করিয়া পরিবেশন করাই আর্ট। অবশ্য একই বস্তু সকলের ভাল না লাগিতে পারে, অতএব আর্টের সৃষ্টি ও উপভোগ কতকটা ব্যক্তিগত। কিন্তু এমন জিনিস অনেক আছে যা অনেকেরই ভাল লাগে কেবল মাত্রার তারতম্য লইয়াই বিবাদ। সকলেই বলে—দুধ অতি উপাদেয় বস্তু, কিন্তু কেউ ঢকঢক করিয়া খায়, কেউ একটু-আধটু খায়। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ প্রসিদ্ধ, মাত্রা-ভেদে ভদ্র-অভদ্র অনেকেরই রুচিকর। অতএব দুধ ও পেঁয়াজ দুই অপরিহার্য রসবস্তু! তথাপি, সমাজ মনে করে—দুধ যত খাওয়া যায় ততই বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু পেঁয়াজ বেশী মাত্রায় বিকট। তাই আমরা গতানুগতিক ভাবে দুধ-খোরকে বলি সাত্ত্বিক, পেঁয়াজ-খোরকে বলি নেড়ে। ইহা অন্ধ সমাজের কথা, আমাদের অন্তরের কথা নয়। দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি প্রীতির কথা শুনিতে আমাদের বেশ ভাল লাগে তা অবশ্য মানি, কিন্তু কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, খুনোখুনি-ব্যভিচার, নরমাংস, নারীমাংস —এ সকলও উপযুক্ত অনুপানের সহিত কম উপভোগ্য নয়।

সর্বভুক্ পাঠক হাঁ করিয়া আছে, ওস্তাদ রসস্রষ্টা কাহাকেও বঞ্চিত করিতে, কিছুই বাদ দিতে পারেন না। তিনি শান্ত করুণ রসের স্রোত বহাইবেন, আবার ষড়্‌রিপুর বিচিত্র খেলা দেখাইয়াও তাক্ লাগাইয়া দিবেন। কিন্তু নিন্দকের মুখ বন্ধ করিবেন কোন্ উপায়ে? পূর্বাচার্যগণ তাহা দেখাইয়া গেছেন। ভারতচন্দ্র পায়সান্ন পরিবেশনের সঙ্গে কালীনামের গরম মসলা দিয়া শুঁটকী মাছ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগে তাহা চলিবে না, কারণ উক্ত মাছের নূতনত্ব নাই, কালীনামেরও আর তেমন হজম করাইবার ক্ষমতা নাই।

মনীষী রেনল্ড্স ও তাঁর ভারতীয় শিষ্যগণ উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁরা যথাসাধ্য আর্টের কেরামতি করিয়া অবশেষে দেখাইয়াছেন ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়। ইহাই নিন্দকের প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। এখন আর্টের সীমা আরও বর্ধিত হইয়াছে, প্রাচীন লেখকগণ যা স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন নব নব রসবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,—আলকাতরা হইতে স্যাকারিন, বানরের অঙ্গে নব যৌবনের গ্রন্থি, ছাগলের মনের গোপন কোণে উদ্দাম প্রেমের আদিধারা। কিছুই বাদ দিবার দরকার নাই, যা কিছু ব্যাপার হইয়া থাকে বা ঘটিতে পারে তা-ই আর্টের গণ্ডিতে পড়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা চাই। যত ইচ্ছা নরক মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার কর, কিন্তু উপসংহারে সমস্ত পাপাত্মার নাক কাটিয়া দাও।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব, কিন্তু প্লট মনে আসিতেছে না। অপরের প্লট যে আত্মসাৎ করিব তার জো নাই,—আজকালকার ছোকরারা অতি চালাক, রুশিয়া হইতে চুরি করিলেও ধরিয়া ফেলিবে। অতএব ঋণ স্বীকার করিয়াই চন্দ্রশেখর হইতে দু-একটি চরিত্র লইব। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশী হইয়াছে,—আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের ব্যাপ্তি না জানায় প্রতাপকে তিনি একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল —ভটচায, ও ভটচায।

চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন,—কে ও, প্রতাপ যে। বেশ সেরেচ বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল—শৈবলিনীকে ডেকে দিন।

চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—নাই বা দেখা করলে।

—দেখা করতে আমি আসি নি, একেবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগ্‌গির।

—সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

—হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আমি তো আর লরেন্স ফস্টর নই। সব ঠিক করেচি, তোকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবে,—তার পর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাব খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধরে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল—আমি জাল! মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? একই বৃন্তে দুটি ফুল কে ছিঁড়িয়াছিল? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষী, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্বে গণিয়া দেখ নাই?

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে কহিলেন—খুবই অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। স্ত্রী-চরিত্র তো জ্যোতিষে গণা যায় না। এই কলিকালে যে বিবাহের পূর্বে প্রেম হতে পারে তা জানতুমই না। যেতে দাও বাবা, যেতে দাও—যা হবার হয়ে গেছে। বেচারী এখন শান্তিতে আছে, সংসারধর্ম করচে, পুরনো কথা সব ভুলেচে। আহা, আর তাকে উদ্‌ব্যস্ত করো না।

প্রতাপ উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিল—এই বিদ্যে নিয়ে তুমি পণ্ডিতি কর? যে অন্তরে অন্তরে আমারই, তাকে তুমি কোন্‌ অধিকারে আটকে রাখবে? বল ব্রাহ্মণ, বল বল। যে আমার শৈশব-সঙ্গিনী, সে আজু কাঁহা মেরী হৃদয়কী-ঈ-ঈ—(স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর ভীত হইয়া বলিলেন—একটু ঠাণ্ডা হও বাবা। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি।—পাপের স্পর্শ হতে কেউ রক্ষা পায় না, শৈবলিনীও ছেলেবেলায় পাপে পড়েছিলেন—

—অ্যাঁ! পূর্বরাগ পাপ?

—সর্বত্র পাপ নয় বাবা। কিন্তু যেখানে স্বাধীন বিবাহ চলিত নেই, সেখানে পূর্বরাগের ফলে পরে শান্তিভঙ্গ হতে পারে, সেজন্যই পাপ।

—তবে পাপীয়সীকে ছেড়ে দাও না ঠাকুর।

—খাপ্‌পা হয়ো না বাবা। পাপ হলই বা—ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনি,—অমন একটু-আধটু পাপ আমরা সবাই করে থাকি। কিন্তু সেটা নির্মূল করাও যায়। শৈবলিনী মন্ত্রলাভ করেছেন, যে মন্ত্রবলে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাতে চালানো যায়। (মূল গ্রন্থ দেখ)

—বুঝেচি বুঝেচি, বুজরুকি করে তাকে আটকে রাখতে চাও! ও চলবে না ঠাকুর, তুমি তাকে আটকাবার কে? আমার শৈবলিনীকে চাই, এক্ষুনি এক্ষুনি। উচাটন মন যারে ধরিবারে ধায়, তারে কেন-ক্যানও-কেন নাহি পায়! (স্টার থিয়েটার দেখ)

চন্দ্রশেখর খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন—ক্যানও নাহি পায় তা আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। রামচরণ, অ রামচরণ—

রামচরণ এখন ভটচায-বাড়িতেই কাজ করে। সাড়া দিল—আজ্ঞে।

—ওরে নিয়ে আয় তো আমার ছড়িটা, সেই বেতের লিক্‌লিকে ছড়ি। বাঁশের লাঠিটা নয়, বুঝেচিস্‌?

প্রতাপ বলিল—ছড়ি কি হবে, ভটচায?

—তোমায় লাগাব। দু-এক ঘা খেলেই বুদ্ধি সাফ হয়ে যাবে। রামচরণ, জল্‌দি—

প্রতাপ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—অ্যাঁ, মারবে? প্রতাপ রায়ের গায়ে হাত? তবে রে পাজী, শুয়ার—

—অ রামচরণ, বেতের ছড়িতে হবে না রে, বাঁশের লাঠিটাই আন্‌—

প্রতাপ সদর্পে পলায়ন করিল। আর্ট ও সমাজধর্ম দু-ই বজায় রহিল, অথচ লাঠি ভাঙিল না।

❑

চিরকুমার সভা সম্বন্ধে দুটো আপত্তি জানিয়েছিলেন। —এমন মজার একটা ঘটনায় কবি কেন এক বালবিধবা চরিত্র রাখলেন—শৈলবালা-অবলাকান্তবাবু। দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভয়ানক—কবি ভাবলেন না 'ফেণী' পূর্ণকে বিয়ে করে চলে গেলে একা বৃদ্ধ চন্দ্রবাবুকে কে দেখবে; উচিত ছিল ওঁরও একটা বিয়ে দেওয়া। জগত্তারিণী হলেও চলত। এটি বলেছিলেন ওঁর দৌহিত্রী, আমার মাকে। —সঃ।

তামাক ও বড় তামাক

(১৩৫৬/১৯৪৯)

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, মানুষ নেশা করিতে শিখিয়াছে, জন্তু শেখে নাই। বিড়াল দুধ মাছ খায়, অভাবে পড়িলে হাঁড়ি খায়, ঔষধার্থে ঘাস খায়, কিন্তু তাকে তামাকের পাতা বা গাঁজার জটা চিবাইতে কেউ দেখে নাই। মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে, ঘর-সংসার পাতে, জীবন-ধারণের জন্য যা-কিছু আবশ্যক সমস্তই সাধ্যমত সংগ্রহ করে, কিন্তু এতেই তার তৃপ্তি হয় না—সে একটু নেশাও চায়। অবশ্য গম্ভীর-প্রকৃতি হিসাবী লোকের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে নেশা মাত্রই অনাবশ্যক; কারণ তাতে দেহের পুষ্টি হয় না, জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে অপকারই হয়। তথাপি বহু লোক কোনও অজ্ঞাত অভাব মিটাইবার জন্য নেশার শরণাপন্ন হয়।

নেশা বহু প্রকার, যথা তামাক গাঁজা মদ সঙ্গীত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি। সকলগুলির চর্চার স্থান এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় নাই, সুতরাং তামাক ও গাঁজা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

তামাক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দক জুটিয়াছে। তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, বুদ্ধি জড় হয়, হৃৎপিণ্ড দূষিত হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে? জগতের আবাল-বৃদ্ধ তামাকের সেবক, বনিতারাও হইয়া উঠিতেছেন। তামাকের বিরুদ্ধে যেসব ভীষণ অভিযোগ শোনা যায়, তামাক-খোর তার খণ্ডনের কোন প্রয়াসই করে না, শুধু একটু হাসে ও নির্বিকারচিত্তে টানে। কিন্তু তাদের অন্তরে যে জবাব অস্ফুট হইয়া আছে, আমরা তার কতকটা আন্দাজ করিতে পারি।—মশায়, তামাক জিনিসটা স্বাস্থ্যের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যই কি সব চেয়ে বড়? একটু না হয় ক্ষুধা কমিল, চেহারায় পাক ধরিল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করিল,—কিন্তু আনন্দটা কি কিছুই নয়? মোটের উপর লাভটাই আমাদের বেশী। লোকসানের মাত্রা যদি বেশী হইত, তবে আপনিই আমরা ছাড়িয়া দিতাম, উপদেশের অপেক্ষা রাখিতাম না। আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে, ভদ্র-সমাজে কেউ আমাদের অবজ্ঞা

করে না। হাঁ, কোন কোন অর্বাচীনের তামাক খাইলে মাথা ঘোরে তা মানি; কিন্তু দু-এক জনের দুর্বলতার জন্য আমরা এত লোক কেন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব?

এই সময় গঞ্জিকাসেবীর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল—ভায়া, আমরাও আছি। আমাদের তরফেও কিছু বল।

তামাক-খোর ধমক দিয়ে বলেন—দূর হ লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল! তোদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

গাঁজা-খোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—সে কি দাদা? তোমাতে আমাতে তো কেবল মাত্রার তফাত। তুমি খাও তামাক, আমি খাই বড়-তামাক। তোমরা শৌখিন বড়লোক, তাই বিস্তর আড়ম্বর,—রুপোর ফরসি, জমিদারি সটকা, সোনার সিগারেট-কেস, কলের চকমকি। আমরা গরীব, তাই তুচ্ছ সরঞ্জামের বড়বড় নাম রাখিয়াই শখ মিটাই। গাঁজা কাটিবার ছুরিকে বলি রতন-কাটারি, কাঠের পিঁড়িকে বলি প্রেম-তক্তি, ধোঁয়া ছাঁকিবার ভিজা ন্যাতাকে বলি জামিয়ার, গাঁজা ডলিবার সময় মন্ত্র বলি—বোম্ শঙ্কর কঙ্কড় কি ভোলা! আমাদের নেশার আয়োজনেই কত কাব্য-রস—তোমরা তো পরের প্রস্তুত জিনিস টানিয়াই খালাস। আর, আনন্দের কথা যদি ধর, তবে তোমরা বহু পশ্চাতে। ত্বরিতানন্দ জান? আমরা তাই উপভোগ করি। স্বাস্থ্য? তার জবাব তো তোমরা নিজেরাই দিয়াছ। আমরা স্বাস্থ্যের উপর একটু বেশী অত্যাচার করি বটে, কিন্তু আনন্দটি কেমন? না হয় গলাটা একটু কর্কশ হইল, চোখ একটু লাল হইল, চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হইল, কিন্তু মোটের উপর শরীর মন ঠিকই আছে।

হিসাবী সমাজহিতৈষী দুই তরফের কথা শুনিয়া বলিলেন—তোমাদের বচসা মিটানো বড়ই শক্ত কাজ। আমি বলি কি—তোমরা দু দলই বদ অভ্যাস ত্যাগ কর। শরবত খাও, ভাল ভাল জিনিস খাও, যাতে গায়ে গত্তি লাগে, যথা লুচি-মণ্ডা। প্রকৃত আনন্দ তাতেই আছে।

তামাক-খোর বলিলেন—শরবত খুব স্নিগ্ধ, লুচি-মণ্ডাও খুব পুষ্টিকর, সুবিধা পাইলেই আমরা তা খাই। কিন্তু এ সব জিনিসে আত্মা তৃপ্ত হয় না, আড্ডা জমে না। কিঞ্চিৎ নেশার চর্চা না করিলে মানুষে মানুষে ভাবের বিনিময় অসম্ভব। তামাক অবশ্য চাই, এইটিই নিরীহ প্রকাশ্য নেশা, আর সব নেশা অপ্রকাশ্য।

গাঁজা-খোর বলিলেন—ঠিক কথা। নেশা চাই বইকি, কিন্তু গাঁজাই পরাকাষ্ঠা। তোমাদের পাঁচ জনের উৎসাহ পাইলেই আমরা ভদ্র-সমাজে চালাইয়া দিতে পারি।

সমাজহিতৈষী চিন্তিত হইয়া বলিলেন—তাই তো, বড় মুশকিলের কথা। দেখিতেছি তোমরা কেউ-ই ধোঁয়া না টানিলে বাঁচিবে না। আচ্ছা, অক্সিজেন শুঁকিলে চলে না?

তামাক-খোর গাঁজা-খোর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সমস্বরে কহিলেন—আজ্ঞে, ওটা অন্তিম কালে, হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছু সাকার সুগন্ধি সুস্বাদ মনোহারী ধোঁয়ার ফরমাশ করুন।

হিতৈষী নাচার হইয়া বলিলেন—তবে ঐ তামাক অবধি বরাদ্দ রহিল। তার উপর আর উঠিও না, ঐখানেই গণ্ডি টানিলাম।

গাঁজা-খোর অট্টহাস্যে বলিলেন—খুব বুদ্ধি আপনার! নেশার তত্ত্ব আপনি কিছুই বোঝেন না। ঐ তামাকই তো একটু একটু করিয়া বেমালুম ভাবে গাঁজায় পরিণত হইয়াছে—তামাক-তামা-তাজা-গাঁজা। 'মৌচাক'এর শিশু পাঠকরাও এই তত্ত্ব জানে। কোথায় গণ্ডি টানিবেন?

সমাজহিতৈষী মহাশয় হতাশ হইয়া বলিলেন—তবে মর তোমরা পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা। দিন কতক যাক, তারপর বুঝিব কার পরমায়ু কত কাল।



সমালোচনা

॥ ১ ॥

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। আকার ৯১/২ × ৬১/৪ ইঞ্চ, ২২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এই রচনা পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে, তার পর এ পর্যন্ত আরও ছ বার ছাপা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক ব্যক্তি, বিষয় এবং ঘটনা সম্বন্ধে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য—গ্রন্থের শেষে যোজিত একান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী 'গ্রন্থপরিচয়', কবির বংশলতা, এবং বর্ণক্রমিক উল্লেখপঞ্জী।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র সূচনায় লিখেছেন—'এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য।...নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।...এই স্মৃতিগুলি সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, পাঠকবর্গের কাছে এই রচনা শুধুই সাহিত্য নয়। জীবনবৃত্তান্ত হিসাবে 'এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ' হতে পারে; কিন্তু 'অনাবশ্যক' মোটেই নয়। কেউ যদি নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা নাও বলেন তথাপি নানা উপায়ে তাঁর জীবনের একটা ইতিহাস সংকলন করা যেতে পারে। অধিকাংশ জীবনবৃত্তান্ত এই রকম। কিন্তু এসব বৃত্তান্ত যতই উত্তম হক, তা মূলত বাহ্যদৃষ্ট জীবনচরিত, অর্থাৎ কীর্তি বা আচরণের ইতিহাস। মানসিক ইতিহাস বা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় আত্মচরিত, তা যতই অসম্পূর্ণ হক। 'জীবনস্মৃতি'র একটি পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে—দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি। ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটো একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ।' এই পশ্চাদ্দর্শন বা restrospectionএর জন্যই 'জীবনস্মৃতি' অমূল্য গ্রন্থ।

বর্তমান সংস্করণের শেষে যে 'গ্রন্থপরিচয়' সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা মূল গ্রন্থের পরিপূরক এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যাঁদের চেষ্টায় এই সুদৃশ্য সুমুদ্রিত তথ্যবহুল সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা অশেষ প্রশংসার যোগ্য।

৫/৪/৪৪

॥ ২ ॥

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশক—বুকল্যান্ড লিমিটেড। ৭ × ৫ ইঞ্চ। ৩৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

কীর্তিমানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর কীর্তি। আর কিছু না জানলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু কীর্তিই সমগ্র পরিচয় নয়। তাঁর আকৃতি প্রকৃতি পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতিও লোকে জানতে চায়। বিশেষত যিনি জনপ্রিয় গল্পলেখক এবং বিচিত্র চরিতাবলীর স্রষ্টা, তিনি স্বয়ং কি রকম সে সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের অন্ত থাকে না।

মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর চিঠিপত্র। 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' তাঁর গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। এই চিঠিগুলির বেশীর ভাগ তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বস্ত জনকে লিখেছিলেন। ভবিষ্যতে ছাপা হবে এমন চিন্তা তাঁর মনে ছিল না। সতর্কভাবে লেখা না হলেও এগুলি তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভায় মণ্ডিত। এই সংকলনে আমরা যে ব্যক্তির পরিচয় পাই তিনি সরল, বন্ধুবৎসল, স্নেহাকাঙ্ক্ষী, একটু অভিমানী, বিনয়ী ও পরিহাসপ্রিয়। তিনি খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করেন, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেন। পরের দুঃখে কাতর হন, বাড়ির পশুপক্ষীর মৃত্যুও সইতে পারেন না। প্রায়ই অসুখে ভোগেন, ছবি আঁকেন, বিস্তর বই পড়েন, হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা করেন, 'আবগারী ব্যাটাদের হার মানিয়েছিলাম' বলে গর্ব করেন, কারও কাছে অপরাধ করেছেন মনে করলে অসংকোচে মার্জনা চান। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ethics বোঝেন, কারও চেয়ে কম বোঝেন বলে মনে করেন না। শুধু গল্প নয়, সকল বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখতে পারেন, কেবল পদ্য পারেন না। আরও লিখেছেন—'আমার বাংলা ভাষার উপর দখল নেই বললেই চলে, শব্দসঞ্চয় খুব কম। কাজেই আমার লেখা সরল হয়; আমার পক্ষে শক্ত করে লেখাই অসম্ভব।'

৬/৩/৪৮



পত্রাবলী

সারাজীবন অসংখ্য লোকের—নামী অনামী, কিছু বেনামীও—চিঠি পেয়েছেন রাজশেখর বসু। রোজ ভোরে তাঁর প্রথম কাজই ছিল নিজের হাতে সেসবের—শেষোক্ত দল বাদে—উত্তর লেখা। অতি সামান্য ব্যক্তির চিঠিও কখনও অবহেলিত হত না। হঠাৎ মনে পড়ল প্রায় ৪৫/৪৬ বৎসর আগে পাওয়া এক মানসিক রোগীর বিশাল চিঠি। অতি পরিচিত রোগ—'সকলে আমাকে মেরে ফেলার মতলব করছে।' ঠিকানা ছিল—'Footpath in front of...' বোধহয় দিল্লীর কোনও পরিচিত ভবন। পাওয়ামাত্র কি আন্তরিক সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন সেই ঠিকানাতেই। অনেক সারগর্ভ আলোচনার চেয়ে এ অনেক বড় মানবিকতা।

তবে তাঁর ফাইলে সবচেয়ে বেশী চিঠি দেখেছি বোধহয় বু. ব.—শ্রীবুদ্ধদেব বসুর। রাজশেখর তিরোধানের পরে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র ১৩৬৬ সংখ্যায় তাঁর অসামান্য লেখার কিছু উদ্ধৃতি অবশ্যকর্তব্য।—"...অসংখ্য বার পত্রাঘাত করেছি তাঁকে... বিদ্যুদ্বেগে উত্তর এসেছে, যেমন এককালে শান্তিনিকেতন থেকে আসতো, কখনও, কোনও তুচ্ছ বিষয়েও, নিরাশ করেন নি।...তাঁর চিঠি ছিলো পড়তে ভালো, চোখে দেখতেও কম ভালো নয়—তাও রবীন্দ্রনাথের মতো—এক-একটি পোস্টকার্ডও তাঁর হস্তাক্ষরের গুণে নয়নাভিরাম...। রাজশেখরের হাতের লেখা ছিলো সাবেকি দিশি ছাঁদের, অক্ষরগুলোর ধরণ একটু ঋজু, তাদের স্পষ্টতা অসামান্য—তা একেবারেই রাবীন্দ্রিক নয় বলেই রাবীন্দ্রিকের সঙ্গে তুলনীয়। আর, রবীন্দ্রনাথের চিঠি যেমন উচ্ছল ও বর্ণাঢ্য, তাতে যেমন বোঝা গেছে কোনও সাধারণ কথাকেও কত মনোমুগ্ধকর করে বলা যায়, অলংকরণের কী অসীম সম্ভাবনা তাঁর ভাষার মধ্যে নিহিত, তেমনি রাজশেখরের চিঠিতে দেখেছি ভাষা কত পরিমিত ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে, কত অল্প কথায় সব কথা বলা যায়...। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে সব সময়েই কিছু উপরি-পাওনা জুটতো আমাদের, আর রাজশেখরের চিঠি যেন আক্ষরিক অর্থে যথেষ্ট—একটু বেশি নেই তাতে, কিন্তু একফোঁটা কমতিও নেই; আর এই নিরাভরণ সৌষ্ঠবে ভারি একটি তৃপ্তি আছে আমাদের।..."

অবশ্য অনেক প্রবন্ধের মতন রাজশেখরের বহু চিঠিই দুষ্প্রাপ্য: মাত্র পাঁচটি দিয়েই ক্ষান্ত হতে হল। এর প্রথমটি অতি গুরুত্বপূর্ণ—১৯৩৩এ লেখা।

বাংলা টাইপ সংস্কার সংক্রান্ত এই চিঠির একটি অসম্পূর্ণ অংশ পেয়েছি। প্রাপকের নাম নেই। অবশ্যই বাংলা ভাষা-শব্দ-লিপিতে প্রাজ্ঞ কোনও ব্যক্তি। আর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' 'সত্যবাবু' ও 'পটারির ব্যাপার'—তিনটি সূত্র থেকে প্রায় অখণ্ড অনুমান—প্রাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তাঁর মতন অতি অল্প কয়েকজনকেই রাজশেখর বসু এমন সম্বোধন করতেন। 'পটারি' ইত্যাদি নানান বিষয় যোগেশচন্দ্র নিরীক্ষা করতেন। তাঁর (জ্যেষ্ঠ?) পুত্র— ক্যাপটেন 'সত্য' রায়—রাজশেখর-সুহৃদ্ ছিলেন।

প্রেরকের নাম নেই, ঠিকানা আছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও বকুলবাগানের মাঝের আড়াই বৎসর ওই ছিল রাজশেখরের ঠিকানা। আর আছে তাঁর বু.ব.কথিত রবীন্দ্র-প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তাক্ষর। তাতেই করা সঙ্গের দুটি টাইপএর অসামান্য 'এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং'।

—স:।

॥ ১ ॥

৩০বি সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা
২৬ মার্চ ১৯৩৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সত্যবাবুর কাছে শুনিলাম আপনি আমাকে একটা চিঠি লিখিয়াছেন। সে চিঠি পাই নাই। পটারির ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম।

আপনাকে একটা বড় চিঠি লিখিতেছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছাপার অক্ষর সংস্কারে মন দিয়াছেন। ইউনিভার্সিটি এই চেষ্টার অনুমোদন করিয়াছে। এখনও কোন পাকা কমিটির নিয়োগ হয় নাই, কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকজনের আলোচনা চলিতেছে। আপনি বহুকাল ধরিয়া যে চেষ্টা একাকী করিয়া আসিতেছেন, ইউনিভার্সিটির কর্তৃত্বে ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এখন তাহা কার্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছুই হইবে না, কারণ, বাধা দিবার লোকের অভাব নাই। নূতন টাইপ নির্মাণে অনেক টাকা খরচ, ইউনিভার্সিটি তাহাতে রাজী হইবে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার কয়েকবার কথা হইয়াছে। তাঁহার উৎসাহ এত প্রবল যে রেফের পর দ্বিত্ব বাদ দিতে রাজী হইয়াছেন, এমন কি, 'পণ্ডিত' লিখিতেও আপত্তি নাই। নানা লোকে নানা প্রস্তাব আনিতেছেন, উৎকট প্রস্তাবও হইতেছে। অক্রূর বাবু (প্রবাসীতে যাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে) ইউনিভার্সিটির ছাপাখানায় কাজ করেন। ইনি অক্ষর সংস্কারের একটা পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রস্তাব আমার পছন্দ নয়। যে ব্যবস্থা আমার ভাল বোধ হইতেছে তাহা এই পত্রে সংক্ষেপে জানাইতেছি। আপনার অভিমত পাইলে রবীন্দ্রনাথকে জানাইব

২

আমার প্রস্তাবের ভূমিকা—

১। টাইপের সংখ্যা ১৮০র অনধিক হওয়া আবশ্যক, নতুবা লাইনোটাইপ বা মনোটাইপ যন্ত্রে কম্পোজ করা চলিবে না। টাইপ-রাইটারে আরও কম হওয়া চাই, কিন্তু তাহার ব্যবস্থা পরে হইতে পারিবে। যদি ১৮০টা ছাপার টাইপে লোকে অভ্যস্ত হয় তবে আরও কমাইয়া টাইপরাইটারের উপযুক্ত করা সহজ হইবে।

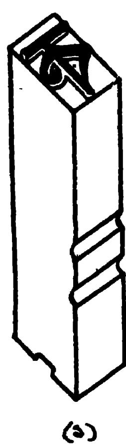
২। অভ্যস্ত লিপির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অবশ্য, কতকটা পরিবর্তন এবং তাহার জন্য সাধারণের বিরাগ অনিবার্য।

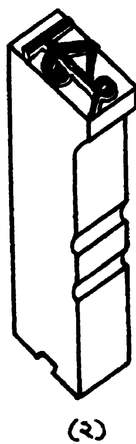
৩। যুক্তাক্ষর সহজবোধ্য হওয়া চাই।

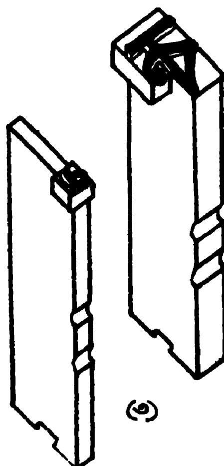
৪। বহু বাংলা টাইপের গড়নে দোষ আছে। টাইপ-নির্মাতা সীস-এন্টিমনির শক্তির উপর জুলুম করিয়াছে। সাধারণ টাইপ (১ম চিত্র) বেশ মজবুত। কতকগুলি টাইপের মুখ উপরে বা নীচে একটু প্রসারিত (kerned। যথা—f, p, উ-স্বর জড়িত-ক। ২য় চিত্র)। এ রকম টাইপ একটু কম মজবুত কিন্তু প্রায় ভাঙে না। কতকগুলি টাইপ দুই খণ্ডে প্রস্তুত, জুড়িলে একটি অক্ষর হয় (৩য় চিত্র। ক+ু)। এই প্রকার kerned টাইপ অত্যন্ত অমজবুত। কু খু ইত্যাদির অখণ্ড টাইপ আছে, তাহা প্রায় ভাঙে না। কিন্তু আপনি যখন রু শু লেখেন, তখন শেষোক্ত kerned টাইপ জুড়িয়া ছাপা হয় এবং উ-কার প্রায় ভাঙে।

অতএব, টাইপ এমন হইবে যে কেবল পাশাপাশি সাজাইয়া দিলেই চলিবে, এক টাইপের শাখা অন্য টাইপের মাথায় বা নীচে বসিবে না।

৫। কতকগুলি অক্ষর এত জটিল যে ছাপার প্রায় অস্পষ্ট হয়। নব-উদ্ভাবিত অক্ষরের আকৃতি যথাসম্ভব সরল হওয়া উচিত।


(১)


(২)


(৩)

॥ ২ ॥

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
২১/৮/৪০

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

অনেকদিন আপনার সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই, আশা করি ভাল আছেন।

একখানা চলন্তিকা ৩য় সংস্করণ পাঠাইলাম। ছাপার ভুল ছাড়া যদি কোনও ত্রুটি আপনার নজরে পড়ে তবে জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব। চলন্তিকার ৪র্থ সংস্করণের জন্য এখন হইতে সংশোধনাদি করিতেছি এবং আপনার শব্দকোষ হইতে অনেক সাহায্য পাইতেছি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বহুপ্রচলিত কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের শুদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছি না। আপনিও হয়তো এইগুলি বিচার করিয়াছেন। যদি আপনার মত আমাকে লেখেন তবে উপকৃত হইব। এখানে যেসকল পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ আছে তাঁহারা একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন—সমাসবদ্ধ শব্দের উত্তর ঞিৎ, ণিৎ বা কিৎ প্রত্যয় হইলে কোথায় পূর্বপদের, কোথায় উভয়পদের, কোথায় বা কেবল উত্তরপদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় তৎসম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়ম নাই, সংস্কৃত সাহিত্যে যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহাই প্রমাণ। আমার প্রশ্ন এই।—আধুনিক প্রয়োজনে যেসকল নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে তাহাদের গঠন কি প্রকার হইবে? কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।—

অতিমানুষিক, আতিমানুষিক। বোধ হয় দুইটাই বর্জন করিয়া 'অতিমানুষ' লিখিলে চলে।

অর্থনৈতিক, আর্থনীতিক, অর্থনীতিক।

প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্বিক।—বোধ হয় 'প্রত্নতত্ত্বীয়', 'প্রত্নতত্ত্ববিৎ' বা 'প্রত্নবিৎ' লিখিলে সংশয় এড়ানো যায়।

বস্তুতান্ত্রিক, বাস্তুতান্ত্রিক।

রাজনৈতিক, রাজনীতিক।—যদি দুইটাই শুদ্ধ ও সমার্থক হয় তথাপি প্রয়োগের সুবিধার্থ প্রথমটি Political (রাজনীতি বিষয়ক), দ্বিতীয়টি

Politician (রাজনীতিজ্ঞ) অর্থে চালানো যায় কি? যেমন আজকাল Scientific অর্থে বৈজ্ঞানিক, Scientist অর্থে বিজ্ঞানী চলিতেছে।

সমসাময়িক, সামসময়িক, সমসময়িক।—প্রথমটিই চলিতেছে। 'সম+সাময়িক' এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিলে চলে না কি? যেমন সমকালীন।

আন্তর্জাতিক।—বোধহয় প্রকৃত অর্থ—জাতির অন্তর্গত।

কিন্তু প্রচলিত অর্থ—International, অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্বন্ধী। শেষ অর্থ সমর্থন করা যায় কি?

বিনীত
রাজশেখর বসু

॥ ৩ ॥

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য।

৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
৪/২/৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুইটি শব্দের বানান সম্বন্ধে সংশয় নিরসনের জন্য আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

(১) Conduction-এর পরিভাষা করা হইয়াছে 'পরিবহন'। শেষে ণ হইবে কি?

(২) 'প্রবহমাণ' শব্দ আজকাল খুব দেখা যায়। ব্যাকরণ কৌমুদী এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা দুই পুস্তকেই ণত্ব প্রকরণে উদাহরণ রূপে 'প্রবহমাণ' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ কৌমুদীতে পরস্মৈপদ-বিধান প্রকরণে পাণিনিসূত্র দেওয়া আছে 'প্রাদ্‌বহঃ' (পাঃ ১/৩/৮১)—প্র পূর্বক বহ্‌ ধাতু পরস্মৈপদী হয়। তাহা হইলে শানচ প্রত্যয়ান্তে 'প্রবহমাণ' কিরূপে সিদ্ধ হয়?

বহুকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনি ভাল আছেন জানিলে সুখী হইব।

বিনীত
রাজশেখর বসু।

॥ ৪ ॥

৩০/৪/৫২

সবিনয় নিবেদন

সমস্ত সুবিধা অসুবিধা বিচার করিয়া বহু পণ্ডিত যে বানান গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্থির করেন, এবং বহু বিখ্যাত লেখক যদি সেই বানানে লেখেন, তবেই তাহা প্রামাণিক। ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল অনুসারে রচিত বানান অগ্রাহ্য।

রা.ব.

॥ ৫ ॥

১৫/৬/৫৭

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু
প্রীতিভাজনেষু

আপনার ১০/৬ এর চিঠি। সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি। কোনও ভুল শব্দ বা অর্থ যদি বহু শিক্ষিত লোকে বহুকাল ধরে চালাতে থাকে তবে কালক্রমে তা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায়, এ আমি মানি। সংস্কৃত শব্দও কালে কালে বদলেছে; বাঙলা ভাষার সুবিধার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম ক্ষেত্র- বিশেযে সরলতর করা যেতে পারে, এও মানি। কিন্তু কোনও লেখক (যত বড়ই হন) অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে ভুল প্রয়োগ করলেই বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে তা মানি না। শব্দের প্রতিষ্ঠিত অর্থ বিকৃত করার চাইতে অশুদ্ধ নূতন শব্দের প্রয়োগও মন্দের ভাল।

৪নং পত্র। এক সাধারণ জন পোস্টকার্ড লিখে জানতে চেয়েছিলেন 'শিক্ষক, পক্ষে, লক্ষ্য, দক্ষতা' স্থানে 'শিক্‌খক, পক্‌খে, লক্‌খ, দক্‌খতা' বানান ব্যবহার ভুল কিনা। তারই এই দুই বাক্যের উত্তর।

ভাষা-বানান-শব্দপ্রয়োগের মূলমন্ত্র এই দুটি বাক্যে নিহিত। সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অবশ্যই কাম্য। তবে নয়ও। কারণ তার অবধারিত ফল যথেচ্ছাচার, anarchy। এই দুই বাক্যে তারই দৃঢ় সংকেত। —স:

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
উৎপদ্যমান—যা উৎপন্ন হচ্ছে।	উৎপাদ্যমান—যা উৎপাদন করা হচ্ছে।
ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়মাণ—যা ঘুরছে।	ঘূর্ণ্যমান—যাকে ঘোরানো হচ্ছে।
প্রতীক্ষমাণ—যে প্রতীক্ষা করছে।	প্রতীক্ষ্যমান—যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে।
সেবমান—যে সেবা করছে।	সেব্যমান—যে সেবিত হচ্ছে।

চাল্যমান—যাকে চালানো হচ্ছে। কর্তৃবাচ্যএর শানচ্ যুক্ত রূপ হয় না। কিন্তু চাল্যমানের অর্থ বিকৃত না করে যদি উল্লিখিত শব্দাবলীর নকলে চলতি অর্থে চলমান লেখা হয় তা মন্দের ভাল। যদি আরোহী বা আরোহণশীল অপছন্দ হয় এবং শানচ্ প্রত্যয়ের প্রতি একান্ত ঝোঁক থাকে, তবে আরোহ্যমাণ-এর অর্থে হস্তক্ষেপ না করে ব্যাকরণবিরুদ্ধ আরোহমাণ করাও মন্দের ভাল মনে করি।

ভ্রাম্যমাণ—-ণ হবে। প্রবহমান সংস্কৃত নয়, সেজন্য ন বিধেয়। একাধিক—একের চাইতে বেশী। লক্ষ, লক্ষ্য,—অর্থের ভেদ থাকলেও বাঙলা প্রয়োগে প্রায় সমান। অনুরূপ—উপলক্ষ্য,—লক্ষ।

চলন্তিকা ৮ম সংস্করণের প্রুফ সুদক্ষ লোক দেখে দিয়েছেন, বোধ হয় ছাপার ভুল নেই বা নগণ্য। ৯ম সং-এ অল্প শব্দ বাড়াবার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু আরও কিছু করবার শক্তি আমার নেই। নূতন অভিধান অনেক লেখা হয়েছে, আরও হবে। আপনি যেমন চান তাও হয়তো হবে। কিন্তু সব অভিধানকারই নিজের রুচি অনুসারে শব্দ সংকলন করেন, সকলকে তুষ্ট করা অসাধ্য।

কাদম্বরী থেকে উদ্ধৃত শব্দাবলী একটা খাতায় টোকা আছে। ঠিক বর্ণানুক্রমে নেই, ছাপাতে হলে সাজিয়ে নিতে হবে, কিছু টিপ্পনীও দিতে হবে। আমার পক্ষে সে কাজ এখন অসাধ্য। যদি করিয়ে নিতে পারেন তো খাতা দিতে পারি।

রা.ব.

❑

প্রকৃত 'সৃজনধর্মী' কাজ আর লেখাপড়া নিয়েই সারাজীবন কাটিয়েছেন রাজশেখর। অকাজে লোকের সঙ্গে মেশা, একই লোকের বারবার সান্নিধ্য এবং বিশেষত কোনও অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বের অনুরোধ সযত্নে পরিহার করে গেছেন চিরকাল। প্রবলতম আপত্তি ছিল কোনও সংবর্ধনা নেওয়ায়।

চৌরঙ্গি রোডের একদা বিখ্যাত সপ্তাহব্যাপী কংগ্রেস উৎসবে প্রতিদিন এক গুণিজন সংবর্ধনা হত। বাড়িতে একেবারে দোতলার ঘরে তার অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হলেন কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ;—'দশ মিনিট থাকবেন, ইচ্ছে হলে কিছু বলবেন, ইচ্ছে না হলে কিছুই বলবেন না।' কিন্তু বিনীত প্রত্যাখ্যান নিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হল।

আশি বছরের জীবদ্দশায় এসবের ব্যতিক্রম হয়েছে সামান্য কয়েকবার।

পরিস্থিতি বদলে গেল ১৯৫৯এর শেষে ঘনঘন এপিলেপটিক ফিটের যন্ত্রণার পর। জীবনে প্রথম দেখা দিল কিছু লোকের সঙ্গে সামান্য বিষয়ে গল্প করার প্রবণতা। ১৯৫৬এ লেখা পরশুরামএর বটেশ্বরের অবদান গল্পের—'বটেশ্বরের কোথাও যাবার জো নেই, কথা কইবার লোকও নেই। তাঁর অনুরক্ত বন্ধুদের কেউ যদি এখন এসে পড়েন তো তিনি খুশী হন'—সত্য হয়ে উঠল রাজশেখর বসুর জীবনে। এই সময়ে প্রায়ই সন্ধ্যায় সদলবলে হাজির হতেন শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। এককালের এক নিতান্ত অমিশুক ব্যক্তি প্রায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন এই আড্ডার জন্য।

৪২ বৎসর আগের কথা, ছবির মতন মনে আছে—একদিন গজেন্দ্রবাবু বলে ফেললেন—আপনি কিছুতেই যখন কোথাও যাবেন না, আমরাই আপনার বাড়িতে এসে সংবর্ধনা দোব। এক না হলেও দুই, বড় জোর আড়াই কথায় রাজী হয়ে গেলেন। রবিবার, ১০ই জানুআরি ১৯৬০ দিন স্থির, যদিও ৮০ পূর্তি ১৬ই মার্চ। আমাকে আড়ালে বললেন—এরা আর সবুর করতে সাহস করলে না, যদি মারা যাই!

গজেন্দ্রবাবু ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের উদ্‌যোগে অনেক সাহিত্য-জ্যোতিষ্কের সমাবেশে বকুলবাগানের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল সংবর্ধনা সভা। তারই এই উত্তর। জীবনে প্রথম ও শেষ আত্মবিশ্লেষণ—মিস্ত্রী-কেরানী, শিশুসাহিত্যের মতন বিপাংক্তেয় পরশুরাম-সাহিত্য ইত্যাদি—সঙ্গে চিরাচরিত সামান্য খোঁচা—'সৃজনধর্মী সাহিত্য'।

শেষ কয়েক মাসে লেখা ৪/৫টি প্রবন্ধ ছাড়া ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সাধারণের জন্য এই তাঁর সর্বশেষ রচনা। এই সংকলনের একমাত্র 'ব্যক্তিগত' রচনা। —স: